ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১

এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল)

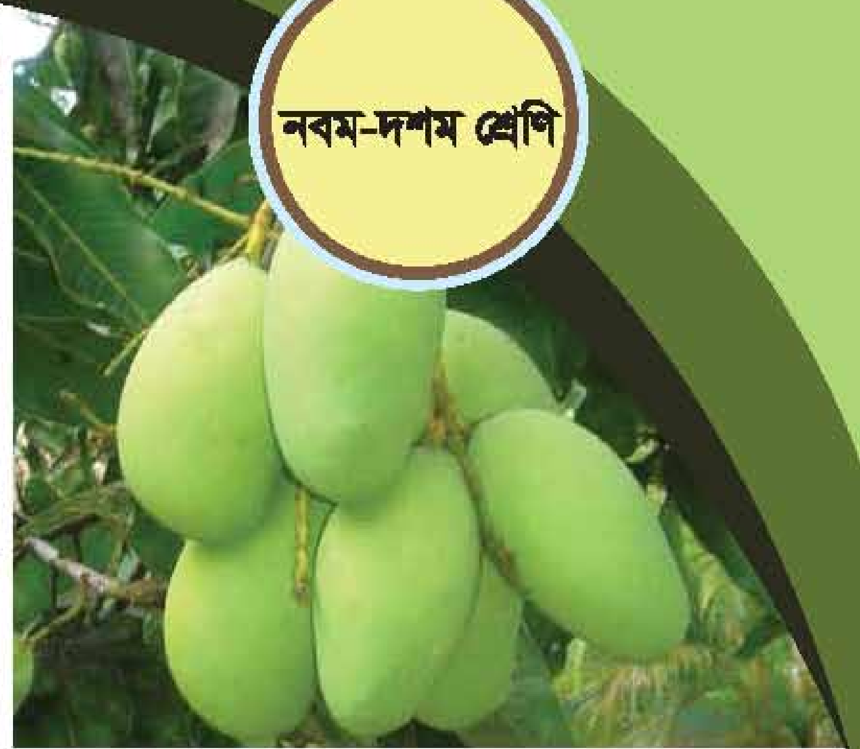

নবম-দশম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত

স্বাধীনতার
সুবর্ণ জয়ন্তী

"যে জাতি স্বাধীনতাকে ভালোবাসে
সে জাতিকে বন্দুক-কামান দিয়ে দাবায়ে রাখা যায় না।"
-বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল)
ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১

Fruit and Vegetable Cultivation-1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র
নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক
মো: আলাউদ্দিন পিকে
বিএসসি এজি (অনার্স), এমএসসি এজি, বাকৃবি
বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার
শাক সবজি উৎপাদন প্রশিক্ষণ (জাপান)
পেষ্ট সার্ভিলেন্স ট্রেনিং (ইন্দোনেশিয়া)
মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ (চীন)

সম্পাদক
ড. মো: জাফর উলাহ
অধ্যাপক
শের-ই-বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

পরিমার্জনায়
প্রফেসর ড. মো: আব্দুল আলীম
ফুড টেক্নোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বার্ডে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণেঃ

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজ্জীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিকস্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনালস্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনালস্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ বছর উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রচ্ছদ ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র

অধ্যায়	তাত্ত্বিক বিষয়ের বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রথম	সবজির পরিচিতি ও গুরুত্ব	১–১৫
দ্বিতীয়	সবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব	১৬–৩৩
তৃতীয়	সবজি উৎপাদন সমস্যাসমূহ ও সম্ভাব্য সমাধান	৩৪–৪৯
চতুর্থ	সবজির বীজতলা তৈরি, বীজের বিশুদ্ধতা ও বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা	৫০–৬৬
পঞ্চম	সবজির চারা উৎপাদন ও রোপণ এবং অঙ্গজ বংশ বিস্তার	৬৭–৭৮
ষষ্ঠ	সবজি চাষের সাধারণ নিয়মাবলি	৭৯–১১৩
সপ্তম	বেগুন ও টমেটোর চাষ	১১৪–১২০
অষ্টম	ফুলকপি ও বাঁধাকপির চাষ	১২১–১২৮
নবম	মূলা, লালশাক, ডাঁটাশাক, পালংশাক চাষাবাদ	১২৯–১৩৭
দশম	লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া ও শশার চাষাবাদ	১৩৮–১৫০
একাদশ	ঝিঙা, চিচিংগা, পটল ও করলার চাষাবাদ	১৫১–১৬২
দ্বাদশ	শিম, বরবটি, ঢেঁড়শের চাষাবাদ	১৬৩–১৭১
ত্রয়োদশ	গোল আলুর চাষ	১৭২–১৮০
ব্যবহারিক		১৮১–২১১

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়	তাত্ত্বিক বিষয়ের বিবরণ	পৃষ্ঠা
প্রথম	বাংলাদেশে সবজি চাষের বর্তমান অবস্থা	২১৩–২১৯
দ্বিতীয়	সবজির শ্রেণিবিভাগ	২২০–২২৭
তৃতীয়	পুষ্টি চাহিদা পূরণে সবজির ভূমিকা	২২৮–২৩৬
চতুর্থ	সবজি চাষের সাধারণ নিয়মাবলি	২৩৭–২৮৪
পঞ্চম	কাঁকরোল ও ধুন্দলের চাষাবাদ	২৮৫–২৮৯
ষষ্ঠ	মুখীকচু ও লতিরাজ কচু চাষাবাদ	২৯০–২৯৩
সপ্তম	পুঁইশাক ও গিমা কলমির চাষাবাদ	২৯৪–২৯৯
অষ্টম	গাজরের চাষ	৩০০–৩০২
ব্যবহারিক		৩০৪–৩১৬

প্রথম অধ্যায়
সবজির পরিচিতি ও গুরুত্ব

সবজির ধারণা দুটি গ্রীক শব্দ যথা ঃ 'Oleris' অর্থ গুল্মজাতীয় গাছ এবং 'culture' অর্থ চাষাবাদ হতে সবজি সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে ঝোপজাতীয় নরম ও রসালো গাছ যা বিশেষ যত্নসহকারে, সীমিত আকারে চাষ করা হয়। অনেক বিরুৎ বা তৃণলতা ও কিছু কিছু বৃক্ষজাতীয় গাছের বিভিন্ন অংশ সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তবে ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে গাছের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন শ্রেণির সবজিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমনঃ

- পাতাজাতীয় সবজি ঃ উদাহরণ- পুঁইশাক, লালশাক, ধনে পাতা, লেটুস, বাঁধাকপি, কচুশাক, সজিনা পাতা, কুমড়া ও লাউ পাতা শাক, থানকুনি, শুষনি শাক, পুদিনা, পালংশাক ইত্যাদি।
- মূলজাতীয় সবজি ঃ উদাহরণ- গাজর, মূলা, শালগম, বিট ইত্যাদি।
- টিউবার বা কন্দজাতীয় সবজি ঃ উদাহরণ- গোল আলু, মেটে আলু, মুখি কচু, ওলকচু, মানকচু ইত্যাদি।
- ফলজাতীয় সবজি ঃ উদাহরণ- পেঁপে, টমেটো, বেগুন, লাউ, চাল কুমড়া, ঝিঙ্গা, চিচিংগা, করলা, কাঁকরোল, ঢেড়শ, পটল, বরবটি, শশা ইত্যাদি।
- কাণ্ডজাতীয় সবজি-উদাহরণ ঃ ডাটা শাক, কচি বাঁশ, পুঁই, ডাটা, কলা গাছের শাঁস ইত্যাদি।
- ফুল জাতীয় সবজি ঃ উদাহরণ-ফুলকপি, ব্রকোলি, বকফুল, কুমড়া ফুল, কলার মোচা ইত্যাদি।
- বীজজাতীয় সবজি ঃ উদাহরণ- মটরশুটি, শিম, কাঁঠালের বীজ ইত্যাদি।

বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত শাকসবজি

বাংলাদেশে প্রায় ৬০ ধরনের শাকসবজি পাওয়া যায় (সারণি-১)। কিন্তু সবগুলো চাষাবাদ করা যায় না। আদিকালে যখন মাঠে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন হয়নি, তখন মানুষ জঙ্গল হতে বিভিন্ন গাছের লতাপাতা, কাণ্ড, ফুল, মূল ইত্যাদি সবজি হিসেবে আহরণ করে জীবন ধারণ করতো।

সারণি-১

শাক-সবজির নাম	শাক-সবজির নাম	শাক-সবজির নাম	শাক-সবজির নাম
কাঁচকলা	পেঁয়াজ পাতা	লালশাক	সাজিনা শাক
কলমী শাক	ওলকপি	মিষ্টিআলু	কলার মোচা ও শাঁস
গ্রীষ্মকালীন বাঁধাকপি	চিনা বাঁধাকপি	ফুলকপি	ফার্ন শাক
চালকুমড়া	মূলা	বাঁধাকপি	শাপলা ফুল, বক ফুল
চিচিঙ্গা	গাজর	ব্রকোলি	সর্ষে শাক
ঝিঙ্গা	শালগম	খেসারি শাক, মটর শাক	টমেটো
পানি, দুধ ও মৌলভী কচু	বীট	থানকুনী	লাউ
ঢেঁড়শ	লাউশাক	পেঁপে	কাঁকরোল
বরবটি	আলু	পটল	ধুন্দল
মুখীকচু	মেটে আলু	পুঁইশাক	শিম
মানকচু	শিমুল আলু	পুদিনা	মটরশুটি

ওলকচু	লেটুস	বেগুন	বথুয়া শাক
মিষ্টিকুমড়া	ধনিয়া পাতা	সাজিনা	নটেশাক
শশা	পালংশাক	হেলেঞ্চা	পেচাই শাপ
উচ্ছে ও করলা	মাসরুম	ডাঁটা	পাটশাক

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে কোটি কোটি মানুষ দৈহিক ও মেধা সম্পর্কিত বহুবিধ অসুখ বিসুখে ভূগছে। খাদ্যে ভিটামিন 'এ', 'বি', 'সি', লৌহ, ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের অভাবেও মানুষ নানাবিধ রোগ আক্রান্ত হচ্ছে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। এর মধ্যে শুধু ভিটামিন 'এ'র অভাবে বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রায় সব ধরনের সবজিতেই সব ধরনের কম বেশি ভিটামিন ও বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বিদ্যমান, যা মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

মানুষের শরীরের বহু ধরনের অসুস্থতা দূর হতে পারে অধিক পরিমাণ শাক-সবজি খাওয়ার মধ্য দিয়ে। কেননা পুষ্টিমান ও স্বাদে টাটকা শাক-সবজির জুড়ি নেই। শরীরের পুষ্টির সিংহভাগ আমরা এখান থেকেই পেয়ে থাকি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউট ঘোষণা দিয়েছে যে যত বেশি সবজি ও ফল খায়, ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও তার ততই কম। এছাড়া এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে নিরামিষভোজীরা দীর্ঘজীবি হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে খনিজ পদার্থযুক্ত খাদ্যের প্রাপ্যতা অনেকটা কম। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদিতে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ থাকলেও এগুলোর উচ্চমূল্যের কারণে দরিদ্রদের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের জন্য ফল ও সবজির ওপর তাদেরকে নির্ভর করতে হয় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির বৃহৎ অংশ এখান থেকেই পুষ্টি পেয়ে থাকে। এদেশে আবহাওয়া ঋতুভিত্তিক হলেও ঋতু বৈচিত্রের সাথে মিল রেখে হরেক রকমের শাক-সবজি উৎপন্ন হয়। অধিক পরিমাণে সবজি গ্রহণ খাদ্যকে সুষম করে। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে খাদ্যের মোট ক্যালরির অন্তত ৫% ফল ও সবজি থেকে আসা উচিত। এতে যে পরিমাণ সবজি খেতে হবে, তা দেহের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের চাহিদাও পূরণ করতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশে দৈনিক মাথাপিছু শাক-সবজির প্রাপ্যতা প্রায় ৭০ গ্রাম (আলুসহ) অথচ জাপানের লোকেরা প্রতিদিন গড়ে ৪২৫ গ্রাম সবজি খেয়ে থাকে। বাংলাদেশে অনেক পত্রবহুল সবজি ভিটামিন সমৃদ্ধ। আমাদের দৈনন্দিন চাহিদাকৃত কিলোক্যালরীর ২১২২-এর প্রায় ৭৫% যোগান পাই দানাদার খাদ্য হতে, আর বাকী ২৫% পাই ফলমূল, ডাল-তেল ও শাকসবজি হতে। সেজন্য প্রতিদিন আমাদের অন্তত ২০০ গ্রাম শাক-সবজি খাওয়া উচিত। কিন্তু আমরা পাই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। যেহেতু উৎপাদন কম হয়। আমাদের ও এশিয়ার উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য গ্রহণের তুলনামূলক চিত্র দেখলে সহজে বুঝা যাবে যে আমাদের অবস্থান কত নিচে। কারণ এ বিষয়ে আমাদের পরিকল্পনা, গবেষণা ও সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

দেশের অবস্থান	দানাজাতীয় খাদ্য গ্রহন (%)	শাকসবজি জাতীয় খাদ্য গ্রহণ (%)	পশু খাদ্য (%)
উন্নত দেশ	২৩%	৪৭%	৩০%
উন্নয়নশীল দেশ	৬০%	৩০%	১০%
বাংলাদেশ	৬৬%	৩০%	৪%

২০২২

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সভ্যতার বিকাশ, মানুষের চাহিদা, রুচির পরিবর্তন, আবহাওয়ার বৈচিত্রতা, সবজি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও পরিবহন ইত্যাদির ধরন ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে। বিজ্ঞানের উন্নতি, প্রতিযোগিতা ও টেকসই প্রযুক্তির কারণে শাক-সবজি, ফলমূলের উৎপাদন মৌসুম, চাষের ধরন, একক জমিতে ফলন বৃদ্ধি, আকার, রং, পুষ্টির পরিমাণ ইত্যাদির উৎকর্ষ সাধন হচ্ছে। এর ফলে অনেক পুরাতন শাক-সবজির চাষ কমে যাচ্ছে এবং নতুন ধরনের শাক সবজির প্রবর্তন হচ্ছে। যেমন: দেশি সবুজ বেগুন, কাটুয়া ডাটা, দেশি লাল মূলা, দেশি পেঁপে, বথুয়া ও কাটানটে শাক, দেশি কচুশাক ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে কমে যাচ্ছে। অপরদিকে গাজর, গিমা কলমী, গ্রীষ্মকালীন পিয়াজ ও বাঁধাকপি, হাইব্রিড করলা, লাউ ও শশা ইত্যাদির প্রবর্তন হচ্ছে।

খাদ্য হিসেবে সবজির গুরুত্ব

মানুষ সবজিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করলেও খাদ্য হিসেবে এর গুরুত্ব সর্বাধিক, কারণ সবজিতে খাদ্যমান বেশি এবং সহজে আহরণ উপযোগী হয়। খাদ্য হিসেবে সবজির গুরুত্ব বেশি হওয়ার কারণগুলো হলো—

(ক) খাদ্যমান- শাকসবজিতে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান।

(খ) প্রোটিনের উৎস হিসেবে শাক সবজি- সবজিতে প্রোটিনের পরিমাণ সাধারণত শতকরা ২ ভাগের মতো। কিন্তু শিমজাতীয় সবজিতে এর পরিমাণ বেশি।

(গ) পানি ও আঁশের উৎস হিসেবে শাক সবজি-বাঁশ, ঢেঁড়শ, মিষ্টিআলু শাকে আঁশ আছে এবং ফল ও পাতা জাতীয় সবজিতে প্রচুর পানি থাকে।

(ঘ) ক্যালোরির উৎস্য হিসেবে সবজি- দানা ফসলের তুলনায় একক জমিতে শ্বেতসার সমৃদ্ধ সবজি বেশি উৎপাদন সম্ভব। সবজির মধ্যে শিম, মটরশুটি, কাঠালের বীজ ইত্যাদি যথেষ্ট ক্যালরি সমৃদ্ধ।

(ঙ) ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের উৎস পত্রবহুল সবজি- এ জাতীয় সবজি ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ। মানুষের দেহের বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ, শরীরকে সুষ্থ ও কর্মক্ষম রাখার জন্য সুষম খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। তাই এজন্য একজন ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

[একজন ব্যক্তির (প্রাপ্ত বয়স্ক) দৈনিক খাদ্য তালিকা]

খাদ্যের নাম	পরিমাণ (গ্রাম)	খাদ্যের নাম	পরিমাণ (গ্রাম)
চাল	২৩৫	সবজি	১১৫
গম/আটা	১১৫	মাছ	৩০
আলু/মিষ্টি আলু	২৪০	তেল	১৫
ডাল	১১৫	ফলমূল	৬০
শাক	১২০		

মানুষের শরীরের তাপমাত্রা রক্ষা এবং দৈনন্দিন শারীরিক ও মানসিক কাজকর্ম করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা শর্করা ও স্নেহ জাতীয় উপাদান হতে সরবরাহ পায়। নিচে শর্করা ও স্নেহ সরবরাহকারী শাক-সবজির তালিকা দেয়া হলো—

২০২২

শর্করা সমৃদ্ধ সবজি	স্নেহ/চর্বি সমৃদ্ধ সবজি
কচু জাতীয় সবজি-২৪.৪ গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে	করলা-০.১ গ্রাম/প্রতি ১০০ গ্রামে
মটরশুঁটি-২৩.৭ গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে	সেজন ২.৯ গ্রাম গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে
গোল আলু ১৯.১ গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে	ফুলকপি ০.১ গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে
মিষ্টি আলু ২১.৬ গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে	কচুশাক ১.৫ গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে
কাঁকরোল ১৭.৪ গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রামে	

পুষ্টির জন্য শাকসবজির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিভিন্ন পুষ্টির উৎসভিত্তিক চিত্র দেয়া হলো।

শাকসবজির গুরুত্ব

পুষ্টিমানের উন্নয়ন ঃ ভিটামিন "এ" এর উত্তম উৎস। প্রতি ১০০ গ্রা. ভক্ষণযোগ্য অংশে বিটা ক্যারোটিনের তুল্য পরিমাণ (মিগ্রা. হিসাবহার)

ভিটামিন "বি" এর উত্তম উৎস (থায়ামিন, রাইবোফ্লাবিন এবং নায়াসিন) ১০০ গ্রা ভক্ষণযোগ্য অংশে (মিগ্রাঃ হিসাবহার)

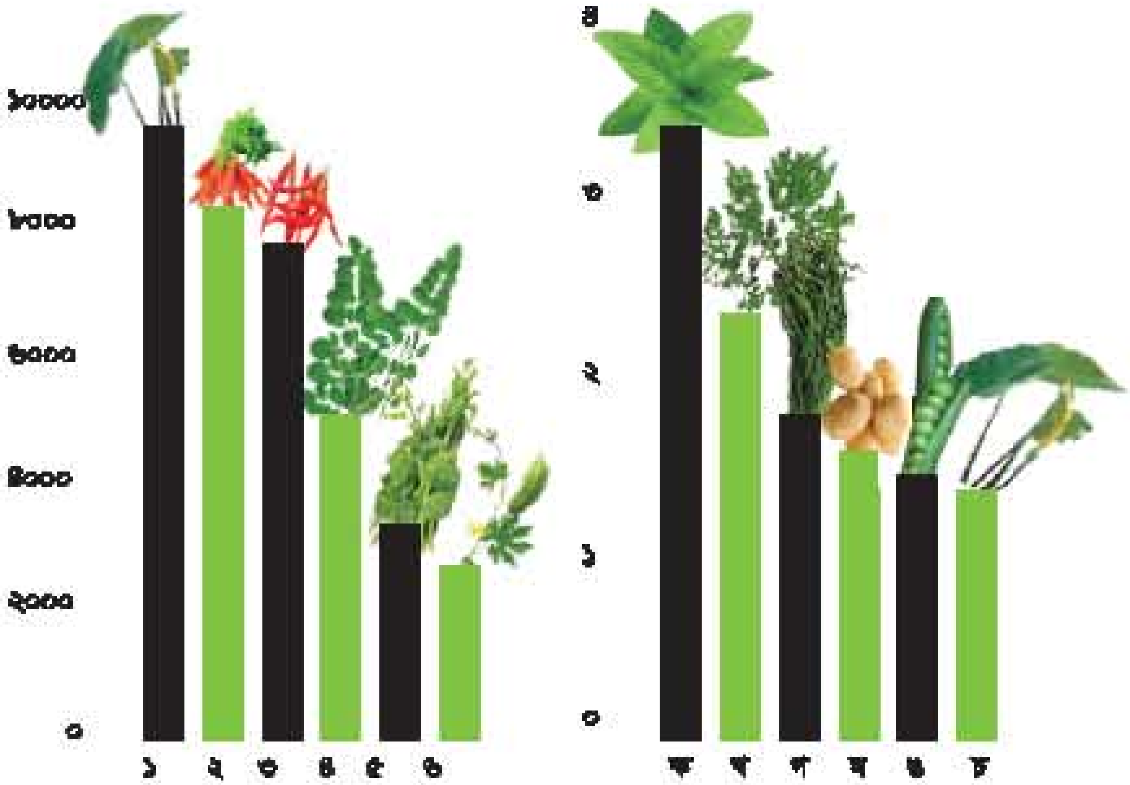

১ - কচু (পাতা)
২ - গাজর (মূল)
৩ - লাল মরিচ
৪ - ম্যালানগাই (পাতা)(ম্যালানগাই হচ্ছে সজিনা বা মরিঙ্গা জাতীয় পাতা।)
৫ - পুঁইশাক (কচি পাতা)
৬ - করল্লা (শীর্ষ এবং কচি পাতা)

১ - পুদিনা পাতা
২ - ম্যালানগাই
৩ - বরবটি
৪ - আলু
৫ - গো-মটর
৬ - কচু

ভিটামিন "সি" এর উৎস, ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে এসকোরবিক এসিড সিদ্ধ করার পর প্রাপ্ত মিলিগ্রাম

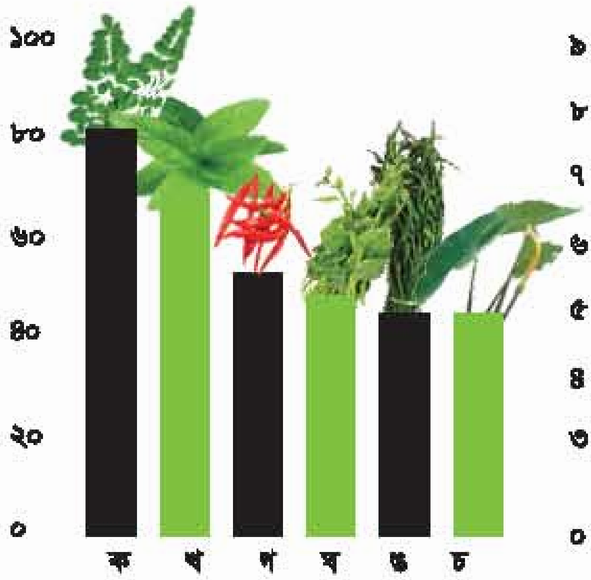

আয়রণ এর ভাল উৎস সিদ্ধ করার পর প্রতি ১০০গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে প্রাপ্ত মিলিগ্রাম

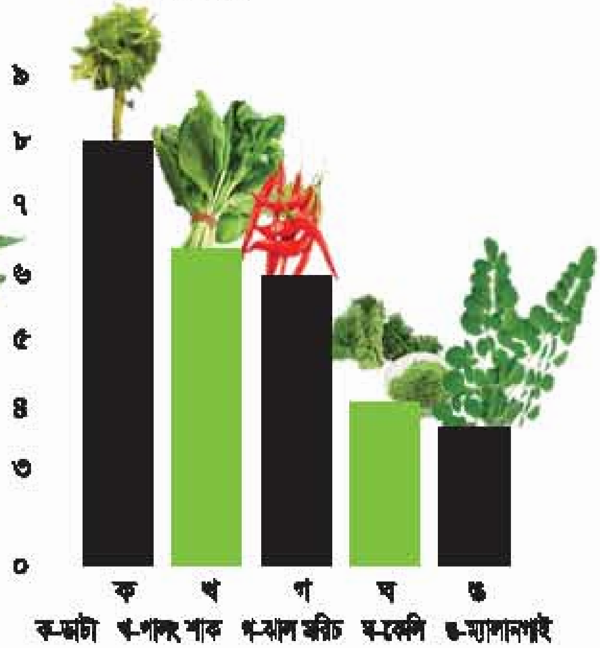

ফল জাতীয় সবজি

% আর্দ্রতা-শাক সবজিতে শরীরের প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যায়।

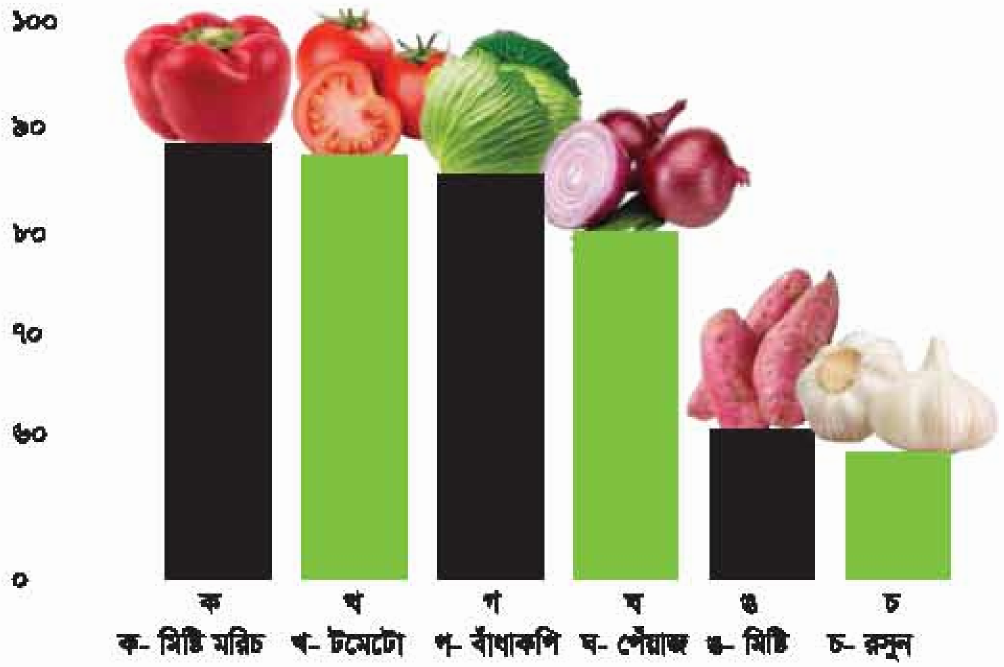

মূল জাতীয় সবজি

সিদ্ধ করার পর প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে প্রাপ্ত আঁশ (গ্রাম)

ক. বাঁশ খ. অরহর গ. মিষ্টি আলু ঘ. মুগ কলাই ঙ. লাল বীন চ. সাজিনা

আয়োডিনের ভাল উৎস-ঢেঁড়শ, পেঁয়াজ, শতমূলী

রক্তশূন্যতা রোধে- ম্যালানপাই (সাজিনা পাতা), কালোকচু, লালশাক, কাঁচা কলা। রাতকানা রোধে- গাজর, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়া। বাতরোগ রোধে- রসুন।

ঔষধ হিসেবে সবজি: উচ্চ রক্তচাপ হ্রাসে রসুন

- পাতা জাতীয় সবজি (বোঁটা ও কচি বিটপ)

পুঁইশাক

সরিষা

গিমাকলমী

কেলি

মূল, কন্দ, টিউবারজাতীয় সবজি

মূল/বাল্ব/টিউবারসমূহ

মূলা

পিঁয়াজ

রসুন

গোল আলু

ফল জাতীয় সবজি

বেগুন

তরমুজ

টমেটো

স্কোয়াশ

ফুল জাতীয় সবজি - ব্রোকলী স্কোয়াশ সরিষা ফুলকপি

বীজ জাতীয় সবজি - পল্লবিত মুগডাল বীজ জাতীয় সবজি মটরশুটি বরবটি

শীতকালীন সবজি - শতমূলী ব্রাসেলস স্প্রাউট লেটুস ওলকপি

গ্রীষ্মকালীন সবজি - ডাটাশাক বরবটি শশা মূলা

বাংলাদেশে প্রচলিত শাক-সবজির উৎপাদনের জায়গা, বপন বা রোপণ সময়, সগ্রহ সময় ও সংগ্রহ করার পদ্ধতি ও পারিপার্শ্বিক অবকাঠামো।

বাংলাদেশে শাক-সবজি উৎপাদন বিভিন্ন পরিবেশ, এলাকা, জমির অবস্থান, আবহাওয়া ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল।

(ক) উচ্চমূল্য ও দ্রুত বর্ধনশীল শাক-সবজি-শহর এলাকার আশেপাশে লালশাক, ডাটাশাক, পুঁইশাক, গীমা কলমি, ঢেঁড়শ, কপিজাতীয় সবজি ইত্যাদি বেশি চাষাবাদ হয়ে থাকে।

(খ) নিচু, পানি জমা ও স্যাঁতসেঁতে এলাকায় কলমিশাক, কচু লতি, শাপলা, শালুক, পানি কচু, মৌলভী কচু ইত্যাদি জন্মে থাকে।

(গ) শীতকালে- বেগুন, লাউ, শিম, পালংশাক, মূলা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকোলি, লেটুস, টমেটো, আলু ইত্যাদি চাষাবাদ হয়ে থাকে।

(ঘ) গ্রীষ্মকালে- পটল, ঝিঙা, করলা, শশা, চিচিঙ্গা, ডাটাশাক, পুঁইশাক, পেঁপে ইত্যাদি চাষাবাদ হয়ে থাকে।

বীজ বপন ও চারা রোপণ- উভয় পদ্ধতিতে শাক-সবজি উৎপাদন করা হয়। শাক-সবজির সাথে অন্যান্য ফসলের চাষাবাদ ও সংগ্রহ পদ্ধতির অনেক পার্থক্য আছে। সাধারণত ধান ব্যতীত কিছু কিছু দানাজাতীয়, তেলজাতীয়, ডালজাতীয় ও আঁশ উৎপাদনকারী ফসল সরাসরি বপন করা হয়ে থাকে। কিন্তু শাক-সবজির ক্ষেত্রে কিছু কিছু শাক-সবজি ব্যতিত অধিকাংশ শাক-সবজিরই চারা উৎপাদন করে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। শাক সবজি ব্যতিত অনেক ফসল একসাথে কেটে বা সম্পূর্ণ গাছ উঠায়ে সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু শাক-সবজি সাধারণত একসাথে উঠানোর উপযোগী হয় না। যেমন- ঢেঁড়শ, বেগুন, শিম, বরবটি, করলা, চিচিংগা, ঝিঙা, ধুন্দল, বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদি।

বাংলাদেশে সবজি চাষের অধীন জমি ও নিদৃষ্ট নিয়মে রোপণ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পাওয়া কঠিন। কেননা আমাদের প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ কৃষক পরিবার আছে। তারা মাঠে খাদ্য শস্য আবাদ ও সবজির আবাদ করার পাশাপাশি বাসাবাড়ির আশপাশ, ঘরের চাল, বাড়ির দেউড়ি, বেড়ার উপর বা অন্য গাছের উপর বাইয়ে দেওয়া গাছ হতে বা অন্যভাবে সবজির একটি বড় অংশ পেয়ে থাকে।

কোন কোন ক্ষেত্রে জমির আইল বা অন্য ফসলের সাথে মিশ্রভাবে সবজি চাষ করা হয়ে থাকে। এভাবে চাষের ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয় না। তবে বাণিজ্যিক বা সফলভাবে উৎপাদন করতে হলে পরিকল্পিতভাবে চাষাবাদ করতে হবে। বাংলাদেশে উৎপাদিত শাক-সবজির প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক বপন বা রোপণ সময়, সংগ্রহ বা উঠানোর সময় ও সংগ্রহ বা উঠানোর পদ্ধতি সম্পর্কে নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

বপন ও সংগ্রহ সময়

ফসলের নাম	বপন/রোপণ সময়	সংগ্রহ সময়	মন্তব্য
শাক জাতীয় ফসল। ১। বাঁধাকপি	ভাদ্র-কার্তিক	অগ্রহায়ন-পৌষ	মাসাধিককাল ধরে বারে বারে তোলা হয়।
২। পালংশাক	ভাদ্র-অগ্রাহায়ন	কার্তিক-মাঘ	সারা বছর করা যায়।

১। লাল শাক	সারা বছর	বপনের ১ মাসের মধ্যে	সারা বছর করা যায়।
২। কলমী শাক	চৈত্র-আষাঢ়	বৈশাখ-আশ্বিন	১ম বীজ বুনে ৩০ দিন পর। পরে ১৫ দিন পর পর ২/৩ বার।
৩। পুঁই শাক	ফাল্গুন-শ্রাবণ	চৈত্র-আশ্বিন	একবার রোপণ করে ৮/১০ বার ২০-২৪ সেমি. করে ডগা কাটা যায়।
৪। লেটুস	কার্তিক অগ্রাহায়ন	মধ্য অগ্রাহায়ন মধ্য মাঘ।	রোপণের ১মাস পর তোলা যায়।
৫। মূলা শাক	আশ্বিন অগ্রাহায়ন	কার্তিক-পৌষ	বীজ বপনের ৩ সপ্তাহ পর হতে তোলা যায়।
৬। লাউ শাক	ভাদ্র-আশ্বিন	কার্তিক-ফাল্গুন	গাছ বেশি বৃদ্ধি পেলে পাতা, ডগা কাটা যায়।
৭। ডাঁটা শাক	মাঘ-জৈষ্ঠ	চৈত্র-আষাঢ়	সারা বছর বারে বারে উঠানো যায়।
৮। পাটশাক	ফাল্গুন-চৈত্র (দেশি)	চৈত্র-বৈশাখ বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য	বপনের ১ মাস পর পাতলা করার সময় ছোট গাছ শাক হিসেবে নেওয়া যায়।
৯। চিনা বাঁধাকপি	চৈত্র-বৈশাখ (তাষো)	কার্তিক-পৌষ	বারে বারে তোলা হয়।
১০। সাজিনা শাক	চৈত্র-বৈশাখ	আষাঢ়-শ্রাবন	নতুন পাতা গজানোর পর
১১। পুদিনা পাতা	ভাদ্র-কার্তিক	শ্রাবণ অগ্রাহায়ন	রোপণের ২ মাস পর হতে সংগ্রহ করা যায়।
১২। বথুয়া শাক	কার্তিকের ২য়, ৩য় সপ্তাহ	অগ্রহায়ন-পৌষ	২-১টা ফুল দেখা দিলে শাক উঠাতে হয়।
১৩। মটর খেসারীশাক	আশ্বিন কার্তিক/কার্তিক অগ্রাহায়ন	অগ্রাহায়ন পৌষ/অগ্রাহায়ন -পৌষ	২-১টা পড় দেখা দিলে শাক উঠাতে হয়।
১৪। থানকুনী/ শুষনি শাক	বৈশাখ-জৈষ্ঠ	জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়	বপনের ১ মাসে শাক তোলা যায়।
১৫। বাটিশাক	বৈশাখ-জৈষ্ঠ	আষাঢ়-শ্রাবণ	বপনের ১ মাসে শাক তোলা যায়
কন্দ, ফুল ও ফল জাতীয় ফসল			
১। আলু	কার্তিক অগ্রহায়ন	মাঘ-চৈত্র	দেশের উত্তরাঞ্চলে মধ্য কার্তিক, দক্ষিনাঞ্চলে অগ্রাহয়ন মাসে সংগ্রহ করা যায়।
২। পানিকচু	ফাল্গুন-চৈত্র	আষাঢ়-ভাদ্র	শীতে রোপণ করলে ফাল্গুন চৈত্রে লতি সংগ্রহ করা যায়।
৩। মুখীকচু	মধ্যমাঘ-মধ্য ফাল্গুন	শ্রাবণ-ভাদ্র	রোপণের ৫-৬ মাস পর পাতা হলুদ হয়ে মরতে থাকলে কচু সংগ্রহ করা যায়।
৪। ফুলকপি	ভাদ্র-কার্তিক	কার্তিক-মাঘ	চারা রোপণের ৪০-৮০ দিন পরই জাতভেদে কপি সংগ্রহ করা যায়।

২০২২

৫। ব্রকোলি	মধ্য আশ্বিন-মধ্য অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ন-মাঘ	চারা রোপণের ৩ মাসের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। একে সবুজ ফুলকপিও বলে।
৬। ওলকপি	ভাদ্র-অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ন-মাঘ	চারা রোপণের ৫০-৬০ দিনে তোলা যায়। বেশি বিলম্ব হলে কপি শক্ত হয়ে যায়।
৭। শালগম	কার্তিক-অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ন-মাঘ	সরাসরি বীজ বপন করা উত্তম। এতে বীজ বপনের অগ্রহায়ন ৫০-৬৫ দিনে সংগ্রহ করা যায়। বিলম্বে মুল শক্ত হয়ে যায় ও আঁশ হয়।
৮। মূলা	আশ্বিন-অগ্রহায়ন	কার্তিক-মাঘ	বীজ বপণের ৬-৭ সপ্তাহ পর হতে তোলা যায়। কিছু জাতে ২ মাস পরে ভিতরে ফাঁপা হয়ে যায়।
৯। গাজর	ভাদ্র-কার্তিক	কার্তিক-মাঘ	বীজ বপনের ৩ মাস বয়সে সংগ্রহ করা যায়। তবে ৪ মাসে পরিপূর্ণ পরিপক্ক হয়। যা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার উপযোগী হয়।
১০। বেগুন	ভাদ্র-মধ্য অগ্রহায়ন	কার্তিক-মাঘ	চারা রোপণের ৪০-৫০ দিনে ফল ধরে। তবে বেগুন সারা বছর চাষ করা যায়।
১১। শশা	মধ্য মাঘ-মধ্য আশ্বিন	চৈত্র-কার্তিক	সালাদের জন্য কচি অবস্থায়, তরকারির জন্য মাঝারি পরিপুষ্ট ও পায়েশের জন্য পাকা অবস্থায় উঠাতে হয়।
১২। বীট	মধ্য আশ্বিন-মধ্য পৌষ	অগ্রহায়ন-ফাল্গুন	বীজ বপনের ৮০-৯০ দিনে তোলা যায়। বিলম্বে মূল শক্ত হয় এবং আঁশ হয়ে যায়।
১৩। বরবটি	মধ্য মাঘ-মধ্য আশ্বিন	চৈত্র-কার্তিক	বীজ রোপণের ৫০-৬০ দিনে ফুল ও ফল ধরে এবং ৪-৫ দিনেই সংগ্রহ করার উপযোগী হয়।
১৪। ঢেঁড়শ	ফাল্গুন-বৈশাখ	বৈশাখ-ভাদ্র	বীজ রোপণের ৬-৮ সপ্তাহে ফল আসে। ৪-৫ দিনেই ফল সংগ্রহ করতে হয়। অন্যথা আঁশ হয়ে খাবার অনুপোযোগী হয়ে যায়।
১৫। লাউ	ভাদ্র-আশ্বিন	কার্তিক-ফাল্গুন	সারা বছর চাষ করা যায়। বীজ রোপণের ৬-৮ সপ্তাহ পর ফল আসে এবং ১৫ দিনেই সংগ্রহপযোগী হয়। বিলম্বে শক্ত হয়ে যায়।
১৬। চালকুমড়া	মধ্য মাঘ-ভাদ্র	চৈত্র-আশ্বিন	বীজ রোপণের ২ মাসে ফল আসে এবং ১০-১৫ দিনে সংগ্রহ করা যায়। তবে বোঁটার নিকট চুনা/সাদা ভাব দেখা দিলে তরকারি খাওয়া যায় না। তখন আরও পরিপক্ক করে মোরব্বা হিসেবে ব্যবহার করতে হয়।
১৭। মিষ্টিকুমড়া	ভাদ্র-মাঘ	অগ্রহায়ন-চৈত্র	বীজ রোপণের ৭-৮ সপ্তাহেই ফুল আসে এবং ফল প্রায় ৩ সপ্তাহে তোলা যায়। তবে সম্পূর্ণ পরিপক্ক করে উঠালে ৩-৪ মাস সংরক্ষণ করা যায়।
১৮। চিচিংগা	মাঘ-বৈশাখ	ফাল্গুন-কার্তিক	মাঘ হতে দফায় দফায় বীজ রোপণ করলে ৬-৭ সপ্তাহ পর হতে প্রায় ৬ মাস ধরে তোলা যায়। তবে কচি অবস্থায় উঠাতে হয়।

২০২২

১৯। ঝিঙা	ফাল্গুন-চৈত্র	বৈশাখ-শ্রাবণ	বীজ রোপণের ৬-৭ সপ্তাহ পর হতে ফুল ধরে। কচি অবস্থায় উঠাতে হয়। দেরিতে শক্ত হয়ে যায়।
২০। ধুন্দল	মধ্য ফাল্গুন-মধ্য আষাঢ়	বৈশাখ-কার্তিক	বীজ রোপণের ১.৫-২ মাস পার হতে ফল ধরে। কচি অবস্থায় উঠাতে হয়। অন্যথা আঁশ শক্ত হয়ে যায়।
২১। করলা	মধ্য পৌষ - ভাদ্র	ফাল্গুন-আশ্বিন	বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পর হতে ফসল সংগ্রহ করা যায়। প্রায় ২ মাস ফসল তোলা যায়।
২২। কাঁকরোল	ফাল্গুন-বৈশাখ	জৈষ্ঠ্য-ভাদ্র	চারা গজানোর ২ মাসের মধ্যে ফল ধরে। সবুজ অবস্থায় ফসল তুলতে হয়। একই গাছে ২য় বছর ফল বেশি ধরে।
২৩। পটল	কার্তিক-অগ্রাহায়ন	আষাঢ়-ভাদ্র ফাল্গুন-চৈত্র	ফুল হওয়ার ৭-৮ দিনেই ফল সংগ্রহ করতে হয়। প্রায় ৮-৯ মাস ধরে পটল তোলা যায়।
২৪। টমেটো	আশ্বিন-কার্তিক	পৌষ-মাঘ	চারা রোপণের ৭৫-৮০ দিনে টমেটো সংগ্রহ শুরু হয়। ফলের নিচের অংশে একটু লালচে ভাব দেখা দিলে তোলার উপযোগী হয়। প্রতি গাছ হতে ৭-৮ বার ফল তোলা যায়।
২৫। মানকচু	আষাঢ়-ভাদ্র (বছরের যে কোন সময়)	কার্তিক-ফাল্গুন	বছরের যে কোন সময় সংগ্রহ করা যায়। তবে ১ বৎসর পরে সংগ্রহ করা লাভজনক। ২-৩ বছর পর্যন্ত মাটিতে থাকলে বড় আকার ধারণ করে (১৫-২০ কেজি)।
২৬। ওলকচু	ফাল্গুন-মধ্য বৈশাখ	কার্তিক-অগ্রহায়ন	রোপণের ৬-৭ মাস পর সংগ্রহ করা যায়। ১-২ বছর জমিতে রেখে তুললে খেতে সুস্বাদু হয়, ফলনও বেশি হয়।
২৭। শিম	আষাঢ়-ভাদ্র	কার্তিক-ফাল্গুন	ফুল ফোটার - ২৫-৩০ দিনের মধ্যে শিম তোলার উপযোগী হয়। ৫-৭ দিন পর পর ১৩-১৪ বার গুণগত মান সম্পন্ন শিম তোলা যায়।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১, সবজি শব্দের ব্যাখ্যা কোন দেশীয় শব্দ হতে পাওয়া যায়?

২. ভিটামিন 'এ' এর অভাবে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় কত শিশু অন্ধ হয়ে যায়?

৩. খাদ্যের মোট কত ক্যালরি ফল ও সবজি হতে আসা উচিত?

৪. আমাদের চাহিদাকৃত কিলোক্যালরির কত % দানাশস্য হতে পাই?

৫. পর্যায়ক্রমে চাষ কমে যাচ্ছে এমন ৩টি সবজির নাম লেখ।

৬. নতুনভাবে প্রবর্তিত হচ্ছে এমন ৩টি সবজির নাম লেখ।

৭. সবজিতে সাধারণত কত % প্রোটিন থাকে?

৮. কোন জাতীয় সবজিতে স্বাভাবিক অপেক্ষা প্রোটিনের পরিমাণ বেশি? ২০২২

৯. সারা বছর চাষ করা যায় এমন ১টি সবজির নাম লেখ।

১০. কোন শাক সবজির বীজ বপনের ১ মাসের মধ্যে শাক সংগ্রহ করা যায়?

১১. একজন লোকের দৈনিক কমপক্ষে কতগ্রাম সবজি প্রয়োজন?

১২. পুষ্টি জরিপে গোমেজের রিপোর্ট অনুযায়ী কত % শিশুর স্বাভাবিক ওজন হয়?

১৩. ৫-১৫ বছরের কত শতাংশ শিশু রাতকানায় ভোগে?

১৪. দৈহিক পরিশ্রমীদের জন্য কোন জাতীয় খাদ্য বেশি প্রয়োজন?

১৫. ভ্রূণের মস্তিষ্ক, মাংসপেশি, হাঁড় ইত্যাদি কত মাসের মধ্যে তৈরি হয়?

১৬. শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ৫ মাসে জন্মের ওজনের কতগুণ হওয়া উচিত?

১৭. কত বছর বয়সের পর ডিম ও তৈলজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয়?

১৮. প্রতি বছর কত % আবাদি জমি কমে যাচ্ছে?

১৯. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?

২০. বাংলাদেশে কত কিলোমিটার সড়কপথ আছে?

২১. বাংলাদেশে কতটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে?

২২. খারিফ-১ মৌসুম ইংরেজি মাসের কত তারিখ হতে কত তারিখ পর্যন্ত?

২৩. খারিফ-২ মৌসুম বাংলার কোন মাস হতে কোন মাস পর্যন্ত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. শাক সবজি বলতে কী বোঝায় ? কয়েকটি সবজির নাম লেখ।

২. উন্নত, উন্নয়নশীল ও বাংলাদেশের দানাজাতীয় ও শাক সবজি গ্রহণের অনুপাত কত তা লেখ।

৩. শর্করা, চর্বি ও ক্যালোরির উৎস অনুসারে কয়েকটি সবজির নাম লেখ।

৪. ৫টি শাক সবজির বপন/রোপণ, সংগ্রহ সময় ও সংগ্রহ করা সম্পর্কে লেখ।

৫. ৩টি দানাশস্য ও ৩টি সবজির মধ্যে ফলনশীলতায় পার্থক্য উল্লেখ কর।

৬. মানবদেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো কী কী?

৭. ভূমিহীন ও প্রান্তিক পরিবারের জন্য সবজি চাষের পরিকল্পনা প্রণয়ন কর।

৮. রেল লাইন, সড়ক ও জমির আইলে সবজি চাষের পরিকল্পনা উল্লেখ কর।

৯. মৌসুম অনুযায়ী ৩ ধরনের সবজি চাষের তালিকা প্রণয়ন কর।

১০. সবজি চাষে কী ধরনের সুবিধা আছে তা উল্লেখ কর।

১১. ২.৫ শতক জমিতে ৫টি সবজি চাষের উৎপাদন ও আয় দেখাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শাক সবজি বলতে কী বোঝায়? খাদ্য ও পুষ্টিতে সবজির গুরুত্ব এবং একজন লোকের দৈনিক খাদ্য তালিকা কী হওয়া উচিত তা বর্ণনা কর।

২. সবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৩. খাদ্য ঘাটতি পূরণে সবজির গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৪. অনাবাদি ও পতিত জমি ব্যবহারে সবজি চাষের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৫. ছোট ও ক্ষুদ্র পরিবারের জন্য সবজি চাষের পরিকল্পনা সম্পর্কে বর্ণনা কর।

২০২২

দ্বিতীয় অধ্যায়
সবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

বাংলাদেশে খাদ্য তালিকায় বড় অংশ দখল করে আছে দানাজাতীয় খাদ্য (চাল,গম,ভুট্টা)। যেমন-মাথাপিছু দৈনিক গড়ে যেখানে দানাজাতীয় খাদ্য ৫২৮ হতে ৪৫৪ গ্রাম, সেখানে শাক-সবজিসহ মূল জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ৭০ গ্রাম, যা উদ্ভিদ খাদ্যের মাত্র ৬ শতাংশ। এর মধ্যে আলু ও মূলজাতীয় সবজি বাদ দিলে শাক সবজির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৩০-৩৫ গ্রামের মতো অথচ প্রয়োজন প্রায় ২০০ গ্রাম। এদিকে সকল শ্রেণির মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা প্রয়োজন। সেজন্য খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, আবহাওয়ার পরিবর্তন, প্রযুক্তির উন্নয়ন ও উৎকর্ষতায় ভারসাম্যহীনতা, জমির পরিমাণগত ক্রমহ্রাসতা, জনসংখ্যা ও খাদ্যসহ সামগ্রিক চাহিদা মোকাবেলায় শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবহারই একমাত্র সহজতর উপায়। যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত সেই কৃষি পেশারই প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এছাড়াও অন্যান্য পেশাসহ প্রায় ৮৬ ভাগ মানুষ উপযুক্ত পরিমাণ সুষম খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতার শিকার অর্থাৎ তারা দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। আর ৪০ ভাগ মানুষ আলট্রা-দারিদ্র অর্থাৎ চরম দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করছে। বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতির সাথে পুষ্টি সমস্যা প্রকট। নিচের সারণি থেকে সহজে বোঝা যাবে যে বাংলাদেশের লোকেরা কেন পুষ্টিহীনতার শিকার হয়ে নানা প্রকার রোগ আক্রান্ত হচ্ছে।

শাক-সবজি বাড়ির আশপাশে খণ্ড বা পতিত জমিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে চাষাবাদ করা হয়। এতে বেশি খরচ ও পর্যাপ্ত উপকরণের দরকার হয় না। সবজি উৎপাদনে নিবিড়ভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং পুষ্টিযুক্ত খাদ্য স্বল্প সময়ে পাওয়া যায়। পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে এখান থেকে উৎপাদিত শাক-সবজি বিক্রিও করা সম্ভব। যা থেকে অতিরিক্ত আয় হতে পারে। আমাদের দেশে প্রায় দেড় কোটি বসতবাড়ির আওতায় প্রায় ৫ ভাগ জমি রয়েছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে এসব বসতবাড়ির আঙ্গিনার পতিত জমির সুষ্ঠু ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎপাদনের জন্য হচ্ছে না। যার ফলে আমাদের দেশের মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে ও আর্থিক দিক দিয়ে দরিদ্র থাকছে। বসতবাড়ির আঙ্গিনার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টিসহ বাড়তি আয় করা ও শাক-সবজির চাহিদা বহুলাংশে পূরণ করা সম্ভব।

সারণি ঃ দৈনিক-গড়ে শাক-সবজি ও মূল জাতীয় সবজি উৎপাদন (গ্রাম)

দেশের নাম	দানাজাতীয় শস্য	শাক-সবজি	দেশের নাম	দানাজাতীয় শস্য	শাক-সবজি
মালয়েশিয়া	৩১২	২১০	যুক্তরাষ্ট্র	১৭৭	৪০২
থাইল্যান্ড	৪১২	৪১২	মিশর	৫৫১	৩৩০
ফিলিপাইন	৩৪২	১৭৪	জার্মান	২০০	৪৩০
জাপান	৩৮০	৫৫০	বাংলাদেশ	৫২৮	১০৪
যুক্তরাজ্য	২০০	৪৫২			

বাংলাদেশের লোকেরা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের লোকের তুলনায় দানাজাতীয় খাদ্য বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে থাকে।

চিত্রঃ বাংলাদেশ, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের দানাজাতীয় শস্য ও শাক-সবজি উৎপাদনের তুলনামূলক অবস্থা

শাক-সবজি ফলনশীলতা ও খাদ্য ঘাটতি পূরণে ভূমিকা

সরকারিভাবে খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনায় ধান উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়ে থাকে। এমনকি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ক্রয় করার বিষয়ে প্রতি বছর খাদ্য শস্য সংগ্রহ অভিযান গ্রহণ করা হয়। অথচ খাদ্য ঘাটতি পূরণে শাক-সবজির অবদান বেশি এবং গুরুত্বপূর্ণ। দানা জাতীয় শস্য যেমন- ধান, গম, ভূট্টা, জোয়ার, চিনা, কাউন ইত্যাদির চেয়ে অধিকাংশ শাক-সবজির হেক্টর প্রতি বেশি ফলনশীল (সারণি)। এছাড়া সবজি উৎপাদনে দানাজাতীয় শস্য অপেক্ষা কম সময়ের প্রয়োজন হয়।

সারণি-দানাজাতীয় ও শাক-সবজির হেক্টর প্রতি ফলন (মে.টন) ও উৎপাদনের মেয়াদকাল

দানাজাতীয়	ফলন (টন)	উৎপাদন মেয়াদ (দিন)
ধান	৫-৬ টন	১৪০-১৭০ দিন
গম	২-৪ টন	১২০-১৩০ দিন
ভূট্টা	৭-১০ টন	১৫০-১৬০ দিন
চিনা	২-৩ টন	১৪০-১৫০ দিন
কাউন	২.৫-৩.৫ টন	১৪০-১৫০ দিন
জোয়ার	১-১.৫ টন	১৫০-১৬০ দিন
শাক-সবজি		
বাঁধাকপি	১৫-২৫ টন	৯০-১০০ দিন
ফুলকপি	১৫-২৫ টন	৯০-১০০ দিন
মুলা	১৫-২৫ টন	৪০-৭০ দিন
ওলকপি	১৫-২৫ টন	৯০-১২০ দিন
গাজর	১৫-২৫ টন	৯০-১২০ দিন
লাউ	১৫-২৫ টন	৬০-১২০ দিন
আলু	১৫-২৫ টন	৭০-১২০ দিন
মুখীকচু	১৫-২৫ টন	১৮০-২১০ দিন

পুঁই শাক	১৫-২৫ টন	৬০-৯০ দিন
শিম	৪-১০ টন	৯০-১২০ দিন
ঢেঁড়শ	১৫-২৫ টন	৪০-৯০ দিন
শালগম	১৫-২৫ টন	৬০-৯০ দিন
পালংশাক	১৫-২৫ টন	৩০-৬০ দিন
লালশাক	১৫-২৫ টন	৩০-৪০ দিন
বেগুন	২০-৪০ টন	৪০-১৫০ দিন
টমেটো	৩০-৪০ টন	৯০-১২০ দিন
ডাঁটা শাক	২০-৪০ টন	৪০-৬০ দিন

উল্লিখিত সারণি থেকে সহজে বোঝা যায় যে স্বল্প সময়ে সীমিত জমিতে শাক-সবজি উৎপাদন করে সহজেই খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। যেহেতু দানাজাতীয় শস্য উৎপাদনে সময়কাল বেশি লাগে এবং জমির পরিমাণও বেশি প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে একই পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনে শাক-সবজির জন্য জমি এবং সময়কাল উভয়ই কম প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশের মানুষ খাদ্য ঘাটতিজনিত সমস্যায় দু'ভাবে ভুগছে। যেমন-
(ক) পরিমাণগত ও (খ) সুষম ও পুষ্টি চাহিদাগত।

(ক) পরিমাণগত ঘাটতি

কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশ দানাজাতীয় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে। তথাপিও বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিবছর ২৫-৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয়। প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে কোন কোন বছর আরো বেশি পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করার প্রয়োজন হয়। শাক-সবজি যেহেতু একক জমিতে দানাজাতীয় খাদ্যশস্য অপেক্ষা বেশি উৎপাদন করা সম্ভব, সেহেতু শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছাড়া পরিমানগত ঘাটতি পূরণের অন্য কোন সহজ উপায় নেই।

(খ) সুষম ও পুষ্টি চাহিদাগত

উনিশশত তিয়াত্তর সনে দু'জন বিদেশি (মূর ও এ্যাডফিল্ড) বাংলাদেশের মানুষের পুষ্টি প্রাপ্তি সম্পর্কিত অবস্থা তুলে ধরেছেন। তাতে উল্লেখ করেছেন যে সকল প্রকার ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানের অভাবে বাংলাদেশের লোকেরা দারুণভাবে ভুগছে। বিভিন্ন পুষ্টি জরীপে দেখা গেছে বয়সের তুলনায় খাট এবং উচ্চতার তুলনায় কম ওজন বিশিষ্ট ছেলে ও মেয়ে শিশুরা অপুষ্টিজনিত কারণে এরূপ অবস্থার স্বীকার হয়েছে। পুষ্টি জরীপে গোমেজ বিভাগ অনুযায়ী ৩.৫% শিশু স্বাভাবিক ওজন বিশিষ্ট এবং ২৫.৮% শিশু মারাত্মকভাবে পুষ্টিহীনতার স্বীকার এবং অত্যল্প ও মধ্যম পুষ্টিহীনতার শতকরা অংশ হলো যথাক্রমে ১৭.৭ ও ৫৩.০ ভাগ। ১৯৯৪ সালে জুন মাসে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে বাংলাদেশে শতকরা ৯৩ জন শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে ১৯৬২-৬৪ সন পর্যন্ত ৩টি জাতীয় পুষ্টি জরীপে বয়স ও লিঙ্গভেদে বিভিন্ন শ্রেণির খাদ্য গ্রহণের মধ্যে মূল জাতীয়, শাক সবজি ও ফল জাতীয় খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে গেছে।

২০২২

খাদ্য ঘাটতিতে বিশেষত : শাক-সবজির ঘাটতিতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত অপুষ্টির মধ্যে ভিটামিন 'এ' এর অভাবে চোখের অসুখ (Xerosis Conjunctive) বেশি দেখা যায়। ভিটামিন 'এ' -এর অভাবে রাতকানা রোগের প্রকোপতার জাতীয় হার শতকরা ৩.২ ভাগ। ০.৪ বছর বয়সের ১-৩ শতাংশ এবং ৫-১৫ বছরের ৩,৮ শতাংশ শিশু রাতকানায় ভোগে। প্রতি বছর ৩০,০০০-৪০,০০০ শিশু শুধু ভিটামিন 'এ' র অভাবে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যায়, যাদের প্রায় অর্ধেকই ০১ বছরের মধ্যে মারা যায়।

আমরা খাদ্য গ্রহণ করি শরীরের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য। শাক-সবজি খাদ্য পুষ্টির দিক থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শাক-সবজিতে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান বিভিন্ন অনুপাতে বিদ্যমান। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের প্রাচুর্যের কারণে এদেশে শাক-সবজির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা আবশ্যক। কারণ ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ দেহ বৃদ্ধি, পুষ্টিসাধন ও দৃষ্টি শক্তিসহ শরীরের ক্ষয়পূরণ, রোগব্যাধি প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত। যদি কেউ দু'বেলা পেট পুরে খাবার খায় তাহলেই তাকে বলা যাবে না যে তার খাদ্য ঘাটতি নাই। মানবদেহ নানা প্রকার উপাদান দিয়ে গঠিত। তাই শরীর সুস্থ থাকা ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য সব ধরনের পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। দানাজাতীয় খাদ্যে মানব শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্যোপাদান বিদ্যমান নাই। মানবদেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো হলো-

(ক) শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার
(খ) আমিষ বা প্রোটিন
(গ) স্নেহ/তেল বা চর্বি
(ঘ) খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন
(ঙ) খনিজ লবণ
(চ) পানি ও
(ছ) ফাংশনাল ফুড বা দেহ যন্ত্রাদির কার্যঘটিত খাদ্য

আমাদের দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৭০% রক্তস্বল্পতা রোগে ভোগে। ৫ বছরের নিচে ৭৩ শতাংশ, ৫-১৪ বছর বয়সী ছেলে এবং মেয়েদের ৭৫ শতাংশ, গর্ভবতী ও প্রসূতি নয় এমন মহিলাদের প্রায় ৭৪ শতাংশ এমনকি ৬০ শতাংশ পুরুষ রক্তস্বল্পতায় ভোগে।

গ্রামীণ এলাকায় ভিটামিন বি২ -এর অভাবজনিত রোগ সাধারণভাবে দেখা যায়। ১৪.৪ শতাংশ জনগণ ভিটামিন বি২ -এর অভাবে ভোগে। তাদের মধ্যে ৫-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই এ রোগের প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ জন দৃশ্যমান গলগন্ড রোগে ভোগে। দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের প্রায় ৮০% লোক বিভিন্ন গ্রেডের গলগন্ড রোগে ভোগে।

উপযুক্ত পরিমাণ শাক-সবজি নিয়মিত গ্রহণ করলে রাতকানা, অন্ধত্ব, নানা প্রকার চর্মরোগ, স্কার্ভি, মুখের ভিতরে ও ঠোটের কোনায় ঘা, রিকেট, এনেমিয়া, গলগন্ড ইত্যাদি রোগ হতে নিরাপদ থাকা সম্ভব।

২০২২

লিঙ্গ ও বয়সভেদে পুষ্টি চাহিদার তারতম্য

সকল পেশার এবং সব ধরনের পরিশ্রমী ও দৈহিক গঠনের মানুষের একই ধরনের ও একই পরিমাণ খাবারের প্রয়োজন হয় না। দীর্ঘদেহী, কঠোর পরিশ্রমী (হালচাষ করা, লাকড়ি কাটা, মাটি কাটা, পাহাড় ও বনে জঙ্গলে কাজ করা, নৌকার বৈঠা টানা ইত্যাদি), কম দৈহিক পরিশ্রমী (বিভিন্ন কাজ তদারকি করা, অফিসে বসে কেরানীগিরি বা ডেস্কে বসে করা), শিশু, খেলোয়াড়, গর্ভবতী বা দুগ্ধবতি মহিলা প্রত্যেকের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের পার্থক্য আছে। শিশু বা বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, গর্ভবতী ও দুধদানকারী মহিলাদের জন্য আমিষ, ভিটামিন ও ধাতব পদার্থযুক্ত খাবার অন্যদের তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি প্রয়োজন। আবার যারা দৈহিক পরিশ্রম বেশি করে তাদের জন্য শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি প্রয়োজন। গর্ভবতী মহিলাদের প্রথম ৩ মাসের পর ভ্রূণের মস্তিষ্ক, মাংসপেশি, হাড় ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

তাই গর্ভের ২য় ও ৩য় মাসে পুষ্টি চাহিদা সবচেয়ে বেশি এবং মা প্রয়োজনীয় পুষ্টিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ না করলে জটিল সমস্যায় পড়ে। শিশু স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেলে ৫ মাস বয়সের সময় তার ওজন হয় জন্মের ওজনের দ্বিগুণ, ১ বছর বয়সে তিনগুণ এবং ২ বছর বয়সে হবে চারগুণ। জীবনের ১ম দুবছর বয়সের মধ্যেই মানবদেহের ৮০% মস্তিষ্ক বৃদ্ধি ও গঠন হয়ে থাকে। সেজন্য এ সময়কালে প্রচুর পরিমাণ শাক-সবজি ও ফল খাওয়া প্রয়োজন। তবে ৪০ বছর বয়সের পর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য ডিম ও তৈলজাতীয় খাদ্য পরিহার বা সীমিত করে শাক-সবজি বেশি গ্রহণ করা উচিত।

বাংলাদেশের লোকেরা যেহেতু উপযুক্ত পরিমাণ শাক-সবজি ও ফল নিয়মিত খাদ্য তালিকায় গ্রহণ করতে পারে তাই তারা দূর্বল ও বিভিন্ন রোগে ভোগে। ডাক্তারি মতে যারা বা যে দেশের লোকজন বেশি শাক-সবজি ও ফল খায় বা নিরামিষভোজী হয় তাদের স্বাস্থ্য বেশি ভালো থাকে এবং তারা দীর্ঘজীবি হয়। নিচের সারণিতে বাংলাদেশ ও বিশ্বের কয়েকটি দেশের শাক-সবজি ও ফলের উৎপাদন দেখানো হলো।

সারণি ঃ বাংলাদেশের তুলনায় বিশ্বের কয়েকটি দেশে দৈনিক মাথাপিছু গড় শাক-সবজি ও ফল উৎপাদন।

দেশের নাম	শাক-সবজি (গ্রাম)	ফল (গ্রাম)	মোট (গ্রাম)
উন্নত দেশ			
যুক্তরাষ্ট্র	৪০২	২৮৪	৬৮৬
জাপান	৫৫০	১৩৩	৬৮৩
রাশিয়া	২২২	১৩৫	৩৫৭
এশিয়ার দেশ			
দক্ষিণ কোরিয়া	৫৪৯	১০১	৬৫০
থাইল্যান্ড	১৯৯	২৮৭	৪৮৬
ফিলিপাইন	১৭৪	৩২১	৪৯৫
চীন	২৭৭	৩৬	৩১৩
ভারত	১৬৮	১১১	২৭৯
শ্রীলঙ্কা	১৫১	১২৪	২৭৫
মালয়েশিয়া	২১০	১৯১	৪০১
ইন্দোনেশিয়া	৫৩	৯৩	১৪৬
বাংলাদেশ	৩১	৩৫	৬৬

খাদ্য চাহিদা পূরণের সাথে খাদ্যকে সুষম ও পুষ্টিযুক্ত করার জন্য শাক সবজি খেতে হয়। কারণ শাক-সবজি ভিটামিন ও খনিজ জাতীয় উপাদানের প্রধান উৎস। তাই খাদ্যকে সুষম করতে হলে শ্বেতসার ও ডাল জাতীয় খাদ্যের সাথে দৈনিক কী পরিমাণ শাক-সবজি খাওয়া উচিত তা নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

খাদ্যের নাম	দৈনিক প্রয়োজন (গ্রাম)	
	মহিলা	পুরুষ
চাল/আটা	৫০০	৩৭৫
ডাল	৯০	৪৫
ছোট মাছ	৬০	৬০
আলু, মিষ্টি আলু	১২৫	৬০
শাক (কচু, পালং, পুঁই)	৯০	১৫৫
সবজি (উচ্ছে, পটল, লাউ, ঢেঁড়শ)	৯০	৯০
ফল (আম, কুল, পেয়ারা)	২/১টি	১টি
তৈল	৬০	৬০

অনাবাদি ও পতিত জমির সদ্বব্যবহারে সবজি চাষের গুরুত্ব

বাংলাদেশে জনসংখ্যা ১.৪৮% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে প্রতি বছর ১% হারে আবাদি জমি চাষের আওতা বহির্ভূত হচ্ছে। সেইসাথে কৃষি খানা বা পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জমি খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছে। মানুষের ভোগের সুবিধা বৃদ্ধির জন্য বসতবাড়ি, স্কুল-কলেজ, মসজিদ, মন্দির, হোটেল রেস্তোরা, বিনোদনকেন্দ্র-ক্লাব, সড়কপথ, রেললাইন ইত্যাদি নতুন নতুন গড়ার ফলে এর আশেপাশে অনেক জমি অব্যাবহৃত ও অনাবাদি হিসেবে পড়ে থাকছে। এসব জমিগুলো সাধারণত উঁচু হয় এবং অনেকটা অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে প্রায় দেড়কোটি কৃষক পরিবার বা খানা আছে। ২৮৩৫ কিলোমিটার রেলপথ, ২১৫ কিলোমিটার সড়কপথ (জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, সংযোগ মহাসড়ক, জেলা সড়ক, উপজেলা সড়ক আছে) , ১৩৬২ টি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি, ৮০৩৯৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৩৭৮ নিম্ন মাধ্যমিক, ১৪৮৯৬টি মাধ্যমিক, ১৯০২টি উচ্চ মাধ্যমিক, ২৭৬টি টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠান, ৯৯৫৩টি মাদ্রাসা ও বিপুল সংখ্যক সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা এবং টাংগাইল জেলার আয়তনের সমপরিমাণ সারাদেশে জমির আইল আছে। এ ছাড়াও ৭০০০ কিলোমিটার প্রধান নদী ও ২৪০০০ কিলোমিটার শাখা-প্রশাখা নদী আছে।

বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৯০৯৪০০০ হেক্টর। এর মধ্যে প্রায় ২৭৮০০০ হেক্টর জমি আবাদযোগ্য জমি পতিত থাকে। বাড়ির ও প্রতিষ্ঠানের আশপাশসহ রেলপথ, সড়কপথের ধারের অনাবাদি ও আবাদযোগ্য পতিত জমিতে পরিকল্পিতভাবে শাক-সবজি ও ফল উৎপাদন করা যেতে পারে। এতে খাদ্য চাহিদা পূরণ ও পুষ্টিহীনতা দূরিকরণসহ অধিকহারে সবজি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব হবে। পতিত ও অনাবাদি জমিতে শাক-সবজি ও ফল উৎপাদন করা হলে পরিবেশের ভাসসাম্য রক্ষা করা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষতি কমিয়ে উৎপাদন নতুন মাত্রা যোগ হবে। এরফলে সারাবছর পারিবারিক খাদ্য, পুষ্টি ও অন্যান্য দ্রব্যাদির চাহিদাও নিশ্চিত হবে।

২০২২

অনাবাদি ও পতিত জমিকে নিবিড়ভাবে ব্যবহারের জন্য স্থান বিশেষের ফসল পঞ্জিকা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। জমির আইলসহ অব্যবহৃত জমিতে দ্রুত বর্ধনশীল ও স্থানের প্রতি সংবেদনশীলতা দেখে শাক-সবজি নির্বাচন করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এ স্থানগুলোকে একটি আদর্শ উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে রূপান্তর করা যায়। যার দ্বারা খাদ্য, পুষ্টি চাহিদা মেটানোসহ বাড়তি আয় ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হয়। আমাদের দেশে ভূমিহীন, প্রান্তিক, ছোট, মাঝারি ও বড় কৃষক পরিবার আছে। ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষির বাড়ির আঙ্গিনায় জমি নেই। আবার ছোট ও প্রান্তিক চাষির বাড়ির আঙ্গিনায় জায়গা থাকলেও তা সামান্য। মাঝারি চাষির বাড়ির আঙ্গিনায় কিছু জায়গা থাকে, আর বড় চাষির বাড়ির আঙ্গিনায় পর্যাপ্ত জায়গা থাকে। চাষির ধরন অনুযায়ী শাক-সবজি চাষের পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো-

চাষীর ধরন ও পরিবারের আকার ভিত্তিক শাকসবজি চাষের পরিকল্পনা

১। ভূমিহীন ও প্রান্তিক পরিবারের জন্য পরিকল্পনা-এ জাতীয় চাষীর বাড়ির ঘরের চালে, বেড়া, বাড়ির ঘেরা বা বেড়া, ঘরের পিছনে লতানো সবজি ছাড়া-মান বা ওলকচু লাগানো যায়।

(ক) মৌসুমি পরিকল্পনা-রবি মৌসুম (১৬ অক্টোবর-১৫ মার্চ)
ঘরের চালে; লাউ, মিষ্টি কুমড়া জন্মানো যায়।
ঘরের পাশেঃ বেগুন, ডাঁটা, ধনেপাতা, মরিচ, পেঁপে জন্মানো যায়।

(খ) মৌসুমি পরিকল্পনা খারিফ-১ (১৬ মার্চ-১৫ জুন)
ঘরের চালেঃ চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, পুঁইশাক, মেটে আলু বাউনি দিয়ে চালে জন্মানো যায়।
ঘরের পাশেঃ বরবটি, মরিচ, কালোকচু, বেগুন, ডাটা, সাজিনা, মানকচু, ওলকচু, জন্মানো যায়।

(গ) মৌসুমি পরিকল্পনা-খারিফ-২ (১৬ জুন-১৫ অক্টোবর)
ঘরের চালে-ঘরের পাশে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে আগাম দেশি শিমের বীজ লাগায়ে চালে উঠায়ে দেওয়া যায়।
ঘরের পাশে-মৌসুমের শুরুতে-পুঁইশাক, কামরাঙ্গা মরিচ, বারোমাসি মরিচ, বেগুন, থানকুনি, পুদিনা লাগানো যায়।

২। ছোট বা ক্ষুদ্র পরিবারের জন্য পরিকল্পনা বাড়ির আশেপাশে জমি আছে, কিন্তু তা দ'শতকের কম।

(ক) রবি মৌসুম (কার্তিক-ফাল্গুন)
ঘরের চালে/মাচায়ঃ চালে লাউ/মিষ্টি কুমড়া, মাচায় পটল লাগানো যায়। ঘরের পাশে মৌসুমের শুরুতে সীমিত আকারে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, মূলা, বেগুন, লালশাক, পালংশাক, বাটিশাক লাগানো যায়।

(খ) খারিফ-১ মৌসুম-চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ)
ঘরের চালেঃ চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, গ্রীষ্মকালীন লাউ বাউনি দিয়ে চালে বা মাচায় চাষ করা যায়। গাছে-ধুন্দল, চিচিংগা, ঝিঙা, মেটে আলু জন্মানো যায়। মাচায়- করলা, কাঁকরোল, শশা, চিচিংগা, বরবটি জন্মানো যায়। সবজি বাগান- ঢেঁড়শ, গীমাকলমি, পুইশাক, ডাঁটা, মরিচ, পাটশাক, গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করা যায়। বেড়ায় খুটি হিসেবে সাজিনা লাগানো যায়।

২০২২

(গ) খারিফ-২ মৌসুম (আষাঢ়-আশ্বিন)

ঘরের চালে ও আষাঢ়-শ্রাবণে শিমের বীজ লাগিয়ে ঘরের চালে বাঁশের কঞ্চি বা গাছে বাউনি দিয়ে উঠায়ে দেওয়া যায়।

ঘরের পাশে : মৌসুমের শুরুতে ডাঁটা, বেগুন, পুঁইশাক, গিমাকলমি চাষ করা যায়।

সবজির বাগান : বাড়ির আশেপাশের পতিত জমি সাধারণত ছোট, খণ্ড খণ্ড, বিভিন্ন আকারের, উঁচু নিচু, ছায়াযুক্ত বা খোলামেলা হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে স্থান ও প্রয়োজন অনুযায়ী শাক-সবজি নির্বাচন করতে হবে। প্রায় সারাদিন রোদ থাকে এবং উঁচু সুনিকাশযুক্ত ও সেচের সুবিধা থাকলে সেখানে আশ্বিন থেকে শুরু করে বছরব্যাপী ৮-১০ রকমের শাক-সবজি করা যায়। বছরব্যাপি সবজি চাষের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। যেমন-

(ক) প্রথম খণ্ড জমি-মূলা/টমেটো-লালশাক-পুঁইশাক।

(খ) দ্বিতীয় খণ্ড জমি-লালশাক+বেগুন-লালশাক-ঢেঁড়শ।

(গ) তৃতীয় খণ্ড জমি-বাটিশাক-পেঁয়াজ/গাজর-কলমিশাক-লালশাক।

এছাড়া এসব জমির চারপাশ দিয়ে জীবন্ত বা বাঁশের বেড়া দিয়ে তাতে করলা, বরবটি, পটল, পুঁইশাক লাগানো। যেতে পারে।

৩। মাঝারি পরিবারের জন্য পরিকল্পনা-বাড়ির আশপাশে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ দ'শতক থেকে পাঁচ শতক।

(ক) রবি মৌসুম (কার্তিক-ফাল্গুন) - সম্পূর্ণ রবি মৌসুমে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন শাক-সবজি জন্মানো যায়। বাগানাকারে লালশাক, পালংশাক, বাটিশাক, চীনাবাঁধাকপি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি বীট, গাজর, মূলা, সবুজ ফুলকপি/ব্রকোলি, মটরশুটি, টমেটো, বেগুন, আলু, শালগম, ঝাড়শিম, উচ্ছে, পটল লাগানো যায়। সবজি বাগানের কিনার দিয়ে ভূট্টা, অড়হর লাগানো যায়।

(খ) খারিফ-১ মৌসুম (চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ) - ঘরের চালে চালকুমড়া, গ্রীষ্মকালীন লাউ বাউনি দিয়ে উঠায়ে দেওয়া যায়। বেড়ায়/জাংলায় পুঁইশাক চাষ করা যায়। এ মৌসুমে গীমাকলমি, পুঁইশাক, ঢেঁড়শ, ধুন্দল, ঝিঙা, শশা, বরবটি, করলা, কাঁকরোল, চিচিংগা, গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করা যায়। মধ্য বৈশাখ পর্যন্ত কালো কচু, লতিরাজ কচু লাগানো যায়।

(গ) খারিফ-২ মৌসুম (আষাঢ়-আশ্বিন)-মৌসুমের শুরুতে বেগুন, গীমা কলমি এবং মধ্য শ্রাবণ হতে আগাম শীতকালীন সবজি হিসেবে মূলা, ফুলকপি, টমেটো, লালশাক, পালংশাক, সর্ষেশাক, ধনেপাতা বপন করা যায়। মৌসুমের প্রথমদিকে দেশি শিমের বীজ বপন করা যায়। মধ্য শ্রাবণ থেকে লাউ বীজ বপন করা যায়।

৪। মাঝারি পরিবারের জন্য পরিকল্পনা-বাড়ির আশপাশে পাঁচ শতকের বেশি চাষযোগ্য জমি।

(ক) রবি মৌসুম (কার্তিক-ফাল্গুন)- পুরো রবি মৌসুমের জন্য একক বা মিশ্র বাগান করা যেতে পারে। শীতকালীন যত শাক-সবজি আছে তা সবই অনায়াসে চাষ করা যায়। যেমন-লালশাক, পালংশাক, বাটিশাক, সর্ষেশাক, মূলাশাক, চীনা বাঁধাকপি, বাঁধাকপি, ফুলকপি সবুজ ফুলকপি, টমেটো, বেগুন, ডাঁটা, গাজর, মেটে আলু, শালগম, স্কোয়াস, মটরশুটি, ঝাড়শিম, পটল, লাউ, উচ্ছে, মিষ্টিকুমড়া ও অন্যান্য। মাঘ-ফাল্গুনে মুখীকচু লাগানো যায়।

২০২২

(খ) খারিফ-১ মৌসুম (চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ)- এ সময় গীমাকলমি, পুঁইশাক, লালশাক, ঢেঁড়শ, বেগুন, মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, ধুন্দল, ঝিংগা, চিচিঙ্গা, শশা, বরবটি, করলা, কাঁকরোল, গ্রীষ্মকালীন টমেটো ও অন্যান্য সবজি জন্মানো যায়। মধ্য বৈশাখ পর্যন্ত কালোকচু, লতিরাজ কচু লাগানো যায়।

(গ) খরিফ-২ মৌসুম (আষাঢ়-আশ্বিন)-পূর্ব মৌসুমের সবজির পরিচর্যা করাসহ মৌসুমের প্রথমদিকেই বেগুন, দেশি শিম চাষ করা যায়। মধ্য শ্রাবণ হতে আগাম শীতকালীন সবজি চাষ করা যায়।

বড় পরিবারের জন্য পরিকল্পনা-বাড়ির আশপাশে অনাবাদি ও অন্যান্য পতিত জমিতে সবজি চাষের বারামেসি পরিকল্পনা পঞ্জিকা করা যেতে পারে। এজন্য সম্ভাব্য সবজির ধরন অনুযায়ী তালিকা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। যেমন

তালিকা-সবজির ধরন ও নাম

সবজির ধরন	সবজির নাম
পাতাজাতীয় সবজি	লালশাক, ডাটাশাক, পুঁই, পালং, গিমাকলমি, বাটিশাক, চীনাবাঁধাকপি, পাটশাক, সর্ষেশাক, থানকুনি, পুদিনা, ধনেপাতা, হেলেঞ্চা, লেটুস, বথুয়া শাক, পাতা পেঁয়াজ, মিষ্টি আলুশাক, কচুশাক।
ফলজাতীয় সবজি	বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শ, পেঁপে, কাঁচাকলা, সাজিনা, কাঠাল।
কন্দজাতীয় সবজি	আলু, মেটে আলু, গাছআলু, শিমুল আলু
মূলজাতীয় সবজি	মূলা, গাজর, বীট, শালগম।
কচুজাতীয় সবজি	ওলকচু, মুখীকচু, মানকচু, দুধকচু, পঞ্চমুখীকচু, কালোকচু, লতিরাজকচু (পানিকচু)।
কুমড়াজাতীয় সবজি	মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, লাউ, স্কোয়াস, করলা/উচ্ছে, চিচিংগা, ঝিঙা, ধুন্দল, পটল, কাঁকরোল, শশা, ক্ষীরা।
শিমজাতীয় সবজি	দেশি শিম, ফরাসি শিম, কামরাঙা শিম, মাখন শিম,বরবটি, সয়াবিন, মটরশুটি।
কপিজাতীয় সবজি	বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, চীনা বাঁধাকপি, সবুজ ফুলকপি।
বিশেষ সবজি	মাশরুম, বকফুল, মিষ্টিকুমড়া ফুল, শাপলা ফুল, মুগাংকুর।

সবজি চাষের জন্য বারোমাসি পরিকল্পনা পঞ্জিকা

বৈশাখ (মধ্য এপ্রিল-মধ্য মে)	লালশাক, ডাঁটা, পাটশাক, গিমাকলমি, বেগুন, গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা তৈরি, মিষ্টি কুমড়া, করলা, ধুন্দল, ঝিঙা, চিচিংগা, চালকুমড়া, শশার মাচা তৈরি ও চারা উৎপাদন, খারিফ-১ সবজির চারা রোপণ।
জ্যৈষ্ঠ (মধ্য মে-মধ্য জুন)	খারিফ-২-এর সবজির চারা রোপণ। গ্রীষ্মকালীন টমেটোর চারা রোপণ। নাবি কুমড়াজাতীয় সবজির মাচা তৈরি।
আষাঢ় (মধ্য জুন-মধ্য জুলাই)	গ্রীষ্মকালীন বেগুন, টমেটো, কাঁচা মরিচের যত্ন ও শিমের বীজ রোপণ। খারিফ ২-এর সবজির চারা রোপণ।
শ্রাবণ (মধ্যজুলাই -মধ্য আগষ্ট)	আগাম রবি সবজি যেমন: বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, টমেটো, বেগুন-এর। বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন। শিম, লালশাক ও পালংশাক বীজ রোপণ/বিপন।
ভাদ্র (মধ্যআগষ্ট-মধ্য সেপ্টেম্বর)	আগাম রবি সবজির চারা রোপণ। মধ্যম ও নাবি সবজির বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন।
আশ্বিণ (মধ্যসেপ্টেম্বর -মধ্য অক্টোবর)	রবি সবজির পরিচর্যা ও শিম, লাউ, বরবটির মাচা তৈরি এবং আলু লাগানো।
কার্তিক (মধ্যঅক্টোবর -মধ্য নভেম্বর)	মরিচের বীজ বপন, নাবি রবি সবজির চারা উৎপাদন ও রোপণ আলুর পরিচর্যা।
অগ্রহায়ণ (মধ্য নভেম্বর-মধ্য ডিসেম্বর)	মিষ্টি আলুর লতা ও মরিচের চারা রোপণ ও রবি সবজির যত্ন।
পৌষ (মধ্য ডিসেম্বর মধ্য জানুয়ারি)	নাবি রবি সবজির যত্ন।
মাঘ (মধ্য জানুয়ারি-মধ্য ফেব্রুয়ারি)	খারিফ-১ সবজির বীজতলা ও চারা তৈরি।
ফাল্গুন (মধ্য ফেব্রুয়ারি মধ্য মার্চ)	নাবি খারিফ-১ সবজির চারা তৈরি, ঢেঁড়শ, ডাঁটা, লালশাকের বীজ বপন। খারিফ-১ সবজির চারা রোপণ।
চৈত্র (মধ্যমার্চ-মধ্য এপ্রিল)	গ্রীষ্মকালীন বেগুন, টমেটো, মরিচ-এর বীজবপন/চারা রোপণ, নাবি জাতের বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন।

রেল লাইনের ঢালে লতা জাতীয় সবজি যেমন ঃ ধুন্দল, ঝিঙা, চিচিংগা, চালকুমড়া, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, উৎপাদন করা যায়। বনায়ন করা হলে তাতে মেটে আলু লাগানো যায়। সড়ক বা বাঁধের পাশে মানকচু, পেঁপে, মিষ্টি আলুর লতা জন্মানো যায়! জমির আইলে শিম, বরবটি, শশা, ধনেপাতা, মিষ্টিকুমড়া, ক্ষীরা, স্কোয়াশ, করলা, গিমা কলমি, ঢেঁড়শ জন্মানো যায়। নিচের সারণিতে জমির আইল/সীমানা বেড়ায় সবজি চাষ করে কীভাবে লাভবান হওয়া যায় তা দেখানো হলো।

স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির, অফিস, আদালত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশের পতিত ছায়াযুক্ত স্থানে কালোকচু, মৌলভীকচু, ওলকচু, মানকচু লাগানো যায়। চাল বা বেড়ায় বাউনি দিয়ে উঠানোর সুবিধাযুক্ত স্থানে লতানো সবজি লাগানো যায়। আলো-বাতাসযুক্ত খোলামেলা স্থানে পেঁপে মরিচ বেগন, কপিজাতীয় সবজি লাগানো যায়। এতে করে জমির ব্যবহার নিশ্চিত হবে, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে সহায়ক হবে।

অনাবাদি ও পতিত জমিতে শাক-সবজি চাষের ফলে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হবে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

সারণিঃ জমির আইল/সীমানা বেড়ায় সবজি চাষের হিসাব (জমির পরিমাণ ২ শতক)

সবজির নাম	উৎপাদন (কেজি)	মূল্য (টাকা)	খাওয়া/দিন/জন (গ্রাম)	বিতরণ (কেজি)	বিক্রয় (কেজি)	মোট খরচ (টাকা)	লাভ (টাকা)
পেঁপে সবজি	৯০	৩৬০	৩৬	১০	৩০	৭৫	২৮৫
পেঁপে ফল	২১০	১২০০	৮২	৫	৯০	৭৫	১১২৫
করলা	৬	৪৮	২৪	-	-	৩	৪৫
গাছ আলু	২৫	১২৫	১০	-	২০	৫	১২০

সবজি চাষের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি

আমাদের দেশে প্রায় ১০০ ধরনের ফসল চাষাবাদ হয়ে থাকে। তারমধ্যে ৬০ এর অধিক শাক-সবজি। তবে

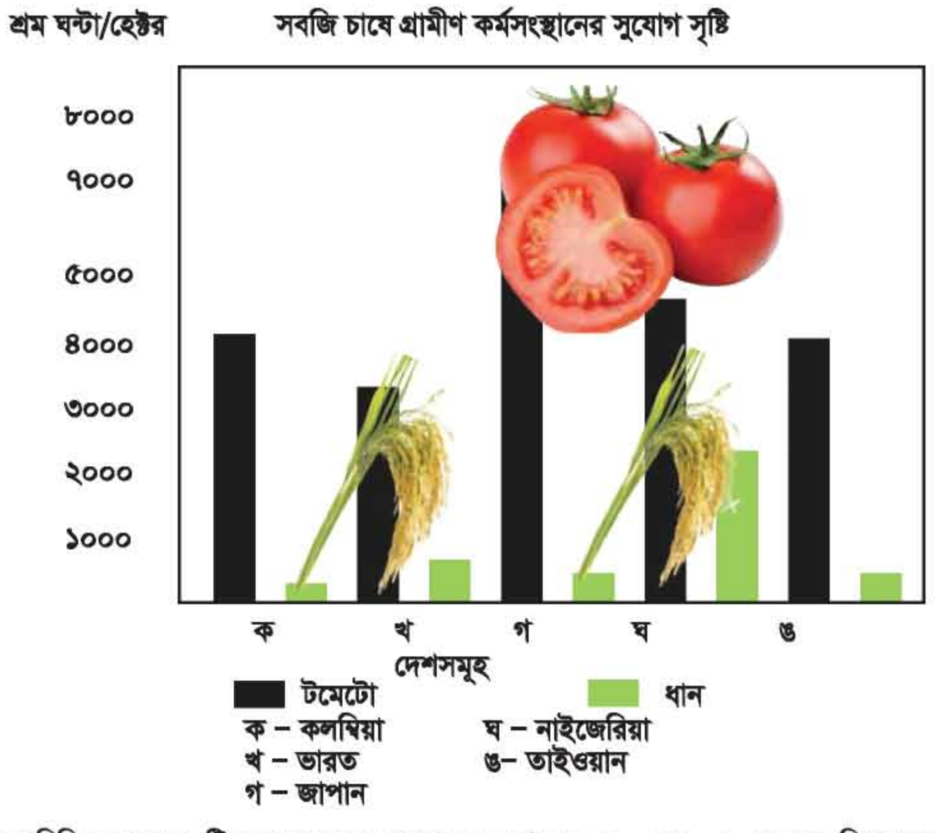

এর মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে ২০টির মতো ফসল চাষাবাদ হয়ে থাকে। ২০০৭-২০০৮ সনের কতিপয় প্রধান কৃষি ফসল চাষাধীন জমির তথ্যে দেখা যায় যে ধান, গম, ভূট্টা ও শাকসবজির ফলনে ও কর্মসংস্থানের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যা থেকে সহজেই বাঝো যায় যে বেকার সমস্যা সমাধানে সবজি চাষের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

সারণি ঃ দানাজাতীয় শস্য ও সবজির চাষাধীন জমি ও উৎপাদন (বাংলাদেশ)

ফসলের নাম	উৎপাদন সন	চাষাধীন জমি (লাখ হেক্টর)	উৎপাদন (লাখ টন)	মন্তব্য
ধান	২০০৭-২০০৮	১১৫.৩৫	৩১৯.৭৫	সম্পূর্ণ পানি নির্ভর ও সকল ফসলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পানির প্রয়োজন হয়।
গম	২০০৭-২০০৮	৭.৬৫	৯.৫৬	স্বল্পকালীন শীতে ফলনে প্রচন্ড প্রভাব পড়ে।
ভূট্টা	২০০৭-২০০৮	৩.৮২	২৩.৬১	বিদেশ নির্ভর বীজের কারণে উৎপাদন ঝুঁকিপূর্ণ।
সবজি	২০০৭-২০০৮	৬.৫১	৮৯.১০	স্বল্প সময়ে ও পরিকল্পিতভাবে পতিত ও অনাবাদি জমি ব্যবহার করা যায়।

খাদ্যশস্য ও শাকসবজির তুলনামূলক বিবরণী

হেক্টর প্রতি খাদ্য উৎপাদন- অধিকাংশ সবজিই দানাজাতীয় শস্যের চেয়ে অনেকগুণে বেশি ফলনশীল। যেখানে বিশ্বে টমেটো, বাঁধাকপি, গাজর, আলু ইত্যাদি সবজির হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২০ টনেরও বেশি, সেখানে সর্বাধিক ফলনশীল দানাশস্য ভূট্টার হেক্টর প্রতি ফলন চার টনেরও কম এবং গম ও চাউলের ফলন যথাক্রমে ২.৫০ ও ৪.০০ টনের মত।

সারণি ঃ বিশ্বের কয়েকটি দেশের সবজি ও দানাজাতীয় ফসলের গড় ফলন

ফসলের নাম	হেক্টর প্রতি ফলন (মে:টন)	ফসলের নাম	হেক্টর প্রতি ফলন (মে:টন)
চাল	৪.০০	গাজর	২১.৮০
গম	২.৫০	ফুলকপি	১৩.৫২
বার্লি	২.২৭	বেগুন	১২.৮৩
জোয়ার	১.৫০	কুমড়া	১১.৬৫
টমেটো	২৩.৪৩	শিম	৭.০০
বাঁধাকপি	২২.৬৭	শশা	১০.০০
আলু	২০.০০		

দানাজাতীয় ফসলের তুলনায় শাক-সবজি কম জমিতে বেশি উৎপাদন করা যায়। দানাজাতীয় ফলস উৎপাদনের জন্য যে শ্রমিক প্রয়োজন হয়, তার চাইতে ৫-৭ গুণ বেশি শ্রমিক প্রয়োজন হয় শাক-সবজি চাষে। খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে বর্তমানে যে সবজি উৎপাদন হয় তার চাইতে ৭-৮ গুণ বেশি পরিমাণ সবজি উৎপাদন করা প্রয়োজন। এই বিপুল পরিমাণ সবজি উৎপাদনের জন্য বহু শ্রমের প্রয়োজন। তাছাড়াও দেশের চাহিদামতে বাড়তি সবজি উৎপাদনের জন্য বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, সবজি পরিবহন, প্যাকিং, কিছু অংশ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের কাজে ৫০-৬০ লক্ষ শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত লোকের শ্রমের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সবজি চাষ যেহেতু সারা বছরই করা হয় এবং সবজি চাষে অত্যন্ত নিবিড় শ্রমের দরকার হয়, তাই সবজি চাষের মাধ্যমে

২০২৫

বেকার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। দানা শস্য ও সবজি চাষে খরচের হিসাব থেকে বাঝো যায় যে সবজি চাষে মুনাফা অনেক বেশি, যা পারিবারিক আয় হিসেবে যোগ হতে পারে। নিচের ছকে ধান, গম, ভূট্টা, আলু, গিমাক-লমি, ঝাড়শিম, লালশাক, লতানো সবজির মোট পরিবর্তনশীল খরচ ও মোট প্রাপ্তি টাকায় দেখানো হলো।

ফসলের নাম	মোট পরিবর্তনশীল খরচ	মোট প্রাপ্তি	নীট প্রাপ্তি
ধান (বোরো)	১১২০০	২৯৮০০	১৮৬০০
গম	৮৬০০	১৫৪০০	৬৮০০
ভূট্টা	৪৫০০	৬৩০০০	১৮০০০
আলু	৫১৬০০	১৪০০০০	৮৮৪০০
মূলা	১০৩০০	৫৩৭০০	৪৩৪০০
ঢেঁড়শ	১০০০০	৩৪০০০	২৪০০০
লালশাক	১৩০০	১০৬২০	৯৩২০
মিষ্টি কুমড়া (মিশ্র চাষ)	৫৪১	৫০৬৪	৪৫২৩
শিম	১৮০০০	৪২০০০	২৪০০০

শাকসবজি উৎপাদনের জন্য সীমিত জমিতে যেহেতু বেশি শ্রমিক প্রয়োজন হয়, সেহেতু বেকার জনসংখ্যার জন্য সবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাড়তি কাজের সুযোগ আছে। আমাদের দেশের সবজিগুলোকে মৌসুম অনুযায়ী ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ শীতকালীন, গ্রীষ্মকালীন ও বারমাসি।

শীতকালীন	গ্রীষ্মকালীন	বারোমাসি	মন্তব্য
টমেটো	মিষ্টি কুমড়া	বরবটি	টমেটো হিমাগারে রাখা যায়। টমেটোর রস তৈরি করা যায়। আলুর চিপস তৈরি করা যায়। আলু ও গাজর হিমাগারে রাখা যায়। মুখী, মান ও ওল কচু মাসাধিক কাল সংরক্ষণ করা যায়। চাল ও মিষ্টি কুমড়া ২/৩ মাস সংরক্ষণ করা যায়।
আলু	চালকুমড়া	বেগুন	
গাজর	মুখী কচু	পেঁপে	
বাঁধাকপি	মানকচু	কাঁচামরিচ	
ফুলকপি	ওলকচু	কাঁচকলা	
চীনাবাঁধাকপি	করলা	লালশাক	
মূলা	উচ্ছে	ঢেড়শ	
লালশাক	পটল	মিষ্টি লাউ	
পালংশাক	ঝিংগা		
লেটুস	চিচিংগা		
ধনে পাতা	পুঁইশাক		
শালগম	ডাটাশাক		
শিম	কচুশাক		
লাউ	গিমাকলমি		
সর্ষে শাক			

২০২২

সবজি চাষের সুবিধা

(ক) অল্প পরিমাণ জমিতে অনেক প্রকার সবজি করা যায়।

(খ) সবজি চাষে অপেক্ষাকৃত সময় কম লাগে এবং একই জমিতে বছরে কয়েকবার সবজি চাষ করা যায়।

■ কৃষকের গড় আয় বৃদ্ধি

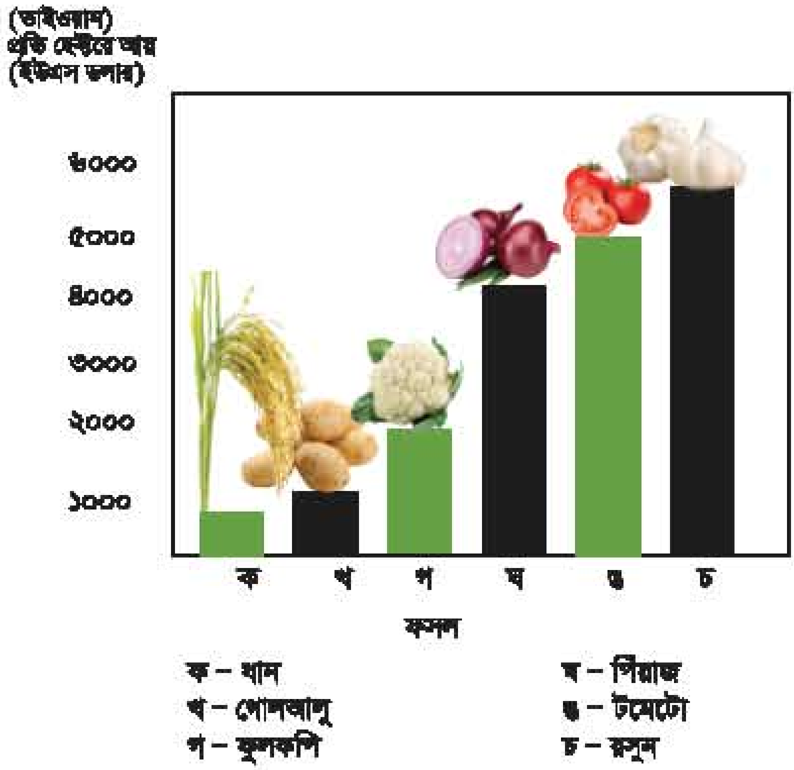

চিত্র ঃ সবজি চাষে কৃষকের গড় আয় বৃদ্ধি

(গ) পুষ্টির দিক থেকে সবজির মান উন্নত এবং সারা বছর পুষ্টি পাওয়া যায়।

(ঘ) অল্প জমিতে অধিক উৎপাদনের কারণে চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি সবজি বিক্রয় করে আয়ের সংস্থান করা যায়।

(ঙ) অল্প জমিতে অনেকবার সবজি চাষের সুবিধার কারণে কর্মের সংস্থান হয়।

(চ) পরিবারে মেয়ে-ছেলে অবসর সময়ে বিনোদন হিসেবেও কাজ করতে পারে।

(ছ) সবজি চাষের জন্য বেশি পুঁজি এবং বেশি জমির প্রয়োজন হয় না।

(জ) সবজি চাষে কৃষকের গড় আয় বৃদ্ধি (উপরের চিত্রে দেখানো হলো)।

সবজি চাষে বেকারদের শ্রম সুযোগ ও আয়ের হিসাব।

(ক) বছরব্যাপী ১ শতক জমিতে ১৩ প্রকার সবজি চাষ করে ১ বছরে মোট ২৯৬ কেজি সবজি উৎপাদন করা যায়। যার স্থানীয় মূল্য ৩১৭৩/- টাকা এবং উৎপাদন ব্যয় হয় প্রায় ১০০০/- টাকা।

২০২৫

সারণি ঃ এক শতক জমিতে সবজি চাষে আয়-ব্যয়ের বিবরণী

সবজির নাম	পরিমাণ (কেজি)	আয় (টাকা)	খরচের খাত	ব্যয় (টাকা)
লালশাক	১২	১২০	বীজ, সার, বেড়া,	২০০
পালংশাক	৫	৬০	পরিচর্যা জমি কর্ষণ	৩৫০
বাঁধাকপি	৩০	৩০০		১৫০
গিমাকলমী	১২	৮৪		৩০০
বাটিশাক	৩০	২১০		১০০০ টাকা উৎপাদন
ডাটা	৪৫	৪৫০		
মূলা	২২	২৬৪		
বেগুন	২৫	৩৭৫		
টমেটো	৪০	৬০০		
পুই	২০	১৬০		
ঢেঁড়শ	৫৫	৫৫০		
মোট =	২৯৬ কেজি	৩১৭৩/-	মোট লাভ = ৩১৭৩/- ১০০০/- = ২১৭৩/-	

সবজি চাষের মাধ্যমে বেকাররা কিভাবে সারা বছর কাজ করতে পারে এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করতে পারে তার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিচের সারণিতে দেখানো হলো। শুধু ২.৫ শতক জমিতে সারা বছর সবজি চাষের মাধ্যমে সারাবছর কাজের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে এবং সবজি খাওয়া বাদে বাড়তি আয় করা যায়। সারণিতে শুধু ২.৫ শতক জমিতে সবজি চাষ করে বছরে খাওয়া বাদে নগদ টাকা আয় করা সম্ভব। সামগ্রিকভাবে ২১৬০/- টাকা খরচ করে ৬২২৫/- টাকা আয় করা যায়। অর্থাৎ ১টাকা ব্যয় করে ৩/- টাকা আয় করা সম্ভব।

সারণি ঃ খামার পদ্ধতিতে সবজি চাষের ২.৫ শতক জমির হিসাব

মাসের নাম	সবজির নাম	মোট উৎপাদন (কেজি)	মোট আয়	মোট খরচ
বৈশাখ	পুই, লালশাক, ঢেঁড়শ, ডাটা, গিমা কলমি	৪০	৩৭০	২১৫
জ্যৈষ্ঠ	চালকুমড়া, ঝিংগা, ধুন্দল, ভেঁড়শ, পুঁই,ডাটা, গিমা কলমী	৫০	৫৩০	২৫০
আষাঢ়	-ঐ-	৯০	৮৩০	২৩০
শ্রাবণ	পেঁপে, করলা, চালকুমড়া, পুই, ধুন্দল, গিমা কলমী	৮০	৭০০	১৩৫
ভাদ্র	লালশাক, পুই, গিমা কলমী, বেগুন মিষ্টি কুমড়া, কাচামরিচ, পেঁপে, করলা, চিচিংগা	৭০	৬৭০	১৪০
আশ্বিন	লাউ, পুঁই, মূলা, পেঁপে	৪৮	৪৯৫	২৫০
কার্তিক	বেগুন, মূলা, শিম, লাউ, পালংশাক, মিষ্টি কুমড়া	৪৭	৩৬০	১৩০
অগ্রহায়ন	শিম, পেঁপে, টমেটো, মূলা, মিষ্টি কুমড়া, পালংশাক, কচু	৮৫	৭০০	২৫৫

২০২২

পৌষ	টমেটো, মূলা, শিম, লাউ, পেঁপে, মিষ্টি কুমড়া, পালংশাক, কচু	৮০	৭০০	২১৫
মাঘ	শিম, লাউ, বাঁধাকপি, বেগুন, করলা, টমেটো, মূলা	৫২	৩৭০	১০৫
ফাল্গুন	বেগুণ, লালশাক, বাঁধাকপি, করলা, টমেটো, চালকুমড়া, মূলা	৪০	৩৯০	১৩০
চৈত্র	লালশাক, মিষ্টি কুমড়া, করলা, চালকুমড়া	৩৫	৩৭০	১০৫
	মোট =	৭১৭	৬২২৫/-	২১৬০/-

শাকসবজি উৎপাদনে জমি তৈরি, চারা/বীজ রোপণ ও ফসল বাজারজাতকরণ ব্যতিত অন্যান্য কাজ যেমনঃ আন্তপরিচর্যা, পানি দেওয়া, ফসল কাটা এবং খাদ্য তৈরির কাজে প্রধানত বাড়ির মেয়েরাই বেশি ভূমিকা রাখে। তাই পারিবারিক পর্যায় হতে ছেলে-মেয়েরা বা গৃহিণীরা শ্রম দেয়ার ফলে তাদের কাজের সংস্থান হয় এবং লাভজনক একটা ভাল বিকল্প উপায় পাওয়া যায়। নিচের সারণিতে সারা বছর শাক-সবজি উৎপাদনে পারিবারিক শ্রম ব্যবহার (%) দেখানো হলো।

সারণি ঃ সারা বছর শাক-সবজি উৎপাদনে পারিবারিক শ্রমের ব্যবহার %।

কাজের বিবরণ	পুরুষ	ছেলে-মেয়ে/এবং গৃহিনী
জমি তৈরি	৯৮	২
বীজ রোপন/বপন	৬০	৪০
আন্তপরিচর্যা	২০	৮০
ফসল কাটা/তোলা	৮	৯২
খাদ্য তৈরি	০	১০০
বাজারে বিক্রি	৮১	১৯

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সবজি চাষের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে সবজি চাষের জন্য আবহাওয়া ও মাটি যথেষ্ট উপযোগী। বাড়ির আশেপাশে, ঘরের চালে, বেড়ার উপরে, অন্য গাছের উপরে বাইয়ে দিয়ে, জমির আইলে, অন্য ফসলের মধ্যে মিশ্র বা সাথী ফসল হিসেবে সবজি চাষ করা হয়। সবজির বৈচিত্রতাও উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত সুযোগ আছে। কেননা কোন কোন সবজি সারা বছর জন্মে, আবার কোন কোন সবজি শীতে বা গ্রীষ্মে জন্মে থাকে। উঁচু, মধ্যম, নিচু বা পানি জমে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সবজি আছে। তেমনি বেলে, বেলে দোঁআশ বা এঁটেল মাটির উপযোগী পৃথক পৃথক সবজি রয়েছে। যে কারণে একটু সচেতন, উদ্যোগী ও যত্নশীল হলে সারা বছর এক এক ধরনের জমিতে এক এক ধরনের উন্নত জাতের ও মানসম্পন্ন সবজি জন্মানো সম্ভব। অথচ পৃথিবীর অনেক দেশেই উপযুক্ত আবহাওয়ার অভাবে শাক-সবজি চাষ করতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশের জলবায়ু ও মাটি সবজি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। মধ্যপ্রাচ্য, ইউরাপে ও অন্যান্য অনেক দেশে সবজির প্রচুর চাহিদা আছে। তাই সুপরিকল্পিতভাবে উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ ও চাহিদাকৃত দেশের সাথে অগ্রিম চুক্তি এবং এলাকা ও কৃষক নির্বাচন করে সবজি উৎপাদন করা যেতে পারে। আর অনায়াসে তা সংরক্ষণ ও রপ্তানী করা সম্ভব। এভাবে প্রতি বছর

২০২২

সবজি রপ্তানীর মাধ্যমে বিশ্ব বাজার থেকে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। আমরা যদি শুধু জৈব কৃষির মাধ্যমে শাক-সবজি উৎপাদন ও রপ্তানী করতে পারি তাহলে স্বাভাবিক বাজার অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশিদামে তা বিক্রি করা যাবে। বাংলাদেশ থেকে রপ্তানীযোগ্য সবজিগুলো হলো গোল আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, লাউ, বেগুন, টমেটো, শশা, শিম, মিষ্টিকুমড়া, করলা, ঢেঁড়শ, পটল, বরবটি, মূলা, কাঁচকলা, পেঁপে, কচুরলতি, মিষ্টি আলু ও মিষ্টি আলুর পাউডার, কাঁচা মরিচ ইত্যাদি।

বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশ হতে কিছু কিছু শাক-সবজি বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশের কোন কোন রপ্তানীকারক ইল্যান্ড ও মধ্যপ্রাচ্যে সবজি প্রেরণ করছে। বিদেশে বিশেষ করে কিছু কিছু নির্দিষ্ট সবজির চাহিদা অনেক। কিন্তু সেগুলো বাংলাদেশের আদি সবজি নয়। অর্থাৎ অপ্রচলিত সবজি। তাই বিদেশের বাজার চাহিদা অনুযায়ী সেগুলোর উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। যেমন- ক্যাপসিকাম, ব্রকোলী, লেটুস, বীট, শালগম, চীনাবাঁধাকপি, সিলারী, গাজর, মূলা ইত্যাদি।
বাংলাদেশের আবহাওয়ায় এসব সবজি অনায়াসে উৎপাদন করা যায়। তাই এসব সবজি পরিকল্পিতভাবে উৎপাদন করে নিশ্চিতভাবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়।

পৃথিবীর অনেক দেশেই মাটি ও আবহাওয়া সারা বছর সবজি চাষের উপযোগী নয়। অথচ তাদের দৈনিক মাথাপিছু সবজি খাওয়ার পরিমাণ বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি। যেমন-জাপানে ৪৫০ গ্রাম, যুক্তরাজ্যে প্রায় ৫০০ গ্রাম, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪০০ গ্রাম। তাই আমরা এ সমস্ত দেশের পছন্দমত চাহিদা জেনে উৎপাদন করে রপ্তানীর সুযোগ গ্রহণ করতে পারি। এক হিসেবে দেখা যায় ১৯৮৭ সনে ১০,০০০ মেট্রিক টন সবজি রপ্তানী করে উল্লেখযোগ্য পরিমাষ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছে। জুলাই ১৯৯৯ হতে জানুয়ারি ২০০০ পর্যন্ত ব্যাক ও বাঁধন এন্টারপ্রাইজ শুধু যুক্তরাজ্যে ফ্রেঞ্চ বীন, বেবি বীন, সবুজ মরিচ, ঢেঁড়শ, করলা, লংবীন, কচুর লতি ও অন্যান্য সবজি প্রায় ৬১ মে.টন রপ্তানী করেছে। হর্টেক্স ফাউন্ডেশন জুলাই ১৯৯৯ হতে জুন ২০০২ পর্যন্ত ফ্রেঞ্চ বীন, বেবি বীন, সবুজ মরিচ, ঢেঁড়শ, করলা, লং বীন প্রায় ৭৫০ মে.টন রপ্তানীর পরিকল্পনা করে তা প্রায় অর্জন করেছে, যার দ্বারা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশে সবজি উৎপাদন এলাকা এবং একক জমিতে গড় ফলন কম। তাই যুগসই, লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তির মাধ্যমে সবজি চাষের এলাকা ও হেক্টর প্রতি ফলন বৃদ্ধি করে রপ্তানী সম্প্রসারণ করা যায়।

বাংলাদেশের লোকজনের চাইতে উন্নত দেশগুলোর লোকজন খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে বেশি সচেতন। যেহেতু সবজিতে পুষ্টি উপাদান বেশি তাই তারা মাথাপিছু বেশি পরিমাণে সবজি গ্রহণ করে। অথচ তাদের উৎপাদনের সুবিধা আমাদের দেশের চাইতে কম। এ কারণে উন্নত দেশের রুচি ও চাহিদার ভিত্তিতে সবজি উৎপাদন ও রপ্তানী করে সবজি রপ্তানী ব্যবস্থাকে লাভজনক হিসেব প্রতিষ্ঠিত করা যায়। শাক-সবজি দ্রুত পচনশীল, সামান্য অব্যবস্থাতেই মান খারাপ হতে পারে, পরিবহনের জুটিতে বিনষ্ট হতে পারে, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কারণে বিনষ্ট বা পচে যেতে পারে। তাই শাক-সবজি টাটকা, সতেজ ও মান ঠিক রেখে দ্রুততার সাথে ভোক্তার নিকট বা বিক্রয়ের স্থানে পৌঁছাতে হয়। এজন্য সবজি সংগ্রহ করে নিরাপদভাবে সংরক্ষণ, গ্রেডিং, পরিষ্কারকরণ, প্যাকেজিং ও উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থায় দ্রুততার সাথে পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিবহন ভাড়া ও প্যাকেজিং খরচ যথাসম্ভব কম করে সড়কপথ, রেলপথ, নদীপথ ও আকাশপথের যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলোকে একক সংযোগের আওতায় আনা দরকার। টাটকা অবস্থায় বিক্রয় স্থানে তাড়াতাড়ি পৌছানো হলে ভোক্তারা ক্রয়ে আগ্রহী হবে। সবজির মান ভাল থাকবে এবং বাজারমূল্যও বেশি পাওয়া যাবে।

২০২২

বিভিন্ন হিসাব থেকে জানা যায় যে সবজির মোট উৎপাদন খরচের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ বাজারজাতকরণে ব্যয় হয়। এজন্য বিদেশে ও সুপার মার্কেটগুলোতে উন্নতমানের সবজিগুলো পাঠাতে হয়। যেহেতু ঐ সব মার্কেটে বিক্রয় মূল্য/দাম বেশি। আমদানিকারক দেশ ও প্রতিষ্ঠানকে বাজারে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে টিকে থাকতে হলে সবজির মান ও মূল্য উভয়ই সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. ধান উৎপাদনে কতদিন সময় লাগে ?
২. লাউ উৎপাদনে কত দিন সময় লাগে ?
৩. মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ ১টি পুষ্টি উপাদানের নাম লেখ।
৪. বাংলাদেশ সরকারকে প্রতি বছর কত লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হয় ?
৫. প্রতি বছর কত হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায় ?
৬. ১৯৬২-৬৪ পর্যন্ত কয়টি পুষ্টি জরীপ হয় ?
৭. দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা কতজন দৃশ্যমান গলগন্ড রোগে ভোগে?
৮. প্রতি বছর কত % আবাদি জমি চাষের বহির্ভূত হচ্ছে?
৯. বাংলাদেশে মোট কত কিলোমিটার রেলপথ আছে ?
১০. খারিফ-১ মৌসুম ইংরেজি কোন মাস হতে কোন মাস পর্যন্ত হয়?
১১. বারোমাসি ১টি সবজির নাম লেখ
১২. বিশ্বে টমেটো, বাঁধাকপি, গাজর -এর হেক্টর প্রতি গড় ফলন কত?
১৩. একই পরিমাণ জমিতে দানাজাতীয় শস্য অপেক্ষ সবজি উৎপাদনে কতগুণ শ্রমিক বেশি দরকার হয়?
১৪. মৌসুম অনুযায়ী সবজিগুলোকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ?
১৫. সবজি চাষে ১ টাকা ব্যয় করে কত টাকা আয় করা সম্ভব ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ২টি দানাজাতীয় ও ৩টি সবজি জাতীয় ফসলের হেক্টর প্রতি ফলন ও উৎপাদন সময় উল্লেখ কর।
২. গোমেজ ও ১৯৯৪ সনের ইউনিসেফ প্রকাশিত পুষ্টি জরিপের চিত্র তুলে ধর।
৩. ভূমিহীন ও প্রান্তিক পরিবারের জন্য শাক সবজি চাষের পরিকল্পনা প্রণয়ন কর।
৪. ৩ মৌসুমে উৎপাদনের জন্য প্রতি মৌসুমের ৫টি করে সবজির নাম লেখ।
৫. ১ শতক জমিতে সবজি চাষের আয় ব্যয়ের ১টি বিবরণী তুলে ধর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. খাদ্য ঘাটতি পূরণে সবজির উৎপাদনগত গুরুত্ব বর্ণনা কর।
২. অব্যবহৃত বা পতিত স্থানে সবজি উৎপাদনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
৩. ২.৫ শতক জমিতে খামার পদ্ধতিতে সবজি চাষের বৎসরভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি কর।

তৃতীয় অধ্যায়
সবজি উৎপাদনের সমস্যাসমূহ ও সম্ভাব্য সমাধান

বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর। নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের ভেতর দিয়ে প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে এক সময় পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় প্রথম জীব কোষের। এই ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ার এক পর্যায়ে মানুষের উদ্ভব ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে মানুষ আরো দ্রুত গতিতে তার চার পাশের প্রকৃতিকে প্রভাবিত, নিয়ন্ত্রিত ও রূপান্তরিত করে চলেছে। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে এই পরিবর্তনের ধারাও হচ্ছে দ্রুততর। জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষিতে এর প্রভাব বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত বিষয়, যা উপেক্ষা করারও সুযাগ নাই। জলবায়ুর উপাদানগুলোর অন্যতম হচ্ছে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা, চাপ ও এর প্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত। পরিবেশের উপাদানগুলো হচ্ছে জীব বৈচিত্র, মাটি, পানি, ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুর অবস্থার সমষ্টি। দীর্ঘদিন জলবায়ু ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে আমাদের এ অঞ্চলে পরিবেশ ও কৃষিতে একটি সুন্দর ধারার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ দূষণের কারণে প্রতিনিয়ত জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে এবং কৃষিতে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে অকাল বা অসময়ে বন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক ফসল বিশেষত সবজি দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে। কেননা সবজি ফসল জলবায়ুর প্রতি বেশি সংবেদনশীল। অসময়ের বন্যায় নিচু এলাকার সবজি সাধারণত সম্পূর্ণভাবেই নষ্ট হয়ে যায়। বর্ষা মৌসুমে নদীর তীরবর্তী এলাকায় বর্ষার প্রভাব বেশি পড়ে এবং নদী তীরবর্তী ও চর এলাকার সবজি তলিয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। অস্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় বন্যার পানি প্রবেশ করে ফসলসহ সবজির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে। সামদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে লবণাক্ত পানি উক্ত এলাকার মাটিকেও লবণাক্ত করে ফেলে সবজি উৎপাদনে দীর্ঘস্থায়ী বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত দিন দিন কমে যাওয়ায় কোন কোন অঞ্চলে মরুকরণ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে। এতে সবজি উৎপাদন ও ফলনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত কমায় শীতকালে ও খারিফ-২ মৌসুমে খরার প্রভাব সবজিতে প্রকট হতে পারে। খরা দীর্ঘমেয়াদি হলে সবজি পানির অভাবে কঠিন চাপের মধ্যে পড়ে। খরাতে গাছের শিকড় এলাকার মাটিতে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান ঠিকমত ছড়িয়ে পড়তে পারে না। ফলে গাছের অপুষ্টিজনিত কারণে বৃদ্ধি ও ফলনের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং ফলন কমে যায়।

গ্রীষ্মকালে খরার জন্য ফলজাতীয় সবজির বোঁটায় এ্যাবসিসিক এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও এ্যাবসিসিক স্তর তৈরি করে। এতে ফলজাতীয় সবজি ঝরে পড়ে এবং ফলন কম হয়।

ফসলে তাপমাত্রার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ফসলের বৃদ্ধি, ফুল ফোটা, ফল ধারণ, ফলের বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় বলেই তাপামাত্রা ক্রান্তি মাত্রার নিচে বা উপরে হলে সবজি উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয়। আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে সবজিতে নানা ধরনের পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের প্রকোপ দেখা দিতে পারে। যেমন কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় আলুতে আর্লি ও লেট বাইট রোগ, শিমে জাব পোকা, লতাজাতীয় সবজিতে মিলডিউ রোগের প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে।। কলকারখানার ও ইটের ভাটার সৃষ্ট বিষাক্ত সালফার, ক্লোরিন ও অন্যান্য গ্যাসের কারণে তার পাশ্ববর্তী এলাকার সবজির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়ে থাকে।

সবজি চাষে জলবায়ুগত সমস্যা

জলবায়ু বিভিন্ন উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা- কোনো স্থানের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, সূর্যের আলো, বায়ুর প্রবাহ ও আর্দ্রতা। উদ্ভিদের জীবনচক্র কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত, যেমন বীজের অঙ্কুরোদগম, দৈহিক বৃদ্ধি, ফুল ও ফল ধারণ ও ফলের পরিপক্কতা লাভ ইত্যাদি। জীবনচক্রের এসব পর্যায়ে উপরেল্লিখিত উপাদানের প্রভাব নিম্নরূপ। এর অন্যথা হলে পুরো উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

তাপমাত্রা : বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় ১০° থেকে ৪০° সে:-এর মধ্যে উঠা নামা করে। বাংলাদেশে মাসিক গড় (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেঃ) নিচে উল্লেখ করা হলো

মাস	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (০ সে.)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (০ সে.)
জানুয়ারি	১৫-২৪	৯-১৫
ফেব্রুয়ারি	১৭-৩০	১১-১৭
মার্চ	১৯-৩৪	১৫-২৩
এপ্রিল	৩১-৩৬	২০-২৪
মে	৩১-৩৮	২০-২১
জুন	২৯-৩৪	২৪-২৬
জুলাই	২৯-৩২	২৫-২৭
আগস্ট	২৯-৩২	২৪-২৭
সেপ্টেম্বর	৩০-৩২	২২-২৬
অক্টোবর	৩০-৩২	২২-২৫
নভেম্বর	২০-৩০	১৭-২১
ডিসেম্বর	১৬-২৭	১১-১৫

তাপমাত্রার আঞ্চলিক ব্যবধান অপেক্ষা ঋতুকালীন ব্যবধান অনেক বেশি। এপ্রিল-মে মাসে তাপমাত্রার উর্ধ্বসীমা সবচেয়ে উপরে উঠে এবং জুন-অক্টোবর মাসে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান কমে আসে। মাঝে মাঝে তাপমাত্রা ৪২° সে. পর্যন্ত উঠে এবং ৭° সে. পর্যন্ত নেমে আসে।

তাপমাত্রার প্রভাব ও উদ্ভিদের জীবনচক্র নিচের তিনটি মৌলিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যথা-

(১) সালোকসংশ্লেষণ ঃ সালোকসংশ্লেষণের সাহায্যে উদ্ভিদ খাদ্যোপাদান থেকে আলোর সাহায্যে যৌগিক পদার্থ তৈরি করে।

(২) শ্বসন ঃ শ্বসনের মাধ্যমে উদ্ভিদ কর্তৃক সংশ্লেষিত যৌগিক পদার্থ নিজের কাজে লাগায়।

(৩) খাদ্য সংগ্রহ ঃ মাটি ও বায়ুমন্ডল থেকে খাদ্যোপাদান শোষণ এবং বিভিন্ন অঙ্গে ব্যবহার করে। উপরেল্লিখিত প্রক্রিয়াসমূহ তাপমাত্রা নির্ভর। ফলে জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়েই তাপমাত্রার প্রভাব রয়েছে। উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি প্রধানত সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল। শ্বসনের হার তাপমাত্রার সাথে সমানুপাতিক কিন্তু সালোকসংশ্লেষণ হার একটি বিশেষ তাপমাত্রার উপরে গেলেও বাড়ে না। অধিকাংশ উদ্ভিদ জন্মে থাকে ৩০° সেঃ এর কাছাকাছি তাপমাত্রায়। শীতপ্রধান অঞ্চলের অধিকাংশ সবজি ফসলে ফুল ধরার জন্য নির্দিষ্ট নিম্ন তাপমাত্রা আবশ্যক। ফল ধরার ওপর শৈত্যের প্রভাবকে হিমাবেশন (vernalization) বলা হয়। কপি গোত্রের সব সবজি যথা- শালগম, মুলা, সরিষা, চীনাকপি এবং গাজর, বিট, পালংশাক, পেঁয়াজ, লেটুস ও মটর ইত্যাদি দ্বিবর্ষজীবী সবজি। এগুলোর চাষাবাদ শীত মৌসুম ছাড়া অন্য মৌসুমে ভালভাবে করা যায় না।

২০২২

কেননা (১) শারীরবৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর তাপমাত্রার মারাত্মক প্রভাব আছে।
(ক) গোল আলুর ২০° সেঃ সালোকসংশ্লেষণ সর্বোচ্চ হয়;
(খ) শিকড় কর্তৃক আহরিত খাদ্য উপাদানের সঞ্চালন ১৮-২২° সে. তাপমাত্রায় সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।
(২) বীজের অঙ্কুরোদগমে তাপমাত্রার প্রভাব আছে? অঙ্কুরোদগমের জন্য শাক-সবজি বীজের একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। উক্ত তাপমাত্রায় বীজের সহজে ও দ্রুত অঙ্কুরোদগম ঘটে। তাপমাত্রা উপরে বা নিচে থাকলে অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয় এবং এক পর্যায়ে অঙ্কুরোদগম হয় না। যেমন-টমেটো বীজ ২৫° সে. তাপমাত্রায় ৬-৭ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদগম করে। কিন্তু তাপমাত্রা নিচে নেমে ১২-১৩° সে. পৌছলে অঙ্কুরোদগম হতে ১২ দিন সময় লাগে।
(৩) শাক-সবজি চারার উপর তাপমাত্রার প্রভাব আছে? অঙ্কুরোদগমের পর বিশেষ করে ৯-১২ দিনের মধ্যে অনেক শাক-সবজির চারাকে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রায় (১১-১২° সে.) জন্মানো উচিত। এ সময়ের নিম্ন তাপমাত্রা চারাকে তেজস্বী শিকড় গুচ্ছ তৈরি করতে সাহায্য করে। ফলে মাঠে রোপণের পর পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সহ্য করে চারা সহজেই বেঁচে উঠতে পারে। তাপমাত্রা শাক সবজির ফুল ধারণকেও প্রভাবান্বিত করে। যেমন- টমেটো। শীতকালীন সবজির ক্ষেত্রে চারা রোপণের সময় পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত একটু বেশি হওয়া উচিত (১৫-২০° সে.)।
(৪) অঙ্গজ বৃদ্ধিতে তাপমাত্রার প্রভাব আছে ও শাক সবজির অঙ্গজ বৃদ্ধিতে তাপমাত্রার প্রভাব অপরিসীম। বিভিন্ন শাক-সবজির তাপমাত্রার চাহিদা বিভিন্ন রকম।

(১) পাতাজাতীয় শাক-সবজি	:	১২-১৭° সে. (দিবসকালীন তাপমাত্রা)
(২) টমেটো, শিম, বেগুন, পেঁয়াজ	:	২০-২৫°
(৩) ফলজাতীয় সবজি	:	২৫-৩০°
(৪) মূলজাতীয় সবজি	:	১৫-২২°
(৫) পালংশাক, লেটুস, বাঁধাকপি	:	৭-১৩°
(৬) বেগুন	:	১৩-১৮°
(৭) টমেটো, মিষ্টি আলু, ঢেঁড়শ	:	১৮-২৪°

৫। ফলোৎপাদনে তাপমাত্রার প্রভাব আছে ও শাক-সবজির ফুল ও ফল উৎপাদনকালে তাপমাত্রা তুলনামূলক কিছুটা কম থাকা উচিত। তাতে গাছে শ্বসনের চেয়ে সালোকসংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি পায় এবং ফলে সঞ্চিত শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায়। টমেটো গাছের ফুলের পরাগায়নে তাপমাত্রার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। যথা-অধিক তাপমাত্রায় টমেটো ফুলের গর্ভকেশর অতিরিক্ত লম্বা হয়ে যায়। উচ্চ তাপমাত্রায় গর্ভমুণ্ড শুকিয়ে যায়। নিম্ন তাপমাত্রায় পরাগরেণু নষ্ট হয়ে যায়- যা স্ব-পরাগায়নকে বিঘ্নিত করে।

অত্যাধিক নিম্ন তাপমাত্রায় কীট পতঙ্গের তৎপরতা তুলনামূলকভাবে কমে যায়। বিধায় শীতকালে জন্মানো Cucurbitaceae গোত্রের সবজি যেমন- লাউ এবং কুমড়ার পর পরাগায়নের হার কমে যায়। ফলের গুণাগুণকেও তাপমাত্রা প্রভাবিত করে।

লেটুস ঃ ২১° সে. তাপমাত্রায় ভাল হয়।

গাঁজর ঃ ১২-২১° সে. তাপমাত্রায় ভাল হয়।

বিট ঃ ঠান্ডা আবহাওয়ায় ভাল হয়

টমেটো ঃ ১৮-২৪° সে. থাকলে উত্তম হয়।

২৭° সেঃ -এর চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় টমেটোতে হলুদ রঙের ভাব বাড়তে থাকে।

(৬) সংগৃহীত ফসলের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব : যেসব সবজি ফসলে সাধারণত অধিক পরিমাণে শর্করা থাকে, সংগ্রহের পর সেগুলোতে প্রধানত নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটে থাকে।

১। চিনি ⟶ শর্করা ২। শর্করা ⟶ চিনি ৩। চিনি ⟶ (Co_2+H_2O+Heat+ শক্তি) নিম্নতাপমাত্রায় ঃ ১ম ও ৩য় বিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম হারে চলে। এজন্য নিম্ন তাপমাত্রায় সংরক্ষিত সবজি ফসলে চিনি বেশি পরিমাণে সঞ্চিত হয়। উদাহরণ- আলু ০-৪° সেঃ তাপমাত্রায় সঞ্চিত করলে মিষ্টি হয়ে যায়। উচ্চ তাপমাত্রায় তিন ধরনের বিক্রিয়াই বেশি হারে চলে। তবে তৃতীয় বিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় হয়। এমতাবস্থায় চিনির পরিমাণ কমে আসে। অতিরিক্ত নিম্ন তাপমাত্রায় বেশিদিন গুদামজাত করা হলে সবজি ৩০-৭০% ভিটামিন সি বাড়ায়।

(৭) শাক-সবজির সর্বোত্তম, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ও তাপমাত্রা এরূপ হওয়া উচিত যাতে গাছের সালোকসংশ্লেষণ অধিক হয়, কিন্তু শ্বসন স্বাভাবিক হারে চলে। ফলে গাছে অঙ্গজ বৃদ্ধি এবং ফলোৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণে শর্করা সঞ্চিত হয়।

ক. সর্বোত্তম তাপমাত্রা ঃ যে তাপমাত্রায় গাছ যথেষ্ট পরিমাণ শর্করা সঞ্চয়ের মাধ্যমে তার স্বাভাবিক অঙ্গজ বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে অধিক ফলন দেয় তাকেই সে গাছের কাঙ্খিত তাপমাত্রা বলে।

খ. সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঃ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলতে সেই তাপমাত্রাকে বোঝায় যাতে গাছ সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি শর্করার প্রায় সবটাই অতিরিক্ত শ্বসন কাজে ব্যবহার করে। যার ফলে স্বাভাবিক অঙ্গজ বৃদ্ধি আর অব্যাহত থাকে না।

গ. সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঃ সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় গাছে সালোক সংশ্লেষণ ও শ্বসনের হার কমে যায় এবং গাছে। শর্করার সঞ্চয় আর হয় না। পরিণতিতে অঙ্গজ বৃদ্ধি থেমে থাকে।

৮. গাছের উপর বিভিন্ন তাপমাত্রার প্রভাব আছে।

উষ্ণতার মাত্রা	প্রভাব
১. সর্বনিম্ন তাপমাত্রার নিচে	গাছের মৃত্যু ঘটে
২. সর্বনিম্ন তাপমাত্রায়	সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন সর্বনিম্ন হারে চলে
	$\frac{\text{সালোকসংশ্লেষণ}}{\text{শ্বসন}} = ১$
	গাছ বৃদ্ধি পায় না
	এই তাপমাত্রা বেশিদিন বিদ্যমান থাকলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে
	$\frac{\text{সালোকসংশ্লেষণ}}{\text{শ্বসন}} = >১$
উপযোগীর কিছু উপরে তাপমাত্রা	
সর্বোচ্চ	$\frac{\text{সালোকসংশ্লেষণ}}{\text{শ্বসন}} = ১$
সর্বোচ্চ উপরে	$\frac{\text{সালোকসংশ্লেষণ}}{\text{শ্বসন}} = >১$

আলোর প্রভাব ও উদ্ভিদের উপর আলোর প্রভাব দু'ধরনের। যথা

(১) সালোকসংশ্লেষণের জন্য আলো প্রয়োজন।

(২) দিবস দৈর্ঘ্য দ্বারা উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রভাবিত হয়। দিবস দৈর্ঘ্যের প্রভাব ২ ধরনের অর্থাৎ দৈর্ঘ্য কমবেশি হওয়ার সাথে সাথে সালোকসংশেষণের জন্য প্রাপ্ত মোট সময়ের ভিন্নতা ঘটে। কিছুসংখ্যক উদ্ভিদের ফুল ধারণ সম্পূর্ণভাবে দিবস দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। শীতপ্রধান অঞ্চলের অনেক সবজির ফুল ধরার জন্য দীর্ঘ দিবস আবশ্যক, নিরীয় এলাকার অনেক সবজির কেবল খাটো দিবসে ফুল ধারণ করে। অবস্থান অনুযায়ী বাংলাদেশে দিবাভাগের দৈর্ঘ্য ১০.২ থাকে ১৩.৮ ঘন্টার মধ্যে। তবে মেঘের কারণে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত দৈনিক গড়ে সর্বোচ্চ ৯ ঘন্টা আলো দিনে পাওয়া যায়। জুন-সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ণ আলো দিনে গড়ে ৫ ঘন্টারও কম হয়। বাংলাদেশে প্রতি মাসের গড় দৈনিক আলোকিত সময়।

মাসের নাম	দৈনিক আলোক সময় (ঘন্টা)	মাসের নাম	দৈনিক আলোক সময় (ঘন্টা)
জানুয়ারি	৮.৯	জুলাই	৪.৭
ফেব্রুয়ারি	৯.২	আগস্ট	৪.৮
মার্চ	৮.৬	সেপ্টেম্বর	৫.২
এপ্রিল	৮.৭	অক্টোবর	৭.৩
মে	৮.২	নভেম্বর	৯.১
জুন	৪.৪	ডিসেম্বর	৮.৯

আলোর প্রখরতা ঃ আলোর প্রখরতার ভিত্তিতে শাক-সবজির প্রকারভেদ-

(১) আলো পছন্দকারী শাক-সবজি ঃ যেমন ঃ বেগুন, আলু, টমেটো।

(২) মধ্যম আলো পছন্দকারী শাক-সবজি ঃ যেমন-ডাটাশাক, নটেশাক, পুঁইশাক।

২০২২

(৩) ছায়া পছন্দকারী শাক-সবজি ঃ যেমন-কচু (মৌলভী কচু), ওলকচু, গাছ আলু।

আলোর স্থিতিকালঃ শিমের বীজ যখনই বপন করা হোক না কেন কেবল ছোট দিবসেই এ গাছে ফুল আসে। পুষ্প উৎপাদন আলোর স্থিতিকালের ওপর নির্ভর করে। শাক-সবজিকে আলোর স্থিতিকালের ওপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ছোট দিবস উদ্ভিদ ঃ যেমন ঃ শিম;
২. দীর্ঘ দিবস উদ্ভিদ ঃ যেমন- পেঁয়াজ, গাঁজর;
৩. দিবস নিরপেক্ষ উদ্ভিদ ঃ যেমন-টমেটো, মরিচ, বেগুন।

(৯) বৃষ্টিপাতের প্রভাব আছে ঃ উদ্ভিদের উপর বৃষ্টিপাতের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। মাটি ও বাতাসের আর্দ্রতা প্রধানত বৃষ্টিপাত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অতিবৃষ্টির কারণে সবজি ফসল নষ্ট হওয়া বাংলাদেশে একটি সাধারণ ঘটনা। বাতাসে আর্দ্রতার আধিক্য সবজিতে রোগ ও পোকার উপদ্রব বাড়ায়। বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের সাথে ঝড়-তুফানের ঘনিষ্ট যোগ রয়েছে। ঝড় তুফান ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে।

(১০) বায়ুর প্রভাব আছে ঃ শাক-সবজি উৎপাদনে বাতাসের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাতাস একদিকে তার উপাদান এবং অন্যদিকে তার প্রবাহের গতিবেগ দিয়ে শাক-সবজি উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। বাতাসে প্রায় ০.৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ০.২ ভাগ $O_২$, ০.০৩ ভাগ $CO_২$ আছে। এছাড়াও বায়ু পরাগায়নে সহায়তা করে।

(১১) বাতাসের আর্দ্রতা ঃ বাংলাদেশে প্রায় সারা বছরই বাতাস যথেষ্ট আর্দ্র থাকে। তবে ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল বছরের শুষ্কতম মাস। এ সময় সর্বোচ্চ আর্দ্রতা ৭৫% ও ৮৫% এবং সর্বনিম্ন আদ্রতা ৪০%-৬৫% এর মধ্যে অবস্থান করে।

(১২) ঝড় তুফান ঃ বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে ঝড় তুফান বয়ে যাওয়া বাংলাদেশের জলবায়ুর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মার্চ-মে মাসে প্রতিবছরই ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় হয়। কোনো কোনো সময় এর সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেও কিছু ঝড় হয়ে থাকে। এসব উপাদানসমূহ শাক-সবজি উৎপাদনে ভীষণভাবে প্রভাব ও সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে।

সবজি চাষে উৎপাদন উপকরণ সমস্যা

শাক-সবজি চাষে বিভিন্ন ধরনের উপকরণের প্রয়োজন হয়। সেগুলো সঠিক সময়ে প্রাপ্যতা, উপকরণের মূল্য, উপকরণের উপযুক্ততা ও তার গুণাগুণ সবজি চাষকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে। যেমন: বীজ, জাত, সার, কীটনাশক, সেচের পানি ও কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

(ক) বীজ ঃ বাংলাদেশের জাত ও মান সম্পন্ন সবজি বীজের অভাব খুবই প্রকট এবং অধিকাংশ চাষী উন্নত জাতের বীজ সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে তারা হাতের কাছে যে বীজ পায় সেগুলো উন্নত কী না বা ভাল জাত কীনা তা বিবেচনা না করেই চাষ করে থাকে। অনুন্নত জাত ও নিম্ন গুণাগুণ সম্পন্ন বীজ বপন বা রোপণ করে তারা আশানুরূপ ফসল পায় না। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে বেশি তাপমাত্রা ও অনিয়ন্ত্রিত বৃষ্টিপাত এবং শীতকালে স্বল্পমেয়াদী ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করে, যা উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের অন্তরায়। তথাপিও প্রতিকূলতার মধ্যে যেটুকু বীজ উৎপাদিত হয় তা আবার সঠিকভাবে শোধন ও সংরক্ষণের অভাবে গুনাগুণ বজায় থাকে না। তবে মানুষ দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য এ সমস্যা দূরীকরণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন ঃ

১। বিভিন্ন সবজির জাত বাছাই করে সেখান হতে উন্নতজাতগুলো নির্বাচন করা।
২। আবাদযোগ্য পুষ্টিকর সবজির জাত উদ্ভাবন বা সংগ্রহপূর্বক পরীক্ষা করে তা প্রবর্তন করা।

৩। বীজের আমদানী নির্ভরতা কমায়ে স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে জোরদারকরণে সহায়তা করা।

৪। চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা ও সময়মত উন্নত বীজ সহজলভ্য করা।

৫। বীজ প্রাপ্তির জন্য তথ্য সরবরাহ জোরদার করা।

৬। বীজ উৎপাদনে কৃষকদের কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

৭। বীজ উৎপাদনে ভর্তুকী প্রদান করা।

৮। বীজ উৎপাদিত চাষীদের পৃথক পরিচিতির ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১০০টি ফসলের চাষ হচ্ছে। এ সমস্ত ফসল চাষাবাদের জন্য বছরে প্রায় ১০ লক্ষ মে. টন বীজের প্রয়োজন হয়। এ পরিমাণ বীজের নূন্যতম মূল্য প্রায় ১৪-১৫ কোটি টাকা। প্রায় ১০০টি ফসলের মধ্যে মাত্র ধান, গম, পাট, আলু এবং কিছুসংখ্যক সবজি, ডাল ও তৈলবীজ সরকারি ব্যবস্থাপনায় সরবরাহের ব্যবস্থা করা ধান-১.২%, গম-১.৬%, আলু-৩.৫৫%, পাট-১০%। এবং অন্যান্য বীজ অতি সামান্য যা পরিসংখ্যানে আনা কঠিন। অথচ উন্নত দেশে শতকরা ১০০ ভাগ ভাল জাতের ও মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সরকারিভাবে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ভাল বীজ উৎপাদনে খরচ বেশি হয়। যার ফলে কৃষকদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় রাখা বীজ অপেক্ষা মূল্য বেশি হওয়ায় কৃষকরা ভাল বীজ কিনতে আগ্রহী হয় না।

১৯৮০-৮১ সাল থেকে বি.এ.ডি.সি সবজি বীজ প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব দুটি খামার বীজ উৎপাদন শুরু করেছে। বর্তমানে সবজি বীজ উৎপাদন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১০০ টন বিভিন্ন জাতের সবজি বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া বেসরকারি সংস্থা বীজ উৎপাদন বাস্তবায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সারণি ঃ বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের বীজ সরবরাহের পরিমাণ (মেট্রিক টন)।

ফসলের নাম	বছর		বীজ (মে.টন)		
	২০০১-২০০২	২০০২-২০০৩	২০০৩-২০০৪	২০০৪-২০০৫	২০০৫-২০০৬
ধান	১৪৯৬৮	১৪৩৭৫	১৭৭৯৪	২৭৪৪	৩৩২০৫
গম	১৪২১৮	১২৩৯০	১২৪৩৮	১৩৭০৫	১২৪১৫
আলু	৬৯৭৭	৬৪৩১	৭৩২৪	৭৬০৯	৮৭০২
ভূট্টা	১৮৯	১৬০	১৬১	৩৫৬	২২২
পাট	৩২৪	৩১৮	৩০৪	১৬২	৪৬৭
ডাল	৪১	৩২	৪৩	১৩৯	৮০
সবজি	১৩	১২	১২	৭৬	১৮
মসুর	১১৫	৪২	৩৩	-	১৭০
সরিষা	৩০৪	২০৩	২০২	৩৩৬	৪১৯

সূত্র: কৃষি পরিসংখ্যান পুস্তিকা, কৃষি সম্প্রসারণ ২০০৭

সার ঃ সার দু'ভাগে বিভক্ত, যথা-জৈব ও অজৈব। জৈব সারের মধ্যে গোবর সার উত্তম। গোবর সার কোন গর্তে সংরক্ষণ করে চালা দিয়ে দিয়ে রাদে বৃষ্টি ইত্যাদি হতে রক্ষা করে পচায়ে ব্যবহার করা ভালো। এতে সারের গুণাগুণ নষ্ট হয় না বরং উপযুক্ত পরিমাণে থাকে। কৃষকদের অজ্ঞতার কারণে গোবর সার সংরক্ষণ ঠিকমত করা হয় না এবং তাদের সারে প্রায় সকল পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়ে যায়। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য শিম জাতীয় ফসল যেমন ধৈঞ্চা, বরবটি, শনপাট, মাসকালাই, গামেটরশুটি ইত্যাদি সবুজ সার হিসেবে চাষ করা যায়। তবে ফুল আসার পর্যায়ে এগুলো চাষ করে মাটিতে মিশায়ে দিলে জমিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। বাসাবাড়ির ঝাড়ু দেওয়া ময়লা আবর্জনা, ঘাস, কচুরিপানা, তরকারি ও ফলমূলের পরিত্যক্ত অংশ হাঁস মুরগির বিষ্ঠা

২০২২

ইত্যাদি পঁচায়ে কম্পোষ্ট বা আবর্জনা পচা সার তৈরি করা যায়। এর গুণাগুণও গোবর সারের অনুরূপ। জ্বালানী সংকটের কারণে গ্রামাঞ্চলে গোবর থেকে জ্বালানী তৈরি করে থাকে। এ কারণে গোবর সারের অপ্রতুলতা রয়েছে। খাদ্য চাহিদা ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় সবুজ সার করা সম্ভব হচ্ছে না। জনগণের সচেতনতার অভাবেও কম্পোষ্ট বা আবর্জনা পচা সারও সংরক্ষণ করা হয় না। জমির অত্যধিক ব্যবহার পাশাপাশি জৈব সারের ব্যবহার অপর্যাপ্ত হওয়ায় দিন দিন জমির জৈব পদার্থের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। যারফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

কোন সবজি চাষে কী পরিমাণ ও কী ধরনের সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। আবার কখন এবং কীভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে যথোপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে পরিমিত পরিমাণ সার ব্যবহার করা হয় না। ফলে ফসলের ফলন কমে যায় ও গুণগত মান বজায় থাকে না। তবে সমস্যা দূরীকরণার্থে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-

১. সবজির বৈশিষ্ট্য ও চাহিদা নিরূপণ।

২. মাটির বুনট, জমির অবস্থান ও মৌসুমভিত্তিক ফসলের সারের সুষমমাত্রা নিরূপণ। এছাড়া সারের প্রয়োগ পদ্ধতি ও ফসলের বয়সের সাথে সাথে প্রয়োগ সময় নির্ণয়পূর্বক সুপারিশ করা।

৩. সারের ধরণ অনুযায়ী উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত পদ্ধতিতে সার প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান, সার সহজলভ্য করা ও অন্যান্য প্রচারণার মাধ্যমে সার ব্যবহারের সুফল প্রদর্শন করা।

৫. একক উপাদানের সার প্রস্তুত না করে যৌগিক উপাদানের সার প্রস্তুত করা, গুণাগুণ বজায় রেখে সার সংরক্ষণ করা।

৬. আগ্রহী ও ভাল কৃষকদেরকে পুরস্কৃত করা।

রোগ ও পোকামাকড় দমনে বালাইনাশক

কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই সবজি ফসলের প্রধান শত্রু। এদের আক্রমণে কেবল ফলনই কমে যায় না, সবজির গুণগত মানও নষ্ট হয়। ফলে সেগুলো বাজারে বিক্রি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অনেক সময় আহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। শাকসবজি রোগবালাইয়ের হাত হতে রক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। কীটনাশকের কার্যপদ্ধতি সাধারণত ৬ (ছয়) ভাগে বিভক্ত। যথা-পাকস্থলীর বিষ, স্পর্শ বিষ, অবশেষ বিষ, সিষ্টেমিক বিষ, ধূপণ বিষ ও বিতাড়নকারী বিষ। আমাদের দেশে সকল বিষই রাসায়নিক বা সিনথেটিক বিষ যা মাটি পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ।

পাকস্থলী বিষ- এই বিষ পৌষ্টিক নালীর উপর ক্রিয়া করে। দর্শন-চর্বণ, চোষণকারী ও লেহনকারী পোকা-মাকড়ের জন্য এ জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। ঔষধ প্রয়োগকৃত গাছের অংশবিশেষ খাওয়ার পরে পাকস্থলীতে বিষ প্রবেশ করে পোকামাকড় আক্রান্ত হয়। যেমন-ঘাসফড়িং, শুয়াপোকা, বিটল, আঁঠালো পাকা ইত্যাদি। লেড , আরসেনেট গ্রুপের ঔষধ, প্যারিস গ্রীণ ইত্যাদি পাকস্থলীতে ক্রিয়া করে।

স্পর্শ বিষ- এই বিষ কীটপতঙ্গ স্পর্শের মাধ্যমে শরীরের ভিতর প্রবেশ করে বিনাশ সাধন করে। এরা সাধারণত ত্বকের বিশেষ স্থান দিয়ে দেহের ভিতর প্রবেশ করে। এই কীটনাশক ঔষধ সরাসরি কীটপতঙ্গের ওপর প্রয়োগ করা যায়। কিছু বিষ আছে যা কীটের ডিমের উপর কার্যকরী এবং ডিমকে নষ্ট করে। এরকম বিষ স্পর্শ বিষের শ্রেণিভুক্ত। সুমিথিয়ন, নেক্সিয়ন, ডিডিটি ইত্যাদি স্পর্শ ক্রিয়াকারী ঔষধ।

অবশেষ স্পর্শ বিষ- কতকগুলো কীটনাশক আছে যেগুলো ব্যবহার করার পর দীর্ঘসময় ধরে মাটিতে ক্রীড়ার ক্রিয়া থাকে। ইহা সাধারণত মাটিতে বসবাসকারী পোকামাকড় মারার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন- সেভিন, ক্যালথেন, ইত্যাদি।

সিস্টেমিক বিধ- এ বিষ কীটনাশক গাছের শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রয়োগের পর পাতা, কান্ড শিকড় ইত্যাদিতে প্রবেশ করে সর্বাংশ বিষাক্ত করে। পরে কোন পোকামাকড় যেমন, ছাতরা পোকা, মাজরা পোকা, ফড়িং গাছের রস চুষে খেলে বা চর্বণ করলে বিষক্রিয়ায় মারা যায়। যে কোন সিস্টেমিক ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

ধুপণ বা ধোঁয়াকারী বিষ- এই বিষ বাষ্প হিসেবে কীটপতঙ্গের শরীরে, শ্বাসযন্ত্রের ভিতর ও শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে কীটের মৃত্যু ঘটায়। এ ঔষধ সাধারণত গর্তে বা বদ্ধ কক্ষে প্রয়োগ করা হয়। কাটুই পোকা, গুদামজাত শস্যের পোকা ইত্যাদি মারার জন্য ধোঁয়া উৎপাদনকারী বিষ ব্যবহার করা হয়। মিথাইল ব্রোমাইড, ফসটকসিন, ইডিসিটি ইত্যাদি ধোঁয়াকারী ঔষধ।

বিতাড়নকারী বিষ- এই জাতীয় কীটনাশক বইপুস্তক, কাপড়-চোপড় সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ফসল ক্ষেতের চারপাশে বিতাড়নকারী বিষের দ্রবণ তৈরি করে ছিটালে গন্ধে পোকামাকড় দূরে সরে যায়। এ বিষে পোকা মরে না, তবে দূরে সরে যায়। তেলাপোকা, উই, ঘুগরি পোকা, পামরি ইত্যাদি পোকা ফসলের জমি হতে দুরে সরায়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। ডীট, সাইট্রোনেলা, ন্যাপথলিন, কেরোসিন ইত্যাদি বিতাড়নকারী ঔষধ।

ফসলে পোকা- পোকামাকড়ের আক্রমণের ধরন এবং ক্ষতির মাত্রা নির্ধারণ করে পরিমিত পরিমাণ বালাইনাশক ব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া বালাইনাশকের একদিকে অপচয় হবে, অপরদিকে মানব স্বাষ্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতি হবে। এতে আস্তে আস্তে পোকামাকড়ের বংশ পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা হবে। তাই এ ব্যাপারে কৃষকদের সম্যক জ্ঞান না থাকলে বালাইনাশকের সফল প্রয়োগ সম্ভব নয়। বালাইনাশকের বিষক্রিয়া ও পোকামাকড়ের আক্রমণ মৌসুম পোকামাকড়ের ধরন বিবেচনা করে বালাইনাশক বাজারজাত করা হয় না বলে কৃষকরা নানাবিধ সমস্যায় পড়ে থাকে। বালাইনাশকের বাজারমূল্যও অনেক বেশি, যার ফলে কৃষকরা সময়মত ও উপযুক্ত পরিমাণে বালাইনাশক ব্যবহারে আগ্রহী হয় না। বাজারে যে সমস্ত বালাইনাশক বিক্রি হচ্ছে তার মধ্যে অধিকাংশ ভেজাল বা নিম্নমানের এবং কিছু কিছু নিষিদ্ধ।

সেচ সুবিধার অপ্রতুলতা- সেচ সুবিধা ব্যতীত শীতকালীন ও আগাম গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ করে আশানুরুপ ফল পাওয়া সম্ভব না। এদেশে সবজি চাষে ব্যবহার উপযোগী সেচ সুবিধা খুবই অপ্রতুল। বর্তমানে বিদ্যমান সেচ সুবিধাদি শুধু দানাজাতীয় শস্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে সবজি চাষ জোরদারকরণের জন্য নিম্নোক্ত প্রচেষ্টা দরকার।

১. আবাদ মৌসুম ও চাষ পদ্ধতি বিন্যাস করে বর্ষার স্বাভাবিক আর্দ্রতায় সবজি চাষ বাড়ানো।

২. বসতবাড়ি, পুকুর, ডোবা ও নালার আশেপাশে ও অন্যান্য ফসলের আইলে বেশি করে সবজির চাষ করা।

৩. খরা সহিষ্ণু সবজির চাষ বৃদ্ধি ও পরিচর্যার মাধ্যমে জমির রস সংরক্ষণ করে বেশি করে চাষ করা।

৪. সবজি চাষোপযোগী জমিতে শুধু দানা শস্য চাষের মানসিকতা পরিবর্তন করে সবজি চাষ করা।

৫. ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমায়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার করা। এজন্য বিভিন্ন স্থানে পানির আঁধার সৃষ্টি করা।

৬. বৃষ্টির পানি ব্যবহারের সুবিধা তৈরি করা।
৭. হেক্টরপ্রতি ফলন কম।

সবজির অনিশ্চিত বাজার মূল্যের কারণ

সবজি বিক্রয়ে বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থায় চরম নৈরাজ্য বিরাজমান। এ যাবৎ সবজি বিক্রয়ের কোন কাঠামো গড়ে উঠেনি, যেখানে কৃষকরা তার পণ্য বিক্রির বা উপযুক্ত বাজারমূল্য প্রাপ্তির জন্য সহায়তা পেতে পারে।

(১) কৃষক তার উৎপাদিত সবজি ভোক্তার নিকট বিক্রয় করে স্থানীয় বাজারসমূহে। এক্ষেত্রে বাজারের চাহিদা বা সরবরাহ সম্পর্কে কৃষকের নিকট আগাম কোন তথ্য থাকে না। যার ফলে বাজারে গিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে সবজি নিয়ে বসে থাকতে হয় এবং ক্রেতার সমাগম হলে বিক্রি হয়, নতুবা অনেক সময় ফেরৎ নিয়ে আসতে হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে কোন কোন সময় শুধু পরিবহণ ব্যয় নির্বাহের জন্যও খুব কম দামে বিক্রি করতে হয়।

(২) কৃষককে অনেক সময় সবজি বাজারে নিয়ে গিয়ে বাজার জমে উঠার আগেই ফড়িয়ার কাছে বিক্রয় করতে হয়। এক্ষেত্রে আশানুরুপ দাম সে পায় না। এমনকি ফড়িয়ার নিকট বিক্রি না করলে অনেক চাপের মুখে পড়তে হয়।

(৩) সবজি দূরবর্তী বাজারে প্রেরণ করতে হলে পরিবহণ ও বিক্রয় প্রতিনিধি প্রেরণের কারণে অল্প পরিমাণ সবজিতে বেশি খরচ হয়ে যায়। এতে কৃষক তার উৎপাদিত সবজির উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়।

(৪) কৃষকদেরকে সবজি উৎপাদন করে অনেক ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট বাড়ি, হোটেল, রেস্তোরা, নির্দিষ্ট বাজার, বিশেষ এলাকার খুচরা বিক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করতে হয়। এরূপ অবস্থায় ভোক্তা কখনো কখনো ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতই হোক সবজি ক্রয়ে অনাগ্রহ দেখায়। সেক্ষেত্রে বিক্রয় এবং বিক্রয়মূল্য অনিশ্চিত হয়ে যায়।

(৫) ফড়িয়া বা চুক্তিবদ্ধ সরবরাহকারী মাঝে মাঝে এলাকায় সবজি ক্রয় করতে যাওয়া বন্ধ করে দেয় বা হঠাৎ করে দুই চারদিন সবজি ক্রয় করে না এতে সবজি বিক্রেতা কৃষকরা দুর্বিপাকে পড়ে।

(৬) কৃষকদের উৎপাদিত সবজির উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন তা ক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ বা সমবায়ভিত্তিক কোন বাজার ব্যবস্থা নাই। যার ফলে কৃষকদের সবজি বিক্রয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থাও তৈরি হয়নি।

(৭) সবজি উৎপাদনে ব্যয়ের নির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই। কেননা হঠাৎ করে উৎপাদন উপকরণের ঘাটতি দেখা দেয়, মূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে যায়, উপকরণ ভেজাল হয় ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয়ের নির্দিষ্ট মান নির্ধারণ ব্যবস্থা নাই বা কোন সংস্থা নাই, যার মাধ্যমে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করার যৌক্তিক সমর্থন পাবে। তাই সবজির বাজার ব্যবস্থায় কোন প্রকার নিশ্চয়তা নাই।

(৮) কৃষকরা দরিদ্র হওয়ায় তাদের উৎপাদিত সবজি বিক্রয়ের জন্য হিমাগারে সংরক্ষণ বা ভাল প্যাকিং ব্যবস্থায় সুপার মার্কেটে প্রেরণ বা সংরক্ষণযোগ্য সবজি বেশিদিন ধরে রাখতে পারে না।

(৯) স্বল্প সুদে বা বিনা সুদে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ না থাকায় কৃষকরা তাদের সবজি উৎপাদনের জন্য স্থানীয় লগ্নীকারীদের নিকট ফসল উঠার আগেই নামমাত্র মূল্যে আগাম বিক্রি করে থাকে। এমনকি অত্যন্ত চড়াসুদেও ঋণ নিতে হয়, এতে উৎপাদন খরচ খুব বেশি হয়ে যায়।

(১০) কৃষকরা অ-সংগঠিত হওয়ায় বিক্ষিতভাবে পণ্য মাঠ হতে উঠায় এবং বিক্ষিপ্তভাবে বিক্রি করে থাকে। এমনকি কৃষকদেরকে সবজি বিক্রির জন্য সরকারিভাবে কোন সহায়তা দেওয়া হয় না, বিক্রির জন্য আইনগত কোন সমর্থন দেওয়া হয় না, সরাসরি বিক্রির জন্য কৃষকদের নির্দিষ্ট স্থান বা কোটা ব্যবস্থা করা হয়নি। যার ফলে কৃষকরা সবজি বিক্রি করে ভাল দাম পায় না।

(১১) বাজার সম্পর্কীত তথ্য-সবজি উৎপাদনকারীদের নিকট পৌছানোর দায়িত্ব পালনের জন্য কোন সংস্থা সরকার গড়ে তোলেনি। বাজার তথ্য না জানার কারণে সবজি কোনদিন উঠাবে বা কোন বাজারে পাঠাবে তা তারা ঠিক করতে না পারায় সবজির উপযুক্ত মূল্য পায় না।

(১২) ওজনের বাটখারার জালিয়াতির কারণে ফড়িয়া বা মধ্যস্বত্বভোগী বা আড়তদারদের কাছে সবজি সরবরাহ করে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়াও সবজির মাপ অঞ্চলভেদে বিভিন্ন নিয়মে অনুসরণ করার কারণেও কৃষকরা ঠকে থাকে। এভাবে কৃষকরা উপযুক্ত বাজারমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

(১৩) সবজি শ্রেণিবিভাগকরণ ব্যবস্থা গড়ে না উঠার কারণে বড়, ছোট, কচি, পরিপুষ্ট, জৈব উৎপাদন, অজৈব উৎপাদন ইত্যাদি সবই একই বাজারে একই দামে একই নিয়মে বিক্রি হয়। সবজি শ্রেণীবিভক্তকরণ সংস্কৃতি গড়ে উঠলে কৃষকদের পক্ষে ভাল বাজার মূল্য পাওয়ার সুযোগ তৈরি হতো। কিন্তু এ যাবৎ সরকারিভাবে এমন কোন উদ্যোগই নেওয়া হয়নি।

(১৪) অপর্যাপ্ত ও অদক্ষ পরিবহণ ব্যবস্থার কারণে সবজি উঠায়ে স্থানান্তরে যথেষ্ট সময় লাগে, প্রচুর ব্যয় হয়, পথে পরিবহণে পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। আর এর সমস্ত ক্ষতির অংশটুকু সবজি উৎপাদকের ওপর ন্যস্ত হয়। যারফলে কৃষক বা উৎপাদক সঠিক বাজারমূল্য পায় না।

বাংলাদেশে সবজি চাষের সমস্যা সমাধানের উপায়

বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

(১) জলবায়ুগত সমস্যা ঃ বাংলাদেশে বিরাজমান জলবায়ুর কারণে বছরের সবসময় সব ধরনের শাক-সবজির উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ফলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় ভালো জন্মে এমন সবজিগুলো কেবল রবি মৌসুমে এবং গরম আবহাওয়ার উপযোগী সবজিগুলোকে খারিফ মৌসুমে উৎপাদন করা সম্ভব। তদুপরি বর্ষাকালে অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের দরুণ সবজি উৎপাদন বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া বর্ষাকালে গড় তাপমাত্রা ৩০° সে. হয় এবং আর্দ্রতা অনেক বেড়ে যায়। মার্চ-মে মাসে বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত ও অনিয়মিত হলেও এ সময়ে বারবার প্রবল ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়, যা সবজির জন্য নিরাপদ নয়।

(২) নিম্নমানের ফলন ঃ বাংলাদেশে সবজির গড় ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। যদিও অন্যান্য দেশের তুলনায় জমির গুণাগুণ এত খারাপ নয়। উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহার না করার ফলে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ এর প্রধান কারণ।

(৩) বীজের সমস্যা ঃ বীজ সমস্যার কারণে এদেশের সবজি উৎপাদন ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সবজি উৎপাদনের পরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা প্রায়ই বীজের অভাবে অবাস্তবায়িত থেকে যায়। সবজি বীজ সমস্যার মধ্যে অনেক সবজির বীজ আমাদের দেশে উৎপাদিত না হওয়া, উৎপাদিত বীজের নিম্নমান এবং বিদেশ থেকে বীজ আমদানিতে উদ্ভূত সমস্যা উল্লেখযোগ্য। বিদেশ থেকে যে বীজগুলো আমদানি করা হয় তা আমাদের দেশের জলবায়ুতে হয় না। যেমন-বাঁধাকপি, ফুলকপি।

(৪) বাজারজাতকরণ সমস্যা ঃ বাংলাদেশে সবজির বাজারজাতকরণের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। মূলত জলবায়ুর কারণে বছরের কোনো কোনো সময়ে সবজির সরবরাহ খুব কম, এসময় ক্রেতাদেরকে অধিক মূল্যে সবজি কীনতে হয়, যার দরুণ সবজির ব্যবহার কমে আসে। উৎপাদনে মৌসুমে চাহিদা আছে এমন স্থানে শাক-সবজির যথেষ্ট মূল্য থাকলেও উৎপাদন এলাকায় এর মূল্য থাকে খুবই কম। এতে কৃষক তার নায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। বাংলাদেশে সবজি কেনা-বেচায় মধ্যস্বত্বভোগীরা সবজির পচনশীলতা ও কৃষকদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করে।

(৫) শাক-সবজির উচ্চ উৎপাদন খরচ ও নিম্নমূল্য ঃ সবজি চাষের উপকরণের মধ্যে বীজ, সার, ফসল সংরক্ষণের ওষুধ ও সিঞ্চন যন্ত্র প্রধান। এসব উপকরণের প্রাপ্যতা, গুণাগুণ ও দাম খুব বেশি, কিন্তু এগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে সবজি উৎপাদন করে যে আয় হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

(৬) শাক-সবজি উৎপাদনে যথাযথ ও সমন্বিত প্রচেষ্টার অভাব ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অনেক জাতের সবজির জাত উদ্ভাবন করেছে কিন্তু এগুলো অনেক অঞ্চলের কৃষকদের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছায়নি। কারণ সম্প্রসারণ ও অন্যান্য বিভাগের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থা নেই।

(৭) অন্যান্য সমস্যা ঃ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সবজি উৎপাদন করতে প্রচুর কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন। বাংলাদেশে কৃষিকাজের বেশিরভাগ কর্মকাণ্ড নিরক্ষর কৃষকদের হাতেই রয়ে গেছে। ফলে অনেক উন্নত প্রযুক্তি থাকলেও সেগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে না।

শাক-সবজির বর্তমান অবস্থা উন্নয়নের অগ্রগতি

শাক-সবজির উৎপাদন ব্যবহার সার্বিক উন্নয়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১) ঘাটতি মৌসুমে শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ জলবায়ুগত কারণে বছরের সব সময় সবজির উৎপাদন সমান থাকে না। যথাযথ উৎপাদন কৌশল ও উপযোগী জাতের ব্যবহারের মাধ্যমে ঘাটতি মৌসুমগুলোতে সবজি সরবরাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(২) শাক-সবজি উৎপাদনে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে ঃ শীতকালীন শাক-সবজির চাষ অনেকাংশে পানিসেচ সুবিধার ওপর নির্ভরশীল। সেচের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সবজি চাষাধীন জমি বাড়ানো সম্ভব। একটি সুপরিকল্পিত গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনায়াসে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(৩) শাক-সবজির ফলন বৃদ্ধি ঃ উন্নত ও উপযোগী জাত দ্বারা সবজির ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সকল কৃষকই যদি উন্নত জাতের সবজি চাষ করে তাহলে সবজির ফলন অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

(৪) বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করে ঃ আমাদের দেশে কৃষকেরা খুবই কম পরিমাণে সবজি উৎপাদন করে এবং কম জমিতে সবজি চাষ করে। সবজি যদি বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয় তবে সবজি উৎপাদন বেড়ে যাবে।

(৫) সবজি বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে ঃ বাংলাদেশের সব জায়গা বীজ উৎপাদনের জন্য উপযোগী নয়। তাই যে অঞ্চলে বীজ উৎপাদন ভালো হয়, সেই এলাকায় বীজ উৎপাদন কার্য সম্পাদন করে আমরা ভালো বীজ পেতে পারি। সবজি বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করে সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

(৬) গবেষণা জোরদারকরণ ঃ সবজি গবেষণার জাত উন্নয়ন এবং প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতিটি সবজির উন্নত জাত উদ্ভাবন করতে হবে। রোগ ও পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত বের করা খুবই প্রয়োজন।

(৭) উৎপাদন উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ঃ উন্নতমানের বীজ, নির্ভেজাল ওষুধ ও অন্যান্য উৎপাদন উপকরণ কৃষকেরা যাতে সময়মত এবং যুক্তিসঙ্গত দামে ক্রয় করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা।

এদেশে সবজি উৎপাদনে জলবায়ুর প্রভাব থাকার কারণে বছরের সবসময় সবজির উৎপাদন ও সরবরাহ একই থাকে না। ফলে বছরের কোনো কোনো সময় বিশেষ করে সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ও এপ্রিল-মে মাসে সবজির সরবরাহ অনেক কমে আসে। গ্রীষ্মকালীন সময়ে শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

ক. উৎপাদন কলোকৌশল ও উপযোগী জাতের ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালীন সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। বর্তমানে এমন অনেক সবজি আছে যেগুলো উভয় ঋতুতে জন্মানোর উপযোগী জাত রয়েছে। যেমন-বাঁধাকপি, । ফুলকপি, টমেটো, বেগুন এগুলো গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায়।

খ. সুপরিকল্পিত গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অনায়াসে গ্রীষ্মকালীন সবজি উৎপাদনবৃদ্ধি করা সম্ভব।

গ. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হেক্টর প্রতি ফলনে শাক-সবজির স্থান উঁচুতে। যেখানে টমেটো ও বাঁধাকপির হেক্টর প্রতি ফলন যথাক্রমে ৫০-৬০ টন, সেখানে চাল ও গমের ফলনের বিশ্বগড় ২-৩ টন। ক্যালোরিতে রুপান্তরিত করলেও বহু সবজি গম ও চাল অপেক্ষা অধিক উৎপাদনশীল।

ঘ. যে দেশে প্রচুর পরিমাণে শাক-সবজি খাওয়া হয়, সেখানে চাল, গম কিংবা ভূট্টা তথা প্রধান খাদ্য শস্যের চাহিদা কম।

ঙ. বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের বিকল্প খাদ্য হিসেবে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের পুষ্টি সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করলে পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব। ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা এমনভাবে সাজানো উচিত যাতে পুষ্টি উপাদানসমূহ অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। এসব ব্যবস্থার সাহায্যে পুষ্টি সমস্যার ব্যাপকতা কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

মানুষের বয়স ও ওজনভিত্তিতে সবজি খাওয়া উচিত। তবে দেশের প্রায় ১৫ কোটি লোকের জন্য প্রায় ১০-১২ মিলিয়ন টন সবজির প্রয়োজন। অথচ এখানকার সবজি (আলুসহ) বর্তমানে বার্ষিক উৎপাদন ৩.৫ মিলিয়ন টনের মতো। সুতরাং দেশের বর্তমান উৎপাদন চার গুণে পৌছানো প্রয়োজন।

উল্লেখযোগ্য যে, যেখানে বাংলাদেশে দৈনিক মাথাপিছু মোটামুটি প্রায় ৫০০ গ্রাম দানা শস্য এবং ১০০ গ্রাম সবজি ও মূলজাতীয় খাদ্য খাওয়া হয়, সেক্ষেত্রে জাপানে ২০০ গ্রাম দানা শস্য ও ৪০০ গ্রাম সবজি ও মূল, যুক্তরাজ্যে ২০০ গ্রাম দানা শস্য ও ৪৫০ গ্রাম সবজি ও মূল এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৮০ গ্রাম দানা শস্য ও ৪০০ গ্রাম সবজি ও মূল খাওয়া হয়।

২০২২

সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় : সবজি উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সবজি উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশে সবজি চাষকৃত জমির পরিমাণ, সবজি উৎপাদন ও বিশ্বে সবজি উৎপাদন পরিস্থিতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো। সবজির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

(১) সবজির উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন।
(২) পতিত জমিকে অধিক পরিমাণে শাক-সবজি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা।
(৩) সবজির প্রকারগত বহুমুখীকরণ।
(৪) প্লাবনমুক্ত পাহাড়ি এবং টেরেস এলাকায় সবজি উৎপাদন বাড়ানো।
(৫) হিমাগারের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি করে বীজ-আলু সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
(৬) বর্ষাকালে অধিক সবজি উৎপাদনের উদ্দেশে দেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম এলাকায় বিশেষ প্রকল্প প্রণয়ন।
(৭) বাড়ি-ঘর, অফিস, স্কুল-কলেজ এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী পতিত জমিতে শাক-সবজি উৎপাদন।
(৮) সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
(৯) কীট-পতঙ্গ শত্রু ও রোগ দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(১০) শিম, মিষ্টি আলু, শাক ও কচুজাতীয় সবজি উৎপাদন বাড়ানো।
(১১) লবণাক্ত অঞ্চলে চাষাবাদের জন্যে বিভিন্ন সবজির জাত উদ্ভাবন।

(ক) বাংলাদেশে সবজি চাষে জমির পরিমাণ ও উৎপাদন

বছর	খারিফ		রবি		মোট	
	জমি (০০০' একর)	উৎপাদন (০০০ টন)	জমি (০০০' একর)	উৎপাদন (০০০ টন)	মোট জমি (০০০' একর)	মোট উৎপাদন (০০০ টন)
১৯৯৩-৯৪	১৭৬	৩৬৯	২৭১	৭৯৬	৪৪৭	১১৬৫
১৯৯৪-৯৫	১৮২	৩৮৮	২৭৫	৮১১	৪৫৭	১১৯৯
১৯৯৫-৯৬	১৮৯	৩৯৮	২৮৩	৮৪৬	৪৭২	১২৪৪
১৯৯৬-৯৭	১৯৫	৪১১	২৯২	৮৭৮	৪৮৬	১২৮৯
১৯৯৭-৯৮	১৯৯	৪১৮	২৯৭	৮৮৭	৪৯৬	১৩৯৫
১৯৯৮-৯৯	২১০	৪৭৩	৩২৪	১০৩৭	৫৩০	১৫১০
২০০৬-২০০৭	৭৯১	৯৩০	১০৭০	২০০০	১৮৬১	২৯৩০
২০০৭-২০০৮	৮.৩১	১০৩৪	১০৯৪	২৩৪০	১৯২৫	৩৩৭৪

২০২২

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. পৃথিবীর বয়স কত বছর?
২. মাঝে মাঝে তাপমাত্রা কত ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে?
৩. মাঝে মাঝে তাপমাত্রা কত ডিগ্রী সেলসিয়াস পর্যন্ত নামে?
৪. অধিকাংশ উদ্ভিদ কত ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় জন্মে ?
৫. গোল আলুর সালোক সংশ্লেষণ কত ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বেশি হয় ?
৬. টমেটো বীজ কত ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গজাতে ১২ দিন পর্যন্ত সময় লাগে ?
৭. কত ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা গাজরের গুণাগুণের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে ?
৮. আলু কত ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করলে মিষ্টি হয়ে যায় ?
৯. বাংলাদেশের দিবাভাগের দৈর্ঘ্য কত ঘন্টা থেকে কত ঘন্টা বিরাজ করে ?
১০. বাতাসে কত ভাগ নাইট্রোজেন থাকে ?
১১. বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় কত লক্ষ মে. টন বীজ লাগে?
১২. সার কয়ভাগে বিভক্ত?
১৩. কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই কিসের প্রধান শত্রু?
১৪. কীটনাশকের কার্যপদ্ধতি সাধারণত কয় ভাগে বিভক্ত ?
১৫. একটি সিস্টেমিক বিষের নাম লেখ।
১৬. একটি বিতাড়নকারী বিষের নাম লেখ।
১৭. বিদেশ থেকে কোন ফুল জাতীয় সবজির বীজ আমদানি করতে হয় ?
১৮. টমেটো ও বাঁধাকপির হেক্টর প্রতি ফলন কত টন হতে পারে ?
১৯. মার্চ-মে মাসে বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত হলেও এসময় কী বয়ে যায় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জলবায়ু ও পরিবেশের উপাদানগুলো কী কী তা উল্লেখ কর।
২. বাংলাদেশের মাসওয়ারি গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত ?
৩. সবজির অঙ্গজ বৃদ্ধিতে তাপমাত্রার প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা কর।
৪. সবজি সংগ্রহোত্তর তাপমাত্রার প্রভাব তার ওপর কী ধরনের তা বর্ণনা কর।

২০২২

৫. বাংলাদেশে ভাল মানের বীজ সরবরাহ পরিস্থিতি উল্লেখ কর।

৬. জমির উর্বরতা বৃদ্ধি কীভাবে করা যায় ?

৭. মানসম্পন্ন সবজি বীজের চাহিদা কীভাবে দূর করা যায়?

৮. ফসলের রোগ ও পোকামাকড় দমনে কীটনাশকের কার্যপদ্ধতিগুলো উল্লেখ করাসহ যে কোন একটির বর্ণনা দাও।

৯. সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করে কীভাবে সবজি চাষ বাড়ানো যায় ?

১০. শাক-সবজির বর্তমান অবস্থা উন্নয়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ?

১১. মানুষের জন্য কী পরিমাণ সবজির প্রয়োজন তা আলোচনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শাক-সবজি উৎপাদনে জলবায়ুগত সমস্যা কীভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা কর।

২. সবজি চাষে উৎপাদন উপকরণের কী ধরনের সমস্যা হয় তা বর্ণনা কর।

৩. বাংলাদেশে সবজি চাষের সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়
সবজির বীজতলা তৈরি, বীজের বিশুদ্ধতা ও বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা

বীজতলার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

ফসল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করা যায়। এমন অনেক ফসল আছে যেগুলোর বীজ সরাসরি মূল জমিতে বপন বা রোপণ করা হয়, যেমন-লালশাক, পালংশাক, পাট, সরিষা, মুলা ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু সবজি আছে যেগুলোর বীজ সরাসরি মূল জমিতে বপন বা রোপণ করা হয়না; যেমন-কপিজাতীয়, বেগুন, টমেটো, পেঁপে ইত্যাদি। এগুলোর বীজ কোন স্থানে বা পাত্রে বপন করে আগে চারা তৈরি করে নেয়া হয়। এ চারা উৎপাদনের স্থানকে বীজতলা বলে। বীজতলায় বিশেষ যত্নের সাথে চারা উৎপাদন করে মূল জমিতে রোপণ করা হয়। বীজতলার মাটিতে চারা জন্মায় এবং জীবনের প্রথম ধাপ সেখানে অতিবাহিত করে। তাই বীজের সুষ্ঠ অঙ্কুরণ ও চারার সুষ্ঠু বৃদ্ধির উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য বীজতলার স্থান উঁচু ও খোলামেলা হওয়া উচিত এবং সেচ ও নিকাশ সুবিধা থাকা বাঞ্ছনীয়।

বীজতলার ধরন ও প্রস্তুত প্রণালী অনুসারে বীজতলাকে দুভাগে ভাগ করা যায়; যেমন- (ক) স্থানান্তরযোগ্য ও (খ) অস্থানান্তরযোগ্য।

(ক) স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা

প্রতিকূল পরিবেশে বা স্বল্পসংখ্যক চারা তৈরির জন্য বা বিশেষ প্রয়োজনে সরাসরি জমিতে বীজতলা তৈরি না করে স্থানান্তরযোগ্য পাত্রে বীজতলা করা হয়। পাত্রটি কাঠের, প্লাষ্টিকের বা টিন দ্বারা তৈরি করা যেতে পারে।

চিত্রঃ বীজতলা

স্থানান্তরযোগ্য বীজতলার সুবিধা

উপযুক্ত জায়গার অভাব ও প্রতিকূল আবহাওয়া বিশেষত ও বৃষ্টি বাদলের সময়ে খোলা আকাশের নিচে সবজির চারা উৎপাদান করতে বিশেষ অসুবিধা হয়। তাছাড়া পারিবারিক সবজি বাগানের সামান্য সংখ্যক চারার জন্য বৃহদাকারের বীজতলা তৈরি করাও যুক্তিযুক্ত নয়। তাই সরাসরি ভূ-পৃষ্ঠের উপরে বীজতলা তৈরি না করে স্থানান্তরযোগ্য বীজতলায় চারা উৎপাদন করা হলে সেগুলো বৃষ্টি বাদল ও প্রখর রোদে বা শীতের সময়ে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখা যায়। ফলে স্থানান্তরযোগ্য বীজতলায় প্রতিকূল পরিবেশে কম খরচে চারা উত্তোলন করে আগাম ফসল জন্মানো ও অধিক মুনাফা লাভের পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়।

স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা তৈরির নিয়ম

প্রথমে ঢাকনাবিহীন কাঠের বাক্স, প্লাস্টিক, মাটি বা কাঠের ট্রে, চেপ্টা আকৃতির অগভীর মাটির পাত্র, বাঁশের ঝুড়ি, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি তৈরি বা সংগ্রহ করতে হয়। স্থানান্তরযোগ্য বীজতলার পাত্র টেকসই, সস্তা, ওজনে হাল্কা। এর তলায় ছিদ্রযুক্ত ও ১৫ সে. মি. এর কম গভীর হওয়া উচিত। নাড়াচাড়ার সুবিধার্থে হাতলযুক্ত ও আকারে ছোট হলে ভাল হয়। কাঠের বাক্স, ট্রে ইত্যাদি ৬০, ৪৫, ১৫ সে. মি. এবং মাটির পাত্র, বাঁশের ঝুড়ি ইত্যাদি আকারে বড় হলে সহজে স্থানান্তর করা যায় না। একসাথে অনেক চারা উৎপাদনের জন্য গ্রীণ হাউজে বাঁশ, কাঠ বা স্টীলের কাঠামো তৈরি করে অনেকগুলো চারার বাক্স বা পাত্র ধাপে ধাপে সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চিত্র : স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা

পাত্রের তলায় বিশেষত ও ছিদ্রের উপরে মাটির পাত্র ভাংগা চাড়া, ইটের খোয়া, শুকনো পাতা ইত্যাদি বিছিয়ে দিয়ে ৫ সে.মি. পুরু করে বালি দিতে হয়, যেন অতিরিক্ত পানি বের হতে পারে। অতঃপর সার মাটি দিয়ে পাত্র ভর্তি করে বীজ বুনতে হয়। (৫০% পচানো গোবর সার, তবে ১০ কেজির প্রতি ঝুড়িতে ৬ গ্রাম ইউরিয়া, ৪ গ্রাম টিএসপি, ৬ গ্রাম এমওপি, ১ গ্রাম সেভিন মেশাতে হবে)।

চিত্র : নিচু এলাকায় পানির উপর তৈরি স্থানান্তরযোগ্য বীজতলা

বাঁশের ঝুড়ি, মাটি, কাঠ বা প্লাস্টিকের বাক্স, ট্রে, পানিতে ভাসমান অবস্থায় কচুরিপানার স্তুপ, পলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি। বিভিন্ন পাত্রে চারা তৈরি করলে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় সময় সহজে যেকোন নিরাপদ স্থানে নেওয়া যায়। নিচু এলাকায় বা যে সকল স্থানে কিছু সময়ের জন্য প্লাবিত থাকে সে সকল স্থানে চারা তৈরির জন্য মাদা তৈরি করা হয়। এই মাদা পানির উপরে ভাসমান থাকে এবং এতে বিভিন্ন খড়কুটা বা কচুরিপানা ব্যবহার করা হয়। ঐ মাদায় খড়কুটা পচার পর তাতে কুমড়াজাতীয়, যেমন, টমেটো ইত্যাদির বীজ নির্দিষ্ট দূরত্বে বপন করা হয়। এই বীজতলা প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে টেনে নেয়া যায়।

(গ) অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলা- সরাসরি জমিতে যে বীজতলা তৈরি করা হয় তা এ শ্রেণিভুক্ত। এ শ্রেণির বীজতলা সাধারণত খোলামেলা, আলোবাতাসযুক্ত উঁচুস্থানে তৈরি করা হয়। অনেক সময় পলিথিন ঘরে, গ্রীনহাউজ বা কাঁচ ঘরের মধ্যেও এ ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়। অস্থানান্তরযোগ্য বীজতলাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) স্থায়ী ও (২) অস্থায়ী।

(১) স্থায়ী বীজতলা- যে সকল স্থানের মাটি এঁটেল বা পানির স্তর উপরের দিকে বা মাটি লবণাক্ত সে সকল স্থানে এ ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয়। বীজতলার জন্য স্থান নির্বাচন করে মাপজোখ দিয়ে সেই স্থানের মাটি কোদাল দিয়ে প্রায় ৬ ইঞ্চি বা ১৫ সে. মি. গভীর করে খুড়ে তুলে ফেলতে হয়। অতঃপর নিম্নোক্তভাবে তিনটি স্তরে সাজিয়ে বীজতলা তৈরি করতে হবে।

(১) সর্বনিম্নস্তরে- ৭.৫ সে. মি. বা ৩ ইঞ্চি পুরাতন সুরকী, ভাঙা ইট, খোয়ামাটি

(২) মধ্যস্তর- ৭.৫ সে. মি. বা ৩ ইঞ্চি দোঁ-আঁশ মাটি বালির সমভাবে মিশ্রণ।

(৩) উপরের স্তরটি-৭.৫ সে.মি. বা ৩ ইঞ্চি দোঁআশ মাটি, পচা গোবর ও পাতা পচা সারের মিশ্রণ।

উপরের স্তরটি জমির তল অপেক্ষা শীতকালে ৭-৮ সে. মি. এবং গ্রীষ্মকালে ১০-১৫ সে.মি. উঁচু করতে হয়। বর্ষার সময় যাতে পাশ ভেঙ্গে না যায় সে জন্য ছিদ্রযুক্ত ইট বা বাঁশের চাটাই দ্বারা পাশ দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। বীজতলার মধ্যভাগ দু'পাশ অপেক্ষা সামান্য উঁচু করতে হয়, যাতে বৃষ্টির পানি সহজে দুপাশে সরে যেতে পারে।

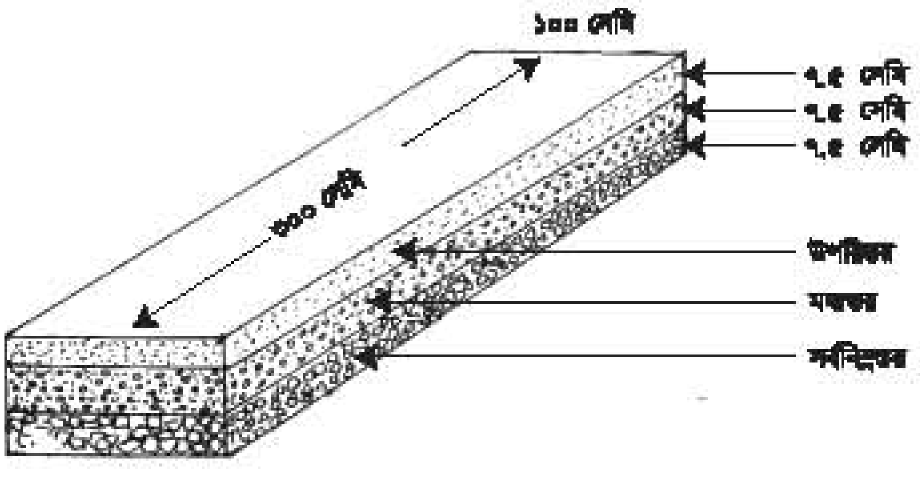

চিত্র : অস্থানান্তরযোগ্য স্থায়ী আদর্শ বীজতলা

কাজের সুবিধার জন্য একটি আদর্শ বীজতলার মাপ সাধারণত ৩ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ১ মিটার প্রস্থ হওয়া উচিত। অবশ্য চারার প্রয়োজনীয়তার ওপর নির্ভর করে দৈর্ঘ্য কম করা যেতে পারে। কিন্তু প্রস্থ ১ মিটার অপেক্ষা কম করলে জায়গার অপচয় হবে। প্রস্থ ১২ মিটার অপেক্ষা বেশি করলে বীজতলার দুপাশ থেকে চারা যত্ন নেওয়ার অসুবিধা হবে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে বীজতলার উচ্চতা বেশি করলে জায়গার অপচয় হবে। প্রস্থ ১ মিটার অপেক্ষ বেশি করলে বীজতলায় দুপাশ থেকে চারার যতন নেওয়ার অসুবিধা হবে। শীতকালে বীজতলার উচ্চতা গ্রীষ্মকালে অপেক্ষা কম হবে। কারণ গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাতের পানি জমে চারা নষ্ট হতে পারে। পানি নিকাশের সুবিধার জন্য বীজতলা উঁচু রাখার প্রয়োজন পড়ে। নিচে একটি আদর্শ বীজতলার নমুনা দেয়া হলো।

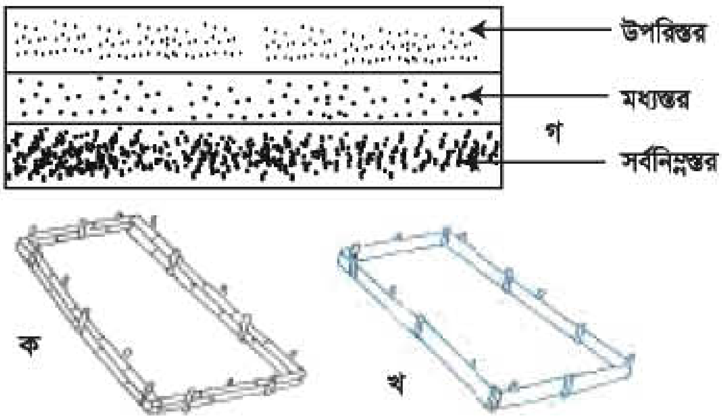

চিত্র ঃ বীজতলার চার পাশে বাঁশের দেয়াল (ক) (খ) ও (গ)

২। অস্থায়ী বীজতলা বাড়ীর আশেপাশে খোলামেলা আলোবাতাস লাগে এমন উঁচুস্থানে শাক-সবজির চারা তৈরির জন্য বীজতলার তৈরি করা হয়। তবে চারার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে সুবিধাজনক স্থানে বিভিন্ন আকারে বীজতলা তৈরি করা হয়।

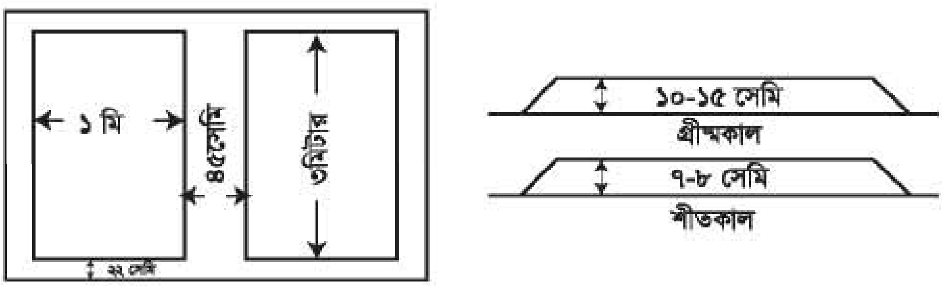

চিত্র : অস্থানান্তরযোগ্য অস্থায়ী বীজতলার মাপ

২০২২

বীজতলা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়াদি

সবজির চারা উৎপাদনের জন্য জমির অবস্থান; মাটির প্রকৃতি, উর্বরতা, সেচ ও নিকাশ সুবিধা ইত্যাদি বিষয় নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। যেমন-

(১) বীজতলার মাটি উর্বর ও দো-আঁশ বা বেলে দো-আঁশ প্রকৃতির হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) চারা উৎপাদনের জন্য পরিচ্ছন্ন জায়গা দরকার যেখানে দিনের বেলা সব সময় রোদ পড়ে এবং সহজে বাতাস চলাচল করে।

(৩) দেখাশোনার সুবিধার জন্য বাড়ির আশেপাশের জমি বীজতলার জন্য উপযোগী।

(৪) উঁচু, সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উপযোগী জমি।

(৫) স্যাঁতসেঁতে, জলাবদ্ধ ও ছায়াযুক্ত স্থান বা গাছের নিচে কখনই বীজতলা তৈরি করা উচিত নয়।

(৬) বীজতলার মাটিতে উপযুক্ত মিশ্রণের ওপর মাটির পানি ধারণ ও পানি চুয়ানো ক্ষমতা নির্ভর করে।

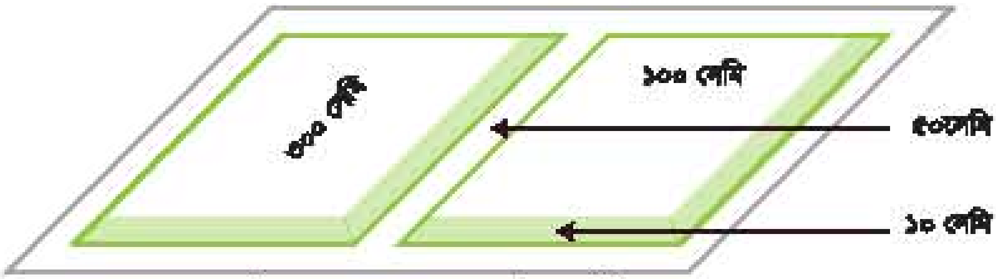

চিত্র : স্থানান্তরযোগ্য অস্থায়ী আদর্শ বীজতলা

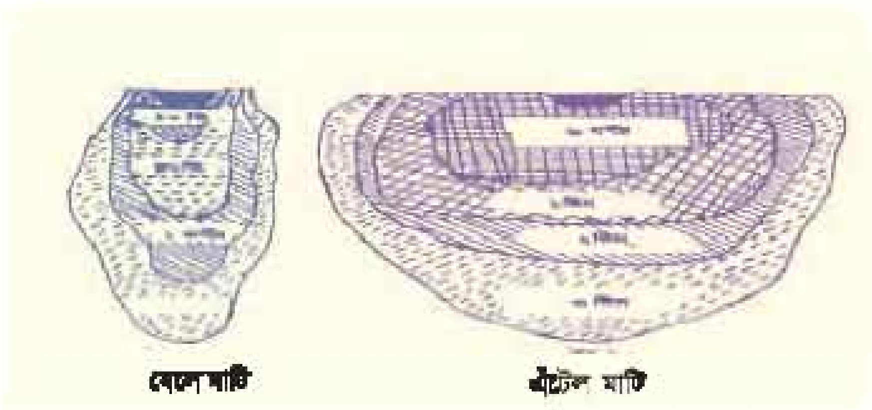

চিত্র : এঁটেল ও বেলে মাটিতে সেচ দেওয়ার পর কত তাড়াতাড়ি নিচের দিকে পানি চুয়ায়

তাই বীজতলার মাটিতে পরিমাণমত গোবর সার কম্পোষ্ট সার, পাতা পঁচা সার ও দোঁআশ মাটি মেশাতে হয়। দেখা যায় যে বেলে মাটিতে ৬ ঘন্টা সময়ে ১৮০ সেমি. গভীরে যেখানে পানি পৌঁছতে পারে অথচ এটেল মাটিতে ঐ একই দুরত্বে পানি পৌছতে ৩ দিন সময় লাগে। অনুরুপ ভাবে পানি ঢালার খাদ হতে উভয় পাশে বেলে মাটিতে যেখানে ৩০ সেমি. দূর পর্যন্ত রস ছড়াতে পারে, সেখানে এঁটেল মাটিতে ৬০ সেমি. এর বেশি দূর পর্যন্ত রস ছড়াতে পারে।

বীজতলা প্রস্তুতে করণীয় বিষয়

বেগুন, মরিচ, কপিজাতীয়, টমেটো, ব্রকোলি ইত্যাদি সবজির বীজ সরাসরি জমিতে বুনে সফলভাবে আবাদ করা যায় না। বীজতলায় বিশেষ যত্নের মাধ্যমে এগুলোর চারা উৎপাদন করে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। বীজতলায় চারা উৎপাদন করে চারার সহ্যশক্তি বৃদ্ধি করার পর নির্বাচিত স্থানে চারা রোপণ করতে হয়। বীজতলায় চারার বিশেষ যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা থাকে বিধায় চারাগুলো সতেজ ও শক্ত চারা হিসেবে গড়ে উঠে। বীজতলার কাজে সুবিধার জন্য বীজতলার মাপ ৩ মিটার দৈর্ঘ ও ১ মিটার প্রস্থ হওয়া প্রয়োজন। তবে চারার সংখ্যা অনুযায়ী কম বা বেশি করা যেতে পারে। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সবজির চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজতলার উচ্চতার তারতম্য রাখতে হয়। গ্রীষ্মকালীন বীজতলার উচ্চতা সাধারণত ১০-১৫ সে.মি. এবং শীতকালীন বীজতলার ক্ষেত্রে ৭-৮ সেমি. উচ্চতা রাখতে হয়। তবে গ্রীষ্মকালীন সবজির বীজতলায় চারাকে রোদ, বৃষ্টি হতে রক্ষা করার জন্য বীজতলার উপরে চাটাই দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয়। বীজতলায় সমতল হওয়া বাঞ্চনীয় এবং জো অবস্থায় পুনঃ পুনঃ চাষ ও মই দিয়ে ১৫-২০ সেমি. গভীর পর্যন্ত মাটি ঢেলামুক্ত ও ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়। বীজতলায় স্বাভাবিক তাপ রক্ষা ও বায়ু চলাচলের সুবিধার জন্য কম্পোষ্ট বা গোবর সার মেশাতে হয়। বীজতলার মাটি রোগ বালাই ও কীটমুক্ত করতে হয়।

ভেজা অবস্থায় জমি চাষ করা উচিত নয়। জমি তৈরি করণের সময় শেষ চাষের পূর্বে মৌল সার সম্পূর্ণ জমিতে ছিটিয়ে দিতে হয়। তারপর চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বীজতলার মাটি প্রস্তুতে কয়েকটি নির্দেশাবলি নিচে দেওয়া হলো-

১. দোঁআশ বা বেলে দোঁআশ মাটি রোদে শুকিয়ে গুড়ো করে নিতে হবে।

২. বীজতলার মাটির ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ভর করে মাটি-কণার ওপর। তাই বীজতলায় শুধু বালি বা কাদামাটি ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়।

৩. মাটিতে কাঁকর, আগাছা ইত্যাদি থাকলে তা ভালভাবে বেছে বা চালনিতে চেলে নিতে হবে।

৪. বীজতলার মাটিতে বায়ু চলাচল, পানি ধারণ ক্ষমতা ও খাদ্যের প্রাপ্যতা এবং গরম রাখার জন্য কম্পোষ্ট সার মেশাতে হবে।

৫. পোকামাকড় প্রতিরোধের জন্য সেভিন, কার্বোফুরাণ বা ক্যাপটান ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬. সারের বিক্রিয়া শেষ হওয়ার জন্য বীজ বপণের ৫-৭ দিন আগে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।

৭. বাক্স বা পলিব্যাগে মিশ্রিত মাটি ভরতে হলে মাটি ভিজিয়ে ৫-৭ দিন রাখার পর পত্রে মাটি ভরতে হবে।

৮. পটে মাটি ভরতে হলে পটের আকার ভেদে পটের উপরের কিনারা হতে ১ থেকে ৩ সেমি. খালি রাখতে হবে। তাতে পানি দেয়া ও অন্যান্য পরিচর্যা করা সহজ হবে।

২০২২

চিত্র : বীজতলা বা পটে ভরার জন্য মাটির মিশ্রণ

চিত্র : পটে মাটি ভরা

চারা উৎপাদনের জন্য মাটির মিশ্রণ-বীজতলার জন্য মাটি খুব উর্বর বা খুব অনুর্বর হওয়া উচিত নয়। নিচে উল্লিখিত পদ্ধতিতে মাটির মিশ্রণ তৈরি করা যেতে পারে।

১) পঁচা গোবর ১ ভাগ + বালু ১ ভাগ + ভিটি মাটি ১ ভাগ। অথবা

২) পঁচা গোবর ১ ভাগ + বালু ২ ভাগ। অথবা

৩) পুকুর পঁচা ডোবা, খাল বা দীঘির তলদেশের মাটি অথবা কম্পোষ্ট ২ ভাগ + বালু ১ ভাগ অথবা

৪) ভিটামাটি ১ ভাগ + কম্পোষ্ট বা পঁচা গোবর ১ ভাগ + রাসায়নিক সার (প্রতি ঝুড়ি মাটিতে ৬ গ্রাম ইউরিয়া, ৪ গ্রাম, টিএসপি, ৬ গ্রাম পটাশ খুব ভালভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এভাবে মিশ্রণ তৈরি করলে সে মাটি ভাল বীজতলা তৈরির জন্য উপযুক্ত হবে। প্রতি বর্গমিটার বীজতলার জন্য কমপক্ষে ১০ কেজি পঁচা গোবর বা কম্পোষ্ট সার প্রয়োগ করতে হবে। অতিরিক্ত পানি নিকাশ ও চারার গড়ন ও বাড়নের উপযুক্ত পরিবেশের জন্য এ কাজ অতি উত্তম।

অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজতলা তৈরি পদ্ধতি সহজ ও সস্তা। সেক্ষেত্রে বীজতলা তৈরি যেভাবে করবেন-

১. পূর্ব-পশ্চিমমুখী করে বীজতলা তৈরি করবেন। এভাবে বীজতলা করলে সকল চারার গায়ে সূর্যালোক পড়বে।

২. ২০ থেকে ৩০ সে.মি. গভীর পর্যন্ত মাটি আলগা করে মাটির ভেতর থেকে পাথর, আগাছা ও চারার শেকড় বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টিকারী দ্রব্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩. বীজতলার বাইরে বসেই যাতে বীজ বপন, আগাছা পরিষ্কার ও পরিচর্যার কাজ সহজে করা যায় সে লক্ষ্যে। বীজতলা কতটুকু চওড়া হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

৪. বর্ষাকালে বীজতলার উপরিভাগে পাশ থেকে মাটি দিয়ে উঁচু করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে বেডের উঁচু উপরিতলের চারপাশে দিয়ে মাটির পাড় তৈরি করে সেচের পানি বীজতলায় ব্যবহার করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. বর্ষাকালে আধুলা বাঁশ বা ইট দ্বারা বীজতলার চতুর্দিকে প্রান্ত দেয়াল তৈরি করতে হবে। ভারী বৃষ্টিপাতে বীজতলার ব্যাপক ক্ষয়রোধ করার জন্য এ ব্যবস্থা খুবই কার্যকর।

৬. বীজতলায় বালু এবং পঁচা গোবর বা কম্পোস্ট সার ব্যবহার করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রতি ১০ বর্গমিটার বীজতলার জন্য ১ ঘন মিটার বা ৩৫ ঘনফুট পঁচা গোবর বা কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করতে। হবে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও চারার গঠন বাড়ানের জন্য এ কাজটি উত্তম।

বীজতলা জীবাণুমুক্ত করণের সহজলভ্য ও কার্যকরি পদ্ধতি

বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ কী এবং কেন করা হয়

আমরা যখন একটি বীজতলায় বীজ বপন করি তখন দেখা যায় যে কিছু বীজ একেবারে গজায় না। আবার কিছু কিছু বীজ গজানোর পর ঢলে পড়ে ও পরে মারা যায়। কেননা বীজতলার মাটিতে নানা ধরনের কোটি কোটি জীবাণু আছে। এ সকল জীবাণুর মধ্যে কিছু কিছু জীবাণু আছে যা গাছপালার জন্য উপকারী, আবার কিছু কিছু জীবাণু আছে যা গাছপালার জন্য অপকারী। এদের মধ্যে ফিউজিরিয়াম, রাইজোকটনিয়া, পিথিয়াম, সারকোসপোরা ইত্যাদি ধরনের ছত্রাক বীজতলায় চারার ক্ষতি করে থাকে। আবার কিছু কিছু জীবাণু আছে যারা বীজের গায়ে লেগে থাকে। যখন বীজ গজায় তখন ঐ জীবাণু কার্যকর হয়ে উঠে ও চারাকে আক্রমণ করে। তাতে চারা ঢলে পড়ে বা ঝলসে মারা যায়। মাটিতে নানা ধরনের কীটপতঙ্গ থাকে এদের মধ্যে উইপোকা, কাটুই পোকা, পিপড়া, ফিল্ড ক্রিকেট, মোল ক্রিকেট ইত্যাদি চারার শিকড় কেটে দিয়ে ক্ষতি করে। তাই সুস্থ সবল চারা উৎপাদনের জন্য আমাদেরকে বীজ ও বীজতলা উভয়ই শোধন বা জীবাণুমুক্ত করতে হবে। বীজ বাহিত রোগজীবাণু বা বীজতলার মাটিতে থাকা নানা ধরনের ছত্রাক বা রোগের জীবাণু ও পোকামাকড় চারার ক্ষতি করে থাকে। এগুলোকে ধ্বংস করে সুস্থ, সবল ও সতেজ চারা তৈরি করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করাই হচ্ছে বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ।

বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতি

বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি আছে। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু পদ্ধতি ব্যয়বহুল এবং কিছু কিছু পদ্ধতি অল্প খরচের। কিছু কিছু পদ্ধতি পরিবেশকে দূষণ করে, আবার কিছু কিছু পদ্ধতি পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে। বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতিকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) যান্ত্রিক (২) জৈবিক (৩) রাসায়নিক (৪) কর্ষণ বা পরিচর্যামূলক এবং (৫) আইনগত দমন।

(১) যান্ত্রিক পদ্ধতি- বীজতলার উপরের স্তরের ১০-১৫ সে. মি. গভীর করে মাটি তুলে চুলার উপর লোহার কড়াই বা ড্রামে নিয়ে ঢাকনাযুক্ত অবস্থায় তাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি জীবাণুমুক্ত করা যায়। এ পদ্ধতিতে ১ ঘন্টা সময় আগুনের তাপে মাটিকে ভেজে নিয়ে জীবাণুমুক্ত করা যায়।

চিত্রঃ লোহার কড়াই এ মাটি ভেজে জীবাণুমুক্তকরণ

অনেক শিল্পোন্নত দেশে মাটির মধ্যে ছিদ্রযুক্ত ধাতব পাইপ বসায়ে তার মধ্যে দিয়ে গরম জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করে জমিকে বা বীজতলাকে আংশিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা যায়।

চিত্র ঃ মাটির নিচ দিয়ে গরম বা প্রয়োগ

১। জৈবিক পদ্ধতি ও একইস্থানে বা একই বীজতলায় প্রতি বছর একই সবজি বা ফসলের বীজ বপন করা উচিত নয়। বীজতলার মাটিতে মাঝে মাঝে গাঁদা ফুলের চাষ করে মাটির সাথে মিশায়ে দিয়ে কিছু কিছু জীবাণুমুক্ত করা যায়। যেমন-নিমাটোড। এছাড়া নিম পাতা, তামাকের গুড়া, বীজতলার মাটিতে মিশিয়ে জীবাণুমুক্ত করা যায়। যেমন-উই, পিপড়া ইত্যাদি।

২। রাসায়নিক পদ্ধতি- রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আছে। যেমন (ক) ফরমালডিহাইড (খ) মিথাইল ব্রোমাইড ও (গ) ক্লোরোপিক্রিন (ঘ) ভ্যাপাম (ঙ) ভাওফিউম (চ) নেমাগন ফরমালডিহাইড-সাধারণত ১ লিটার বাণিজ্যিক ফরমালডিহাইডের সাথে ৫০ লিটার পানি মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। প্রতি ১ বর্গ মিটার জায়গার বীজতলায় প্রায় ১২ লিটার পরিমাণ এই মিশ্রণ সমানভাবে ছিটাতে হবে।

চিত্র ঃ কাদামাটি দিয়ে প্লাষ্টিকের মাথা ঢেকে দেওয়া হয়েছে প্লাষ্টিক শিটে কোন ছিদ্র থাকবে না এবং কীট যথেষ্ট পুরু হবে।

(১) কর্ষণ বা পরিচর্যামূলক বীজতলার মাটিতে সৌরতাপের মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত করা যায়। এটি আমাদের দেশের জন্য সবচেয়ে সস্তা ও সহজ কার্যকর পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্তকরণের জন্য বীজতলা উত্তমরূপে কর্ষণ করে প্রখর রৌদ্রে উন্মুক্ত রাখতে হবে এবং এ প্রক্রিয়া কয়েকবার করতে হবে। এছাড়া বীজতলা ভালভাবে কর্ষণ বা কোপানোর পর সমতল করে, সাদা ও স্বচ্ছ পলিথিন কীট দিয়ে সম্পূর্ণ বীজতলার মাটি ঢেকে দিতে হবে। তারপর ২/৩ সপ্তাহ ঢাকা অবস্থায় সরাসরি সূর্যরশ্মি স্বচ্ছ পলিথিন শিটের উপর পড়বে। এতে করে বীজতলার মাটির ভিতর গরম হয়ে যে তাপ সৃষ্টি হবে তাতে মাটির ক্ষতিকারক জীবাণুগুলো মারা যাবে। এছাড়া ঢাকা থাকার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিষাক্ত এমোনিয়া গ্যাস নির্গত হয়। তাই এ পদ্ধতিতে জীবাণুমুক্ত করার সাথে সাথে বীজতলায় বীজ বপন করা যাবে না কোদাল দিয়ে মাটি ভালভাবে কোপায়ে এই বিষাক্ত এমোনিয়া গ্যাস বের করে দিতে হবে। তারপর বীজ বপন করা যাবে। এতে বীজ বা চারার কোন ক্ষতি হবে না।

চিত্র : জমি চাষ করে রোদে শুকানো

এ পদ্ধতিতে তাপের ফলে বীজতলার মাটিতে বসবাসকারী পোকামাকড় মারা যাবে অন্যথায় তারা স্থান ত্যাগ করে চলে যাবে। তাপের মাধ্যমে বীজতলা জীবাণুমুক্ত করতে গেলে মাটিতে রক্ষিত নাইট্রোজেন সার বাতাসে উড়ে যায়। আবার বীজতলা সরাসরি তাপের মাধ্যমেও জীবাণুমুক্ত করা যায়। এ পদ্ধতিতে বীজতলার উপরে ভালভাবে খড় বিছিয়ে দিয়ে তারপর ঐ খড়ে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। ঐ আগুনের তাপে বীজতলার মাটির উপরের স্তরের ৫ সে.মি. গভীর পর্যন্ত জীবাণুমুক্ত হয়ে যাবে। এ প্রক্রিয়া দ্বারা ক্ষতির হাত থেকে চারাকে মুক্ত রাখা যায়। ১ টি , আবার বীজতলায় গরম পানি দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা যায়। এ পদ্ধতিতে বীজতলার উপরিভাগের মাটিতে ১০ সে.মি. গভীর পর্যন্ত ৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার গরম পানি আধাঘন্টা ধরে রাখতে হবে। এতে মাটিতে বসবাসকারী ক্ষতিকারক রোগজীবাণু নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু উপকারী জীবাণুর তেমন কোন ক্ষতি হবে না। এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর। তবে এতে খরচ বেশি, তাই গরিব দেশের জন্য সহজসাধ্য নয়।

চিত্র : জমি চাষ করে পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে সৌরতাপের মাধ্যমে মাটি গরম করে জীবাণুমুক্তকরণ

চিত্র : মাটিতে খড়কুটা বিছায়ে আগুন দিয়ে জীবাণুমুক্তকরণ

বীজ বপণের পূর্বে বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষাকরণ। বীজের নমুনা সংগ্রহ-বীজ পরীক্ষা করার জন্য বীজের নমুনা সংগ্রহ করার পদ্ধতির ওপর পরীক্ষার ফলাফল নির্ভর করে। তাই বীজ যেখানে রাখা আছে সেখান হতে নমুনা সংগ্রহ করার সময় খুব সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে। বীজের পাত্র বা বস্তার উপরের দিক, নিচের দিক ও মাঝখান হতে সমপরিমাণে বীজ নিতে হবে। বীজের পাত্র বা বস্তার সংখ্যা বেশি হলে নমুনা বেশি হবে। নমুনা সংগ্রহের সময় বীজের নাম, জাত, তারিখ, কোথা হতে বীজ পাওয়া গেছে তা লিখে রাখতে হবে। কয়েকটি নমুনা সংগ্রহ করে একত্রে মেশাতে হবে। তারপর বড় বীজের জন্য ১০০-২০০ গ্রাম এবং ছোট বীজের জন্য ২৫-৫০ গ্রাম নমুনা নিলেই চলে।

বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা- বপনের আগে শাক-সবজির বীজ ভালোভাবে পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। সাধারণত ভালো ও বিশুদ্ধ বীজের অভাবে বেশি ফলন আশা করা যায় না। বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার মাধ্যমে বীজে কী পরিমাণ ধুলা বালি, ভাঙ্গা বীজ, অন্যান্য ফসল বা আগাছার বীজ আছে তা নির্ণয় করা যায়। প্রথমে

নমুনা বীজ হতে কিছু পরিমাণ বীজ নিক্তিতে ওজন করে নিতে হবে। এরপর ঐ বীজ একটুকরা কাঁচ বা পরিষ্কার কাগজের উপর ছড়াতে হবে। ছড়ানো বীজ হতে প্রতিটি বীজের বিশুদ্ধতা দেখে ভালো বীজ হতে অন্যান্য সকল দ্রব্যাদি আলাদা করতে হবে। যেমন-ধূলাবালি, কাঁকর, ভাঙা বীজ, রোগাক্রান্ত বা পোকায় খাওয়া বীজ, বীজের খোসা, আগাছা বীজ, অন্যান্য ফসলের বীজ ইত্যাদি।

নিচে দেয়া সূত্রানুযায়ী বীজের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করে শতকরা হারে প্রকাশ করা যেতে পারে।

বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের সূত্র -

$$\text{বিশুদ্ধতা \%} = \frac{(\text{মোট বীজের পরিমাণ-অন্যান্য দ্রব্যাদির পরিমাণ})}{\text{গ্রাম মোট বীজের পরিমাণ}} \times ১০০$$

উদাহরণ- দশগ্রাম মূলার বীজের মধ্যে দুই গ্রাম অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত আছে।

$$\text{তাহলে, সূত্রানুযায়ী বিশুদ্ধতার শতকরা হার} = \frac{১০-২}{১০} \times ১০০ = \frac{৮}{১০} \times ১০০ = ৮০\%$$

$$\text{আর বীজে অন্যান্য দ্রব্যাদি বা অবিশুদ্ধতার হার} = ১০০-৮০ = ২০\%$$

চিত্র ঃ বীজ পরীক্ষা- বোর্ডে ভাল বীজ ও অন্যান্য বীজ আলাদা করা

বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা

বীজের গুণ বিশেষভাবে নির্ভর করে তার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতার ওপর। অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতা পরীক্ষার মাধ্যমে বীজের স্বাভাবিক চারা গজানোর ক্ষমতা এবং একক জমিতে বীজের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সন্তোষজনক না হলে জমিতে বিশুদ্ধ বীজ বুনেও ভালো ফলন পাওয়া যায় না। তাই বীজ কেনার আগে বীজের অঙ্কুরোদগম হার জেনে নেওয়া উচিত। তা হলে বীজের সঠিক পরিমাণ, চারার সংখ্যা ইত্যাদি নির্ণয় করা সহজ হবে। ইতোপূর্বে বীজ গজালেই তা হিসেব করে বীজের গুণ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু বর্তমানে তা বিবেচনা করা হয় না। কেননা অনেক বীজ গজানোর পর সুস্থ ও সবল চারা বা গাছ উৎপাদন করতে পারে না। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে বীজ গজানোর পর চারার মূল, কাণ্ড ও পাতা সমানুপাতিকভাবে বৃদ্ধি দেখে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নির্ণয় করা হয়। চারা উৎপাদনের বীজ ব্যবহারের পূর্বে সাধারণত ৬-৮ মাস গুদামজাত করে রাখা হয়।

এ সময়কালের মধ্যে বর্ষা মৌসুম পার হয়ে যায়। তাই বীজ বোনার আগে বীজ পরীক্ষা করা উচিত। খারাপ বীজ বপন করলে অপচয় হবে এবং ফলন কমে যাবে। বীজের অঙ্কুরোদগমের হার বের করার জন্য একটি পেট্রিডিস বা মাটির বা কাঁচের পাত্র, ভেজা কাপড় বা চট নিতে হবে। পেট্রিডিস হলে এক খণ্ড চোষ কাগজকে বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ভিজিয়ে পেট্রিডিসে বীজ বসাতে হবে।

চিত্র : বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা

বীজ গজানোর পর গজান বীজ গণনা করে বীজের অঙ্কুরোদগমের হার নির্ণয় করা যায়। বীজ গজানো পরীক্ষার বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা হলো।

যেমন - বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার জন্য এক খণ্ড কাপড় বা চট বিছিয়ে নিতে হবে। এরপর বিশুদ্ধ বীজ হতে বড় বীজ হলে ৫০টি এবং ছোট হলে ১০০টি বীজ পরীক্ষার জন্য নিতে হবে। এরপর পেট্রিডিস বা মাটির পাত্র বা ভিজা কাপড়ে বীজগুলো এমনভাবে বসাতে হবে যেন একটির সাথে আরেকটি লেগে না থাকে। কাপড়ে বসানো হলে কাঠির সাথে বীজসহ কাপড় পেচাতে হবে এবং লেবেল লিখে বীজসহ কাপড় ভিজিয়ে রাখতে হবে। অপরদিকে বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষার জন্য অন্য কোন পাত্র যেমন মাটির বাসন নেওয়া যায়। এতে বালু দিয়ে পাত্রটির উপরের কিনারা হতে কিছু নিচ পর্যন্ত ভর্তি করতে হবে। এরপর পরিমাণমত পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হবে।

চিত্র : মাটির পাত্রে বীজ বপন

চিত্র : একটি কাঠির দ্বারা কাপড়টিকে পেচানো

চিত্র : কাপড়ের উপর ৫০ বা ১০০টি বীজ ছড়ানো।

২০২২

বীজ বসানোর পর পেট্রিডিস বা মাটির পাত্রে ঢাকনা দিয়ে আলো ও তাপ পায় এমন ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। আর ভেজা কাপড়ে বীজ বসানো হলে কাপড়টি গোল করে জড়ায়ে অন্ধকার ও গরম জায়গায় রাখতে হবে। এ পদ্ধতিকে জাগ দেয়া বলে। তবে থলেতে বীজ জাগ দেওয়া হলে বীজের থলেটি অন্যান্য খালি থলে বা মোটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। দরকারমত পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে। অধিকাংশ সবজি বীজ ২ থেকে ৫ দিনের মধ্যে গজিয়ে যায়। আবার কোন কোন সবজি বীজ গজাতে সপ্তাহখানেক সময় লাগে। বীজ গজানোর মেয়াদ শেষে মোট বীজের সংখ্যা ও অঙ্কুরিত চারার সংখ্যা হিসেব করে লিখে রাখতে হয়। এক্ষেত্রে বীজ গজানোর গতি, মেয়াদ, চারার চেহারা ইত্যাদি দেখা উচিত।
বীজ গজানোর জন্য বসানোর আগে বীজ রোদে শুকিয়ে নেয়া উচিত। বীজ মোটা ও পুরু হলে ভিজিয়ে নেয়া ভাল। বীজের গজানো সংখ্যা গণনা করে নিচের সূত্রানুযায়ী গজানোর শতকরা হার হিসেব করে নিতে হবে।

$$\text{অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার} = \frac{\text{মোট গজানো বীজের সংখ্যা}}{\text{গজানোর জন্য বসানো বীজের সংখ্যা}} \times \text{১০০} = \frac{\text{১০০-১০}}{\text{১০০}} \times \text{১০০}$$

উদাহরণ- নব্বইটি বীজ গজিয়েছে। তাহলে অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার কত হবে?

$$\text{অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার} = \frac{\text{৯০}}{\text{১০০}} \times \text{১০০} = \text{৯০}\%$$

সাধারণভাবে শতকরা ৮০ ভাগের ওপরে বীজ গজালে সে বীজ ভালো বলে বিবেচিত এবং তা গ্রহণযোগ্য।

বীজ গজানো ত্বরান্বিত করা ও বীজের গজানোর মধ্যে সমতা রাখা

(ক) বীজ ভিজিয়ে নেওয়া -বীজের আবরণ যদি শক্ত হয়, তাহলে পানি সহজে বীজের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে এবং সে সমস্ত বীজ গজাতে সময় লাগে। তাই সহজে গজানোর জন্য বপন/রোপণের আগে সে সমস্ত বীজ ভিজিয়ে নিতে হয়। বীজের মধ্যে গজানো সমতা আনয়নের জন্য বীজ ভেজানো হয়েছে, বীজাবরণ নরমও হয়েছে, কিন্তু অঙ্কুর বের হয়নি, এ অবস্থায় বীজ শক্তকরণ করতে হয়।

বীজ নরম হয়েছে, মূলরোম বের হয়নি, কিন্তু বীজ ভেজা, এরূপ বীজ খুব তাড়াতাড়ি রোপণ করে দিলে সব চারা একসাথে গজাবে এবং এগুলোর মৃত্যু হার কম।

বীজ শোধনের মাধ্যমে গজানোতে সহায়তাকরণ

বীজের বহিরাবরণে ও ভেতরেও রোগ জীবাণু থাকে, যা বীজের গজানোতে বাধা সৃষ্টি করে। তাই বীজ শোধন করে নিলে সে সমস্ত বীজ তাড়াতাড়ি গজায় এবং ফসলের ফলনও বেশি হয়। বীজ শোধনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যেমন (ক) রাসায়নিক, (খ) গরম পানি (গ) ভিজা ও (ঘ) রোদে শুকানো পদ্ধতি।
(ক) রাসায়নিক পদ্ধতি- বীজ বপন/রোপণের প্রায় ১ মাস পূর্বে শোধন করে রাখলে বীজ বেশি ভাল থাকে। বীজ শোধনে বালাইনাশক ব্যবহারের পরিমাণ।

ফসলের বীজের নাম	পাউডার বালাইনাশকের পরিমাণ গ্রাম/১০০ কেজি বীজে	
	ভিটাভেক্স/ক্যাপটান	থিয়াম
পালংশাক	২৫০	৩৩৫
কপিজাতীয়	২৫০	২৫০
কুমড়াজাতীয়	১৫০	২০০
বেগুন	-	২০০
পিঁয়াজ	-	২৫০
টমেটো	-	৩৩৫
ঢেঁড়শ	২৫০	২৫
মরিচ	২৫০	২৫০
শশা	-	২০০
মূলা/শালগম/বীট	২০০	২৫০
কিমজাতীয়	-	২৫০
গাজর, লেটুস	১৫০	২৫০

(খ) গরম পানি পদ্ধতি-পাতলা কাপড়ে থলে বানিয়ে তাতে বীজ ১ কেজি করে বেঁধে গরম পানিতে নিম্নোক্ত নিয়মে রাখতে হবে। এভাবে বীজ শোধনের পর তাড়াতাড়ি বীজ শুকাতে হয়।

গরম পানিতে বীজ শোধন পদ্ধতি

ফসলের বীজের নাম	পানির তাপমাত্রা (সে.)	পানিতে ডুবানোর সময়কাল
পালংশাক	৫০ ডিগ্রী সেলসিয়াস	২০ মিনিট
কপিজাতীয়	ঐ	ঐ
বাঁধাকপি	ঐ	২৫ মিনিট
টমেটো	ঐ	ঐ
বেগুন	ঐ	ঐ
মরিচ	ঐ	ঐ
পিঁয়াজ	ঐ	ঐ
শশা	ঐ	১০ মিনিট
গাজর	৫১ ডিগ্রী সেলসিয়াস	১০ মিনিট

(গ) ভিজা পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে ফরমালডিহাইড, তুঁতে, মারকিউরিক ক্লোরাইড ইত্যাদির যে কোন একটি ঔষধ পানিতে মেশানো হয়। পরে দরকারি বীজ পাতলা মার্কিন কাপড়ে ঢিলা করে বেঁধে ঔষধ মিশানো পানিতে ডুবানো হয়। শোধনের পর দানাজাতীয় বীজ তাড়াতাড়ি রোদে শুকাতে হয়। বীজ বপনের মূহূর্তে শোধন করা হলে ১০০ কেজি বীজের সাথে ২৫-৩০ গ্রাম ক্যাপটান, ভিটাভেক্স , মিশালে সুফল পাওয়া যায়। ভিজা পদ্ধতির জন্য কোন ধাতব পাত্র (যেমন-কাসা, পিতল, লোহা ইত্যাদি) ব্যবহার করা উচিত নয়। নিচের সারণিতে বিভিন্ন প্রকার সবজি বীজ শোধন পদ্ধতি দেওয়া হলো।

২০২৫

সারণি : বিভিন্ন বীজ ভিজা পদ্ধতিতে শোধন

বীজের নাম	ঔষধের নাম	পানিতে মেশানারে ঘনত্ব %	ডুবানোর সময় মিনিট
কপিজাতীয়	মারকিউরিক ক্লোরাইড	০.২৫	১৫ মিনিট
কুমড়াজাতীয়	ফরমালডিহাইড বা তুঁতে	০.২৫ ০.৫০	১৫ মিনিট -ঐ-
কীমজাতীয়	থিরাম বা তুঁতে	০.২৫ ০.৫০	১৫ মিনিট ১০ মিনিট
টমেটোজাতীয়	ফরমালডিহাইড বা মারকিউরিক ক্লোরাইড	০.২৫ ০.২৫	৫ মিনিট ২০ মিনিট
বেগুন আলু	ফরমালডিহাইড মারকিউরিক ক্লোরাইড	০.২৫ ০.৩-০.০৫	৫ ও ২০ মিনিট ২ ঘন্টা ও ১৫ মিনিট

(ঘ) রোদে শুকানো পদ্ধতি- প্রখর রোদে সাধারণত ৫-৬ ঘন্টা (সকাল ১০ ঘটিকা হতে ৪ ঘটিকা পর্যন্ত) বীজ শুকাতে হবে। কিন্তু খুব ঘন ঘন বীজ ওলট পালট করে শুকাতে হবে, অন্যথা বীজ রোদে পোড়া হতে পারে। ফলে ভ্রূণ নষ্ট হতে পারে। রোদে শুকানো বীজ ঠান্ডায় কিছুক্ষণ রেখে বীজ ঠান্ডা হলে সংরক্ষণ পাত্রে বায়ুরোধী করে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ রাখার জন্য শুকনা নিম পাতার গুড়া/তামাক গুড়া/ছাই/বিষকাটালীর পাতাগুড়া ব্যবহার করা ভাল। তবে কালো রংয়ের পত্র বীজ বেশিদিন ভাল থাকে।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. বীজতলার ধরন ও প্রস্তুত প্রণালী অনুযায়ী কয়ভাগে বিভক্ত ?
২. বীজতলার প্রস্থ কত মিটার হলে দু'পাশ হতে যত্ন নেওয়ার সুবিধা হয় ?
৩. খাদ্য হতে উভয় পাশে বেলে মাটিতে রস যেখানে ৩০ সে.মি. পৌঁছতে পারে সেখানে এঁটেল মাটিতে কত সে.মি. পর্যন্ত যেতে পারে?
৪. মাটিতে সারের বিক্রিয়া শেষ হওয়ার জন্য বীজ বপণের কতদিন আগে মাটি ভেজাতে হয় ?
৫. চারা উৎপাদনে মাটির মিশ্রণ করতে পঁচা গোবরের ১ ভাগের সাথে কতভাগ বালি মেশাতে হয় ?
৬. বীজতলা জীবাণুমুক্তকরণ পদ্ধতিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ?
৭. মাটি জীবাণুমুক্ত করতে কড়াইতে মাটি কত ঘন্টা ভাজতে হয় ?
৮. বীজতলা জীবানুমুক্ত করণে ব্যবহৃত ১টি রাসায়নিক পদার্থের নাম লেখ।
৯. ক্লোরোপিক্রিণের অপর নাম কী ?
১০. গরম পানি দিয়ে মাটি শোধনে কত ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার গরম পানি ব্যবহৃত হয় ?
১১. বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় বড় বীজের ক্ষেত্রে কতগ্রাম নমুনা নিলেই কাজ করা যায় ?
১২. সাধারণভাবে শতকরা কতভাগ বীজ গজালে সে বীজকে ভালো বীজ বলা হয় ?
১৩. বীজ বপন/রোপণের কত মাস আগে বীজ শোধন করা ভাল ?
১৪. কপি জাতীয় সবজি বীজ শোধরেন জন্য ফরমালডিহাইডে কত মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সবজি চাষে জলবায়ুর উপাদানগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা উদ্ভিদের জীবনচক্রে যে ৩টি মৌলিক প্রক্রিয়া পরিচালিত করে তা উল্লেখ কর।

২. উদ্ভিদের ওপর আলোর প্রভাব কীভাবে পড়ে তা বর্ণনা কর।

৩. সবজি চাষে উৎপাদন উপকরণের মধ্যে বীজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

৪. রোগ ও পোকামাকড় দমনে স্পর্শ ও সিস্টেমিক বিষ বলতে কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা দাও।

৫. সবজি উৎপাদনে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপগুলো বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সবজি চাষে জলবায়ুগত সমস্যা কীভাবে সবজির উৎপাদন ব্যাহত করে তা বর্ণনা কর।

২. জলবায়ুর উপাদানগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা চারার ওপর ও অঙ্গজ বৃদ্ধিতে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা বর্ণনা কর।

৩. সবজি চাষে উৎপাদন উপকরণের মধ্যে সার ও বীজের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় তা বর্ণনা কর।

৪. সবজি চাষে সার্বিক উৎপাদন সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

টীকা লেখ

১) সংগৃহীত ফসলে তাপমাত্রার প্রভাব, (২) বিতাড়নকারী বিষ।

২০২২

পঞ্চম অধ্যায়

সবজির চারা উৎপাদন ও রোপণ এবং অঙ্গজ বংশ বিস্তার

বিভিন্ন সবজি উৎপাদনে বীজের হার ও বীজতলায় বীজ বপন পদ্ধতি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে সফলভাবে ফসল জন্মানোর জন্য যে পরিমাণ বীজ বপন/রোপণ করা হয় তাকে সেই ফসলের বীজ হার বলে। ফসলের বৈশিষ্ট্য তথা লতানো, ঝোপালো, কুঁশি সংখ্যা, পাতার আকৃতি, গাছ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা, ডালপালার পরিমাণ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে একক জমিতে বীজের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। বীজ বপনের দূরত্ব ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে নিচের সূত্র অনুযায়ী বীজ হার নির্ণয় করা হয়। এ নিয়মে বীজের পরিমাণ প্রধানত চারা করে রোপণ পদ্ধতিতে আবাদকৃত সবজির জন্য প্রযোজ্য।

$$\text{বীজহার (গ্রামে)} = \frac{\text{চাষাবাদকৃত জমিতে কাঙ্খিত চারা/গাছের সংখ্যা} \times \text{প্রতিটি বীজের গড় ওজন (গ্রামে)}}{\text{বিশুদ্ধতা\%} \times \text{অঙ্কুরোদগমের\%} \times \text{বাস্তবে অঙ্কুরোদগমের সম্ভাব্য\%}}$$

উদাহরণঃ এক একর বাঁধাকপির জমিতে ১৪৫২০ টি চারা লাগানোর দরকার। এক্ষেত্রে ১০০টি বীজের ওজন ৪ গ্রাম, তার বিশুদ্ধতা ৯৫% অঙ্কুরোদগম ৯০% এবং বীজতলায় বাস্তবে সম্ভাব্য অঙ্কুরোদগম ৮০% হলে বীজহার হবে নিম্নরূপ।

$$\text{বীজহার (গ্রামে)} = \frac{১৪৫২০ \times .০০৪}{৯৫\% \times ৯০\% \times ৮০\%} = \frac{৫৮.০৮}{০.৯ \times ০.৯ \times ০.৮} = \frac{৫৮.০৮}{০.৬৮৪} = ৮৯.৬২ \text{ গ্রাম}$$

$$\left(\frac{১৪৫২০ \times ৪}{১০০০} = ১৪৫২ \times .০০৪ = ৫৮.০৮\right)$$

অর্থাৎ অঙ্কুরিত সব চারা জমিতে রোপণ ও আশানুরূপ ফসল পেতে হলে প্রতি একরে ৮৪.৯১ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হবে। কিন্তু অঙ্কুরিত সব চারা রোপণ করা সম্ভব হয় না বা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদন হয় না। এ অবস্থায় নির্ণীত পরিমাণ বীজ গজানোর পর শতকরা যতভাগ চারা রোপণ বা নিদৃষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদন উপযোগী হয় তার ভিত্তিতে পরিমাণ নির্ণয় করলে প্রকৃত বীজ হার পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ৬০% চারা যদি রোপণ করা হয় বা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়। তাহলে প্রকৃত বীজ হার হবে ৬০% -এর জন্য ৮৪.৯১ গ্রাম এবং

$$৪০\% \text{ এর জন্য প্রয়োজন} \quad \frac{৪০ \times ৮৯.৬২}{১০০০} = \frac{৮৯.৬২}{১০০} = ৩৫.৮৪ \text{ গ্রাম}$$

এখন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ফসল উৎপাদনের জন্য ৮৯.৬২ + ৩৫.৮৪ = ১২৫.৪৬ গ্রাম বীজাহার ধার্য করতে হবে। বর্ষাকাল বা শীতকালে আগাম সবজির চারা তৈরি করার সময় বৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

বীজ ছিটিয়ে বপন করলে সারিতে বপন করার চেয়ে ১.৫-২ গুণ বেশি বীজ লাগে। আবার চারা তৈরি করে রোপণ করা হলে সারিতে বপনের ক্ষেত্রে মাত্র অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ বীজ দরকার হয়।

বীজ বপন/রোপণ (লতা, কন্দ, মূল, চারা, মুখী) হার হেক্টরপ্রতি ছকে দেখানো হলো।

২০২২

সারণি ঃ সবজি বীজের তথ্য

ফসলের নাম	বীজের ধরন	বীজের সংখ্যা/গ্রাম	বীজের হার/শতক (গ্রাম)	বীজের হার/হেক্টর (গ্রাম)
১. আলু	কন্দ	-	-	১৫০০ কেজি
২. উচ্ছে	বীজ	৮-১০টি	১৫ গ্রাম	৩৫০০ গ্রাম
৩. করলা	বীজ	৬-৮টি	৮ গ্রাম	১৮০০ গ্রাম
৪. ফুলকপি	বীজ	২৫০-৩০০টি	১.৫ গ্রাম	৩০০ গ্রাম
৫. বাঁধাকপি	বীজ	২২০-২৫০	১.৫ গ্রাম	৩৭০ গ্রাম
৬. ওলকপি	বীজ	২২০-২৫০	৩ গ্রাম	৩০০ গ্রাম
৭. ব্রকোলি	বীজ	২৫০-৩০০	১.৫ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
৮. শালগম	বীজ	৩৫০-৪০০	২ গ্রাম	৩৫০০ গ্রাম
৯. গাজর	বীজ	৭৫০-৮০০	১৫ গ্রাম	৩৫০০ গ্রাম
১০. মূলা	বীজ	৮০-১২০	১৫ গ্রাম	২৫০০ গ্রাম
১১. টমেটো/বেগুন	বীজ	৩৫-৪০০	১ গ্রাম	৩০০০ গ্রাম
১২. মরিচ (বোনা)	বীজ	২৫০-৩০০	৭ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
১৩. মরিচ (বোনা)	বীজ	২০০-২৫০	২ গ্রাম	৩৫০০ গ্রাম
১৪. দেশি শিম	বীজ	২-৩	১৭ গ্রাম	৮০০০ গ্রাম
১৫. ঝাড় শিম	বীজ	৭-১০	৪০ গ্রাম	৫০০০ গ্রাম
১৬. বরবটি	বীজ	১২-১৭	২২ গ্রাম	১২০০ গ্রাম
১৭. বীট	বীজ	৫৫-৬৫	৫ গ্রাম	১৫০ গ্রাম
১৮. লেটুস	বীজ	৯০০-৯৫০	১ গ্রাম	২৪৭ গ্রাম
১৯. পালংশাক	বীজ	৬৫-৮০	৮০ গ্রাম	৩৫০০ গ্রাম
২০. লালশাক	বীজ	১০০০-১২০০	১৮ গ্রাম	২৫০০ গ্রাম
২১. ডাঁটা	বীজ	১১০০-১৩০০	১০ গ্রাম	৩৫০০ গ্রাম
২২. ঢেঁড়শ	বীজ	২০-২৫	১৭ গ্রাম	২৫০ গ্রাম
২৩. চালকুমড়া	বীজ	১২-১৫	১ গ্রাম	১৩৫০ গ্রাম
২৪. মিষ্টি কুমড়া	বীজ	৬-৭	৫ গ্রাম	১৮০০ গ্রাম
২৫. চিচিংগা	বীজ	৩-৪	৮ গ্রাম	১২০০ গ্রাম
২৬. পুইশাক	বীজ	৪০-৫০	৫ গ্রাম	৩৫ গ্রাম
২৭. পেঁপে	বীজ	৮০-১০০	১.৫ গ্রাম	৪৫০ গ্রাম
২৮. শশা	বীজ	৩৫-৪৫	২ গ্রাম	১০০০০ টি
২৯. ওলকচু	মুখী	-	৪০-৫০ গ্রাম	২১-২৪০০ টি
৩০. পটল	লতা	-	৯০-১০০ টি লতা	২২২৩০ টি

২০২২

বীজতলায় বীজ বপন পদ্ধতি

জমিতে 'জো' অবস্থায় বীজতলার মাটি সমতল ও পরিপাটি করে তারপর ছিটিয়ে বা সারিতে বীজ বপন করতে হয়। তবে ৪-৫ সে.মি. পর পর অগভীর খাদ বা নালা কেটে পাতলা করে সারিতে বীজ বপন করা উত্তম। ক্ষুদ্রাকৃতির বীজের সাথে শুষ্ক বালি বা ছাই মিশিয়ে নিলে বপন করতে সুবিধা হয়। বীজ বপনের পর পচা গোবর বা কম্পোষ্ট সার মিশ্রিত মিহি বা ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ১-১.৫ সেমি পুরু করে বীজ ঢেকে হাল্কাভাবে মাটির সাথে চেপে দিতে হয়। আবহাওয়া বেশি শুষ্ক বা ঠান্ডা হলে খড়ের মালচিং দেওয়া ভাল। চারা গজানোর সংগে সংগে মালচিং সরিয়ে দিতে হয়। বৃষ্টি বাদলের সময়ে ৩-৫ সে.মি. লম্বা করে ধান বা গমের খড় কেটে বীজতলার উপরে ছড়িয়ে দিলে বীজতলার মাটির বা বীজ অপসারিত হয় না। চারা ঘন হলে বা বেশিদিন বীজতলায় থাকলে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় সেগুলো দুর্বল ও লিকলিকে হয়ে যায়। দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তরের পরিকল্পনা না থাকলে ঘন করে বীজ বপন করা অনুচিত। পাতলা করে বীজ বপন করে বীজতলায় পরস্পর থেকে ৪-৫ সে.মি. দূরত্বে রাখা হলে চারা সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে।

বীজতলার পরিচর্যা

চারা গজানোর পূর্বে বীজতলায় পানি সিঞ্চন না করাই উচিত। তবে চারা গজানোর পর কাল বিকালে ঝাঁঝরি দিয়ে খুব নিচু থেকে পরিমিত পানি সিঞ্চন করা উচিত। বীজতলায় অতিরিক্ত পানি দেয়া হলে মাটিতে চাটা বেঁধে বায়ু চলাচলে বিঘ্ন ঘটায় ও অক্সিজেনের অভাবে বা গ্যাস জমে চারার ক্ষতি করে। তাই মাঝে মাঝে বীজতলার মাটি খচিয়ে আগল করে দিতে হয়। চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করা না হলে বৃষ্টি বাদলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে চারার গোড়া অনেক সময় বাঁকা হয়ে যায়, গুচ্ছমূল যথারীতি বাড়তে পারে না। ফলে অধিকাংশ চারা বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই চারা গজানোর পর এরূপ অসুবিধা দেখা দিলে ২-৩ কিস্তিতে চারার গোড়ায় ১.৫-২ সেমি. পুরু করে ঝুরঝুরে প্রকৃতির মিহি গুঁড়ো করা দো-আঁশ মাটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এতে চারা সোজা থাকে। সারিতে বীজ বুনলে দু'সারির মধ্য দিয়ে সহজেই মাটি দেয়া যায়। কিন্তু ছিটিয়ে বীজ বুনলে চালনীতে গুঁড়ো মাটি নিয়ে চারার উপর দিয়ে চেলে বীজতলার উপরে ফেলতে হয় ও পরে চারাগুলিকে সোজা করে দিতে হয়। পাতা ভেজা অবস্থায় মাটি প্রয়োগ করা অনুচিত।

কচি চারা প্রখর রোদ সহ্য করতে ও মাটি থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি গ্রহণ করতে পারে না। তাই ঐ বয়সে প্রখর রোদে বীজতলার মাটি শুকিয়ে গেলে তাপদগ্ধ হয়ে চারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে শিকড় যথাযথভাবে বিস্তৃত হওয়ার পর পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেলে চারা বলিষ্ঠ ও কষ্ট সহিষ্ণু হয়ে বেড়ে উঠতে পারে। রাতের কুয়াশা চারার জন্য উপকারী। তাই বীজতলার আচ্ছাদন রাতে সরায়ে রাখা উচিত। বৃষ্টি বাদলের সময়ে পলিথিনের আচ্ছাদন ব্যবহার করলে চারার আলো পেতে সুবিধা হয়, অথচ বৃষ্টির ক্ষতি হতেও রক্ষা পায়।

বীজতলার রোগ ও পোকা দমন

গোড়া পচা ও ঢলে পড়া রোগ চারার প্রধান সমস্যা। ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে ও আক্রান্ত চারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বীজতলার মাটি সব সময় স্যাঁত স্যাঁতে থাকলে, ক্রমাগত মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া বিরাজ করলে ও বায়ু চলাচলে বিঘ্ন ঘটলে প্রধানত ঃ এ রোগাক্রমণের আশংকা বেশি থাকে।

বপনকৃত বীজ ও চারা উভয়েই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত বীজ গজায় না এবং চারার কাণ্ড মাটির কাছাকাছি চিকন হয়ে পচে যায় ও নেতিয়ে পড়ে এবং বীজতলা ও চারার গায়ে ছত্রাকের উপস্থিতি দেখা যায়। তাছাড়া বয়স্ক চারার শিকড়ের অগ্রভাগ পচে যায় ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য বীজতলা আলো-বাতাসময় ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত স্থানে তৈরি করা, বীজ ও মাটি শোধন করে নেয়া এবং বীজতলা স্যাঁত স্যাঁতে ও বায়ু চলাচল বন্ধ হতে না দেয়া উত্তম। তাছাড়া এ রোগ দমনের জন্য ক্যাপ্টান, বোর্দোমিক্সার ও

২০২২

ডায়থেন এম বা কপার অক্সি ক্লোরাইড প্রয়োগ করা যেতে পারে। পিঁপড়া, কাটুই পোকা ইত্যাদি দমনের জন্য বীজতলার চারদিকে কেরোসিন মিশ্রিত ছাই, ক্যালেথেন, সেভিন বা এ জাতীয় অন্যকোন কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হয়। অন্যান্য পোকার আক্রমণে কার্বোফুরান, ভেপোনা, ম্যালাথিয়ন বা সমমানের যে কোন কীটনাশক প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তর- ৫-৭ দিন বয়সের ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট চারা প্রথম বীজতলা থেকে তোলে দ্বিতীয় বীজতলায় ফাঁক ফাঁক করে রোপণ ও পরিচর্যা করতে হয়। বিশেষ যত্ন ও পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেয়ে চারার পাতা, কাণ্ড ও শিকড় দ্বিতীয় বীজতলায় সমানুপাতিকভাবে সবল ও সতেজ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। ফলে মূল জমিতে চারা স্থানান্তরের সময় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। প্রধানতঃ ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলী, বেগুন, মরিচ, টমেটো ক্যাপসিকাম, তরমুজ, শশা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ প্রথা অনুসরণ করা হয়। দ্বিতীয় বীজতলায় ৫-৭ সে.মি. দূরত্বে সারি করে ৪-৫ সে.মি. পর পর ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি চারা রোপণ করা যায় এবং শশা, তরমুজ ইত্যাদি লতানো গাছের চারা পলিথিন ব্যাগে স্থানান্তর করে জন্মানো হয়। স্থানান্তরের ৪-৫ সপ্তাহ পর চারা মূল জমিত রোপণ করা যায়।

চিত্র ঃ চারা স্থানান্তর

চিত্র ঃ চারার ছায়া সরায়ে রোদে রেখে কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ানো

চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বাড়ানো-চারা বেশি নাদুসনুদুস, নরম, ফ্যাকাশে, আদুরে প্রকৃতির হলে মূল জমিতে রোপণজনিত আঘাত বা প্রতিকূল অবস্থা সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। তাই বীজতলায় থাকা অবস্থায়ই প্রখর রৌদ্র ও শীতের প্রভাব এবং পর্যাপ্ত পানির অভাব ইত্যাদি সমস্যা ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি করে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে

চিত্র : বীজতলায় চারার কষ্টসহিষ্ণুতা বাড়ানো

অভ্যস্ত করার প্রক্রিয়াকে চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বাড়ানো বলে। পানি সেচ ও সূর্যালোক প্রাপ্তি নিয়ন্ত্রণ এবং উষ্ণ ও শৈত্য পরিবেশে বীজতলায় চারা ধাপে ধাপে খুলে রাখার মাধ্যমে চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বাড়ানো সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় চারায় শ্বেতসারের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় যা রোপণ পরবর্তীকালে প্রচুর নুতন শেকড় গজাতে ও স্থানান্তরিত জমিতে

দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করে। বীজতলায় বীজ বপনের ২ দিন পর হতে বীজ গজানোর হার লক্ষ রাখতে হয়। বীজ গজালে বীজতলার ঢাকনা বা চাটাই মাঝে মাঝে কিছু সময় অর্থাৎ আধাঘন্টার জন্য তুলে রাখতে হয়। পর পর কয়েকদিন ঝাপ তুলে রাখার সময় আস্তে আস্তে বাড়াতে হয়। এই ঝাপ বা চাটাই এমনভাবে খুঁটির উপর থাকবে যেন তা নিচের দিকে বীজতলা থেকে ১.৫ ফুট বা ৪৫° সে.মি. উপরে থাকে।

চারা রোপণের বয়স ও সময়

মূল জমিতে রোপণে সুবিধা হয় এবং রোপণের পর জমিতে সহজে লেগে যেতে পারে এমন বয়সের চারাই রোপণের জন্য উপযুক্ত। কোন চারা অনির্দিষ্টকালের জন্য বীজতলায় রাখা চলে না। কেননা বয়স্ক চারার শেকড় উঠানো কালে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় বলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়। চারার শেকড়, কাণ্ড ও পাতা সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৭-৮টি পাতা ধারণ করেই সাধারনত রোপণের উপযুক্ত হয়। তবে চারা বৃদ্ধির হার স্বাভাবিক হলে বীজ বপনের কতদিন পরে বিভিন্ন প্রকার সবজির চারা রোপণের উপযোগী হয় নিচের সারণিতে তা দেখানো হলো। চারা তোলার ৫-৭ দিন আগে থেকে বীজতলায় পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়। এতে গাছে শর্করার পরিমাণ বেশি হয় ও চারা তোলাজনিত আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা বেড়ে যায়।

সারণিতে বিভিন্ন সবজির চারা রোপণের বয়স ও সময়

চারার নাম	বীজ বপন সময়	চারার রোপন উপযোগী বয়স (দিনে)
ফুলকপি	অক্টোবর-নভেম্বর	৩০-৩৫
ব্রকোলী	-ঐ-	২৫-৩০
বাঁধাকপি	-ঐ-	৩০-৩৫
ওলকপি	-ঐ-	৩০-৩৫
চিনাবাঁধাকপি	-ঐ-	২৫-৩০
ক্যাপসিকাম	-ঐ-	২৫-৩০
বীট	-ঐ-	২৫-৩০
লেটুস	-ঐ-	২৫-৩০
টমেটো	সারা বৎসরই	৪০-৪৫
বেগুন	মার্চ-এপ্রিল	৪০-৪৫
মরিচ	অক্টোবর-নভেম্বর	৪০-৪৫
বাঞ্চিং অনিয়ন	-ঐ-	৪০-৫০
পেঁয়াজ	অক্টোবর-ডিসেম্বর	৪০-৫০
শশা	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	৩০-৪০
পুঁইশাক	এপ্রিল-মে	৩০-৪০
সিলারী	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	৪০-৫০
পেঁপে	ফেব্রুয়ারি-মার্চ	৩০-৪০
কুমড়া/লাউ	এপ্রিল-মে	৩০-৪০
শিম	জুন-আগস্ট	৩০-৩৫
শালগম	অক্টোবর-নভেম্বর	২৫-৩০

২০২২

চারার রোপণ উপযোগী বয়স

মূল জমিতে রোপণ করতে সুবিধা হয় এবং রোপণের পর জমিতে সহজে লেগে যেতে পারে এমন আকৃতি ও বয়স প্রাপ্ত হলেই চারা রোপণ উপযোগী হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। অল্প বয়স্ক চারা স্থানান্তর জনিত আঘাত তেমন সহ্য করতে পারে না। ফলে বহুলাংশে মরে যায়। পক্ষান্তরে বয়স্ক চারার শিকড় বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় বলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়। চারার শিকড়, কাণ্ড ও পাতা সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে ৭-৮ টি পাতা ধারণ করলেই রোপণের উপযুক্ত হয়। তবে বীজতলা থেকে চারা উঠানোর অন্তত ঃ ১ (এক) ঘন্টা পূর্বে একবার হালকা সেচ দিতে হয়। এরপর মাটি শুকিয়ে এলে চারা উঠাতে হয়। তাতে চারার শেকড় কম ছিড়ে ও রোপণজনিত আঘাত দ্রুত সেরে উঠে। চারা উঠানোর সময় চিকন কাঠি দিয়ে মাটিতে চাড় দিয়ে চারার পাতা হালকাভাবে ধরলে সহজেই চারা উঠে আসবে। এছাড়া খুরপি বা অগার দিয়েও বীজতলা হতে আলতোভাবে চারা উঠানো যায়। চারার গোড়ার মাটির বলসহ উঠানো চারা গর্তে বলসহ রোপণ করলে সে চারা সাধারণত রোপণজনিত আঘাত পায় না। তাই এই চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

চিত্র ঃ মাটির বলসহ চারা

চিত্র ঃ খুরপি দিয়ে চারা উঠানো

বীজতলা হতে কাঠি দিয়ে চারা উঠালে চারার শিকড় সাধারণত নগ্ন হয়ে যায়। এ সময় চারার অতি কোমল কাণ্ডে হাত না লাগিয়ে আলতোভাবে প্রতিটি চারার পাতার ধরতে হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নগ্ন চারা লাগালে ঢলে পড়তে পারে বা শুকিয়ে যেতে পারে। তাই একটি পাত্রে অর্ধেক পানি নিয়ে একটি একটি করে উঠায়ে তাতে জড়ো করতে হয়। এ ব্যবস্থা করা হলে চারা ঢলে পড়বে না বা শুকিয়ে যাবে না।

চিত্র ঃ চারা উঠানো ও পানিতে চারা রাখা

চিত্র ঃ গর্তে সঠিক পদ্ধতিতে চারা রোপণ ও পানি দেয়া

প্রখর রোদের সময় চারা উঠানো অনুচিত। অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রা এবং বাতাসে বেশি জলীয়বাষ্প থাকাকালীন সময় চারা তোলা সবচেয়ে ভাল। বিকেলে সূর্য ডুবার পূর্ব মুহূর্তে মাঠে চারা রোপণ করা উচিত। রাত্রিকালীন কুয়াশা ও শিশির বাতাসে অধিক জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করে যা চারাকে সতেজ রাখতে সাহায্য করে। এসময় চারার সালোক সংশ্লেষণ হার কম হয়। বিকেলে রোপণের পর মাটিতে শিকড় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চারা প্রায় ১২-১৪ ঘন্টা উপযুক্ত পরিবেশ পায়। এতে রোপণ পরবর্তী চারার মৃত্যুহার কমে যায়।

চারা উঠানোর পর যতশীঘ্র সম্ভব রোপণ করতে হয়। রোপণের সময় নির্দিষ্ট স্থানে বাঁশের কাঠি দিয়ে একটি গর্ত করে নিয়ে তারপর ঐ গর্তের মধ্যে শেকড়সহ চারাটি বসায়ে দিতে হয়। বীজতলায় যে গভীরতা হতে চারা উঠানো হয় গর্তটির গভীরতাও তার সমান হতে হয়। সাধারণত এ গভীরতা ৫-৮ সে.মি. পর্যন্ত হতে পারে। চারাটি গর্তে স্থাপনের পর আঙ্গুল দিয়ে চারার গোড়ার দু'দিকের মাটি আস্তে আস্তে সামান্য চেপে দিতে হবে। যাতে গোড়ার শেকড়ের গায়ে মাটি লেগে যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন চারার গোড়া ও কাণ্ড সোজা থাকে। চারা বাঁকা করে লাগানো মোটেই উচিত নয়। কোন কারণে চারা উঠানোর পর রোপণে দেরি হলে চারাগুলো গুছিয়ে মুঠি আকারে বেঁধে ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হয় এবং সতর্কতার সাথে নড়াচাড়া করতে হয়।

চিত্র ঃ কাণ্ড বাঁকা ও সোজা চারা

চিত্র ঃ পানি দিয়ে ভেজানো ও গর্ত করা

চারা রোপণ প্রবর্তী পরিচর্যা-চারা রোপণের পর চারার গোড়ায় ৩-৪ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে পানি দিতে হয়। এই সেচের পানি চারার শেকড়কে মাটির আরো অধিক সংস্পর্শে আসতে সাহায্য করে। চারা রোপণের পরের দিন সূর্যতাপ হতে চারাকে বাঁচানোর জন্য ছায়া দেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। এ ব্যবস্থা না করা হলে চারা অত্যধিক প্রস্বেদনের কারণে শুকিয়ে মারা যেতে পারে বা ভীষণ দুর্বল হয়ে যেতে পারে। কারণ মাটিতে শেকড় ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত চারার প্রস্বেদন ও রস শোষণের মধ্যে ভারসাম্যতা বজায় থাকে না। তাই ৩/৪দিন

অব্যাহত ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে রাতের বেলায় শিশির পড়ার জন্য ঢাকনা সরায়ে দিতে হয়। চারা মাটিতে প্রতিষ্ঠিত হলে মাঝে মাঝে চারার গোড়ার চারিদিকের মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হয়। পেঁপে, বেগুন, মরিচ, পুঁই, শালগম, শিম, লাউ, কুমড়া জাতীয় ইত্যাদি চারা রোপণে বিশেষ যত্নবান হতে হয়। কারণ এগুলো মরে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ব্রকোলি, বিট, ফুলকপি, লেটুস, টমেটো, সিলারী, চিনা বাঁধাকপি, পটল, কাঁকরোল, পেঁয়াজ, কাঁচকলার চারা ইত্যাদি রোপণের আঘাত সহ্য করে সহজেই বেঁচে উঠতে পারে।

পোকামাকড় ঃ রোগবালাই দমন- চারা রোপণের পর প্রথম অবস্থায় যদি গাছের ২-১টি পাতায় বা ডালে পাকামাকড়ের ডিম বা কীড়া দেখা দেয়, তাহলে সেগুলো হাত দিয়ে সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হয়। এতে ফসল মাটি ও পরিবেশ রক্ষা পায়, ঔষধ স্প্রে করার খরচ বাঁচে, ডিম ফুটে পোকা ছড়াতে পারে না।

চিত্র ঃ ভোর বেলা ছাই ছিটানো

চিত্র ঃ আক্রান্ত চারা তুলে ফেলা ও কীটনাশক ঔষধ স্প্রে করা

বেগুন, লাউ, শশা, কুমড়াজাতীয় ইত্যাদি চারাতে সকাল বেলা পাতায় শিশির থাকা অবস্থায় ছাই ছিটিয়ে দেওয়া যায়। এতে বিটলজাতীয় পোকা ও পিপড়ার উপদ্রব কমে যায়। এছাড়া চারা আক্রান্ত হলে ডাল ও পাতা ছেটে দেওয়া যায়। আবার অনেক সময় চারা ছোট থাকলে আক্রান্ত চারা তুলে ফেলতে হয়। আক্রমণ খুব বেশি হলে পোকামাকড় দমনের জন্য বালাইনাশক যেমন- নগজ, ভেপোনা, ডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন, নেক্সিয়ন, ফেনিট্রিথিয়ন, মেটাসিসটোক্স ইত্যাদি স্প্রে করতে হয়। আর রোগবালাই বা ছত্রাক দমনের জন্য ছত্রাকনাশক যেমন- বোর্দোমিক্সার, টিল্ট, কপার-অক্সিক্লোরাইড, ডায়াথেন এম-৪৫ ইত্যাদি স্প্রে করতে হয়।

সবজির অযৌন বংশ বিস্তার

আমাদের দেশে কিছু কিছু সবজি আছে যেগুলোর আদৌ বীজ তৈরি হয় না বা তাদের বীজ তৈরি করা কষ্টসাধ্য। আবার, যে ধরনের বীজ উৎপাদন করে তা দ্বারা সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তাই এই সমস্ত সবজির বংশবিস্তারে বা চাষাবাদের জন্য বীজের পরিবর্তে অঙ্গ ছাড়া অন্য কোন সহজ উপায় নেই। যেমন- কাঁচকলা, গোলআলু, মিষ্টি আলু, কচু, পটল, মেটে আলু, রসুন, আদা ইত্যাদি। অযৌন বংশবিস্তারের কারণ।

যথা- (ক) কিছু গুরুত্বপূর্ণ সবজি আছে যেমন-পটল, কাঁকরোল, ঢুন্দুল, কাঁচকলা প্রভৃতি ধরনের গাছ সুস্থ সবল ও প্রকৃত বীজ উৎপাদন করতে পারে না। তাই এসব গাছের বংশকে টিকিয়ে রাখার জন্য অঙ্গ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করতে হয়।

(খ) বীজ থেকে উৎপাদিত গাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না। তাই মাতৃগুণ সম্পন্ন গাছ পেতে হলে অযৌন পদ্ধতিতে নতুন গাছ উৎপাদনের প্রয়োজন হয়।

(গ) অনেক গাছের বীজ খুব ধীরে ধীরে গজায় এবং বীজে সজীবতা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে অযৌন বংশবিস্তার ছাড়া বিকল্প পন্থা থাকে না। ২০২২

(ঘ) কুমড়াজাতীয়, বেগুন, টমেটো, শশা ইত্যাদির এমন কতগুলো জাত আছে যেগুলো উচ্চ ফলনশীল। কিন্তু খরা, জলাবদ্ধতা, রোগ, পোকামাকড় ইত্যাদির প্রতি অধিক সংবেদনশীল। এক্ষেত্রে ঐসব জাতের গাছের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করে ফসল হিসেবে চাষ করা হয় না। তাই প্রতিকূল অবস্থার সাথে খাপ খায় এমন কোন গাছের সাথে কলম করে চাষ করা হয়। যেমন- বেগুনের সাথে জংলি বেগুন, কুমড়ার সাথে শশা ইত্যাদি।
(ঙ) অঙ্গজ পদ্ধতিতে জন্মানো গাছ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকারে ছোট হয় এবং শিকড় খুব মজবুত হয়। এজন্য ফল সংগ্রহ ও পরিচর্যা সহজ হয়। ফলের সংখ্যা বেশি ও আকৃতিতে বড় হয়। অল্প জায়গাতে বেশি করে গাছ লাগানো যায়।
(চ) এ পদ্ধতিতে নতুন গাছ তৈরিতে কোন কোন ক্ষেত্রে সময় কম লাগে, খরচ কম এবং পদ্ধতিও অনেকটা সহজ। যেমন-কচু, আলু, কাঁকরোল, পটল, মেটে আলু, গাছ আলু ইত্যাদি।

সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারের উপকরণ

সবজির অঙ্গজ বংশবিস্তারে ব্যবহৃত উপকরণগুলো হলো সবজির শাখা ও রূপান্তরিত বিভিন্ন অঙ্গ। নিচে বিভিন্ন প্রকারের অঙ্গের নাম উল্লেখ করা হলো। যেমন-
শাখাকলম, শল্ক কন্দ, কন্দ স্ফীতকন্দ, গুঁড়িকন্দ বা করম, গুড়িচারা বা বক্রধাবক, ধাবক, রাইজোম, টিউবারকন্দ, কন্দমূল, মুকুট ইত্যাদি।
১। শাখাকলম– সাধারণত কোন গাছের কান্ডের টুকরা বা অংশ ব্যবহার করে নতুন গাছ উৎপাদন করা হয়। কান্ডের প্রতিটি টুকরায় কমপক্ষে একটি করে আইক বা গিরা বা পর্ব থাকতে হয়। উদাহরণ মিষ্টি আলুর লতা, পুঁইশাক, কলমিশাক, পটল, সাজিনা ইত্যাদি শাখা কলমের সাহায্যে বংশবিস্তার করে থাকে। রোপণের সময় কান্ডের টুকরার তিনভাগের দুই ভাগ মাটির নিচে পুঁতে দিতে হয় এবং এক ভাগ মাটির উপরে রাখতে হয়।

চিত্র ঃ সাজিনা ডাল ও মিষ্টি আলুর কাটিং রোপণ

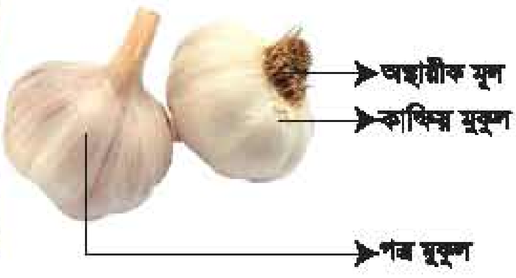

চিত্র ঃ ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড

১। শল্ক -এটি একটি বিশেষ ধরণের ভূনিম্নরূপান্তরিত কাণ্ড। এ কান্ড খাটো প্রকৃতির এবং অর্ধগোলোকার চাকতির মতো। এতে রসালো শল্কপত্র একটির পর একটি অর্ধগোলোকারভাবে সাজানো থাকে। সমস্ত শল্কপত্রগুলো শুষ্ক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত থাকে। শল্কপত্রগুলো হলো পাতার রূপান্তরিত নিচের অংশ। শল্কপত্রে একটি শীর্ষমুকুল থাকে, যা থেকে নতুন গাছের সৃষ্টি হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে শল্ক কন্দের কাক্ষিক মুকুলও থাকে। এসব কাক্ষিক মুকুল ক্ষুদ্রাকার কন্দে পরিণত হয়ে কোয়ার রূপধারণ করে। উদাহরণ- পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি।

চিত্র ঃ ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড (রসুন)

চিত্র ঃ কন্দ (গোল আলু)

৩। স্ফীত কন্দ– এটি একটি ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড বা টিউবার। এর গায়ে অনেক চোখ থাকে এবং এ চোখেই কুঁড়ি থাকে। এই কুঁড়ি হতে নতুন গাছের জন্ম হয়। উদাহরণ- গোল আলু।

৪। গুড়িকন্দ বা কন্দম– এটি ভূনিম্নস্থ সকল কান্ডের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং মাটির নিচে সাধারণত খাড়াভাবে অবস্থান করে। কোন কোন কাক্ষিক মুকুল খাদ্য সঞ্চয় করে স্ফীত হয়ে ছোট ছোট গুড়িকন্দের সৃষ্টি করে। এই গুড়িকন্দ হতে আলাদা আলাদাভাবে নতুন গাছের জন্ম দেয়। যেমন-ওলকচু।

চিত্র ঃ গুড়িকন্দ (ওলকচু)

চিত্র ঃ গুড়িচারা (কচু)

চিত্র ঃ বক্রধাবক পানিকচু(রানার)

৫। গুড়িচারা বা বক্র ধাবক-কোন কোন উদ্ভিদের মাটি সংলগ্ন কাণ্ড বা মূল থেকে পার্শ্বমুকুল বের হয়। এ পার্শ্বমুকুল বেড়ে একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়। কচু গাছের কাণ্ডের গোড়া হতে গুড়িচারা বের হয়।

চিত্র ঃ অর্ধবায়বীয় রূপান্তরিত কাণ্ড (আমরুল ও টোপাপানা)

চিত্র ঃ ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কান্ড (আদা)

এটি একটি লতানো গাছ এবং এর গিরা (পর্ব) হতে পার্শ্বমুকুল বের হয়ে সরু লম্বা হয়ে যায়। এই লম্বা শাখা মাটিকে স্পর্শ করে সমান্তরালভাবে থাকে। কিছুদূর যাবার পর অগ্রভাগের গিরার (পর্ব) নিচের দিকে অস্থানিক মূল এবং উপরের দিকে পাতা বের হয়। পরবর্তীতে প্রতিটি পর্ব হতে এক একটি কুঁড়ি বের হয়ে স্বতন্ত্র গাছে পরিণত হয়। যেমন-থানকুনি, আমরুল, টোপাপানা ইত্যাদি।

৭। রাইজোম- এটি একটি ভূনিম্নস্থ রূপান্তরিত কাণ্ড এবং মাটির নিচে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে। এতে পর্ব, মধ্যপর্ব, শল্কপত্র, শল্কপত্রের কক্ষে কক্ষমুকুল এবং অগ্রভাগে অগ্রমুকুল থাকে। আদা ও হলুদের বংশবিস্তারে রাইজোম ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ঃ টিউবারকন্দ (মেটে আলু)

চিত্র ঃ কন্দমূল (মিষ্টি আলু)

৮। টিউবারকন্দ-কাণ্ডের ভূ-উপরস্থ অংশে অর্থাৎ লতার পর্বে (পাতার বোঁটায়) অনেক সময় স্বাভাবিক শাখা বের না হয়ে মাংসল অঙ্গ সৃষ্টি করে। এদেরকে টিউবারকন্দ বা বুলবিল বলে। চুপড়ি আলুর বিভিন্ন জাত টিউবারকন্দের সাহায্যে বংশবিস্তার করে থাকে।

৯। কন্দমূল-এটি একটি ভূ-নিম্নস্থ রূপান্তরিত মূল। এদের গায়ে অস্থানিক কুঁড়ি থাকে, যা থেকে চারা বের হয়। মিষ্টিআলু, কাঁকরোল, চারকোণী শিম ইত্যাদি কন্দমূলের সাহায্যে বংশবিস্তার করে।

১০। মুকুট -কিছু কিছু সবজির পুষ্ট উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের জন্য ভক্ষণযোগ্য কিছু অংশ এবং পাতার উপরের অংশ কিছুটা কেটে বীজতলায় রোপণ করা হয়। এতে মূল জমি মুক্ত হয়ে যায় এবং অল্প পরিসরে পরিচর্যার মাধ্যমে বেশি পরিমাণ বীজ উৎপাদন করা যায়। যেমন- মূলা, গাজর, বীট, শালগম ইত্যাদি।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. বীজ ছিটিয়ে বপন করলে সারিতে বপন অপেক্ষা কতগুণ বীজ বেশি লাগে?

২. পালংশাকের জন্য এক হেক্টরে কত গ্রাম বীজ লাগে?

৩. বীজতলায় চারা হতে চারা কত সে.মি. দূরে দূরে রাখলে চারা সুষ্ঠুভাবে বড় হতে পারে?

৪. চারা বাঁকা হওয়া রোধে কতবারে চারার গোড়ায় ঝুরঝুরে মাটি দিতে হয় ?

৫. বীজতলায় পিপড়ার আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবহার্য ১টি কীটনাশকের নাম লেখ।

৬. দ্বিতীয় বীজতলায় কতদিন বয়সের চারা স্থানান্তর করা যায় ?

৭. ফুলকপির চারা রোপণ উপযোগী বয়স কতদিনে হয় ?

৮. কোন সময় চারা রোপণ করলে প্রতিষ্ঠিত হতে ১২-১৪ ঘন্টা সময় পায় ?

৯. অঙ্গজ বংশ বিস্তার হয় এমন ১টি সবজির নাম লেখ।

১০. রেটুন বা মুড়ি ফসল হয় এমন ১টি সবজির নাম লেখ।

১১. কন্দমূলের ১টি উদাহরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বীজ হার বলতে কী বোঝায় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

২. ৫টি সবজি বীজের বীজসংখ্যা/গ্রাম, বীজ হার শতক ও বীজ হার/হেক্টর উল্লেখ কর।

৩. বীজতলার রোগ ও পোকামাকড় দমন সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৪. ৫টি সবজির চারা রোপণের বয়স ও সময় সম্পর্কে লেখ।

৫. চারা রোপণ পরবর্তী পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন সম্পর্কে লেখ।

৬. সবজির অঙ্গজ বংশ বিস্তারে শুষ্ক কন্দ ও স্ফীত কন্দ সম্পর্কে উদাহরণসহ লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বীজতলায় বীজ বপন ও বীজতলার চারার পরিচর্যা, রোগ ও পোকা দমন সম্পর্কে বর্ণনা কর।

২. চারা রোপণ পূর্ব প্রস্তুতি এবং রোপণ প্রক্রিয়াসমূহ ধাপে ধাপে বর্ণনা কর।

৩. চারা রোপণ পূর্ব প্রস্তুতি এবং রোপণ প্রক্রিয়াসমূহ ধাপে ধাপে বর্ণনা কর।

৪. চারা রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৫. সবজির অঙ্গজ বংশ বিস্তার বলতে কী বোঝায় এবং বংশ বিস্তারে ব্যবহৃত ৩টি উপকরণের ছবিসহ ব্যাখ্যা কর।

টিকা লেখ

১) চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা, (২) বীজতলায় বীজ বপন ৩) দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তর।

২০২২

ষষ্ঠ অধ্যায়
সবজি চাষের সাধারণ নিয়ামাবলি

জমি ও মাটি নির্বাচন

শাক সবজি চাষের জন্য যথেষ্ট আলো বাতাসের সুবিধা আছে এমন উঁচু দোঁআশ মাটির জমি নির্বাচন করা উচিত। বিশেষ করে ফল জাতীয় সবজির (বেগুন, ঢেঁড়শ, কুমড়া, শশা, পেঁপে, মরিচ, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, করলা, কাঁকরোল, বরবটি, শিম ইত্যাদি) জন্য বেশি আলোর দরকার হয়। শাক ও মূলজাতীয় সবজি (ডাঁটা, পুঁইশাক, কলমিশাক, সিলারি, লেটুস, বিট, গাজর, মূলা, শালগম) কিছু কম আলোতে এবং কচু, মেটে আলু, গাছ আলু ইত্যাদি সবজি ছায়াতেও ভালভাবে জন্মিতে পারে।

সারা বছর শাক সবজি চাষাবাদের জন্য উঁচু সেচ নিকাশযুক্ত জমি সুবিধাজনক। পানি সেচ ও নিকাশের জন্য জমি মোটামুটি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু থাকলে ভালো হয়। তাই সবজি বাগান এমনস্থানে হওয়া উচিত যেখানে। সহজেই পানি সেচ ও নিকাশ করা যায়। সবজি বাগানে গাছের বা বাড়ি ঘরের ছায়া যত কম পড়বে ততই ভালো, যদিও শাক সবজির বাগান সাধারণত বাড়ির আশে পাশেই হওয়া উচিত, তাতে সহজে দেখাশানো করা যায়। তবে সবজির চাহিদা ও উৎপাদনের উদ্দেশের ওপর ভিত্তি করে জমির স্থান নির্বাচন করতে হয়। যেমন-পারিবারিক সবজি বাগান, বিক্রয়মূলক সবজি বাগান ও বিশেষ সবজি বাগান।

পারিবারিক সবজি বাগান- এ ধরণের সবজি বাগান সাধারণত ছোট আকারের হয়ে থাকে। যতদূর সম্ভব বাড়ির আশে পাশে পতিত বা ফাঁকা স্থানগুলোতে এ বাগান করা হয়। এক্ষেত্রে পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য স্বল্প সময়ে বেশি পরিমাণে জন্মে এমন ধরনের সবজি চাষ করা হয়। এ বাগানে কী কী শাক সবজি জন্মানো হবে তা পরিবারের লোকজনদের পছন্দের ওপর নির্ভর করে অনেক সময় চাষ করা হয়। বাড়ির আশে পাশের জমিতে বাগান করা হয় বলে পরিবারের মেয়েরা এ ধরনের বাগানের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সবজি সংগ্রহ মহিলারাই করতে পারে। শাক সবজি টাটকা অবস্থায় খাওয়া উচিত। তাই গার্হস্থ্য সবজি বাগান হতে বেশি ফলপ্রসূভাবে টাটকা অবস্থায় শাক সবজি সহজে সংগ্রহ করা যায়।

বিক্রয়মূলক সবজি বাগান- বাজারের চাহিদা এবং বেশি মূল্য পাওয়ার ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের বাগান করা হয়। আগেকার দিনে বিক্রয়মূলক সবজি বাগান শহরের আশে পাশে সীমাবদ্ধ থাকতো। কিনতু বর্তমানে বিভিন্ন কারণে শহর বা বাজার হতে অনেক দূরবর্তী স্থানেও বাণিজ্যিকভাবে শাক সবজি চাষাবাদ করা হচ্ছে। কেননা রাস্তা ঘাট ও যানবাহনের সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনগণের রুচি ও চাহিদা বাড়ছে, অধিক লাভজনক ও নতুন নতুন আকর্ষণীয় সবজি প্রবর্তন হচ্ছে ইত্যাদি।

জমি মাটি দ্বারা গঠিত। গাছপালা মাটি হতে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। মাটি একটি জীবিত ও পরিবর্তনশীল পদার্থ। মাটিকে সাধারণত বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। যথা- (ক) ভৌতিক (খ) রাসায়নিক ও (গ) জৈবিক।
(ক) ভৌতিক- মাটি বিভিন্ন প্রকার কণার সমন্বয়ে গঠিত। এর বিভিন্ন প্রকার কণার আকার ও পরিমাণের ওপর নির্ভর করে মাটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ১। পাথুরে মাটি ২। বেলে মাটি ৩। পলি মাটি ৪। কাদা মাটি ও ৫। দোঁআশ মাটি।

১। পাথুরে মাটি- পাথর, পুঁড়ি, কাঁকর ও বালির সমন্বয়ে এ মাটি গঠিত। এ মাটি চাষ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সবজি চাষের জন্য অনুপযোগী।

২। বেলে মাটি- শতকরা ৭০ ভাগ বা তার অধিক বালিকণাযুক্ত মাটি। নদীর চর, চরাভূমি, মরুঅঞ্চল এবং বৃষ্টিবহুল এলাকায় এরূপ মাটি দেখা যায়। এ মাটি সহজে কর্ষণ করা যায়; কিন্তু অনুর্বর ও পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই

কম। এ মাটিতে আগাম শীতকালীন সবজি ও মূলজাতীয় ফসল ভাল জন্মে। এ মাটি সব ধরনের সবজি চাষের জন্য খুব উপযুক্ত নয়।

৩। পলি মাটি- নদীর তীরবর্তী ও পাবিত অঞ্চলে এ ধরনের মাটি বেশি পাওয়া যায়। এ মাটি উর্বর, তাই সব ধরনের সবজিই জন্মানোর উপযোগী।

৪। কাঁদা মাটি- শতকরা ৪০-৫০ ভাগ কর্দম কণাযুক্ত মাটি। এ মাটিতে পলিকণার পরিমাণ বেশি থাকে এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। ভিজা অবস্থায় খুবই নরম ও আঁঠালো প্রকৃতির হয়, কিন্তু শুকালে খুবই শক্ত হয়। সাধারণভাবে সবজি চাষের জন্য এ মাটি খুব বেশি সুবিধাজনক নয়। কিন্তু কচুজাতীয়, কলমিজাতীয় সবজি চাষের জন্য বেশ উপযোগী।

৫। দোঁআশ মাটি- শতকরা ৭০ ভাগের কম ও ২০ ভাগের বেশি বালিকণা বিশিষ্ট মাটি। কোন কোন ক্ষেত্রে বালিকণার পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত নেমে গেলেও মাটি দোঁআশ হতে পারে। তবে আদর্শ দোঁআশ মাটিতে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ বালিকণা এবং অর্ধেক পরিমাণ পলি ও কর্দমকণার মিশ্রণ থাকে। দোঁআশ মাটিতে বালি ও কর্দম কণার কম বেশির অনুপাত অনুসারে এ মাটিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) বেলে দোঁআশ ও (খ) এঁটেল দোঁআশ।

(ক) বেলে দোঁআশ- বেলে দোঁআশ মাটিতে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ হতে ৬৫ ভাগ পর্যন্ত বালি কণা থাকতে পারে।

(খ) এটেল দোঁআশ- এঁটেল দোঁআশ মাটিতে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ কর্দমকণা এবং একই পরিমাণ পলিকণা থাকতে পারে। এছাড়া পলি কণার তারতম্য অনুসারে দোঁআশ মাটিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) পলি দোঁআশ ও (২) পলি এঁটেল দোঁআশ।

(১) পলি দোঁআশ মাটিতে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ পলি ও ২০ ভাগ কর্দম কণা এবং
(২) পলি এঁটেল দোঁআশ মাটিতে শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ বালি এবং ৩০ ভাগ কর্দম কণা থাকে।

দোঁআশ মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা বেশি এবং এর অভ্যন্তরে বেশি পরিমাণে বায়ু চলাচল করতে পারে। তাই এ মাটি গভীর স্তর পর্যন্ত রসালো থাকে। এ মাটি ঝুরঝুরে প্রকৃতির ও উর্বর হয়ে থাকে এবং যেকোন ফসল ভালোভাবে জন্মানো যায়। মাটিতে রসের কম বেশি বা জলাবদ্ধতা হলে কী অবস্থা হয় তা পরবর্তী চিত্রে দেখানো হলো।

(খ) রাসায়নিক- রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা মাটির উর্বরতা এবং মাটিতে পুষ্টির অভাব আছে কি না তা জানা যায়। সাধারণত দুই ধরনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়। যথা- মাটিতে মোট পুষ্টির পরিমাণ এবং যে সকল পুষ্টি গাছের খাদ্য হিসেবে প্রয়োজন হয়। মাটির রাসায়নিক উপাদান তথা গাছের পুষ্টি উপাদানগুলো যথা- নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, বোরণ, কপার, জিংক, আয়োডিন, মলিবডেনাম ইত্যাদি। এগুলো মাটির মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে থাকা দরকার যেহেতু শাক-সবজি স্বাভাবিকভাবে জন্মানোর জন্য এগুলোর প্রয়োজন।

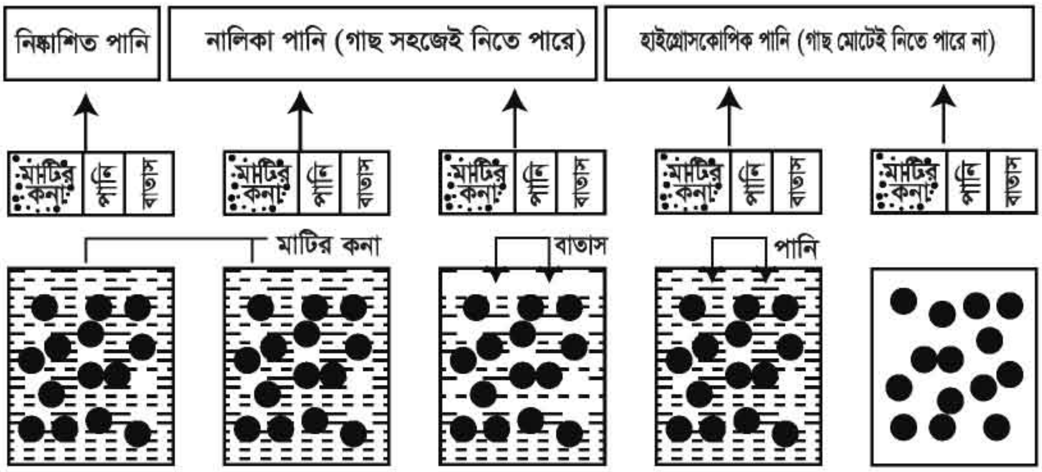

চিত্র ঃ মাটিতে রস ও বাতাস মাটি কণার মধ্যে অবস্থানগত অবস্থা

এই উপাদানগুলো উপযুক্ত পরিমাণে না থাকলে গাছের বৃদ্ধিতে নানা ধরনের অসুবিধা হয়। উল্লিখিত উপাদানগুলোর মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও জিংক গাছের জন্য বেশি পরিমাণে দরকার হয়। তাই সুষ্ঠুভাবে ফসল ফলানোর জন্য এগুলো জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। তবে অন্যান্য উপাদানগুলো খুব অল্প পরিমাণে দরকার হয় এবং মাটিতে যে পরিমাণে আছে তাতেই ফসলের প্রয়োজন মিটে যায়। সারা বছর বার বার ফসল চাষের ফলে অন্যান্য উপাদানগুলোর ঘাটতিও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

মাটিতে বিভিন্ন উপাদানের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে মাটি অম্ল বা ক্ষার ধর্মীয় হয়। সফলভাবে শস্য উৎপাদন এই অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের (পি.এইচ মানাঙ্ক) ওপর নির্ভর করে। এই অম্লত্ব বা ক্ষারত্বকে পিএইচ মানাঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পি,এইচ-এর নিরপেক্ষ মানাঙ্ক হলো ৭-এর নিচের মানাঙ্ক অশীয় এবং উপরের মানাঙ্ক ক্ষারীয়। নিরপেক্ষ মানাঙ্ক হতে হাইড্রোজেন আয়নের মান যত দূরে হবে মাটি ততবেশি অম্লীয় বা ক্ষারীয় হয়। বিভিন্ন শাক সবজির চাষ উপযোগী পিএইচ মানাঙ্ক পরের পাতায় সারণিতে দেখানো হলো।

অম্লীয় মাটি- যে মাটির পি.এইচ মানাঙ্ক ৭ এর চেয়ে কম থাকে তাকে অম্লীয় মাটি বলে। মাটিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম বা চুনের অভাব হলে বা জৈব পদার্থ বেশি হলে মাটি অম্লীয় ভাবাপন্ন হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টির পানির সাথে চুন মাটির অভ্যন্তরে চুইয়ে যায়। এর ফলেও মাটিতে অম্লীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এমোনিয়াম সালফেটজাতীয় সার বেশি ব্যবহার করলে মাটিতে অম্লত্ব সৃষ্টি হয়। শাকসবজি সাধারণত অম্লীয় মাটিতে ভালো জন্মে।

ক্ষারীয় মাটি- যে মাটির পি,এইচ মানাঙ্ক ৭ -এর উপরে থাকে তাকে ক্ষারীয় মাটি বলে। কোন মাটিতে পানি নিকাশের ব্যবস্থা না থাকলে এবং দীর্ঘদিন ধরে বাষ্পীবতন হলে সেখানে লবণাক্ততা ও ক্ষারীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের মাটিতে লৌহের অভাব দেখা দেয় এবং ক্ষার সহিষ্ণু ফসল ছাড়া অন্য ফসল ভালভাবে জন্মে না। মাটির পিএইচ মানাঙ্ক নিরপেক্ষ করার জন্য চুন প্রয়োগের পরিমাণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

অম্লীয় মাটি কৃষিকাজের ব্যবহারের সুবিধার্থে মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভিত্তিতে মাটিকে ৭টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

ক্রমিক নং	বিক্রিয়া শ্রেণি	প্রধান বিক্রিয়া	অম্লান মাত্রা
১	তীব্র অম্ল	০ – ৫.৫ এর নিচে	অম্ল মাটি
২	মধ্যম অম্ল	৫.৫ – ৬.০	
৩	সামান্য অম্ল	৬.০ – ৬.৫	
৪	প্রশম	৬.৫ – ৭.৫	প্রশম মাটি
৫	সামান্য ক্ষারীয়	৭.৫ – ৮.০	ক্ষারীয় মাটি
৬	ক্ষারীয়	৮.০ – ৮.৫	
৭	তীব্র ক্ষারীয়	৮.৫ -এর উপরে	

তবে ৭.০ মানাঙ্ককে নিরপেক্ষ মাটি হিসেবে ধরা হয়।

সারণি ঃ অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব সংশোধনের উপায়

ক্রমিক নং	অম্লীয় মাটি	ক্রমিক নং	ক্ষারীয় মাটি
১	পানি নিকাশ ব্যবস্থার উন্নয়ন	১	পানি নিকাশের ব্যবস্থা করা
২	চুনা বা ক্যালসিয়াম প্রয়োগ	২	প্লাবন সেচের দ্বারা জমি ধৌত করা
৩	উপযুক্ত শস্যচক্র অনুসরণ	৩	জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জিপসাম বা ক্যালসিয়াম সালফেট ব্যবহার করা
৪	কাঠের ছাই প্রয়োগ	৪	মাটির উপরিভাগে খড়কুটার মালচিং দ্বারা পানির বাষ্পীভবন রোধ করা।
৫	মাটিতে চুন প্রয়োগের একমাসের মধ্যে গোবর, খৈল, ইউরিয়া ব্যবহার না করা এবং বীজ/চারা রোপণ বা বপন না করা।	৫	জমির উপরিভাগের মাটি ৫-১০ সেমি. গভীর করে অপসারণ করা।

সারণি ও বিভিন্ন শাক-সবজির চাষ উপযোগী পিএইচ মানাঙ্ক

সবজির নাম		যে পিএইচ মানাঙ্কে সবজি জন্মানো সম্ভব	সর্বোত্তম পিএইচ মানাঙ্ক	মন্তব্য
১	বাঁধাকপি	৫.৮	৬.৫	কপিজাতীয় সবজির ক্লাবরট প্রতিরোধ হয় পিএইচ নিরপেক্ষ মানাঙ্কে বা তার উপরে থাকলে।
২	ফুলকপি	৫.৫-৬.৬	৬.২	
৩	ব্রকোলি	৫.৫-৬.৬	৬.২	
৪	চিনাবাঁধাকপি	৫.৫-৭.০	৬.৪	
৫	মটরশুটি	৫.৯-৭.২	৬.৫	
৬	ওলকপি	৫.৯-৭.২	৬.৫	
৭	টমেটো, মরিচ, মূলা, ডাঁটা, লালশাক, লাউ, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা	৫.৫-৭.৫	৬.৫	
৮	বেগুন, মিষ্টি আলু	৬.০-৭.৬	৬.৪	
৯	চালকুমড়া, গাজর, মুখীকচু, শিম, শশা, করলা, বরবটি	৫.৫-৭.৩	৬.৩	
১০	গোল আলু, শালগম, পেঁয়াজ, পালংশাক ভুট্টা, বীট, লেবু	৪.৬-৭.৪	৬.২	গোল আলুর স্ক্যাব রোগ পিএইচ মানাঙ্ক ৫.৫ বা নিরপেক্ষতার নিচে থাকলে প্রতিরোধ হয়।

২০২২

সারণি ঃ পিএইচ মানাঙ্ক সংশাধেনের জন্য চুন প্রয়োগর পরিমাণ

মাটির ধরন	বিভিন্ন পিএইচ মানাঙ্ককে নিরপেক্ষ করতে চুনের চাহিদা (কেজি/হেক্টর)						
	৫.২	৫.৪	৫.৬	৫.৮	৬.০	৬.২	৬.৪
বেলে দোঁআশ	৯৭৫	৮২৫	৬৭৫	৫২৫	৩৭৫	২২৫	৭৫
দোঁআশ	১৪৬২	১২৩৭	১০১২	৭৮৭	৫৬২	৩৩৭	১১২
এঁটেল দোঁআশ	২২৭৫	১৯২৫	১৫৭৫	১২২৫	৮৭৫	৫২৫	১৭৫

(গ) জৈবিক- মাটিতে অনেক প্রকার সুক্ষ্ম জীবাণু আছে। যথা- ব্যাকটেরিয়া, মোল্ড, ইষ্ট, প্রটোজোয়া এবং ফানজাই। এই সমস্ত জীবাণুসমূহের রাসায়নিক কার্যাবলির ফলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ অংশ পঁচে সারে রূপান্তরিত হয়। কতকগুলো ব্যাকটেরিয়া শিম বা ডালজাতীয় শস্যের শিকড়ে বাতাস হতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে জমা করে। কতকগুলো ব্যাকটেরিয়া এমোনিয়া এসিডকে এমোনিয়াতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। কিছু কিছু গাছপালা কেবল নাইট্রোজেন এমোনিয়া রূপে থাকলে তা গ্রহণ করতে পারে।

জমি তৈরিকরণ

জমি কর্ষণ ঃ সবজি চাষের জমি সমতল হওয়া বাঞ্চনীয়, যাতে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা হয়। চাষের পুর্বে অসমতল ভূমি ও পূর্ববর্তী ফসলের আইল, কেয়ারী, মাদা ইত্যাদি কেটে সমতল করে নিতে হয়। জো অবস্থায় পুনঃ পুনঃ চাষ ও মই দিয়ে ১৫-২০ সে.মি. গভীরতা পর্যন্ত মাটি ঢেলামুক্ত ও ঝুর ঝুরে করে তৈরি করতে হয়। এ কাজ কোদাল, মোল্ড বোর্ড প্লাউ বা রোটোভেটরের সাহায্যে সহজে করা যায়। জমি যত ভালোভাবে তৈরি হয়, গাছের শেকড় তত সহজে বিস্তার লাভ করে, অধিক খাদ্যোপাদান গ্রহণ করতে পারে এবং মাটির পানি ধারণ ও বায়ু চলাচল ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া মাটিতে স্বাভাবিক তাপ ও উষ্ণতা বজায় থাকে। অনিষ্টকারী কীট ও রোগ জীবাণু, আগাছা বিনষ্ট হয় এবং জীবাণুসমূহের বিশেষত নাইট্রোজেনযুক্তকারী ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি উত্তমরূপে তৈরি করা জমিতে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয়। রোপণকৃত চারার শেকড় সহজে লেগে যায়।

ভেজা অবস্থায় জমি চাষ দেয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে এঁটেল মাটি ভেজা অবস্থায় চাষ করলে এর ঢেলা ভাঙ্গা দূরুহ হয়ে পড়ে। দোঁ-আশ মাটি কিছু ভেজা অবস্থায় চাষ করা গেলেও মাটি শুকানোর পূর্বে মই দেয়া উচিত নয়। উল্লেখ্য যে, যেখানে চাষ করা জমি থেকে বৃষ্টি বা সেচের পর প্রায় ১৪% পানি বাষ্পীভূত হয়, সেখানে চাষহীন জমি হতে প্রায় ৮০% পানি বাষ্পীভূত হয়ে যায়। সুতরাং জমি তৈরির সাথে মাটির রস তাপ সংরক্ষণ ও সবজি আবাদের সাফল্য ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। জমি তৈরিকরণের সময় অর্থাৎ শেষ চাষের পূর্বে মৌল সার জমিতে ছিটিয়ে দিয়ে বীজ বপন বা চারা রোপণের জন্য জমি প্রস্তুত করতে হয়।

পানি সেচ ও নিকাশন নালা তৈরি- সবজির রকম, মৌসুম, প্রকৃতি ও আবাদ পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জমিতে প্রয়োজনীয় আইল ও নালা এমনভাবে তৈরি করতে হয় যেন পানি সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধা হয়।

কেয়ারী তৈরি- আধুনিক প্রথায় জমিতে কেয়ারী তৈরি করে সবজির চাষ করতে সুবিধা হয়। জমি চাষ করার পর রোপণ দূরত্বের সাথে সংগতি রেখে ১৫-২৫ সে.মি. চওড়া অগভীর নালা কেটে একে সরু লম্বা ফালিতে বিভক্ত করে কেয়ারী তৈরি করতে হয়। নালার মাটি দিয়ে দু'পাশের কেয়ারীগুলোকে ১০-১৫ সে.মি. উঁচু করা হয়। পরে কেয়ারীর মাটি পরিপাটি করে তাতে নিদৃষ্ট দূরত্বে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা হয় এবং নালাগুলো পানি সেচ, নিষ্কাশন বা ফসলের পরিচর্যামূলক কাজের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হয়। কেয়ারীতে দুই বা ততোধিক সারিতে সবজি আবাদ করা যায়। বর্ষা মৌসুমে কেয়ারী কিছুটা বেশি উঁচু হলে জলাবদ্ধতাজনিত কারণে শস্য বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কম থাকে।

মাদা তৈরি- শিম ও কুমড়া পরিবারের সবজির শেকড় এবং কাণ্ডের শাখা প্রশাখা চারিদিকে বেশি ছড়ায়। তাই সেগুলো আবাদের জন্য জমিতে যথেষ্ট ফাঁক ফাঁক করে গর্ত বা মাদা তৈরি করে বীজ বা চারা রোপণ করতে হয়। মাদা তৈরির জন্য সাধারণত: ৫০-৬০ সেমি. ব্যাস ও ৪০-৫০ সেমি. গভীর করে গর্ত খুড়তে হয় এবং এর মাটির সাথে মৌল সারের অর্ধেক পরিমাণ মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হয়। সার দেয়ার ৫-৭ দিন পরে গর্তের মাটি কুপিয়ে পরিপাটি করে বীজ বপন বা চারা রোপণের জন্য তৈরি করতে হয়। বর্ষাকালে মাদার উপরিভাগ আশপাশের মাটি থেকে কিছুটা উঁচু রাখতে হয়। অন্য সময়ে পানি সেচের সুবিধার্থে মাদার চারিদিকে জুলিকাটা ও জমিতে নালা করা আবশ্যক। জমি তৈরির সময়ে মৌল সারের অর্ধেক জমিতে ছিটিয়ে দিতে হয়।

জুলি তৈরি- বেডের বা মাদার চারিদিকে সেচ কাজের সুবিধার্থে যে অগভীর খাদ বা নালা কাটা হয় সেগুলোকে জুলি বলে। হাত কোদাল, পুরাতন লাঙ্গল বা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে জুলী কাটা যায়।

জমিতে সরাসরি বীজ বপন- অনেক রকমের সবজি যেমন- শাক, মূলা, সীম ও কুমড়া জাতীয় সবজির বীজ সরাসরি জমিতে বপন করে জন্মানো যায়। সরাসরি বীজ বপন করা সহজতর ও কম ব্যয়বহুল। এ প্রথায় জন্মানো গাছের শিকড় খাড়াভাবে মাটির গভীরে প্রবেশ করে। ফলে গাছের বৃদ্ধি ও জীবনকাল কিছুটা ত্বরান্বিত হয় এবং অপেক্ষাকৃত অধিক খরা সহ্য করতে পারে। তবে এ পদ্ধতিতে বীজ বেশি লাগে ও মূল জমি অধিক সময় আবদ্ধ থাকে। চারা অধিক এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে বলে প্রতিকূল অবস্থায় বিশেষ যত্নের ব্যাবস্থা করা বা অসময়ে আবাদের পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না।

বীজ বপনের সময়- স্থানীয় ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, বাজারের চাহিদা এবং জাতের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে বপনের সময় নির্ধারণ করতে হয় যেন সবজি জন্মানো এবং বিপণনে অসুবিধা না হয়। এক্ষেত্রে অধিক ফলনের চেয়ে অধিক মুনাফা লাভের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কেননা ভরা মৌসুমে ফলন বেশি হলেও দর কম থাকে বলে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়। পক্ষান্তরে অসময়ে অর্থাৎ আগাম বা নাবি মৌসুমে ফলন কম পাওয়া সত্বেও বাজার দর ভাল পাওয়া যায় ও অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি- সবজির ধরন, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, আবহাওয়া ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে সবজি বীজ রোপণ বা বপন পদ্ধতিসমূহকে ৪টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

ক) ছিটিয়ে বীজ বপন- মাটির উপরে বীজ ছিটিয়ে দিয়ে লাংগলের বা আঁচড়ার সাহায্যে হাল্কা চাষ বা কোদালে কোপানো বা অন্য কোন উপায়ে তা মাটির সহিত মিশিয়ে দেওয়ার পদ্ধতিকে ছিটিয়ে বীজ বপন বলে। বাংলাদেশের সর্বত্র এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। আসলে এ পদ্ধতি ভালো নয়। এতে জমির ২০২২

সর্বত্র একই গভীরতায় ও সমান ঘনত্বে বীজ বপন করা যায় না। ফলে বীজের অঙ্কুরণ, গাছের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিতে অসমতার সৃষ্টি হয় ও ফলন হ্রাস পায়। এ প্রথায় বীজ বেশি লাগে ও পরবর্তী পরিচর্যায় বা যান্ত্রিক প্রযুক্তি অনুসরণে অসুবিধা হয়।

খ) সারিতে বীজ বপন- জমি ও কেয়ারীর উপরে জুলি তৈরি করে লাইনে বীজ বপনের পদ্ধতিকে সারিতে বীজ বপন বলে। সীড ড্রিল বা অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে সহজে সারিতে বীজ বপন করা যায়। বাংলাদেশে এ পদ্ধতি আস্তে আস্তে বৃদ্ধি লাভ করছে। ছিটিয়ে বপন পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি বহুগুণে শ্রেয় ও ফলন বৃদ্ধির সহায়ক। এ প্রথায় ছিটিয়ে বোনার অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ বীজ লাগে, সমগভীরতায় বীজ বপন হয় ও সমদূরত্বে। গাছ রাখা হয়। পরবর্তী পরিচর্যা ও যান্ত্রিক চাষাবাদে বিশেষ সুবিধা হয় ও খরচ কম লাগে। তবে কায়িক শ্রমে বীজ বপন করতে সময় ও খরচ বেশি লাগে এবং দক্ষতার সাথে তা অনুশীলন করতে হয়। জমিতে বা কেয়ারীর উপরে এক সারি, জোড়া সারি বা বহু সারি প্রথায় বীজ বপন করা চলে। মূলা, ঢেঁড়শ, গাজর, বরবটি, ফ্রেঞ্চবীন ইত্যাদি জোড়া সারি প্রথায় আর শাকজাতীয় শস্য এক সারি বা বহুসারি প্রথায় আবাদ করা উত্তম। তাছাড়া সারিতে বীজ হতে বীজের মধ্যে দূরত্ব না রেখে শাকজাতীয় সবজি এবং সুনির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে ঢেঁড়শ, বরবটি, মূলা ইত্যাদির বীজ বপন করা উচিত।

গ) মাদায় বীজ বপন- মাদা তৈরি করে বীজ বপন করার পদ্ধতিকে মাদায় বীজ বপন বলে। সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকার কুমড়া, শিম ইত্যাদির বীজ এ প্রথায় রোপণ করা হয়। মাদায় বপনের বীজ আকারে বড় ও গাছ লতানো প্রকৃতির হয়ে থাকে। প্রতি মাদায় পরস্পর বীজ থেকে ৮-১০ সে.মি. দূরত্বে ৫-৬টি বীজ বপন করতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রতি মাদায় ২-৩ টি সুস্থ ও বলিষ্ঠ চারা রেখে বাকীগুলো কেটে ফেলতে হয়।

চিত্র ঃ মাদায় বীজ বপন

(ঘ) খুবরীতে বীজ বপন- অনেকটা মাদায় বীজ বপনের মত। তবে এখানে মাদা তৈরি করে নেওয়া হয় না। জমিতে বীজ বপনের সময়ে মাটিতে খুবরী বা গর্ত করা হয় ও সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সবজি/শস্যের বীজ ঐ খুবরীতে দেয়া হয়। পাহাড়ি অঞ্চলের জুম প্রথা অনেকটা এর অনুরূপ। এতে বীজ কম লাগে, পরিচর্যা করতে সুবিধা হয় এবং কম রসে চারা গজাতে পারে ও ফসলের সমরূপতা বজায় থাকে।

বীজ বপনের গভীরতা- সরাসরি মাটির বেশি গভীরে বীজ বুনলে গজাতে অসুবিধা হয় ও বেশি সময় লাগে। পক্ষান্তরে গভীরতা কম হলে রসের অভাবে বীজ গজাতে পারে না বা চারা অবস্থায় বেশি বৃষ্টিতে গোড়ার মাটি সরে গিয়ে চারা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মোটামুটিভাবে ক্ষুদ্রাকৃতির বীজ বীজতলায় ১-১.৫ সে.মি. ও মূল জমিতে ১.৫-২ সে.মি. এবং বৃহদাকৃতির বীজ ৩-৫ সে.মি. গভীরে বপন করা উচিত। বীজের নিজ পুরুত্বের ৩-৪ গুণ গভীরে বপন করলেও সমভাবে গজাতে পারে ও ফসলে সমরূপতা বজায় থাকে।

বীজের অঙ্কুরণ- অঙ্কুরণের জন্য সব ধরনের বীজের উপযোগী তাপমাত্রা ও পারিপার্শ্বিকতা এক রকম নয়। যে সব সবজি উচ্চ তাপমাত্রায় জন্মে সাধারণত সেগুলোর বীজ অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায় অঙ্কুরিত হয়। তাই শশা, তরমুজ, ঢেঁড়স, পুঁইশাক ইত্যাদি সবজির বীজ নিম্ন তাপমাত্রায় সহজে অঙ্কুরিত হয় না। অপরদিকে যে সব বীজের বীজত্বক পুরু সেগুলোর ত্বক ফাটানোর উপযাগী ব্যবস্থা না নিলে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয় না। মাটিতে রসের আধিক্যে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাবেও বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

সবজি চাষে সারের চাহিদা নিরূপণ- চাষের পূর্বে সবজির সারের চাহিদা নিরূপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সবজির চাহিদা মোতাবেক সঠিক পরিমাণ অপেক্ষা কম সার ব্যবহার করলে ফলন কমে যাবে। অন্যদিকে বেশি সার ব্যবহারে সারের অপচয় হবে, খরচ বেড়ে যাবে, ফসলের গুণাবলি ও জমির উর্বরতা নষ্ট হবে। সবজির সারের চাহিদা সঠিকভাবে জানতে হলে চাষাবাদের পূর্বে মাটিতে কতটুকু খাদ্যোপাদান আছে পরীক্ষা করা উচিত। মাটিতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম উপাদান থাকলে তা প্রয়োগের মাধ্যমে পূরণ করে দিতে হবে। ফসল সংগ্রহের পর আবার পরীক্ষা করে জানা যাবে যে উক্ত ফসল জমি হতে কতটুকু বিভিন্ন খাদ্যোপাদান শোষণ করেছে। শোষণকৃত পরিমাণই হলো উক্ত ফসলের সারের চাহিদা। তবে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে কতগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন-(১) ফসলের খাদ্যোপাদান চাহিদা ও পরিশোষণ ক্ষমতা (২) ভূমির উর্বরতা (৩) মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক অবস্থা (৪) আবাদ পদ্ধতি ও মৌসুম (৫) সারের গুণাবলি এবং (৬) সার ও ফসলের মূল্যের অনুপাত। মাটিতে কোন একটি খাদ্যোপাদানের ঘাটতি থাকলে এবং অন্যান্য খাদ্যোপাদানের পরিমাণ বেশি থাকলেও গাছ সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তাই ফসলের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করে কৃত্রিম উপায়ে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন হয়। কোন ফসলের প্রয়োজনীয় সব খাদ্যোপাদানের উপযুক্ত মাত্রাকে একত্রে সুষম মাত্রা বলে। যেখানে মাটি পরীক্ষার সুযোগ নেই সেখানে সবজির সারের চাহিদা নিরূপণ করতে হয় এর আহারাপেযোগী অংশ বিবেচনা করে। যেমন, পাতাজাতীয় সবজি প্রধানত নাইট্রোজেন, ফুল ও ফলজাতীয় সবজি ফসফরাস এবং মূলজাতীয় সবজি পটাশ সার বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে থাকে। তাই আহারপযোগী অংশের কথা খেয়াল রেখে সবজির সারের চাহিদা ঠিক করতে হবে। এছাড়া সবজি চাষের মেয়াদ বিবেচনা করেও সারের চাহিদা ঠিক করা যেতে পারে। স্বল্প মেয়াদি সবজির বেলায় বেশি মেয়াদি সবজির চেয়ে কম পরিমাণ সারের প্রয়োজন হবে।

সারের চাহিদা পূরণের জন্য রাসায়নিক সারের ওপর পুরোপণরি নির্ভর না করে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। সবজির প্রধান খাদ্যোপাদানগুলোর মোট চাহিদার অন্তত ১০-২৫ ভাগ জৈব সার হতে আসা উচিত। বিভিন্ন সবজির খাদ্যোপাদান চাহিদা সারণিতে দেয়া হলো।

২০২২

সারণি ও বিভিন্ন সবজির খাদ্যোপাদান পরিশাষেনের পরিমাণ (জাপানী মিঃ ইয়ামা জাকির ফলাফল ১৯৫৮)।

সবজির নাম	ফলন	মোট খাদ্যোপাদান পরিশোষণ (কেজি একরে)			কখন বেশি পরিশোষণ করে
	টন/একর	নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ	ফসল তোলার পূর্বের ৪০দিন
ফুলকপি	৩.৭	৫৪	২৫	৫০	মাথা বাঁধা ফুল হওয়া শুরু থেকে ৩০ দিন
বাঁধাকপি	১২.০	৬৫	২৫	৮৮	-ঐ-
চিনাবাঁধাকপি	২০.০	৫০	২৩	৬০	-ঐ-
বেগুন	১৮.৫	৭০	১৮	১৩০	ফল ধরা শুরু থেকে ৭০ দিন
টমেটো	১৮.৫	৫৫	৯	১০৫	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
শালগম	৭.৪	৩০	১২	৪০	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন
মুলা	২০.০	৫০	১৪	৫৪	ফসল তোলার পূর্বের ৪৫ দিন
গাজর	৫.৫	৪৫	২৩	৫৪	-ঐ-
গোলআলু	৭.৪	৩২	১৫	৪০	-ঐ-
মিষ্টি আলু	৭.৪	৩৫	১২	৮৫	-ঐ-
শিম	৪.৪	৫২	২২	৫০	ফসল তোলা শুরুর পুর্বের ৩০ দিন
মটরশুটি	২.৭	৫০	১৮	৩৬	-ঐ-
শশা	১৮.৫	৩০	২২	৭০	ফল ধরার শুরু থেকে ৩০ দিন
পেঁয়াজ	৮.১	১৪	৭	২০	ফসল তোলার পূর্বের ৪৫ দিন
পালংশাক	৬.৮	৪০	১৪	৩৩	ফসল তোলার পূর্বের ৩০ দিন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি– সবজি চাষে সার প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সারের প্রয়োগ পদ্ধতি নিম্নোক্ত কারণে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যথা- (১) মাটির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থা ২) আবহাওয়া ৩) সারের প্রকার ও গুণাবলি ৫) ফসলের প্রকার পাতা, দানা বা ফুলজাতীয় ইত্যাদি) ৬) শেকড়ের প্রকৃতি ও খাদ্যোপাদান গ্রহণ ক্ষমতা ৭) ফসলের সময়কাল ৮) সারের ধরন ইত্যাদি। সারের প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর সারের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুষ্ঠুভাবে উপযুক্ত পরিবেশে শেকড়ের নাগালের মধ্যে সার প্রয়োগ করা হলে ফসল পুরোপরি তা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া সার মাটিতে আবদ্ধ হয়ে পানিতে ধুয়ে বা বাতাসে উড়ে বিনষ্ট হতে পারে। সার প্রয়োগের পদ্ধতি ও সময়কে বিবেচনা করে সার প্রয়োগ কার্যক্রমকে চারভাগে ভাগ করা হলো। যথা- (ক) মৌল (খ) উপরি (গ) পাতায় ও (ঘ) বিশেষ প্রয়োগ।

(ক) মৌল প্রয়োগ- জমিতে বীজ বপন বা চারা রোপণের পূর্বে সার প্রয়োগ করাকে মৌল প্রয়োগ বলা হয়। যে সব সার ধীরে ধীরে দ্রবণীয় বা গাছের গ্রহণ উপযোগী হয় এবং সহজে বিনষ্ট হয় না সেগুলো মৌল হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন জৈব সার, চুন, ফসফরাস, জিপসাম ইত্যাদি প্রায় পুরোপরি মৌল হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। আবার পটাশ, জিংক, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মাটির ও ফসলের প্রকারভেদে ২৫-৫০ ভাগ মৌল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে দ্রবণীয় সার আগাম প্রয়োগ করা হলে ফসলের প্রয়োজনের সময়ে পরিশোষণের উপযোগী সারের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে বীজ বা চারার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

২০২২

(১) ছিটিয়ে প্রয়োগ- এ ক্ষেত্রে জমি চাষের পর সমস্ত জমিতে সার ছিটিয়ে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। এ পদ্ধতি খুবই সহজ, কম শ্রম ও স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ এবং সময়ও কম লাগে। গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধিকালীন সময়ে উপরি প্রয়োগ বা পার্শ্ব প্রয়োগের মাধ্যমেও সার ছিটিয়ে দেয়া হয়। ছিটিয়ে দেয়া পদ্ধতিতে সার গাছের নাগালের বাইরে চলে যায় এতে অপচয় হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ঝড়ো বাতাসের সময় বিশেষ করে গুড়ো সার প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক এবং অপচয় হয়। অনুর্বর, সেচবিহীন এবং পাতলা চারা সম্পন্ন ফসলের জমিতে এ পদ্ধতি একবারেই উপযোগী নয়। ফসলের অঙ্গজ বৃদ্ধির সময় সার ছিটিয়ে উপরি প্রয়োগ করা হলে গাছের পাতা জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চিত্র ঃ সার ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া

স্বল্প মেয়াদি ও ঘন করে ছিটিয়ে বোনা শাক সবজির জমিতে দ্রুত দ্রবণীয় ও পরিচালনশীল সার ছিটিয়ে যৌল হিসেবে প্রয়োগ করতে হয়।

(২) স্থানীয় প্রয়োগ- অনুর্বর জমিতে এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী এবং কম সার ব্যবহার করে বেশি ফলন পাওয়া যায়। বীজের কাছাকাছি সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশে ও গভীরতায় যথাক্রমে ৮ সে.মি. দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। আর গাছের বেলায় শেকড়ের বিস্তৃতি লক্ষ করে সার প্রয়োগ করা উচিত। যৌল সারের অর্ধেক ছিটিয়ে এবং বাকী অর্ধেক সারি বা শেকড়ের কাছে প্রয়োগ করা উত্তম। নিচে সার প্রয়োগের কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

(১) চারার গর্তে প্রয়োগ- সবজির চারা রোপণের পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে মাটির সাথে যৌল সারের অর্ধেক মিশিয়ে দিতে হয়। যথা- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকোলী, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি।

(২) মাদায় প্রয়োগ- ফলজাতীয় সবজির বীজ বা চারার জমিতে নির্দিষ্ট স্থানে মাদা বা থালা তৈরি করে লাগানো হয়। চারা লাগানোর পূর্বে মাদায় যৌল সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যথা-কুমড়াজাতীয়, লাউ, শসা, চিচিঙ্গা, পেঁপে, কলা ইত্যাদি।

(৩) লাঙ্গল স্তরে প্রয়োগ- জমি তৈরি শেষে লাঙ্গলের সাহায্যে অগভীর জুলি বা নালা তৈরি করে তাতে যৌল সার প্রয়োগ করা হয়। পরে মই দিয়ে জমি সমান করে দিয়ে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা হয়। বীজ বা চারার শেকড় বাড়ার পর প্রয়োগকৃত সার শেকড়ের সাহায্যে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে।

চিত্র ঃ লাঙ্গল স্তরে সার প্রয়োগ ও মই দিয়ে ঢেকে দেয়া

২০২২

(ঙ) বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ- এ পদ্ধতিতে বীজ ও সার একত্রে বীজ বপনযন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। এ প্রথায় বীজের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই একত্রে বীজ ও সার ড্রিল বা বপন না করাই ভালো।

(খ) উপরি প্রয়োগ- জমিতে বীজ বপন বা চারা রোপণের পরে সার প্রয়োগ করা হলে তাকে উপরি প্রয়োগ বলে। সাধারণত নাইট্রোজেন, পটাশ, ছাই, দস্তা, তরল গোবর ইত্যাদি সার জমিতে উপরি প্রয়োগ করা হয়। সারের মাত্রা বেশি হলে গাছের পাতায়, কাণ্ডে বা মূলে সরাসরি লেগে ফসলের ক্ষতি হয়। তবে শস্যের অবস্থা বুঝে সার প্রয়োগ করা হলে সারের অপচয় কম হবে। সবজি চাষে এ পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিচে উপরি প্রয়োগের কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

১। ছিটিয়ে উপরি প্রয়োগ- ছিটিয়ে বোনা সবজির জন্য নাইট্রোজেন ও পটাশজাতীয় সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা বেশ সহজ। মাটিতে রসের অভাব থাকলে উপরি প্রয়োগে সারের সুফল কম পাওয়া যায়। মূলা, ডাটা, লালশাক, পালংশাক ইত্যাদি সবজিতে উপরি প্রয়োগ হিসেবে সার ছিটিয়ে দেয়া হয়।

২। পার্শ্বপ্রয়োগ- সারি পদ্ধতিতে আবাদ করা সবজির পাশে লাইন টেনে তাতে সার প্রয়োগ করা যায়। যথা : ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ, গোলআলু, টমেটো, শসা, মুখীকচু। কোন কোন ক্ষেত্রে মূলা, পালংশাক ইত্যাদি সার প্রয়োগের পর ফসলের চাহিদানুযায়ী গোড়ায় মাটি তুলে সার ঢেকে দেয়া হয়। এ পদ্ধতি সবজি চাষের জন্য উপযোগী। ফসলের সারির দুদিকে একবারে সার না দিয়ে পর্যায়ক্রমে দু'দিকে দু'বারে সার দেয়া উত্তম। একে ব্যান্ড প্রয়োগ পদ্ধতিও বলা হয়।

৩। চারার/ গাছের চারপাশে প্রয়োগ- মাদায় লাগানো গাছের চারপাশে শিকড় থেকে নিরাপদ দূরত্বে রিং করে নালা কাটা হয়। এক্ষেত্রে নালায় সার প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। যথা-লাউ, শিম, কুমড়াজাতীয়, শসা, কলা, পেঁপে ইত্যাদি।

৪। কাদার গোলক প্রয়োগ- এ পদ্ধতিতে কাদামাটি দিয়ে দলা বা গোলক তৈরি করা হয়। মাটির গোলকের কেন্দ্রে সামান্য পরিমাণ ফাঁকা করে নাইট্রোজেন সার দিয়ে গোলকটি আঁটিকে ভালোভাবে শুকানো হয়। সাধারণত ১৪:১০ অনুপাত নাইট্রোজেন সার ও কাদামাটি দিয়ে গোলক তৈরি করা উত্তম। এ পদ্ধতিতে প্রয়োগকৃত সার অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে দেড়গুণ বেশি পরিমাণে গাছ গ্রহণ করতে পারে।

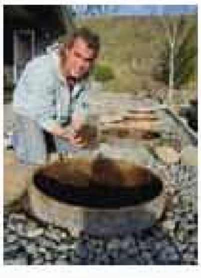

চিত্র ঃ কাদার গোলকে সার প্রয়োগ

চিত্র ঃ মাটিতে সার প্রবিষ্টকরণ

৬। প্রবিষ্টকরণ- এ পদ্ধতিতে তরল বা দানাজাতীয় সার সিরিঞ্জের মত যন্ত্রে চাপ প্রয়োগ করে মাটির অভ্যন্তরে দেয়া হয়। এতে মাটির বিভিন্নস্তরে এবং গাছের শিকড়ের কাছাকাছি সার প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। এ পদ্ধতিতে সারের অপচয় হয় না। উন্নত দেশে এ পদ্ধতি বহু বছর আগে হতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(গ) পাতায় প্রয়োগ বিশেষ ক্ষেত্রে সারের দ্রবণ তৈরি করে সিঞ্চনের মাধ্যমে গাছের পাতায় প্রয়োগ করা হয়। এতে নির্দিষ্ট অনুপাতে দ্রবীভূত সার সিঞ্চন যন্ত্রে বা হেলিকপ্টারের সাহায্যে গাছের পাতায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।. দ্রবণকৃত সার সব সময় পাতার কোষের রসের ঘনত্বের চেয়ে কম হওয়া দরকার। অন্যথা পাতা পুড়ে যাবে। এ পদ্ধতিতে যে কোন মুখ্য উপাদানের অর্ধেক ও গৌণ উপাদানের প্রায় সবটুকু সার পাতায় প্রয়োগ করা চলে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ জাতীয় সার অধিক পরিমাণে লাগে বিধায় শুধু পাতায় প্রয়োগ করে গাছের চাহিদা মেটানো খুব দুরূহ। তবে গৌণ উপাদানের প্রকৃতি অনুপাতে দ্রবণ তৈরি করে পাতায় স্প্রে করে গাছের চাহিদা পূরণ করা যায়। সারের দ্রবণ তৈরির নিয়ম নিচে দেয়া হলো।

সারণি ও বিভিন্ন সারের দ্রবণ তৈরির বিবরণ

উপাদান	কী আকারে পাওয়া যায়	প্রতি লিটার পানিতে মেশানোর পরিমাণ (গ্রাম)	
লৌহ	ফেরাস সালফেট	২.৫	৩.৫
ম্যাংগানিজ	ম্যাংগানিজ সালফেট	২.৫	৫.০
কপার	কপার সালফেট	২.৫	৫.০
জিংক	জিংক সালফেট	২.৫	৫.০
বোরন	সোডিয়াম বোরেট	২.৫	৬.০
মলিবডিনাম	এমোনিয়াম মলিবডেট, সোডিয়াম মলিবডেট	০.৩	০.৮

এছাড়া-১-১.৫ ভাগ ইউরিয়া সারের দ্রবণ তৈরি করে সবজি ও অন্যান্য ফসলের পাতায় বিকালে প্রয়োগ করা যায়। পাতাজাতীয় সবজিতে পাতায় প্রয়োগে সবজি তাড়াতাড়ি সবুজ ও সতেজ হয়। বয়স্ক পাতা ও পাতার বাহিরের পিঠের পরিশোষণ ক্ষমতা বেশি। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলেই প্রথমে পাতায় সার সিঞ্চন করা যায়। বর্ষজীবি ফসলে তার জীবনকালে ৩-৪ বার সিঞ্চন করা চলে। গোবর, খৈল ইত্যাদি জৈব সার ভালভাবে পচায়ে তরলাকারে পাতায় প্রয়োগ করা যায়। এ পদ্ধতিতে অপচয় কম হয় ও গাছে দ্রুত পরিশোষিত হয়। ফসলের জমিতে পানি পরিপূর্ণ থাকলে এবং মাটিতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এ পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা যায়। তবে মুখ্য খাদ্যোপাদানের চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ করা যায় না। সার প্রয়োগের পর পরই বৃষ্টি হলে সার ধুয়ে যায়। তাই মেঘলা আবহাওয়ায় বা বৃষ্টির পূর্বে সার দেওয়া উচিত নয়। যে সব ফসলের পাতা মোমযুক্ত সেক্ষেত্রে পাতায় সার প্রয়োগে কোন সুফল পাওয়া যায় না। এরূপক্ষেত্রে ফসলে দ্রবণের সাথে আঠালো পদার্থ (টুইন-২০) মিশিয়ে স্প্রে করা উত্তম।

চিত্র ঃ সিঞ্চন পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ

চিত্র ঃ সেচের পানির সাথে সার প্রয়োগ পদ্ধতি

(ঘ) বিশেষ প্রয়োগ

(১) সেচের পানির সাথে- এ পদ্ধতিতে সেচের পানির সাথে সার মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। সমতল

জমিতে সমস্ত জমিতে সমভাবে ও সম উচ্চতায় পানি পৌছালে সবগাছ সমানভাবে সার পরিশোষণ করতে পারে।

(২) বুস্টার বা স্টার্টার দ্রবণ প্রয়োগ- চারার চাহিদা পূরণ ও বৃদ্ধি দ্রুত করার জন্য মূখ্য উপাদানসমূহের দ্রবণ চারার গোড়ায় সিঞ্চন করা হয়। মূখ্য উপাদান ৩টি যথা-নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ। এগুলোকে একত্রে বা পৃথকভাবে পানিতে গুলিয়ে ১ঃ৫ঃ২ অনুপাতে চারার গাড়ায় সিঞ্চন করাকে স্টার্টার প্রয়োগ বলে। সাধারণত এন.পি.কে ১ঃ৫ঃ২ অনুপাতের দ্রবণ তৈরির জন্য ডাই এমোনিয়াম ফসফেট ও মনোপটাশিয়াম মিশ্রণ সমানুপাতিকভাবে গুলিয়ে নিতে হয়। প্রতি গ্যালন পানিতে এক আউন্স বা প্রতি লিটার পানিতে ৬ গ্রাম দ্রবীভূত করলে এই দ্রবণ (এনপিকে) তৈরি হয়।

(৩) বায়বীয় আকারে প্রয়োগ- বায়ুতে সাধারণত ০.০৩ ভাগ কার্বন ডাই অক্সাইড বিদ্যমান। বাতাসে এর পরিমাণ বাড়ানো গেলে গাছের সালাকেসংশ্লেষণের পরিমাণ বেড়ে যাবে। ফলে ফসলের ফলন ও গুণগতমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং গাছের জীবনকাল কমে যাবে। তাই ফলন বাড়ানোর জন্য অনেক দেশে গ্রীণ হাউজে ও খোলা মাঠেও কার্বন ডাই অক্সাইড বা এমোনিয়াম প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সার প্রয়োগের সময়- ফসলের দৈহিক বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যোপাদানের চাহিদা বিভিন্ন রকম হয়। চারা অবস্থায় খাদ্যোপাদানের চাহিদা কম এবং বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে চাহিদা বাড়তে থাকে। গাছের দৈহিক বৃদ্ধি, শাখা প্রশাখা, মূল ইত্যাদি অপেক্ষা ফুল ও ফল ধারণকালে চাহিদা সবচেয়ে বেশি হয় এবং সময়ে চাহিদা কমে যায়। সার ভালোভাবে কাজে লাগার জন্য নিচের বিষয়গুলো বিশেষভাবে দায়ী। যথা-
১। গাছের বিভিন্ন খাদ্যোপাদান মাটিতে ধরে রাখার ক্ষমতা। ২। সারের মাত্রা। ৩। সারের দ্রবীভূত ক্ষমতা।
৪। সারের গুণাবলি। ৫। মাটিতে তাপমাত্রা, সারের প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি। ৬। মাটিতে রসের পরিমাণ।

সার ব্যবহারের কয়েকটি সাধারণ নিয়মাবলি নিচে দেয়া হলো। যথা-

(১) সব ধরনের জৈব (গোবর, আবর্জনা পঁচা ও সবুজ সার), ফসফরাস পুরোপুরি এবং পটাশ সারের অর্ধেক মাত্রা জমি তৈরির সময় দিতে হয়। সার প্রয়োগ করে মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

(২) সেচবিহীন ও শুকনো জমিতে সব ধরনের জৈব ও অজৈব সার পূর্ণমাত্রায় বীজ বপনের পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়।

(৩) মাদায় রোপণযোগ্য (লাউ, কুমড়াজাতীয়, শিম, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি) সবজির জন্য ফসফরাস ও জৈব সার পুরোপুরি বীজ বপন বা চারা রোপণের পূর্বে মাদায় মৌল হিসেবে প্রয়োগ করতে হয়। পটাশ ও নাইট্রোজেনযুক্ত সার পরবর্তীতে বারে বারে উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

(৪) বহুবর্ষজীবি ফসলে বর্ষা মৌসুমের শুরুতে ও বর্ষার শেষ দিকে মোট ২ বারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

(৫) স্বল্পমেয়াদী শাকসবজিতে নাইট্রোজেন ব্যতিত সব সারই মৌল হিসেবে এবং নাইট্রোজেন সার কয়েক কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

বিভিন্ন শাক-সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, শশা, মূলা, বেগুন, মরিচ, টমেটো, গাজর ইত্যাদি বৃদ্ধির কোন পর্যায়ে কী পরিমাণ খাদ্যোপাদান প্রয়োজন তা সারণিতে ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। ২-৩ বারে সারের উপরি প্রয়োগ করলে বেশি সুফল পাওয়া যায় এবং অপচয়ও কম হয়।

সার প্রয়োগের সাবধানতা- সার প্রয়োগের জন্য নিচের সাবধানতাগুলো মেনে চলা উচিত। যেমন-

(১) ঝড়ো বাতাসের সময় বা ফসলের পাতা ভেজা অবস্থায় সার উপরি প্রয়োগ করা উচিত নয়। এতে ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

(২) কাঁচা গোবর, খৈল, চুন, হাঁড়ের গুড়ো ইত্যাদি দন্ডায়মান ফসলে প্রয়োগ করা উচিত নয়। কাঁচা সার জমিতে প্রয়োগ করা হলে তার প্রায় একমাস পরে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা উচিত।

(৩) জমিতে শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহার করে তেমন সুফল পাওয়া যায় না। তাই রাসায়নিক সার ও জৈব সার সুষম মাত্রায় প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বজায় রাখতে হবে।
(৪) সমতল জমিতে সমভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে।
(৫) জমির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের সাথে মিল রেখে সার প্রয়োগ করা উচিত।
(৬) বিভিন্ন ধরনের সার একত্রে মেশানোর পুর্বে সেগুলোর রাসায়নিক বিক্রিয়া জেনে তারপর মেশাতে হবে।
(৭) বৃষ্টি ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বা জমিতে পাবন পদ্ধতিতে সেচ দিলে হলে সে সময় সার প্রয়োগ করা উচিত নয়।
(৮) প্রখর রোদের সময় বিশেষ করে নাইট্রোজেনযুক্ত সার ছিটালে বেশির ভাগই নষ্ট হতে পারে।

পানি সেচ ও নিকাশ

পানির অপর নাম জীবন। এ কথাটি প্রাণি ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। পানি মাটির খাদ্যোপাদানসমূহকে দ্রবীভূত করে গাছের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে থাকে। গাছের অঙ্গার আত্মীকরণ, শস্যের সজীবতা রক্ষা, প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সরবরাহ প্রভৃতি কাজে পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাটিতে পর্যাপ্ত রসের অভাবে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আবার জলাবদ্ধতা ঘটলে উদ্ভিদের শ্বাস প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সুতরাং সবজি চাষে সাফল্য লাভের জন্য পানি সেচ ও নিকাশের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টি অত্যধিক হলেও বারো মাসে সমানভাবে হয় না। বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত অতিবৃষ্টি, আর কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত অনাবৃষ্টির কারণে সবজি চাষে অসুবিধা হয়। তাই সেচ ও নিকাশ সুবিধাযুক্ত জমি সবজি চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। পানি সেচ ও নিকাশ সুবিধার জন্য জমি কয়েকটি সুবিধাজনক খন্ডে বিভক্ত করে নিতে হয়। এরপর সবজির ধরন, মৌসুম ও আবাদ পদ্ধতির ওপর লক্ষ রেখে জমিতে প্রয়োজনীয় আইল ও নালা তৈরি করতে হয়।

চিত্র ঃ সেচের জন্য জমি বিভক্তিকরণ

বিভিন্ন সবজির পানির চাহিদাসব ধরনের সবজির পানির চাহিদা এক রকম নয়। তাছাড়া একই সবজির জীবন-চক্রের বিভিন্ন স্তরে পানির চাহিদাও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। নিচের সারণিতে সবজির জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে পানির চাহিদার তারতম্য দেখানো হলো।

সারণি ঃ সাধারণভাবে সবজির জীবনচক্রের বিভিন্ন তুরে পানির চাহিদা

জীবনচক্রের স্তর	প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ
বীজের অঙ্কুরোদগম	বীজের ওজনের ৬০-১০০%
অঙ্কুরোদগমের অব্যবহিত পর	মাটির ধারণ ক্ষমতার ৯০%
চারা অবস্থায়	মাটির ধারণ ক্ষমতার ৮০-৯০%
চারা স্থানান্তরের পূর্বে কিছুদিন	মাটির ধারণ ক্ষমতার ৬০-৭০%
চারা রোপণের পর	মাটির ধারণ ক্ষমতার ৮০%
অঙ্গবৃদ্ধি ও ফুল ফল ধারণকালে	মাটির ধারণ ক্ষমতার ৫০-৮০%
মূল জাতীয় সবজি সংগ্রহের কিছুদিন পূর্বে	মাটির ধারণ ক্ষমতার ৪০-৫০%
বীজ পরিপক্কতা লাভের শেষ পর্যায়ে	মাটির ধারণ ক্ষমতার ৫০-৬০%

এই তথ্যের ভিত্তিতে জমিতে সেচ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। পাতাজাতীয় সবজি (লেটুস, পালংশাক, পুঁই শাক) ও কপি গোত্রের সবজির পানির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এগুলোর শেকড় মাটির বেশি গভীরে প্রবেশ করে না বিধায় বেশি পরিমাণে ও ঘন ঘন সেচ দিতে হয়। পেঁয়াজ, মরিচ, বেগুন, শশা এবং টমেটোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানির প্রয়োজন। গোল আলু, মূলা প্রভৃতির জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন থাকলেও নিয়ন্ত্রিতভাবে সেচ দিতে হয়। সেচের দ্বারা বা বৃষ্টির কারণে পানিবদ্ধতা ঘটলে সেঁকড় ও ফসল পচে বিনষ্ট হতে পারে। অপরদিকে শিমজাতীয়, কুমড়া ও অন্যান্য বহুবর্ষজীবি সবজি পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত সেচে ভাল ফলন দেয়।

সবজি চাষে সেচের মাধ্যমে কী ধরনের পানি দিতে হবে তাও জানা দরকার। কেননা সেচের পানির সাথে ফসলের ক্ষতিকর রোগ জীবাণু বা উপাদান যেতে পারে। বীজতলায় বীজ গজানোর বা সবজি রোপণের পর পরই যে সেচ দেওয়া হয় তা লবণমুক্ত হতে হবে। পুকুর, নদী বা খালের পানিতে নানা ধরনের আগাছা ও কলকারখানার বর্জ্য মিশে সেচের অনুপযোগী হতে পারে। তাই সেচের পানিতে সেচের ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

১। পুকুর, নদী বা খালের পানি সেচ দেওয়ার সময় ছেঁকে নিতে পারলে ভালো।
২। পানির উৎসের পাশে ট্যাঙ্ক স্থাপন করে বালির ফিল্টার করে তা সেচে ব্যবহার করা।
৩। সবজির চারা অবস্থায় ০.৫ মিলিগ্রাম ক্লোরিন প্রতি এক লিটার পানিতে মেশায়ে সেচ দেয়া যায়। তাতে অনেক রোগের জীবাণু মারা যায় ও শেওলা দমন হয়।
৪। গভীর বা অগভীর নলকুপের পানি কোন পুকুর বা ট্যাংকে জমা রেখে তারপর সেচে দেওয়া ভালো। বর্তমানে খাল, নালা, ডোবা ইত্যাদি জলাশয়ের পানি যেভাবে দূষিত হচ্ছে তাতে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সেচের সঠিক সময় নির্ণয়- সেচ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মাটিকে সরস রাখা, যাতে ফসলের ভালো ফলন নিশ্চিত হয়। শাক সবজির (পানি কচু ব্যতিত) বেলায় জমির সরস অবস্থার (FC) একটু নিচেই পানির মাত্রা গিয়ে যখন পৌছে তখনই সেচের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ অবস্থা কখন হবে তা খালি চোখে দেখে বোঝা যায় না। এজন্যে মাটির রস মেপে দেখতে হয়। হাতের সাহায্যে মাটির রস মাপার সহজ পদ্ধতি নিচে ছবিতে দেখানো হলো। সবজি চাষে সেচ সময় নির্ধারণের সাধারণ বিবেচ্য বিষয়গুলো। যথা-

চারা গজানোর পর থেকে ফুল ধরা পর্যন্ত সবজির পানির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। তাই গাছের বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে কখন এবং কতবার সেচ দিতে হবে তা ঠিক করে নিতে হয়। সাধারণত বৃষ্টি না হলে সবজির ফুল আসা অবধি প্রতি ১০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেওয়া যেতে পারে। (১) বেলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা খুব কম। এ জাতীয় মাটিতে ঘন ঘন সেচ দিতে হবে।

২০২২

(২) জমিতে পানির অভাব হলে মাটির রং হালকা ধরনের হয়। তাই মাটি হালকা রং ধারণ করলে সেচ দিতে হয়।
(৩) পানির অভাবে গাছের পাতা নেতিয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখা দেওয়ামাত্র পানি সেচ দিতে হয়।
(৪) স্বল্প গভীর শেকড় বিশিষ্ট সবজির জমিতে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতার শতকরা ৭০ ভাগের কম হলেও সেচ দিতে হয়।
(৫) নিচের সূত্র দ্বারা মাটিতে পানির পরিমাণ জেনে নিয়ে সবজির জমিতে সেচ দেয়া যেতে পারে।

$$\text{মাটিতে পানির পরিমাণ (\%)} = \frac{\text{১ কেজি মাটির ওজন-চুলোতে শুকানোর পর ঐ মাটির ওজন}}{\text{শুকানো মাটির ওজন}}$$

ধরা যাক শুকনো মাটির ওজন ৬০০ গ্রাম, তাহলে রসের পরিমাণ = ১০০০-৬০০ = ৪০০ গ্রাম।

$$\text{অতএব, রসের \%} = \frac{\text{১০০০-৬০০}}{\text{১০০০}} \times \text{১০০} = \frac{\text{৪০০}}{\text{১০০০}} \times \text{১০০} = \text{৪০\%}$$

সূত্র মোতাবেক মাটিতে পানি শতকরা ৫০% ভাগের নিচে এলেই সবজির জমিতে সেচ দেয়া উচিত। সবজি চাষে সবজির নাজুক অবস্থা দেখে সেচ দিতে হয়। সবজির পানির নাজুক অবস্থা সারণিতে দেয়া হলো-

হাতের সাহায্যে মাটির রস মাপার কৌশল

এ পদ্ধতি খুব কার্যকরি এবং এভাবে জমিতে রসের অবস্থা দেখে সেচ দেওয়া যেতে পারে। নিচের পদ্ধতি অনুসারে মাটিতে পানির ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় করা এবং সারণির বর্ণনা মোতাবেক মাটিতে সেচ দেয়া উচিত।

ধাপ ১- জমির মাঝখানে একটি ছোট গর্ত করতে হবে। গর্তটির মাপ হবে জমিতে যে ফসল আছে সে ফসলের শিকড়ের গভীরতার ৩ ভাগের ২ ভাগ।

চিত্র ঃ মাটির রস পরীক্ষার জন্য গর্ত করে মাটি সংগ্রহ

চিত্র ঃ মাটির দলা তৈরি করা

ধাপ ২- গর্তের তলা থেকে মাটি নিয়ে হাতের মুঠোয় চাপ দিয়ে গোলাকার করে দলা বা বল তৈরি করতে হবে। শেকড় অঞ্চলের গভীরতার ৩ ভাগের ২ ভাগ গভীরতার মাটি।
ধাপ ৩- সারণির বর্ণনার সাথে এ মাটির দলার মিল করে জমির মাটিতে গাছের উপযোগী কতটুকু রস আছে তা বোঝা যাবে।
ধাপ-৪- মাটির অবস্থা দেখে কোন মাটিতে কতভাগ রস আছে তা বোঝা যাবে এবং কোন মাটিতে কখন সেচ দিতে হবে তা সারণি'তে দেয়া হল।
জমির পানি ধারণ ক্ষমতা ৫০% -এ পৌঁছালে এবং ফসলের বাড়বাড়তি ব্যাহত হলে সেচ দিতে হবে।

সারণিঃ সবজি চাষে কখন সেচের প্রয়োজন

হাতের সাহায্যে মাটিতে কত ভাগ রস আছে তা মাপার সহজ নিয়ম।

মাটিতে রসের পরিমাণ (পানি ধারণ ক্ষমতার শতকরা কতভাগ)	পলিময় কাদা মাটি	
	মাটির অবস্থা	কখন সেচ দিতে হবে
০-২৫	মাটি শুকনা ও ধূলাময়	তাড়াতাড়ি
২৬.৫০	মাটির দলা হবে, কিন্তু ১ মিটার উপর হতে ফেলে দিলে ভেঙে গুড়ো হয়ে ছড়ায়ে যাবে।	তাড়াতাড়ি
৫১-৭৫	মাটির দলা শক্ত ও আঁঠালো হবে, কিন্তু ফেলে দিলে ভাঙবে না।	২ দিন পর
৭৬-১০০	মাটির ভিজা দলা হবে, হাতের তালু ভিজে আংগুলের ফাঁক দিয়ে পানি আসবে।	৪ দিন পর রসের অবস্থা বুঝে
১০০ এর বেশি	মাটি কাদাময়	সেচ দিতে হবে না। প্রয়োজনে পানি বের করে দিতে হবে।
বেলে মাটি		
	মাটির অবস্থা	কখন সেচ দিতে হবে
০-২৫	মাটি শুকনা ও ধুলাময়	তাড়াতাড়ি
২৬.৫০	মাটি ঝরঝরে নয়, কিন্তু দলা হবে না।	তাড়াতাড়ি
৫১-৭৫	মাটি দলা হবে, কিন্তু ফেলে দিলে ভেংগে গুড়ো হয়ে যাবে।	১ দিন পর
৭৬-১০০	মাটি দলা হবে, কিন্তু ফেলে দিলে ভাংবে না।	২ দিন পর মাটির অবস্থা বুঝে
১০০ এর বেশি	মাটির ভেজা দলা হবে, হাতের তালু ভিজে যাবে, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি বের হবে।	৭ দিন পর মাটির রস দেখতে হবে।

সারণি ঃ সবজিতে কোন কোন নাজুক অবস্থায় পানির অভাব দূর করা আবশ্যক।

সবজি	যে অবস্থায় পানির অভাব এড়াতে হবে	মাটিতে রসের সর্বনিম্ন মাত্রা (%)
ফল সবজি জাতীয়		
কুমড়া	ফুল ফোটা ও ফলের বৃদ্ধি অবস্থা	৫০
উচ্ছে/করলা	ফসলের পুরো জীবনকাল	৫০
কাঁকরোল	ঐ	৫০
শশা	ঐ	৫০
পটল	ঐ	৫০
লাউ	ঐ	৫০
পেঁপে	গাছের বাড়তি অবস্থা	৫০

২০২২

কলা	গাছের বাড়তির প্রাথমিক সময়কাল, ফুল ফোটা পর্যন্ত ও ফল ধরা থেকে বড় হওয়া সময়কাল	৬৫
ঢেঁড়শ	গাছের বাড় বাড়তির সময়কাল হতে পুরো জীবনকাল	৬০
টমেটো	ফসলে পুরো জীবনকাল	৬৫
বেগুন	ঐ	৬৫
মরিচ	ঐ	৬০
মূল ও কন্দজাতীয় সবজি		
মুখীকচু	ফসলে পুরো জীবনকাল	৫০
পানিকচু	ঐ	৮০-১০০
মূলা	ঐ	৫০
গাজর	ঐ	৫০
গোলআলু	বোটার অগ্রভাগে ষ্টোলন হওয়া থেকে আলু হওয়া পর্যন্ত	৭০
পাতা ও ফুলজাতীয়		
বাঁধাকপি	চারা রোপণ পরবর্তী ১০ দিন এবং মাথা বাঁধা শুরু থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত	৬৫
ফুলকপি	চারা রোপণ পরবর্তী ১০ দিন এবং ফুল ধরা থেকে শক্ত হওয়া পর্যন্ত	৬৫
ডাটা শাক	ফসলের পুরো জীবনকাল	৬৫
লাল শাক	গাছের বাড় বাড়তির প্রাথমিককাল হতে পুরো জীবনকাল	৬৫
পুঁইশাক	চারা অবস্থা	৬৫
মসলাজাতীয় সবজি		
পেঁয়াজ ও রসুন	কন্দ শুরু থেকে পুরো জীবনকাল	৭০
আদা ও হলুদ	পুরো জীবনকাল	৫০
ধনিয়া	ঐ	৬৫

সবজি চাষে ভাল ফলনের জন্য যেমন সেচের প্রয়োজন তেমনই ভালো নিকাশ ব্যবস্থার অভাবে ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

নিকাশের উপকারিতা

(১) মাটির মধ্যে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয়। গাছের শেকড় ভালোভাবে বাড়ে ও প্রয়োজনীয় খাদ্য সহজে গ্রহণ করতে পারে।

(২) মাটিতে বায়ু চলাচলের ফলে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা জৈব পদার্থ থেকে নাইট্রোজেনকে গাছের গ্রহণপোযোগী করে তোলে।

(৩) মাটির ভিতরের তাপ ঠিক রাখে। তাতে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় থাকে।

(৪) মাটিতে অক্সিজেন প্রবাহ বাড়ে। তাতে গাছ সকল প্রকার খাদ্য উপাদান সহজে নিতে পারে।

(৫) গাছের শেকড় অনেক নিচে যেতে পারে। অনেকদিন বৃষ্টি না হলে মাটির অনেক গভীর হতে রস সংগ্রহ করতে পারে।

নিকাশ না করার অপকারিতা

১. মাটির ভেতরে বায়ু চলাচল কম হয় বা বন্ধ হয়ে যায়। তাতে গাছের শেকড়ে অক্সিজেন না পেয়ে গাছ দূর্বল হয়ে মরে যেতে পারে।

২. বায়ু চলাচল কম হলে মাটিতে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা কমে যায়। ফলে জৈব পদার্থ হতে গাছের খাদ্য উপাদান সহজে বের হতে পারে না।

৩. মাটির ভিতরের তাপ কমে যায়, যা গাছের জন্য ক্ষতিকর।

৪. মাটিতে অক্সিজেনের অভাব হলে গাছের পুষ্টি উপাদান যেমন গন্ধক, লৌহ, নাইট্রোজেনের অভাব দেখা দেয়।

৫. গাছের গোড়ায় ও শিকড়ে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রোগজীবাণুর ও পরজীবির আক্রমণ দেখা দেয়।

সেচ পদ্ধতি

জমিতে সেচের পানি সরবরাহের নানা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে প্লাবন পদ্ধতি, নালা পদ্ধতি,থাল পদ্ধতি, বর্ষণ পদ্ধতি ও ঝাঝরি পদ্ধতি উল্লেখযাগ্যে। বর্ষণ পদ্ধতি সকল প্রকার সবজি চাষের জন্য উত্তম। এ পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষ। পারিবারিক সবজি বাগানে ঝাঁঝরি পদ্ধতিতে দেওয়া হয়। জমির পরিমাণ বেশি হলে সুনিয়মিতভাবে সারি ও কেয়ারির মাঝখান দিয়ে নালা পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া সুবিধাজনক। তাছাড়া মাদায় রোপণকৃত ফল সবজির জন্য থানা পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া ভালো।

সেচের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে সবজি ক্ষেতে সেচ দেওয়া হয়ে থাকে। পদ্ধতিগুলোর বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

(ক) পৃষ্ঠদেশ পদ্ধতি- প্লাবন, নালা, থালা পদ্ধতিগুলো পৃষ্ঠদেশ পদ্ধতির আওতাভুক্ত। সেচের অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি সহজতর। এর মাধ্যমে সবজি ক্ষেতে সেচ দিতে তুলনামূলকভাবে কম খরচ পড়ে। প্লাবন বা নালা পদ্ধতিতে পানির অপচয় হয় না এবং সেচের পর মাটি সহজেই কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। জমি সমতল না হলে প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া কষ্টসাধ্য। নালা করে সেচ দেওয়ার সময় জমি একদিকে অল্প ঢাল করে তৈরি করে নিলে পানির অপচয় কম হয়। আবার বেশি ঢালু হলে সেচের পানির সাথে মাটি ও গাছের খাদ্য উপাদান ধুয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

সবজির দুই সারি বা কেয়ারির মাঝখান দিয়ে নালা করে পানি দেওয়া যায়। এতে সবজি গাছের গোড়ার মাটি রসালো হয়, মাটি ঝুরঝুরে থাকে এবং কর্দমাক্ত হয় না। দোন, সেউতি, কপিকল, পার্সিয়ান হুইল ইত্যাদির সাহায্যে পুকুর, খাল বিল, নদী, কূপ হতে পানি উঠানো যায়। তারপর নালা দিয়ে সবজি ক্ষেতে সেচ দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া গভীর ও অগভীর নলকুপ বা পাওয়ার পাম্পের সাহেয্যে ভূ-নিম্নস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি দিয়েও এ পদ্ধতিতে সেচ দেয়া হয়ে থাকে।

সমতল জমিতে সেচ নালা হতে সেচ উপনালা তৈরি করতে হয়। সেচ উপনালার সাথে জমির প্রতিটি খণ্ডের জোড়া রাখতে হয়। সবচেয়ে দূরের খণ্ডে আগে সেচ দিতে হয়। দূরের খণ্ডের মুখ বন্ধ করে দ্বিতীয় খণ্ডের মুখ খুলে দিতে হয়। এভাবে দূরেরগুলো পর পর বন্ধ করে কাছেরগুলো পর পর খুলে দিতে হয়। এতে পানির অপচয় কম হয়। কেলি করে লাগানো সবজিতে এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।

সমতল জমিতে কেলি করে চাষ করা হলে প্রথম কেলির একদিকের মুখ সেচের নালার সাথে খোলা রাখতে হয়। অপর মুখ দ্বিতীয় কেলির সাথে খোলা হয়। দ্বিতীয় কেলির যে মুখ প্রথম কেলির সাথে খোলা, তার অপরদিকের মুখ তৃতীয় কেলির সাথে খোলা রাখতে হয়। এভাবে সমস্ত কেলিগুলো একটির সাথে আরেকটির সংযোগ তৈরি হবে। এতে প্রথম কেলিতে সেচ দিলে পানি বাধা পেয়ে ঘুরে ঘুরে সমস্ত কেলিতে প্রবেশ করবে। কেলিগুলো সমানভাবে তৈরি করা না হলে সমস্ত কেলিতে সমভাবে পানি প্রবেশ করবে না। ঢাল জমিতে সেচ দিতে হলে ঢালের অনুকুলে কেলি তৈরি করতে হয়। আর ঢালের উপরের দিকে একটি লম্বা লম্বি প্রধান নালা তৈরি করতে

হয়। ঢালের অনুকূলের প্রতিটি কেলির মধ্যবর্তী নালাগুলোর উপরের মুখ প্রধান নালার সাথে খোলা থাকবে। কিন্তু নিচের দিকের মুখ বন্ধ থাকবে। এ সমস্ত জমিতে নালা তৈরির সময় অত্যন্ত সতকর্তার সাথে নালার তলদেশ সমান করে নিতে হয়। সেচ দেয়ার সময় নিয়ন্ত্রিতভাবে সেচ দিতে হয়। নইলে পানির অপচয় হয়।

চিত্র ঃ সমতল জমিতে বাথা এবং নালা সেচ

(খ) নিম্ন পৃষ্ঠদেশ পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে মাটির ভিতর দিয়ে সবজি গাছের শেকড়ের কাছাকাছি পানি পৌছায়ে দেওয়া হয়। এজন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত পাইপ ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে সেচের জন্য সবজি সারি করে রোপণ করতে হয়। এ পদ্ধতি ব্যয়বহুল বলে আমাদের দেশে সাধারণত ব্যবহার করা হয় না বললেই চলে। তবে এ পদ্ধতির কতকগুলো সুবিধা আছে। যথা- ১) মাটি কর্দমাক্ত হয় না, ২) মাটি একস্থান হতে অন্য স্থানে ধুয়ে যায়, ৩) পানির অপচয় হয় না, ৪) মাটিতে বায়ু চলাচলের কোন অসুবিধা হয় না, ৫) গাছ খুব তাড়াতাড়ি রস গ্রহণ করতে পারে ও ৬) খাদ্য উপাদান চুইয়ে যেতে পারে না।

গ) ঝরণা সেচ- এ পদ্ধতিতে মাটির উপর দিয়ে বা খুঁটির সাহায্যে পাইপ স্থাপন করা হয়। পাইপের বিভিন্ন স্থান দিয়ে পানি বের হয়ে বৃষ্টির বা ঝরণার আকারে পড়ার জন্য ঘূর্ণায়মান তাল্লু লাগানো থাকে। এর মাধ্যমে পানি বৃষ্টির আকারে জমির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি পানি সেচের অন্যতম উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে সাধারণ কৃষকের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব নয় না। স্বল্প পরিসরে সবজি চাষে এ পদ্ধতি অবশ্য অনুসরণ করা যায়। এর সুবিধা হলো। যথা-

১) পানি বৃষ্টিপাতের মতো এবং সমভাবে বন্টন করা সম্ভব হয়
২) মাটি ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে না
৩) মাটিতে বায়ু চলাচলের অসুবিধা হয় না
৪) মাটি শক্ত হয়ে যায় না।

চারা ছোট বা লিকলিকে অবস্থায় এবং চারা রোপণের পর পরই ঝরণা পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া উচিত নয়। তাতে চারা মাটিতে শুয়ে পড়ে যেতে পারে। চারার কচি কান্ডে ও পাতায় মাটি লেগে ক্ষতি হতে পারে। গাছে ফুল ধরা অবস্থায় এ পদ্ধতিতে সেচ দিলে পরাগায়নে ব্যাঘাত ঘটে এবং ফলন কমে যায়।

চিত্র ঃ ঝরণা সেচ পদ্ধতি

জলাবদ্ধতা

জমিতে অতিরিক্ত সেচের ফলে বা অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর উপরে উঠে আসে। এতে গাছের শিকড়ের কাছাকাছি স্থান ভেজা থাকে এবং মাটির ভিতরে বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তবে জমিতে শস্যের গোড়ায় পানি জমে থাকা হলো জলাবদ্ধতা। জমিতে জলাবদ্ধতা দেখা দিলে উর্বরা শক্তি হ্রাস পায়, শিকড়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ কৃত্রিম ড্রেন বা নর্দমা তৈরি করতে হয়। এসব ড্রেন জমির উপরিভাগ হতে কমপক্ষে দেড় মিটার নিচে বা সবজি ফসলের শেকড়ের গভীরতার নিচে নামাতে হয়। এর ফলে খোলা নর্দমা বা জমির উপরিভাগের পানি এই ড্রেনের সাহায্যে বের করে সেচ এলাকার বাইরে নদী, খাল ইত্যাদিতে ফেলে দিতে হয়।

অন্তবর্তী পরিচর্যা

জমিতে বীজ চারা লাগানোর পর হতে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত গাছের বৃদ্ধি ও ফলায়নের জন্য পরিচর্যা করতে হয়। এই পরিচর্যাগুলোকে অন্তবর্তী পরিচর্যা বলে। নিচে বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। আঁচড়া, কোদাল, নিড়ানী, বা সময়ে সময়ে হাল্কা চাষের মাধ্যমে সবজি মাঠের আন্তঃকর্ষণ কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়। এ কাজের উদ্দেশ্য মাটিকে ঝরঝরে ও মোলায়েম রাখা। মাটির অভ্যন্তরে অনায়াসে পানি ও বায় চলাচলে সাহায্য করা। ফলশ্রুতিতে মাটিতে বসবাসকারী উপকারী কীট ও জীবাণুসমূহের কার্যকারীতা বৃদ্ধি পায় ও গাছের খাদ্যোপাদান গ্রহণে সুবিধা হয়। কর্ষণ করলে মাটির স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টিপাত বা সেচের পর মাটি শুকালে উপরিভাগে শক্ত আবরণ পড়ে। এতে মাটির অভ্যন্তরে বাতাস ও পানি চলাচলে অসুবিধা হয়। তাই আন্তঃকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। আকর্ষণের ফলে আগাছাও দমন হয়ে যায়।

আচ্ছরণ বা মালচিং

শস্য চাষকালে মাটিতে রস সংরক্ষণ, আগাছা দমন, মাটির চটা ভাঙ্গা ইত্যাদি উদ্দেশে যে সব কাজগুলো সম্পন্ন

২০২২

করা হয় সেগুলোকে আচ্ছাদন বা মালচিং বলে।

মালচিং তিন প্রকার। যথা- (১) মাটি মালচিং, (২) খড়কুটা ও আবর্জনা মালচিং (৩) কাগজ/পলিথিন মালচিং।

(১) মাটি মালচিং- জমি চাষ করলে বা জমির চটা ভেঙে দিলে জমির রস সংরক্ষণ এবং আগাছা নিয়ন্ত্রণ হয়।

(২) খড়কুটা ও আবর্জনা মালচিং-বিভিন্ন সবজির জমিতে ফসলের বৃদ্ধিকালে খড়কুটা/আবর্জনা দিয়ে জমি ঢেকে রাখলে রস সংরক্ষণসহ আগাছা নিয়ন্ত্রণ হয়।

(৩) কাগজ/পলিথিন মালচিং- অনেক সবজির জমিতে আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফসলের স্থান ব্যতিত অন্যান্য স্থান পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এতে আগাছা নিয়ন্ত্রণসহ রস সংরক্ষণ হয়।

চিত্র ঃ মাটি মালচিং

চিত্র ঃ খড়কুটা মালচিং

সবজি চাষে আগাছা ও পোকা মাকড় দমন

ছোট আকারের গাছ বা জমিতে জন্মে ফসলের সাথে পুষ্টি উপাদান, স্থান, পানি, আলো ইত্যাদির জন্য প্রতিযোগিতা তৈরি করে এবং ফসলের সবকিছুতে ভাগ বসায় সে সমস্ত উদ্ভিদকে আগাছা বলা হয়। যেমন- মুথা, দূর্বা, শ্যামা, উলু, চাপড়া, বথুয়া ইত্যাদি। কোন কোন সময় আগাছার কারণে শতকরা ১০০% ফসল নষ্ট হতে পারে। সাধারণত ফসলের প্রথম অবস্থা হতে আগাছা নিয়ন্ত্রণে না থাকলে দেরিতে আর নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এবং ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। আগাছা যেভাবে শস্যের ক্ষতি করে তা হলো—

(১) ফসলের সাথে খাদ্য পুষ্টির প্রতিযোগিতা তৈরি করে থাকে। আগাছা এক হেক্টর জমি থেকে রবি মৌসুমে ২০ কেজি ও আমন মৌসুমে ৫৬.৩০ কেজি নাইট্রোজেন অপসারণ করে।

(২) পানির জন্য ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা তৈরি করে থাকে। আগাছা ফসলের তুলনায় মাটি হতে অনেক বেশি পরিমাণ পানি চুষে নিয়ে থাকে।

(৩) ফসলের সাথে আলো বাতাসের জন্য প্রতিযোগিতা তৈরি করে থাকে। আগাছার বৃদ্ধি দ্রুত, তাই ফসল আগাছার নিচে পড়ে আলো বাতাসের অভাবে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া কম হওয়ায় ফসল দূর্বল হয়ে পড়ে।

(৪) আগাছা ফসলের রোগে পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। অধিকাংশ আগাছাই ফসলের বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের বিকল্প আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। সবুজ সতেজ আগাছা ধানের মাজরা পাকা ও ভাইরাস বহনকারীর বিকল্প আশ্রয় স্থল হিসেবে কাজ করে। জংলী রাইগাছ থেকে "আরগট" রোগ আসে ফসলী রাই গাছে। বারবেরি গাছ থেকে ব্লাক স্টেম রাস্ট রোগ আসে গমে। এমনিভাবে বিভিন্ন আগাছা থেকে এসে শাকসবজির রোগ ও পোকামাকড় আক্রমণ করে।

২০২২

(৫) পরজীবী ক্রিয়াশীল অনেক আগাছা আছে যারা ফসলের গাছের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। আরোবাঙ্কি আগাছা বেগুন গাছের শেকড় হতে রস চুষে নিয়ে বেঁচে থাকে। তাতে বেগুন গাছ দূর্বল হয়ে যায়। সর্ণলতা গাছের লতা শিম, বেগুন গাছের ওপর লতিয়ে গেলে ফসলী গাছ হতে রস চুষে নিয়ে ফসলের ক্ষতি করে থাকে।

(৬) আগাছার কারণে ফসলের ফলন হ্রাস পায়। অনেক কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে আগাছা ফসলের ১০-৩০% ক্ষতি করে থাকে। যদি আগাছা ফসলী জমিতে প্রথম অবস্থা হতে নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তাহলে ৫০%-এর ওপরে এমনকি ১০০% ফসল বিনষ্ট করতে পারে।

(৭) ফসলের ওপর আগাছা বিষাক্ত ক্রিয়া আগাছা করে থাকে। কোন কোন আগাছা তার বৃদ্ধিকালে শেঁকড়ে বিষাক্ত রস সৃষ্টি করে যা মাটিতে ছেড়ে দিয়ে ফসলী গাছের ক্ষতি করে থাকে। দূর্বা, মুথজাতীয় আগাছা এরূপ প্রক্রিয়া করে ফসলের ক্ষতি করে থাকে।

(৮) আগাছা ফসল উৎপাদনে খরচ বাড়ায় এবং ফলন কমায়। আগাছা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিড়ানি, আঁচড়া, কোপানো, হাতে টেনে তোলা, রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এজন্য যথেষ্ট খরচ হয় এবং আগাছা বিভিন্নভাবে ফলন কমিয়ে দেয়। যার ফলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায় অথচ ফলনও কমে যায়।

(৯) ফসলের মান এবং বীজের গুণাগুণ খারাপ করে। আগাছার বীজ ফসলের সাথে মিশে ফসলের মান খারাপসহ অনেক সময় খাদ্যে বিষাক্ততা সৃষ্টি করে। আগাছার বীজ ফসলের বীজের সাথে মিশে বীজের মান খারাপ করে থাকে। যা পরবর্তীতে ফসলের ফলন ও মান উভয়ই কমিয়ে দেয়।

চিত্র ঃ হাত দিয়ে তুলে আগাছা দমন

২০২২

ফসলের জমিতে আগাছা জন্মাতে না দেওয়া বা আগাছাকে বিনষ্ট করাকে আগাছা দমন বুঝায়। আগাছা প্রাতরোধ এবং নিধন করে আগাছাকে দমন করা যায়।

ক) আগাছা প্রতিরোধ- ফসল জন্মানোর আগে জমিতে বারবার চাষ, মই ও আঁচড়া দিয়ে পরিচ্ছন্ন করতে হয়। রোদে জমি শুকাতে হয়, জমিতে পানি আটকিয়ে আগাছা পচাতে হয়। এতে আগাছার বংশ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে আগাছার উপদ্রব কমবে।

খ) ভাল মানের বীজ ব্যবহার- বীজ রাখার জন্য ফসল কাটার আগেই জমি হতে পরিচ্ছন্ন চাষ থেকে ফসল কাটা এবং মাড়াই করার স্থান পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। এতে বীজে আগাছার বীজ মিশ্রণের সুযোগ থাকে না।

গ) গোবর/কম্পোস্ট আবর্জনা সারের ব্যবহার-জৈব সার তৈরির সময় ভালোভাবে পচায়ে দিলে আগাছার বীজ থাকার সুযোগ থাকে না।

ঘ) সেচের পানি প্রবাহের সময় নিয়ন্ত্রণ-ফসলের সেচের আগে নালা পরিষ্কার করে নিলে আগাছার বীজ পানিতে মেশার সুযোগ থাকে না। এক জমি হতে অন্য জমিতে পানি প্রবাহের সময় আইল ও পানি নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

ঙ) কৃষি কাজে ব্যবহারের যন্ত্রপাতি পরিচ্ছন্ন রাখা- আঁচড়া, লাঙ্গল, মই, কোদাল, নিড়ানি ইত্যাদি ফসলের মাঠে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এক জমি হতে অন্য জমিতে নিতে হয়।

চ) পশুপাখির চলাচল নিয়ন্ত্রণ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি ইত্যাদি এক জমি হতে অন্য জমিতে চলাচলের সময় তাদের গায়ে পায়ে লেগে আগাছার বীজ ছড়িয়ে পড়ে। তাই পশুপাখির চলাচল নিয়ন্ত্রণ করলে আগাছা দমন হতে পারে।

ছ) আগাছা নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন- ফসল উৎপাদনকারীকে তার জমি এবং ফসলের আশপাশ আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এ ব্যাপারে অনেক দেশে আইন আছে এবং সেখানে ভালো ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। আগাছা নিধনের কতগুলো কার্যকরি পদ্ধতি আছে। যেমন- যান্ত্রিক দমন, পরিচর্যাগত, রাসায়নিক ও জৈবিক দমন পদ্ধতি।

(ক) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন- আঁচড়া, কোদাল, নিড়ানি, লাঙল, রোটারি, হ্যারো ও ডিস্ক প্লাউ ইত্যাদির সাহায্যে জমি হতে আগাছা নষ্ট করা হয়। চাষের ফলে মাটি ওলটপালট হয়ে আগাছা চাপা পড়ে মারা যায়। নিড়ানি দিয়ে আগাছা উঠায়ে ফেলা হয়, চাষের কারণে আগাছা কেটে টুকরো টুকরো হয় এবং রোদে শুকিয়ে মারা যায়।

খ) পরিচর্যাগত পদ্ধতিতে আগাছা দমন– শস্য পর্যায়, খড়কুটা বা মাটির বা পলিথিনের মালচিং ব্যবহার করলে আগাছা নিধন হয়। বেগুন, কপি, আলুর জমিতে মালচিং করে সহজেই আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাছাড়াও দ্রুত বর্ধনশীল, ঝোপালো ও আবরণ সৃষ্টিকারী ফসলের চাষ, প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দিয়ে জলাবদ্ধতা তৈরি, সবুজ সার উৎপাদন, হাতে টেনে উঠায়ে এবং আন্তক্রিয়া সৃষ্টিকারী ফসল (তিল, ছোলা) চাষ করেও আগাছা দমন করা যায়।

গ) রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন- ফসলের জমিতে জন্মানো আগাছাকে বিভিন্ন ধরনের আগাছানাশক ব্যবহার করে নিধন করা যায়। যেমন- ২-৪ ডি, প্যারাকুয়াট, গামাক্সোন, প্রাপোনিল, এমসিপিএ ইত্যাদি।
ঘ) জৈবিক পদ্ধতিতে আগাছা দমন ও ফসলী জমির আগাছা অনেক ধরনের পোকামাকড়, জীব, রোগ জীবাণু দিয়ে নিধন করা হয়।

সমন্বিত পোকামাড়ক ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

রোগবালাই, পোকামাকড় ও ইদুর প্রভৃতি ফসলের চরম শত্রু। এসব শত্রুকে সময়মতো দমন না করলে ফসলের সুষ্ঠু বাড় বাড়তি ও ফলন কম হবে। শুধু একটি শত্রুকে দমন করে ভালো ফসল আশা করা যায় না। ভালো ফসল পেতে হলে সম্মিলিতভাবে সবগুলো শত্রু অর্থাৎ পোকামাকড়, রোগবালাই, আগাছা, ইদুর প্রভৃতি দমন করতে হবে। স্থানীয় জাতের ফসলে কম সার ও পানি ব্যবহারের প্রেক্ষিতে পোকা ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ সাধারণত কম হয়। তাছাড়া এসব জাতের রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ শক্তি বেশি। এদের ফলন কম বলে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ফসলের চাষ করা হচ্ছে। যার ফলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশে এসব স্থানীয় জাতের চাষ কমিয়ে উন্নত জাতের চাষ বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আনুমানিকভাবে সার পানি ব্যবহার করলে উফশী ফসলে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যায় এবং ফসলের ক্ষতিও বেশি হয়।

সাধারণভাবে রোগবালাই বা পোকামাকড় দমনের জন্য কৃষকগণ বিষাক্ত রাসায়নিক ঔষধের ওপর নির্ভরশীল। এসব বালাইনাশক ঔষধ যেন তেনভাবে ব্যবহার করে কৃষকগণ তাৎক্ষণিক ফল কিছুটা পায়, কিন্তু এসব ঔষধের অপপ্রয়োগের কারণে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গাগুলোর শরীরে ঐসব ঔষধের প্রতি সহনশীলতা জন্মে। পরবর্তীতে এসব পোকামাকড় আর ঐসব ঔষধ দিয়ে দমন করা যায় না। ফলশ্রুতিতে নতুন ও আরও বিষাক্ত ঔষধ আরও বেশি ব্যবহার করতে হয়। এসব ঔষধ থেকে আবহাওয়া, ফসল ও মাটির মধ্যে বিষক্রিয়া থেকে যায় যা মানুষ ও গৃহপালিত পশুর ক্ষতি করে। তাছাড়া ঢালাওভাবে বিষাক্ত ঔষধ ব্যবহারের ফলে মানুষের অনেক উপকারি পোকামাকড় ধ্বংস হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারের ফলে মৌমাছি, বোলতা প্রভৃতি ধ্বংস হচ্ছে। এর ফলে অনেক ফসলেরই পরাগায়নের ক্ষতি হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই ফলন কমে যায়। আবার অন্যদিকে যেনতেনভাবে বালাইনাশক ঔষধ ব্যবহারের ফলে পরিবেশের দূষণ হচ্ছে যা দূষণ বা অন্যান্য জীবকুলের জন্য ক্ষতিকর। এসব কথা বিবেচনা করেই সমন্বিত বালাইনাশক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। ফসল সংরক্ষণ ও ভালো ফলনের জন্য এটি একটি আধুনিক ও উপকারী কলাকৌশল। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো অবস্থাভেদে পোকা দমনে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা। বিষাক্ত ঔষধ কম ব্যবহার করলে শাক সবজিতে বিষাক্ত ঔষধের বিষক্রিয়া তেমন থাকতে পারে না এবং ক্ষতি হয় না। বালাই দমনের বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও পোকার বা রোগবালাইয়ের আক্রমণ বেশি হয়ে আর্থিক ক্ষতির পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। এরূপ অবস্থা হলে রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে। এতে করে ক্ষতিকারক বালাইনাশক ঔষধের ব্যবহার সীমিত হবে, পরিবেশ নির্মল থাকবে। অপরদিকে উপকারি পোকামাকড় ও জীবজন্তুর জীবন ঝুঁকিমুক্ত থাকবে এবং কৃষকের আর্থিক ক্ষতি কম হবে। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা বলতে ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনের জন্য প্রয়োজনে একাধিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বোঝায়। সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার উপকারী দিকগুলো নিচে দেয়া হলো।

১। উপকারী পোকামাকড়, মাছ, ব্যাঙ, পশুপাখী (চিল, পেচা, শালিক ইত্যাদি) ও গুইসাপ প্রভৃতি রক্ষা করা যায়।

২। বালাইনাশক ব্যবহারের জন্য যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

৩। বালাইনাশকের দূর্ঘটনা এড়ানো যায় এবং পরবর্তী কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৪। অপকারী পোকামাকড় বালাইনাশক সহনশীলতা অর্জন করার সুযোগ পায় না।

৫। বালাইয়ের পুনরায় আক্রমণের সম্ভাবনা কম হয়।

৬। দূষণমুক্ত পরিবেশের নিশ্চয়তা থাকে।

সমন্বিত বালাইনাশক ব্যবস্থাপনাকে প্রথমে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছেঃ

১। প্রাকৃতিক দমন পদ্ধতি ২। সরাসরি বালাই দমন পদ্ধতি। ৩। জৈব প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা ৪। কৃষিতাত্ত্বিক বা কৃষি পরিচর্যা পদ্ধতি ও ৫। রাসায়নিক পদ্ধতি।

ক) প্রাকৃতিক দমন পদ্ধতি ফসলের সুষ্ঠু বাড় বাড়তি এবং ভালো ফলনের জন্য এ পদ্ধতিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিকভাবে স্বাভাবিক আবহাওয়ায় পোকামাকড় ও রোগজীবাণু বেঁচে থাকে এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। স্বাভাবিক আবহাওয়ায় বেশি তারতম্য হলে এসবের বংশ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। যেমন- গ্রীষ্মকালে যখন আবহাওয়া উষ্ণ থাকে তখন পোকামাকড়ের উপদ্রব বেশি দেখা যায়। শীতকালে তাপমাত্রা কমার ফলে এসবের আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কমে যায়। আবার স্যাঁতসেঁতে, কম আলোবাতাস ও ছায়াযুক্ত স্থানে এদের আক্রমণ বেশি হয়। বেশি বৃষ্টি, ঝড়, টাইফুন, বন্যা প্রভৃতি ইদুর এবং অন্যান্য অনিষ্টকারী পোকার প্রাকৃতিক শত্রু নষ্ট করে দেয়।

চিত্র ঃ সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা

ভালো ফসলের জন্য সময়মতো ফসল বুনা বা লাগানো, প্রচুর আলোবাতাস আছে এমন জায়গায় সবজি চাষ করতে হয়। স্যাঁতসেঁতে ও ছায়াযুক্ত স্থানে ফসল না করাই উচিত। ঝড় বৃষ্টির পর পরই জমিতে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করা কোনভাবেই উচিত নয়।

আর্দ্র ও মেঘলা আবহাওয়ায় আলুর মড়ক রোগ, শিম গাছের জাব পোকার আক্রমণ ইত্যাদি রোগবালাই বেশি দেখা যায়। ফসলের চারা অবস্থায় বেশি বৃষ্টি হলে চারার গোড়া পঁচা রাগ বেশি হয়। এসব থেকে রক্ষা পেতে হলে বেশি বৃষ্টি হওয়ার পর পরই জমি থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হয়।

পোকা ও রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ- বেশি ফলনের যেসব জাত রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে সে সব জাতের চাষ করা উচিত। তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো পোকামাকড় বা রোগ জীবাণু আস্তে আস্তে শক্তিশালী হয়ে ফসলের ক্ষতি সাধন করে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোন ফসল বালাইয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পারলে তখনই তা চাষ কন্ধ করে দেয়া উচিত। আর যে সব জাতে রোগবালাই বেশি হয় তা ভাল হলেও চাষ করা উচিত নয়। কেননা এ ধরনের ফসল রোগ বিস্তারে সাহায্য করে।

যে সব জাত পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে সে সব জাতে রোগবালাইও কম হয়। তাছাড়া প্রতিরোধ ক্ষতাসম্পন্ন ফসল তাড়াতাড়ি বেড়ে গিয়ে মাটি ঢেকে দেয়, ফলে আগাছা কম হয়।

খ) সরাসরি বালাই দমন পদ্ধতি

পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় এ পদ্ধতি খুব কার্যকরি। তবে এ পদ্ধতিটি সময় সাপেক্ষ এবং এ জন্য প্রত্যহ ফসল পরীক্ষা করা দরকার। অনেকে এ পদ্ধতিকে যান্ত্রিক পদ্ধতি বলে। নিব উপায়ে এ পদ্ধতিতে ফসলের বালাই দমন করা যেতে পারে।

হাতজাল দিয়ে পোকা ধরা- আক্রান্ত ফসলের উপর দিয়ে হাত জাল টেনে নিয়ে পোকা ধরে ফেলা হয়। বিভিন্ন মথ ও ঘাসফড়িং জাতীয় অন্যান্য পোকা এভাবে দমন করা যায়।

হাত দিয়ে পোকা সংগ্রহ করা সাধারণত যে সব পোকা বা পোকার ডিম এক জায়গায় গাদা হয়ে থাকে সে সব পোকা বা ডিম হাত দিয়ে সংগ্রহ করে মেরে ফেলা যায়। পাটের বিছা পোকা, বেগুনের বিটল, পূর্ণ বয়স্ক মথের ডিম এবং যেসব পোকা উড়তে পারে না তাদেরকে এ ব্যবস্থায় দমন করা যায়।

আক্রান্ত গাছ বা গাছের অংশ পুড়িয়ে ফেলা- রোগাক্রান্ত গাছ বা গাছের অংশবিশেষ পুড়িয়ে রোগের আক্রমণ ঠেকানো যায়।

আলোর ফাঁদ দিয়ে পোকা ধরে মেরে ফেলা- আলোর ফাঁদ পাতলে আলোতে আকৃষ্ট হয়ে পাকা ফাঁদে পড়বে ও মরে যাবে। ফাঁদের ভিতর বিষ বা কেরোসিন তেল মেশানো পানি রাখতে হয়। মাজরা পোকার পূর্ণ বয়স্ক মথ, এভাবে দমন করা যায়।

কাঁকরোল, লাউ ও কুমড়া প্রভৃতি ফসলের জমিতে কঁঠালের ভোতা বেঁধে রাখলে ফলের মাছি পোকা ঐ ভোতায় ডিম পাড়বে। এতে করে ঐসব ফসলের কোন ক্ষতি হবে না। অনুরূপভাবে কলা গাছের দুসারির মাঝে কলার

মোথা ও মোথাসহ কান্ড দু'ভাগ করে রাখলে কলার রাইজম উইভিল তাতে আক্রমণ করবে এবং তখন সহজেই ফসল রক্ষা পাবে। প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা- কুমড়াজাতীয় গাছের ফল পাতলা কাপড় দিয়ে বেঁধে বা জড়িয়ে রাখলে প্রজাপতি ও মাছি পোকার আক্রমণ কম হবে। বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি ফসলের চারা লাগিয়ে চারার গোড়া থেকে ছয়। ইঞ্চি বা ১৫ সেন্টিমিটার দূর দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে একটা গোলাকার নালা করে দিলে কাটুই পোকার আক্রমণ থেকে চারা রক্ষা পায়।

গ) জৈব প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা

প্রকৃতিতে অনেক পোকামাকড় আছে যেগুলো ফসলের অনিষ্টকারী পোকামাকড় দমনে সাহায্য করে। এদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) পরভোজী পোকামাকড় ও পরভোজী পোকামাকড় অনিষ্টকারী পোকামাকড়কে খেয়ে বা দেহ থেকে রস চুষে দমন করে। একই পরভোজী পোকা বেশ কয়েক জাতের পোকা খেয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ব্যাঙ, পাখি, মাকড়সা, লেডিবার্ড বিটল প্রভৃতি। জমিতে বাশ পুঁতে দিলে পাখি এসে ঐ বাশে বসে এবং বিভিন্ন রকম পোকা বা কীড়া খেয়ে পোকা দমনে সাহায্য করে। লেডিবার্ড বিটল কেল পোকাকে দমন করে।

(২) পরজীবী পোকার কীড়া ও একটি পরজীবী পোকা একটি জাতের পোকামাকড় দমন করে। যেমন- বোলতা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। নিচে পরজীবী পোকা ও রোগজীবাণু এবং কোন কোন পোকা দমনে সাহায্য করে তা দেয়া হলো ঃ

পরজীবী পোকার কীড়া	যে পোকা দমন হয়
বোলতা এর পাঁচ রকম জাত	হপারের ডিম
বিভিন্ন ধরনের মাছি	পূর্ণবয়স্ক হপার ও এর পুত্তলিকা
খুব ছোট বোলতা	পূর্ণবয়স্ক সবুজ পাতা ফড়িং ও এর নিস্ফ
বোলতা	গল পোকা
ড্রাগন ফ্লাই	পামরী পোকা
	পাতা মোড়ানো পোকা, মশা

এসব উপকারি পোকার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এবং এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে এসব পোকা বেড়ে উঠতে পারে।

২০২২

রোগজীবাণু দ্বারা কীট পতঙ্গা দমন

ছত্রাকজনিত রোগ-মিটাহিজিয়াম জাতের ছত্রাক গাছ ফড়িং, পাতাফড়িং, বাগ এবং বিটলজাতীয় পোকার দেহে রোগ সংক্রমণ করে, ফলে এসব পোকা মরে যায়। নোমুরিয়া জাতের ছত্রাক মাজরা পোকা, পাতামোড়ানো পোকা, সবুজ বিছা পোকার কীড়া আক্রমণ করে।

ঘ) কৃষিতাত্বিক বা ভাল চাষাবাদ পদ্ধতি- এ পদ্ধতিই সবচেয়ে বেশি পুরাতন যার মাধ্যমে কৃষকরা পোকামাকড় ও রোগবালাই সজ্ঞানে দমন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে ভাল ফসল উৎপাদন ও ফলনের উদ্দেশ্যে তারা এ কাজগুলো করে থাকে। এতে তারা দু'ভাবে উপকৃত হয়। যেমন- বেশি ফলন পায় ও রোগ/পোকামাকড়ের উপদ্রব কমে। এ পদ্ধতিতে নিচের বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে হবে।

সময়মত জমি ভালোভাবে চাষ করা-ফসল বুনা বা লাগানোর আগেই জমি যথাসময়ে ভালোভাবে চাষ করা দরকার। এতে করে আগাছা শিকড়সহ উঠে আসবে এবং এমন অবস্থায় কয়েকদিন রেখে দিলে আগাছা শুকিয়ে মরে যাবে। তাছাড়া ভালোভাবে চাষ করলে রোগজীবাণু, পোকার কীড়া ও পুত্তলী মাটির নিচে চাপা পড়ে মরে যাবে। এছাড়া উরচুংগাপোকা, উইপোকা ও কাটুইপোকা প্রভৃতি চাষের ফলে উপরে উঠে আসে এবং পাখিরা এসব পোকা ধরে খেয়ে ফেলে। জমিতে ভালোভাবে চাষ করলে গাছের জঞ্জাল মাটির নিচে যায় এবং তা সার হয়, এতে করে পরবর্তী ফসলের রোগবালাইয়ের আক্রমণ অনেকাংশে কম হয়। কারণ গাছের জঞ্জাল পোকামাকড় ও রোগজীবাণুর একটি ভাল আশ্রয়স্থল। মাজরাপোকা, কুমড়া লাল বিটল, ইপল্যাকনা বিটল প্রভৃতি ফসলের জঞ্জালের ভেতর লুকিয়ে থাকে।

আগাছা দমন- আগাছা ফসলের স্থান ও আলোবাতাসে ভাগ বসিয়ে মূল ফসলকে ঐ সব দরকারি জিনিস থেকে বঞ্চিত করে এবং ফসলের সমূহ ক্ষতি করে। তাছাড়া আগাছা ফসলের অনিষ্টকারী পোকামাকড় ও রোগজীবাণুকে আশ্রয় দেয় ও এদের বংশ বিস্তারে সাহায্য করে। আগাছার বীজ ফসলের বীজের সঙ্গে মিশে যায় ও পরবর্তীতে ঐ বীজ জমিতে ব্যবহার করলে নতুন করে আগাছা দেখা দেয়। এসবের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জমি এবং জমির আইল আগাছামুক্ত রাখা দরকার।

সার ব্যবস্থাপনা- সুষম মাত্রায় সার ব্যবহার ভালো ফসলের জন্য একটি পূর্বশর্ত। গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও ভালো ফলনের জন্য গাছের বিভিন্ন রকমের খাদ্য দরকার। এসব খাদ্যের যে কোন একটি কম বা বেশি হলে ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হবে। যেমন- নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি হলে কুমড়া জাতীয় সবজিতে ফল দেরি করে ধরবে এবং পোকামাকড় সহজে আক্রমণ করবে। নাইট্রোজেন সার দেওয়ার আগে জমি থেকে সমস্ত আগাছা তুলে ফেলতে হবে। নাইট্রোজেন সার একবারে না দিয়ে ২-৩ বারে দেয়া উচিত। এতে করে ফসলের বৃদ্ধি সঠিক মাত্রায় হবে এবং বিভিন্ন রকম বালাই কম হবে। ফসলে ফসফরাসের পরিমাণ কম হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। পটাশের অভাব হলে রোগ প্রতিরোধক শক্তি কম হবে এবং শেকড়ের বাড় বাড়তিও কম হবে। তাছাড়া মূলজাতীয় ফসলের ফলন কম হবে। জিংকের পরিমাণ কম হলে নিমাটোড বা কৃমি রোগের আক্রমণ বেশি হবে। সুতরাং ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও ভালো ফলনের জন্য সঠিক পরিমাণ ও সময়মতো সার দেয়া দরকার।

পানি ব্যবস্থাপনা- পানি গাছের প্রাণ। মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে। অন্যদিকে জমিতে জলাবদ্ধতা হল মরিচ, বেগুন, টমেটো, পেঁপে ও অন্যান্য ফসলের ভীষণ ক্ষতি হবে। জলাবদ্ধ হলে এসব ফসলের শিকড় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নিতে পারে না এবং শেকড় পঁচে গাছ মরে যায়। সুতরাং ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও ভাল ২০২২

ফলনের জন্য সঠিক পানি ব্যবস্থাপনা দরকার। সেচ দিয়ে ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ছাড়াও পোকা দমন করা যায়। যেমন– উই পোকা, পিঁপড়া, কাটুই পোকা মাটির নিচে থাকে। জমিতে সেচ দিলে এসব পোকা সহজেই দমন হয়। তাছাড়া ফসলের বৃদ্ধি ঠিকমত হলে রোগবালাই ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়বে।

পর্যায়ক্রমে ফসলের চাষ- ফসলে সুষ্ঠু বৃদ্ধি, ভালো ফলন, রোগবালাই, পোকামাকড় এবং আগাছা দমনের জন্য পর্যায়ক্রমে ফসলের চাষ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। একই জমিতে একই ফসল পর পর চাষ করা উচিত নয়। এজন্যে ২-৩ বছরের জন্য শস্য পর্যায় ঠিক করে নেয়া দরকার। সাধারণভাবে একই ধরনের পোকা নির্দিষ্ট কোন একটি ফসলে আক্রমণ করে, অন্য ফসলে আক্রমণ করে না। যেমন- বেগুনের মাজরা পোকা, পাটে আক্রমণ করে না। বেগুনের কাঁটালে পোকা কচু বা পেঁয়াজে আক্রমণ করে না। সুতরাং একই জমিতে একই ফসল যদি পর পর করা হয় তাহলে ঐসব পোকার আক্রমণ বেশি হতে পারে।

আগে পাকে এমন জাতের চাষ করা- আগে পাকে বা আগাম ফসলের চাষ করে পোকার আক্রমণ অনেক সময় এড়ানো যায়। যেমন- বাঁধাকপি আগাম লাগিয়ে লেদা পোকার আক্রমণ, পাট আগাম বুনে বিছা পোকার আক্রমণ কমানো যায়। বেশি আগে ফসলের চাষ করলে অনেক সময় পাখি, ইঁদুর আশপাশ থেকে এসে ফসলের ক্ষতি করে থাকে। তাছাড়া ভাইরাস রোগও হতে পারে। সাধারণভাবে দেরিতে ফসলের আবাদ করলে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব বেশি হয়। যে সব ফসলের জীবনকাল কম সে সব জাতের চাষ করে ইদুর এবং ঘাস ফড়িং - এর বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কারণ ঘাস ফড়িং তার জীবনচক্র শেষ করে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষতির পর্যায়ে পৌঁছার আগেই ফসল তোলা যায়।

গাছের অতিরিক্ত শাখা প্রশাখা কেটে গাছ পাতলা করা- আক্রান্ত গাছের ডালপালা কেটেও অনেক সময় গাছকে আরো ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায়। যেমন- শুট বোরার, কান্ডের ডগার মাজরা পোকা দমন করার জন্য আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। অনুরূপভাবে রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত গাছের অংশবিশেষ পুড়িয়ে রোগ প্রতিহত করা যায়। তাছাড়া গাছের অপ্রয়োজনীয় শাখা প্রশাখা কেটে দিলে গাছ প্রচুর আলো বাতাস পেয়ে সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠবে এবং বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়বে। ঘন করে গাছ লাগালে গাছের সুষ্ঠ বৃদ্ধি ব্যাহত হবে এবং এতে বিভিন্ন রকম বালাইয়ের আক্রমণ বেশি হবে।

রোগজীবাণু ও পোকামাকড় আক্রমণমুক্ত বীজ/চারা ব্যবহার করা- রোগ ও পোকামুক্ত বীজ ব্যবহার করে ভাল ফসল আশা করা যায়। এজন্যে আক্রান্ত ফসল থেকে কোনভাবে বীজ সংগ্রহ করা উচিত নয়। তাছাড়া বীজ শোধন করে বুনলে ফসলে বালাইয়ের আক্রমণ অনেকাংশেই কমে যাবে। যেসব ফসলে ভাইরাস রোগ হয়েছে সে সব ফসলের জমি হতে বীজ কোনমতেই সংগ্রহ করা ঠিক নয়।

শোধিত বীজ ব্যবহার করা- সুস্থ সবল বীজ বেছে নিয়ে ব্যবহার করলে রোগের আক্রমণ কম হবে। গরম পানি দ্বারাও বীজ শোধন করা যায়। বিভিন্ন ঔষধ দিয়ে বীজ শোধন করে রোগের আক্রমণ কমানো যায়।

ঙ) রাসায়নিক বিষাক্ত ঔষধের দ্বারা পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন- গুড়া, তরল, দানাদার, পাউডার, এ্যারোসেল, ফিউমিগ্যান্ট, মলম প্রভৃতি ফর্মুলেশনের কীটনাশক ঔষধ পাওয়া যায়। গুড়া, তরল, পাউডার প্রভৃতি পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়।

রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার- রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করার আগে নিচের বিষয়ের উপর বিশেষ ধারণা থাকা দরকার ঃ

* বালাইনাশক ব্যবহারের আগে ফসলে কী ধরনের রোগজীবাণু বা পোকার আক্রমণ হয়েছে তা জানতে হবে।

* ঔষধ ছাড়া অন্যান্য পদ্ধতির দ্বারা দমন করা সম্ভব কি না তা যাচাই করা।
* ঝড় বৃষ্টি দ্বারা ফসলের ক্ষতির লক্ষণকে অনেক সময় পোকার আক্রমণের মত মনে হয়। এ অবস্থায় ঔষধের ব্যবহার করা ঠিক হবে না।
* এর পর ঠিক করতে হবে কী ধরনের বালাইনাশক ব্যবহার করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন অন্যান্য উপকারী পোকামাকড় ও পাখির কোন ক্ষতি না হয়।
* ঔষধ কম বা বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়। যে সব ঔষধের মেয়াদকাল শেষ হয়ে গেছে বা অতি পুরাতন হয়ে গেছে সে সব ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়।
* বালাইনাশক শেষ হয়ে গেছে বা অতি পুরাতন হয়ে গেছে সে সব ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নয়।
* বালাইনাশক ব্যবহারের সময় অনুমোদিত হারের সর্বনিম্ন মাত্রায় (ডোজ) প্রথমে ব্যবহার করা। কোন সময়ই বেশি হারে ব্যবহার করা উচিত নয়। এতে করে শত্রু দমনের সঙ্গে সঙ্গে মিত্রও ধ্বংস হয়ে যাবে।
* যে সব ঔষধ পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে সে সব ঔষধে সঠিক পরিমাণ পানি ব্যবহার করা উচিত। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পানি দিলে ঔষধের কার্যকারিতা কমে যাবে। আবার কম পানি ব্যবহার করলে ঔষধের ঘনত্ব বেশি হয়ে গাছের ক্ষতি করবে। এতে ঔষধ দেওয়ার আসল উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হবে। তবে সব সময়ই পরিষ্কার পানি ব্যবহার করতে হবে।
* কুমড়া, কাঁকরোল প্রভৃতি যে সব ফসলের পরাগায়ন মৌমাছি দ্বারা হয় সে সব ফসলে বালাইনাশক ঔষধ বিকেলের দিকে স্প্রে করতে হবে।

বালাইনাশক ঔষধ ব্যবহার করার সময়- রাগবালাই বা পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলেই তা দমনের জন্য বালাইনাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। কারণ এমন পর্যায় আছে যেখানে এসব বালাই দমন না করলেও ফসলের ক্ষতি হবে না। এ পর্যায়কে ফসলের আর্থিক ক্ষতির ন্যূনতম পর্যায় বলে। পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণে ফসলের এ নূন্যতম পর্যায়ে যে ক্ষতি হবে এ সময় ঔষধ ব্যবহার করার ফলে তার চেয়ে বেশি খরচ পড়বে।

সবাই মিশে এক সঙ্গে সমন্বিত বালাই দমন প্রণালী- সমন্বিত বালাই দমন পদ্ধতি তখনই বেশি কার্যকরি হবে যখন কোন এলাকার সব কৃষক একত্রে ব্যবস্থা নেবে। কারণ একজন কৃষক শুধু তার জমিতে বালাই দমন করলে পরবর্তীতে পাশের জমি হতে তার জমিতে আবার আক্রমণ করতে পারে।

সবজি চাষে রোগ ও পোকামাকড় দমন না করলে রোগ ও পোকামাকড়ের কারণে শাকসবজির মান ও ফলন কমিয়ে দেয়। এমনকি তা মানুষ ও শস্যে রোগের বিস্তার ঘটাতে পারে। যেমন-খনিজ পদার্থ ঘাটতি, প্রতিকূল মৃত্তিকা, পানি, পরিবেশগত ও গাছে বা ফলে সৃষ্ট ক্ষত দ্বারা রোগ জীবাণু প্রবেশ করে নানা রোগের সৃষ্টি করে। তাই এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে রোগ প্রতিরোধী জাত, বীজ শোধন, রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

চিত্রঃ রোগপ্রতিরোধী জাত, রোগমুক্ত বীজ ও বীজ শোধন

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. সবজি বাগান কত ধরনের হয় ?
২. বৈশিষ্ট্য অনুসারে মাটি কয়ভাগে বিভক্ত ?
৩. পলিকণার অনুপাতের ভিত্তিতে দোঁআশ মাটি কয়ভাগে বিভক্ত?
৪. পিএইচ-এর নিরপেক্ষ মান কত ?
৫. মাটির প্রধান রাসায়নিক বিক্রিয়ার কতটি শ্রেণি আছে ?
৬. বাংলাদেশে সবজি চাষের অধীন জমির সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব কি না ?
৭. মোট আবাদি জমির কত % জমিতে সবজি চাষ হয়?
৮. সার প্রয়োগ পদ্ধতি কতভাগে বিভক্ত ?
৯. বীজ অঙ্কুরোদগমের সময় বীজের ওজনের কত% পানির প্রয়োজন ?
১০. জমির পানি ধারণ ক্ষমতা কত %-এ পৌঁছলে অবশ্যই সেচ দিতে হবে?
১১. মাটিতে বসবাসকারী ১টি পোকার নাম লেখ।
১২. গুদামে বীজ সংরক্ষণে কীটনাশকের পরিবর্তে কী ব্যবহার করা যায়?
১৩. মালচিং কত ধরনের হয় ?
১৪. আগাছা দমন পদ্ধতি কত ধরনের ?
১৫. সবজিতে প্রধানত কয়টি পদ্ধতিতে সেচ দেয়া হয় ?
১৬. আগাছার কারণে সর্বোচ্চ কত % ফসল নষ্ট হতে পারে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গার্হস্থ্য ও বিক্রয়মূলক সবজি বাগান বলতে কী বোঝায় ?
২. মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব বলতে কী বোঝায় ?
৩. সবজি চাষে সারের চাহিদা কীভাবে নিরূপণ করা যায় ?
৪. সবজি চাষে সার প্রয়োগ পদ্ধতিগুলো কী কী এবং বিভিন্ন প্রয়োগ পদ্ধতি কেন অবলম্বন করা হয় ?
৫. ৫টি সবজির খাদ্যোপাদান পরিশোষণ এর পরিমাণ, কখন বেশি পরিশোষণ করে এবং তার হেক্টর প্রতি ফলন উল্লেখ কর।
৬. সারের কার্যকারিতা কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল?
৭. সবজির জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে পানির চাহিদা কখন তা উল্লেখ কর।
৮. পানি নিকাশের উপকারিতা বর্ণনা কর।
৯. সবজিতে সেচের প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলো কী কী এবং যে কোন একটি পদ্ধতির বর্ণনা কর।
১০. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার উপাদানগুলো কী কী ?
১১. বালাই ব্যবস্থাপনায় জৈবিক দমন বলতে কী বোঝায় ?

২০২২

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সবজি চাষের উপযোগী মাটি কোনগুলো? মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব কী এবং কীভাবে তা সংশোধন করা যায় তা বর্ণনা কর।

২. বাংলাদেশে সবজি চাষের বর্তমান অবস্থা হালনাগাদ (২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮) পরিসংখ্যানসহ উল্লেখ কর।

৩. আগাছা কীভাবে শস্যের ক্ষতি করে তা বর্ণনা কর।

৪. সবজিতে সেচের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে পৃষ্ঠদেশ পদ্ধতির বর্ণনাসহ মুক্ত প্লাবন পদ্ধতির ছবি অঙ্কন কর।

৫. ফল, মূল, কন্দ ও পাতাজাতীয় সবজির মধ্যে প্রতিটির অন্তত ৩টি করে সবজিতে কোন সময় পানির নাজুক অবস্থা হয় তা বর্ণনা কর।

টীকা লেখ

১) অম্ল ও ক্ষার মাটি

২) মাটিতে পানির পরিমাণ নির্ণয়ের সূত্রটি উদাহরণসহ বোঝাও

৩) পরিচর্যাগত পদ্ধতিতে আগাছা দমন

৪) সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা।

সপ্তম অধ্যায়

বেগুন ও টমেটোর চাষ

বেগুন চাষ

বেগুন বাংলাদেশের অতি পরিচিত সবজি। এদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, জাপান, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ইউরোপীয় দেশসহ প্রভৃতি দেশে এর চাষ হয়ে থাকে।

বেগুনের জাত

বেগুনের প্রধান প্রধান জাতের মধ্যে ইসলামপুরী, মুক্তকেশী, খটখটিয়া, শিংনাথ, মুক্তকেশী, তাল, কাজলা, নয়নতারা, উত্তরা, যশোর লোকাল, খাসা, কাইক্কা, বিজয়, কাঁটাবেগুন, লাফা, বারমেসী, ইশ্বরদী, দোহাজারী, উল্লেখযোগ্য। বারমাসি কালো ও সাদা বর্ণেরও জাত রয়েছে। বিদেশী জাতের মধ্যে ব্ল্যাক বিউটি, কোর্ট, মার্কেট, ফ্লোরিডা বিউটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে উন্নত জাতের বেগুন উৎপাদিত হয়। যথা

১. কেশি বেগুন (কুমিল্লা)	২. দি. চৌধুরী (সিলেট)	৩. ঝুমকা বেগুন (বগুড়া)
৪. খটখটিয়া পটলা কাঁটা বেগুন (দিনাজপুর)	৫. ডিম বেগুন (নেত্রকোণা)	৬. পতেঙ্গা বেগুন (চট্টগ্রাম)
৭. আমুলি (রংপুর) উত্তরা, শেষী বেগুন, চিনিয়াপাড়া	৮. বারমাসী বেগুন (সারাদেশ)	৯. বালিশ বেগুন (বরিশাল)
১০. হাটহাজারি বেগুন (চট্টগ্রাম)	১১. রাজশাহী ঝুমকা (রাজশাহী)	১২. তাল বেগুন ((শকরগাঁও)

বেগুন চাষ প্রযুক্তি- প্রায় সব ধরনের মাটিতেই বেগুন জন্মে। তবে দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটি এ ফসল ফলানোর জন্য বেশি উপযোগী। বীজ বপন ও চারা রোপণ- বীজতলায় চারা তৈরি করে নিয়ে ৫-৬ সপ্তাহ বয়সের চারা ৬০-৮০ সেন্টিমিটার দূরত্বে সারি করে ৫০-৭০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে লাগাতে হয়।

চিত্র : বেগুন গাছের কাণ্ড, পাতা ফুল ও ফল

চারা উৎপাদন- সরাসরি বীজ বুনে বেগুনের চাষ করা যায় না। প্রথমে বীজতলায় চারা তৈরি করে পরবর্তীতে রোপণ করতে হয়। প্রতি হেক্টর জমির জন্য ২৫০-৩০০ গ্রাম বীজ লাগে। এ পরিমাণ বীজ ৩ × ১ মিটার পরিমাপের ১৬-২০টি বীজতলায় বোনা যেতে পারে। বপনের আগে বীজ ১০-১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে ভালো হয়। বীজতলায় শীতের বেগুনের বীজ জুলাই এবং বর্ষার বেগুনের বীজ এপ্রিল-মে মাসে বোনা যায়। রোপণের সময় গ্রীষ্মকালীন ফসল জানুয়ারি-মার্চ, বর্ষাকালীন ফসল এপ্রিল-মে এবং শীতকালীন ফসলের জন্য আগস্ট-অক্টোবর মাসে চারা রোপণ করতে হয়।

জমি তৈরি ও সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে এবং বণ্যামুক্ত উর্বর জমি বেগুন চাষের জন্য উপযুক্ত। ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি পরিষ্কার করে পরিমাণমত দূরত্বে বেড/মাদা তৈরি করে চারা রোপণ করা যায়। তবে শেষ চাষের পূর্বে মৌল সার সমস্ত জমিতে ছিটিয়ে দিতে হয় এবং অর্ধেক গর্তে বা মাদায় দিতে হয়। অর্ধেক গোবর সার জমি তৈরির সময় সমস্ত জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক গোবর, সম্পূর্ণ টিএসপি এবং ১৩ অংশ করে ইউরিয়া ও এমওপি সার মাদা তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হয়। বাকি ইউরিয়া এবং এমওপি সার গর্তে বা তিনটি সমান কিস্তিতে রোপণের ২১, ৫ ও ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

নিচে উচ্চ ফলনের জন্য বেগুনে সার প্রয়োগ বিষয়ে উল্লেখ করা হলো

সারের নাম	সারের পরিমাণ (হেক্টর)
কমপোষ্ট	৪০০-৬০০ কেজি
সাধারণ গোবর	৪০৬ টন
ইউরিয়া	৩০০-৪০০ কেজি
টিএসপি	১৩০-১৫০ কেজি
এমওপি	১৫০-২৫০ কেজি
জিপসাম	৮০-১০০ কেজি
ডলোচুন	৩০০-৫০০ কেজি
বরিক এসিড	৮-১০ কেজি
জিঙ্ক সার	৪-৬ কেজি

চারা রোপণ ও অন্তর্বতীকালীন পরিচর্যা- গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে গাছের গোড়ার কাছের মাটি আগলা করে দিতে হয়। বীজতলায় শীতের বেগুনের বীজ জুলাই এবং বর্ষার বেগুনের বীজ এপ্রিলেও বপন করা যায়। চারা ৫-৬ পাতাবিশিষ্ট হলে জমিতে স্থানান্তরিত করে রোপণ করা হয়।

মাটিতে অধিক পরিমাণে জৈব পদার্থ দিলে ফলন ভালো হয়। চারা রোপণকালে চারার অগ্রভাগ কেটে দিলে গাছে প্রচুর শাখা-প্রশাখা বের হয় এবং তাতে গাছের অধিক পরিমাণ ফল দানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। চারা রোপণের ৪০ ৬০ দিন পরে মাটি কোদাল দিয়ে কুপিয়ে গাছের গোড়ার মাটি উঠিয়ে দেয়া ভালো।

পোকা দমন- এপিলাকনা বা কাটালে পোকার কীড়া ও বয়স্ক পোকা বেগুনের পাতা খায়। মাজরার পোকা ডগা ও ফলে ছিদ্র করে। মিলিবাগ কাণ্ড ও পাতার রস চুষে খায় এবং উরচুঙ্গা পোকা চারার গোড়া কেটে দেয়। পিঁপড়া শিকড় খায়, কাটুই পোকা চারার গোড়া কেটে দেয়। লিফ-রোলার পাতা মাড়োয় ও ভিতরে বসে পাতার সবুজ অংশ খায়। সাইপারমেথ্রিন বা ক্লোরাপাইরিফস বা ম্যালাথিয়ন ছিটিয়ে এসব পোকা দমন করা যায়। উরচুঙ্গা ও কাটুই

২০২২

পোকা দমনের জন্য সেভিন ডাষ্টিং অথবা বিষটোপ, পিপড়া দমনে ক্যাডুসাফস, মেথোক্সিক্লোর, কারবোফুরান ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগ দমন- বেগুন নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়; যথা- ব্যাক্টেরিয়াজনিত, ফিউজেরিয়ামজনিত ও ভার্টিসিলিয়ামজনিত ঢলে পড়া ইত্যাদি। বেগুনের রোগের মধ্যে ফল পচা ও উইল্ট রোগ প্রধান। রোগের জন্য মেটানোক্সাম ও ক্লোরাথোলোনিল, হেক্সাকোনোজল ৫ গ্রাম বা ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ফল পচা রোগে পাতা ও কান্ডে বাদামি দাগ পড়ে। এর জন্য রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার, প্রতিরোধী জাত ও শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হয়। একই জমিতে বারবার বেগুনের চাষ না করা, ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধের জন্য বন্য প্রজাতির বেগুনের সাথে চাষের বেগুন কলম জুড়ে দেয়া যায়।

ফল সহ- বারমাসী ব্যতিত অন্যান্য জাতের গাছের সময়সীমা রোপণের সময় থেকে প্রায় ৫ মাস পর্যন্ত সপ্তাহ করা হয়। ফল ধরা শুরু হলে জমি থেকে দুই একদিন পরপরই বেগুন সংগ্রহ করা উচিত। অন্যথায় বেগুনের কচি অবস্থা নষ্ট হয়ে খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বড় আকারের বেগুন জন্মাতে হলে মাঝে মাঝে কিছু কিছু বেগুন ঐ অবস্থায় ছিড়ে পাতলা করে ফেলতে হয়। ফলন প্রতি হেক্টরে জাতভেদে ৪০-৬০ টন হতে পারে।

টমেটোর চাষ

টমেটোর চাষ টমেটোর জাত-ফলের আকার, আকৃতি, বর্ণ, স্বাদ ও ব্যবহার এবং গাছের আকার ও প্রকৃতি অনুসারে টমেটো নানা রকমের হয়ে থাকে। যেমন- (ক) অবিরত ও (খ) সবিরত শ্রেণির টমেটো।

(ক) অবিরত- এ শ্রেণির টমেটো গাছ মরার আগ পর্যন্ত কাণ্ডের বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। গাছ ৮০ থেকে ১২০ সেমিঃ লম্বা হয়। এ ধরনের গাছে ১৫-২০ টি পাতা হওয়ার পর হতে ফুল জন্মাতে শুরু করে। গাছ লম্বা হয়, তাই কিছু শাখা প্রশাখা ছাঁটাই করে কাঠি দিয়ে বেঁধে দিলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। উদাহরণ- অঙ্গহার্ট, মারগ্লোব, মানি মেকার, সানমার্জিনো, পূষা আর্লি, জায়েন্ট, বারি টমেটো-১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ইত্যাদি।

খ) সবিরত- এ শ্রেণির টমেটো গাছ অনেকটা খাটো এবং ঝোপালো প্রকৃতির। গাছ ৪০ থেকে ৬০ সেমি. লম্বা হওয়ার পর গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এর কাণ্ডে ঘন ঘন ফুলগুচ্ছ হয় এবং একই সময়ে অধিক সংখ্যক ফল ধরে। উদাহরণ রোসা ভিএফ, পুষা রুবী, পুষা আর্লি ডোয়ার্ফ, আনবিক, মানিক, রতন, বারি টমেটো-২। এছাড়াও টমেটোর অন্যান্য জাত আছে। যেমন-পশ্চিমা জাত, জাপানি, স্থানীয় জাত।

জমি তৈরিকরণ ও সার প্রয়োগ- পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে এমন বণ্যামুক্ত উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে শেষ চাষের পূর্বে মৌল সার সমস্ত জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। তবে আগাম মৌসুমে ও খারিফ মৌসুমে টমেটো চারা জোড়া সারি পদ্ধতিতে লাগানো যায়। এজন্য ১০০ সেমি. চওড়া ও ৫-৭ সেমি. উচু করে বেড তৈরি করতে হয়। বেডের পাশ দিয়ে প্রায় ২০ সেমি, নালা তৈরি করে নিতে হয়।

সার প্রয়োগ- টমেটোর জমিতে প্রতি হেক্টরে গোবর ১৫ টন, ইউরিয়া ২৫০ কেজি, টিএসপি ১৭৫ কেজি, এমওপি ১৫০ কেজি প্রয়োগ করা যেতে পারে। গোবর ও টিএসপি সারের অর্ধেক শেষ চাষের সময়ে সমস্ত জমিতে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি অর্ধেক চারা লাগানোর সপ্তাহখানেক আগে গর্তে সার প্রয়োগ করা উত্তম।

চিত্র : পূর্ণাঙ্গ টমেটো গাছ

ইউরিয়া ও পটাশ সার সমান তিন কিস্তিতে ভাগ করে গাছের গোড়ার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। যেমন-
১) চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর প্রথম কিস্তি
২) ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয় কিস্তি এবং
৩) ফসল সংগ্রহ আরম্ভ হলে শেষ কিস্তি।

চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা-টমেটো চাষের জন্য চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সচরাচর দেখা যায় বীজতলার জমিতে বীজ বপন করে চারা দ্বিতীয় বীজতলা স্থানান্তর করা হয় না। এতে চারা দূর্বল হয়। বীজ গজানোর ৮-১০ দিন পর গজানো চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হয়। এতে চারা শক্ত হয়, সুস্থ ও সবল হয়। এই চারা রোপণ করলে ভাল ফলন দেয়।

টমেটো চাষের জন্য প্রতি হেক্টরে ১৫০-২০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। শুরুতে বীজতলায় বীজ বুনে চারা তৈরি করে নিতে হয়। ৩ ×১ মিটার মাপের বীজতলার জন্য ১০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। চারা দুই পাতা বিশিষ্ট হলে দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করে চারাকে শক্ত করে নিলে ভালো হয়। বীজতলায় বীজ ঘন করে বুনলে এবং চারায় পানি ও ইউরিয়া বেশি দিলে চারা লম্বা ও দূর্বল হয়। এরূপ চারা দ্বারা ভালো ফলন পাওয়া যায় না।

চারা রোপণ- চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে রোপণের উপযুক্ত হয়। সাধারণত অবিরত শ্রেণির টমেটোর বেলায় ১ মিটার দূরত্বে সারি করে সারিতে ৬০ সেমিঃ ব্যবধানে চারা লাগানো যেতে পারে। তবে সবিরত শ্রেণির বেলায় ৭৫ সেমি. দূরত্বে সারি করে ৫০ সেমি. দূরে দূরে চারা লাগাতে হয়। নালার গভীরতা ১৫-২০ সেমি. এবং নালার চওড়া ২৫-৩০ সেমি. করে তৈরি করতে হয়।

অন্তবর্তী পরিচর্যা- টমেটোর ভালো ফলনের জন্য গাছে খুঁটি দেয়া প্রয়োজন। বাঁশের শক্ত কাঠি অথবা ধৈঞ্চার কাঠি দিয়ে একটি ইংরেজি A অক্ষরের ন্যায় ফ্রেম তৈরি করা যেতে পারে। গাছে প্রথম ফুল দেখা দিলে তখনই ঐ ফুলের গোছার নিচে গোড়ার অংশে বাঁশের কাঠিতে হালকাভাবে বেঁধে দিতে হবে। এভাবে ফুলের গোছা বেঁধে দিলে বেশি ফলন নিশ্চিত হবে।

টমেটো গাছ যাতে অত্যাধিক ঝোপালো না হয় সেজন্য অঙ্গ ছাঁটাই করা প্রয়োজন। প্রাথমিক অবস্থায় পাতার গোড়া হতে বের হওয়া সব পার্শ্বকুঁড়ি ছাঁটাই করে দিতে হবে। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনমত নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটির উপরিভাগ ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। টমেটো চাষে ৪-৫ বার সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয়। চারা লাগানোর পর হালকা সেচ এবং পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হবে। তবে মাটির প্রকারভেদে ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। টমেটোর জমিতে প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দিলে ফসলের ক্ষতি হয়। এছাড়া টমেটো জমির মাটি স্যাঁতসেঁতে রাখা উচিত নয়।

চিত্র ঃ টমেটো গাছের খুঁটি দেওয়া

চিত্র ঃ টমেটো গাছে বাউনি দেওয়া (ইংরেজি 'A' অক্ষরের ন্যায়)

হরমোন প্রয়োগ- উচ্চ তাপমাত্রায় টমেটো গাছে ফুল ধরে না বা ফুল পরিণত না হয়ে ঝরে পড়ে যায়। এ সমস্যা প্রধানত খরিফ মৌসুমে এবং কোন কোন সময় অতি আগাম ও নাবি মৌসুমে দেখা যায়। এ সমস্যা অক্সিজাতীয় হরমোন প্রয়োগ করে অনেকাংশে দূর করা যায়। প্রয়োজনে নিম্ন অনুপাতে যে কোন হরমোনের সংমিশ্রণ তৈরি করে গাছের পাতায় ও ফুলগুচ্ছে স্প্রে করা যায়।

১. প্যারাক্লোরোফেনক্সি এসিটিক এসিড- প্রতি লিটার পানিতে ১৫-৫০ মিলিগ্রাম।
২. বিটানেপথোক্সি এসিটিক এসিড- প্রতি লিটার পানিতে ৫০-১০০ মিলিগ্রাম।
৩. ২, ৪, ডি- প্রতি লিটার পানিতে ১-৫ মিলিগ্রাম।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

জাব পোকা

এ পোকা টমেটোর অন্যতম ক্ষতিকর পোকা। এ পোকা পাতা, কঁচি ডগা ও কাণ্ড থেকে রস চুষে খেয়ে গাছের সমূহ ক্ষতি করে থাকে। এ পোকা দমনে ১০ লিটার পানিতে ১২-১৫ মিলি. ম্যালাথিয়ন বা ফাইফানন ৫৭ ইসি নামক ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এ হিসেবে হেক্টর প্রতি প্রায় ১০০ স্প্রেয়ার মিশ্রণে ১.২-১.৫ লিটার ঔষধের প্রয়োজন হয়।

চিত্র ঃ টমেটো গাছের ফ্রেম চিত্র ঃ পাখাবিহীন পূর্ণবয়স্ক জাবপোকা চিত্র ঃ পাখাযুক্ত পূর্ণবয়স্ক জাবপোকা

ঢলে পড়া রোগ- এ রোগ টমেটো গাছেরে সবচিয়ে বেশি ক্ষতি করে। রোগাক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করে অথবা মানিক ও রতন এ দুটি জাত রোপণ করে এ রোগের ব্যাপকতা কমানো যায়।

এছাড়া পাঁচ জাতীয় ভাইরাসের আক্রমণ টমেটোর গাছে দেখা যায়। এদের আক্রমণে গাছের অগ্রভাগ কুঁকড়িয়ে যায়, কাণ্ড ও পাতা খর্বাকৃতি হয়। গাছ বিকৃতভাবে কুঁকড়িয়ে যায়। গাছের বিভিন্ন অংশে দাগ পড়ে ও গাছ শুকিয়ে যায়। ঔষধ দ্বারা এ রোগ দমন করা যায় না। আক্রান্ত গাছগুলো তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ- চারা লাগানোর ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ শুরু হয়। প্রতি গাছ থেকে ৭-৮ বার ফল সংগ্রহ করা যায়। গাছের নিচের দিকের ফলে একটু লালচেভাব দেখা দিলে উঠানোর উপযোগী হয়। রঙিন নয় এরূপ টমেটো ১০-১৫.৫° সে. তাপমাত্রায় ৩০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পাকা টমেটো ১৫.৫° সে. তাপমাত্রায় ১০ দিন পর্যন্ত রাখা যায়। টমেটো বিপণনে দূরে পাঠাতে হলে পরিপুষ্ট ও লালচেভাব হলে উঠাতে হয়। একসাথে একই ঝুড়িতে ২০ কেজির বেশি সাজানো উচিত নয়। বিপণন সময় ছাড়াও ঠাণ্ডা স্থানে রাখতে হয়।

২০২২

ফলন-হেক্টর প্রতি ভরা মৌসুমে ৩০-৪০ টন এবং অন্য সময় ১৫-২০ টন।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. ১টি বেগুনের জাতের নাম লেখ।

২. বেগুণ চাষে ১ হেক্টর জমিতে কত গ্রাম বীজ লাগে ?

৩. বীজ বপনের আগে কত ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা ভালো?

৪. টমেটোর ১টি জাতের নাম লেখ।

৫. ৩ ×১ মিটার বীজতলায় কত গ্রাম টমেটো বীজ বপন করা হয়?

৬. উচ্চ তাপমাত্রায় টমেটো ফলে কী প্রভাব পড়ে ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বেগুণের ৫টি জাতের নাম লেখ।

২. বেগুণ চাষের হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ কত উল্লেখ কর।

৩. টমেটোর সবিরত জাত সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

৪. টমেটোতে হরমোন ব্যবহারের কারণ ব্যাখ্যা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বেগুণ চাষে সার ব্যবহার ও পোকামাকড় দমন সম্পর্কে বর্ণনা কর।

২. টমেটো চাষে অন্তবর্তী পরিচর্যা ও রোগ-পোকামাকড় দমন সম্পর্কে আলোচনা কর।

২০২২

অষ্টম অধ্যায়
ফুলকপি ও বাঁধাকপির চাষ

ফুলকপির চাষ

ফুলকপির জাত-উৎপাদনের সময় অনুসারে ফুলকপিকে ৩ ভাগ করা যেতে পারে যথা- আগাম, মধ্য ও নাবী। আগাম ফুলকপির জন্য সেপ্টেম্বর মাসেই চারা তৈরি করতে হয়। আগাম জাতের গাছ আকারে ছোট হয়। ফুলকপির দেশি জাতের মধ্যে অগ্রহায়ণী এবং বিদেশীজাতের মধ্যে সুপার স্নোবল, স্নোবল, স্নোক্যাপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে দেশি অন্যান্য জাতের মধ্যে পৌষালি, চিনকা মোতি, কানোয়ারি এবং বিদেশি জাতের মধ্যে সস্নোড্রিফট, হোয়াইট মাউন্টেন, স্নোবল-এক্স উচ্চ ফলনশীল। ক্রিস্টমাস জাত হচ্ছে নাবী।
বাংলাদশের ফুলকপির উন্নত জাত, যেমন- বারিসহ ফুলকপি-১(রূপা) ও অন্যান্য জাত যথা-

জাতের নাম	উৎস
কার্তিকা	দেশি, ভারত
অগ্রহায়ণী	দেশি, ভারত
পৌষালি	দেশি ভারত
পাটনাই	দেশি
রাক্ষুসি লেট	ভারত
ট্রপিক্যাল ইউনিক স্নোবল	জাপান
সুপ্রিম উইন	তাইওয়ান
হোয়াইট এক্সপ্রেস	তাইওয়ান

ফুলকপি উৎপাদন পদ্ধতি- বীজতলায় বীজ বপন ঃ আগস্টের শেষ হতে নভেম্বরে শেষ পর্যন্ত বীজ বপনের সময়। আগাম ফুলকপির জন্য বর্ষা শেষ হওয়ার আগেই চারা উৎপাদন করতে হয়। ঐ সময়ে ঘরের বারান্দায়, টবে বা গামলায় বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে। পরবর্তী ফুলকপির জন্য বীজ বাইরে বীজতলায় ফেলা হয়। সাধারণত এক হেক্টরে রোপণের প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারা উৎপন্ন করতে ১২৫-১৫০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। প্রমাণ আকারের ৩ × ১ মিটার বীজতলার জন্য ৫-৭ গ্রাম বীজ দরকার হয়। বীজ বপন করার তিন চার দিনের মধ্যে চারা অঙ্কুরিত হয়। এর প্রায় এক সপ্তাহ পরে চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করে ৪-৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করা হয়। এক মাসের বয়সের চারা নির্দিষ্ট স্থানে রোপণের উপযুক্ত হয়। ফুলকপি চাষের জন্য ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা লাগানো যায়। রোপণ দূরত্ব ৬০-৪৫ সেন্টিমিটার দিতে হয় আগাম জাতের জন্য ৬০ × ৬০ সেমি. দিতে হয় মধ্যম জাতের জন্য এবং ৭৫ × ৬০ সেমি. দিতে হয় নাবি জাতের জন্য।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ ঃ মূল জমি পুনঃ পুনঃ চাষ দিয়ে বেশ ঝুরঝুরে করে নিতে হয়। গোবর সার, কম্পোষ্ট, খৈল, ছাই ইত্যাদি সারের অর্ধেক পরিমাণ ভূমি কর্ষণকালে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ ঃ গোবর সার চারা রোপণের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট গর্তে (২৫ × ২৫ সেন্টিমিটার সাইজের) প্রয়োগ করে মাটির সাথে মেশালে ভালো হয়। ইউরিয়া ও মিউরেট অব পটাশ সারের মিশ্রণ চারা রোপণের পরে 'টপ-ড্রেসিং' অর্থাৎ উপরি প্রয়োগ পদ্ধতিতে দিতে হয়।

চিত্র ঃ ফুলকপির পুষ্পমঞ্জুরি

চিত্র ঃ ফুলকপির ঢিলা পুষ্প মঞ্জরী

ফুলকপিতে সার প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ / হেক্টর
সুষম কম পোস্ট গুড়া বা	৪০০-৬০০ কেজি
গোবর সার	৪-৬ টন
ইউরিয়া	৩০০-৩৫০ কেজি
টিএসপি	১৫০-২০০ কেজি
এমওপি	১৫০-২০০ কেজি
জিপসাম	৬০-৮০ কেজি
ডলোচুন	৩০০-৬০০ কেজি
বোরিক এসিড	৮-১০ কেজি
এমোনিয়াম মলিবডেট	৫০০-৮০০ কেজি
দস্তা সার	৪-৭ কেজি

আগাম ফসলের জন্য দোঁ-আশ এবং নাবি ফসলের জন্য ভারী মাটি উত্তম। এঁটেল দোআশ মাটিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করে ভালো ফসল জন্মানো যায়।

৫-৭ টন গোবর সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এছাড়া অম্ল মাটিতে ৪০০-৭০০ কেজি ডলোচুন এবং যথারীতি অনুসার ঘাটতি মাটিতে প্রয়োগ করতে হয়। জমি চাষের সময় অর্ধেক গোবর, সমস্ত টিএসপি ও অর্ধেক এমওপি সার প্রয়োগ করতে হয়। বাকি অর্ধেক গোবর চারা রোপণের এক সপ্তাহ পূর্বে মাদায় দিয়ে মিশিয়ে রাখতে হয়। ইউরিয়া এবং বাকি অর্ধেক এমওপি সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। চারা লাগানোর ৮-১০ দিন পর প্রথম কিস্তি এবং চারা লাগানোর ৩০ ও ৫০ দিন পর অবশিষ্ট সার যথাক্রমে উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা- ৬-৭টি পাতাবিশিষ্ট চারা রোপণ করতে হয়। আগাম ফসলের জন্য ৬০ সেন্টিমিটার পর পর সারিতে ৪০-৫০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে, মধ্যম ফসলের জন্য ৬০ সেন্টিমিটার পর পর সারিতে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে চারা রোপণ করা যেতে পারে এবং নাবি ফসলের জন্য ৭৫ সেমি. পর পর সারিতে ৬০ সেমি. পর পর চারা রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের উপযুক্ত সময় বিকাল।

রোপণের পর চারার গোড়ায় ঝাঁঝরি দিয়ে নিচু থেকে পানি সেচ দেয়া দরকার। পরদিন সকালে কলার খোল, কচুরিপানা প্রভৃতি দ্বারা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয়। এ ছাড়া বিকালে তা সরিয়ে চারায় রাতে শিশির পড়ার সুযোগ দিতে হয়। তিন-চার দিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা এবং সকাল-বিকাল পানি সেচ দিতে হয়। তারপর ছায়া সরিয়ে ফেলা হয় এবং পানিসেচ কেবল বিকালে দিলেই চলে। মাটিতে জো' আসলে গাছের সারির মধ্যবর্তী স্থানে গাছের গোড়ায় মাটি উঠিয়ে, ভেলি করে দেয়া দরকার। চারা রোপণের প্রায় দু'মাসের মধ্যে গাছে ফুল দেখা দেয়। ফুল দেখা দেওয়ার ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ফুলকপি খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ফসলের নিবিড় চাষে যেমন আগাছা দমন, সার প্রয়োগ, পানি সেচ- নিষ্কাশন এবং চটা ভেঙ্গে দেওয়া মাটি ঝুরঝুরে ও বায়ুর চলাচলের উপযোগী রাখা আবশ্যক। ফুলকপির রঙ সাদা রাখার জন্য কচি অবস্থা থেকে চারদিকের পাতা বেঁধে ঢেকে দিতে হয়। ফুল ঢেকে দেওয়ার এ পদ্ধতিকে ব্ল্যানচিং বলে।

পোকা দমন- ফুলকপির বিভিন্ন পোকার মধ্যে জাবপোকা পাতা ও ফুলের রস শোষণ করে। এফিডান, সেভিন ৫% প্রয়োগে পোকা দমন হয়। সেফস বা নেক্সিয়ন ও (০.৫%) বালাইনাশকও ছিটানো যায়। অন্যান্য পোকার মধ্যে মাছি পোকা ও মথ উল্লেখযোগ্য। এদের দমনের জন্য সাইপার- মেথ্রিন, ক্লোরোপাইরিফিস প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রোগ দমন- ফুলকপির রোগের মধ্যে ঢলে পড়া এবং মূলের গিট রোগ উল্লেখযোগ্য। এর আক্রমণে রোদের সময় গাছের পাতা ঢলে পড়ে। শিকড় ফুলে স্থানে স্থানে মোটা হয়। প্রতি ৫০ গ্যালন পানির সাথে ২৩০ গ্রাম পরিমাণে ক্যালোমেল মিশিয়ে গাছে ছিটানো ফলপ্রদ। মূল গিট রাগ এক প্রকারের নেমাটোড দ্বারা সৃষ্ট। এতে মূলে গিঁট দেখা দেয়। এর আক্রমণে ইথিলিন ডাই-ব্রোমাইড দ্বারা মাঠে ফিউমিগেশন করার প্রয়োজন হয়। মাটিতে চুন প্রয়োগেও উপকার পাওয়া যায়।

অপুষ্টিজনিত রোগ- মলিবডেনামের অভাবে হুইপটেইল রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত অম্লীয় মাটিতে এরূপ ঘটতে পারে। হেক্টরপ্রতি ১.২ কেজি পরিমাণে সোডিয়াম কিংবা এমোনিয়াম মলিবডেট প্রয়োগে এ সমস্যা দূর হয়। বোরণের অভাবে কাণ্ডের ভিতরে বাদামি বর্ণের দাগ হয়। কখনও কখনও বিক্ষিপ্ত ফাঁপা কাণ্ডের সৃষ্টি হয়। অম্লীয় মাটিতে হেক্টর প্রতি ১২-১৫ কেজি পরিমাণে সাধারণ বোরাক্স সোডিয়াম টেট্রাবোরেট প্রয়োগে এ রোগ দমন করা যায়।

বোতামায়ন- বোতামায়ন (Buttoning) রোগে ছোট আকারের গাছে অতি ছোট আকারের ফুল হয়। নাইট্রোজেনের অভাবে কিংবা খাদ্য উপাদানের ঘাটতিতে এরূপ ঘটতে পারে। অনেক সময় ফুলকপি ক্ষুদ্র আকারের প্রাকমঞ্জুরি উৎপাদন করে। এগুলো বিক্রির উপযুক্ত নয় এবং বাজারে চাহিদা কম।

বোতামায়নের কারণ ও প্রতিকার

(১) অকালে ফুলকপি গাছে প্রাকমঞ্জরি উৎপাদিত হওয়াই বোতামায়নের কারণ।

(২) আগাম জাত নয় এমন জাত আগাম হিসাবে চাষ করলে বোতামায়ন বেশি হয়।

(৩) আগাম জাতেই বোতামায়ন বেশি হয়।

(৪) ফুলকপির প্রাকমঞ্জুরি উৎপাদন তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

(৫) আগাম জাতের গাছ নিম্ন তাপমাত্রায় উন্মাচিত হলে বোতামায়ন হয়।

(৬) বীজতলায় অনধিক ১০ সেন্টিমিটার উঁচু ও মাত্র কয়েকটি পাতাধারী গাছেও বোতামায়ন হতে দেখা যায়।

(৭) চারা রোপণ করতে দেরি হলে কিংবা রোপণের পর কোনো কারণে চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হলে। বোতামায়নের আশংকা বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার- বোতামায়নের সমস্যা দূর করতে হলে বর্ষা শেষ হওয়ার আগেই বা আগামজাত আগাম মৌসুমে লাগাতে হয়। গাছ যাতে দ্রুত বাড়ে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে জমির উর্বরতা বাড়াতে হয়।

মখমলায়ন ঃ ফুলকপির প্রাকমঞ্জুরি ঢিলে-ঢালা হয়ে মখমলের মতো রূপ ধারণের নাম মখমলায়ন। এ অবস্থার প্রাকমঞ্জরি কিছুটা ফেঁটে যায়, উপরিভাগ ঠাসা, দৃঢ় ও মসৃণ না হয়ে কিঞ্চিত নমনীয় ও উঁচু-নিচু হয়ে যায়। প্রাকমঞ্জুরি থেকে সাদা ফুলকুঁড়ি উঠানামা বেশি হলে ফেঁটে যাওয়া অবস্থা সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

সেচ ও নিষ্কাশন- বৃষ্টি বা সেচের কারণে মাটিতে চটা ধরলে তা ভেঙ্গে ঝুরঝুরে করে দিতে হয়। পানিবদ্ধতা নিরসনে ও সেচের জন্য ভেলি/মাদা করে রোপণ করতে হয়। এ মাদার ফাঁকের মধ্য দিয়ে মাটিতে রসের ঘাটতি হলে, সেচ দিতে হয়। ফুলকপির জমিতে কিছু সময় পানি বেঁধে থাকলে এবং সে সময় চারা ছোট থাকলে বেশি ক্ষতি হয়। তাই জমিতে যাতে পানি বাঁধতে না পারে সেজন্য ভাল নিষ্কাশন ব্যবস্থা রাখতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ- ফুল ফোটা শুরু হবার পূর্বেই ফুলকপি বেশ দৃঢ় থাকা অবস্থায় তা সংগ্রহ করা উচিত। অন্যথায় কপি ফেটে যেতে পারে কিংবা রং খারাপ হয়ে যেতে পারে। ঠাণ্ডা গুদামে ৩২ ডিগ্রী ফাঃ তাপে একমাস পর্যন্ত রাখা যায়। জমি থেকে তালোর প্রায় সপ্তাহ খানেক পূর্বে নেপথলিন এসেটিক এসিড ছিটিয়ে পরে ঠাণ্ডা পরিবেশে দেড় মাস পর্যন্ত ফুলকপি অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়।

ফুল ফোটার পর সংগ্রহকালে বাহিরের চারপাশের পাতাগুলো এমনভাবে ছাঁটতে হয় যাতে পাতা দ্বারা ফুল বেশিরভাগ ঢাকা থাকে। তাতে পরিবহণকালে সূর্যের আলোতে বা পরিবহণজনিত কারণে নষ্ট হতে পারে না। বাঁশের ঝুড়িতে বাছাই করে গ্রেড অনুযায়ী নিচ হতে উপরে সাজায়ে নিলে ফুলকপির গুণাগুণ সহজে নষ্ট হয় না।

বাঁধাকপির চাষ

বাঁধাকপির জাত

এ কপির দেশি ও বিদেশি উভয় ধরনের জাত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আবার আগাম ও নাবী জাত রয়েছে। আগাম জাতের চারা অক্টোবর-নভেম্বর এবং নাবী জাতের চারা ডিসেম্বর মাসে রোপণ করা হয়। বিদেশি জাতের মধ্যে চার্লসটন, ওয়কফিল্ড, জার্সি ওয়কফিল্ড, কোপেনহেগেন মার্কেট, গোল্ডেন একর, আর্লি রাউন্ড ডাচ আলফা, অলহেড আর্লি গ্লোবগ্লোরি, একস্ট্রা আর্লি এক্সপ্রেস ইত্যাদি আগামজাত। নাবী জাতের মধ্যে গ্লোব, ম্যারিয়ন মার্কেট বোনাঞ্জ বাঞ্চউইক, কোহিনুর, ড্রামহেড, ডেনিশ বলহেড, ভলগা, রেড ডেনিশ, লার্জ রেড ইত্যাদি। কে কে ক্রস ও কে ওয়াইক্রস জাতের বাঁধাকপি গ্রীষ্মকালেও জন্মানো যায়।

২০২২

বাংলাদেশে উদ্ভাবিত উন্নত বাঁধাকপির জাত- বাংলাদেশে উদ্ভাবিত বাঁধাকপির ২টি জাত রয়েছে। এসব জাত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত।
(১) বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী) ও (২) বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত)

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ- বাঁধাকপি আলোকিত স্থানে রোপণ করলে বেশি ফলন দেয়। এর বেশি পরিমাণ খাদ্যোপাদান লাগে। আবার জলাবদ্ধতা, খরা ও সরস কোনটিই সহ্য করতে পারে না। তাই বণ্যামুক্ত ও সুনিষ্কাশিত বেলে দোঁআশ বা এঁটেল দোঁআশ মাটিতে জো' অবস্থায় গভীরভাবে ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে ঢেলামুক্তভাবে জমি তৈরি করতে হয়। আগাম মৌসুমে বা গ্রীষ্ম মৌসুমের জন্য বেড় করে চাষ করতে হয়।

সার প্রয়োগ- গোবর সার ও ছাইয়ের সম্পূর্ণ অংশ ভূমি কর্ষণকালে সারা জমিতে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। আবার মাঠে অর্ধেক অংশ প্রয়োগ করে বাকি অর্ধেক চারা রোপণের গর্তে দেয়া যায়। তবে খৈল ও সুপার ফসফেট অর্ধেক জমিতে দিলে বাকী অর্ধেক চারার গর্তে চারা রোপণের ২ সপ্তাহ পূর্বে মাটির সাথে মিশাতে হয়। ইউরিয়া সার এবং মিউরেট অব পটাশ সার চারা রোপণের প্রায় দু'সপ্তাহ পরে উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

সার প্রয়োগ মাত্রা- ইউরিয়া, ৩৫০-৩৭৫ কেজি টিএসপি, এমওপি এবং গোবর সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শেষ চাষের সময় সবটুকু কম্পোস্ট, ফসফেট, খৈল ও অর্ধেক পটাশ সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে ফুলকপি চাষ করা যায়। সম্পূর্ণ ইউরিয়া ও বাকি এমওপি সার তিনটি সমান কিস্তিতে ভাগ করে চারা রোপণের ১০ দিন ও ২৫ দিন পর এবং কপির মাথা বাঁধার সময় প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
সুষম কমপোষ্ট	৪০০০-৬০০০
ইউরিয়া	২০০-২৫০
টিএসপি	১৫০-২০০
এমওপি	১০০-১৫০
ডলোচুন (অম্ল মাটির জন্য)	৪০০-৬০০
জিপসাম	৬০-৮০
বোরিক এসিড	৮-১১
ছাই	২০০০-৩০০০
খৈল (পঁচা)	৫০০-৭০০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

ক. ইউরিয়া ব্যতিত সব সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

খ. ইউরিয়া ২-৩ ভাগে জমি প্রস্তুত, চারা রোপণের ২০-৩০ দিন পর এবং ৫০-৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়। যদি জমি প্রস্তুতের সময় দেয়া না হয় তাহলে ২ বারেও ইউরিয়া প্রয়োগ করা হয়।

২০২২

চিত্র ঃ বাঁধাকপির আটসাট মাথা

চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা

চারা রোপণ- সাধারণত বীজ দিয়েই বাঁধাকপির বংশবিস্তার করা হয়। তবে প্রয়োজনবোধে অযৌন পদ্ধতিতেও বংশবিস্তার সরা সম্ভব। কপি সংগ্রহ করার সময় গাছের কান্ডের নিম্নাংশ মাটিতে থেকে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই সে অংশ থেকে অনেকগুলো করে গুঁড়িচারা (কাক্ষিক মুকুল) গজায়। মাটি দিয়ে ঢেকে রাখলে এগুলোর গোড়ার দিক থেকে শেকড় গজালে সেগুলোকে আলাদা করে লাগালে এসব চারা থেকে পূর্ণাঙ্গ গাছ উৎপন্ন হয়।

বাঁধাকপির জন্য হেক্টর প্রতি ১৫০-১৮০ গ্রাম বীজ লাগে। এক হেক্টরের জন্য ৩ ×১ বর্গমিটার আকারের ২০টি বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। বীজ বোনার ৪-৬ সপ্তাহ পর চারা রোপণের উপযোগী হয়। বাঁধাকপির জাত ও চাষ মৌসুমের ওপর রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে। একই জাত আগাম না করে রবি মৌসুমে জন্মালে বড় মাথা উৎপাদন করবে।

আগাম জাতের গাছ সাধারণত নাবী জাতের গাছ অপেক্ষা ছোট হয়। তাই পরিস্থিতি অনুযায়ী রোপণের দূরত্ব হয়। সারির মধ্যে ৫০-৭০ সেন্টিমিটার এবং চারার মধ্যে ৪০-৬০ সেন্টিমিটার।

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখতে হয়। রোপণের পর প্রথম দিকে মাটি ঝুরঝুরে রাখতে হয়। এজন্য মাঝে মাঝে বিশেষ করে সেচ দেয়ার পর জমিতে জো' আসলে কোদালের পাতলা কোপ দিয়ে জমির চটা ভেঙ্গে দিতে হয়।

সেচ প্রয়োগ- মাটিতে পানির মোট ধারণ ক্ষমতার ৫০-৬০% পানি রাখলে বৃদ্ধি দ্রুততর হয় এবং এর ফলন ভালো হয়। ২০২২

পোকা দমন ঃ জাবপোকা পাতার রস চুষে খায়। সরুই পোকা ও শুয়া পোকা পাতা খায়। কিন্ত ক্রিকেট, চোরা পোকা এবং কাটুই পোকার শুককীট চারার গোড়া কাটে। এফিডান ডাষ্টিং (৫%) লেফস কিংবা ল্যামডা সাইহ্যালোথ্রিনের সাহায্যে জাব পোকা, সেভিন বা ম্যালাথিয়নের সাহায্যে চোরা ও সরুই পোকা দমন করা যায়। সাইহ্যালোথ্রিন এবং কার্বোফুরান দ্বারা ক্রিকেট পোকা, চোরা পোকা, কাটুই পোকা দমন করা যেতে পারে।

রোগ দমন- বাঁধাকপি ঢলে পড়া এবং মূলের গিঁট বা দাগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। ম্যানকোজেব বা কপারঘটিত বালাইনাশক দ্বারা এ রোগ দমন করা যায়। বাঁধাকপির চারা তৈরির সময় বীজতলায় ঢলে পড়া রোগ হলে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মাটির উপরে আসার পূর্বে অনেক সময় বীজ পচে যায়। আবার চারা মাটির উপরে আসার পর অনেক সময় গোড়া দ্রুত পঁচে যায়।।

চিত্র ঃ বাঁধাকপি ও টমেটোর মিশ্র চাষ

চিত্র ঃ বীজতলায় চারার ঢলে পড়া রোগ

চিত্র ঃ জাব পোকা

সেচ ও নিষ্কাশন ঃ বাঁধাকপিতে প্রচুর পানি লাগে। কিন্তু জমিতে জলাবদ্ধতা হলে গাছ/চারা লাল হয়ে মারা যায়। তাই সেচের ফলে বা বৃষ্টিতে যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য এক বা দুই সারি পর পর পানি নিকাশের নালা তৈরি করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ- মোটামুটি মাথা বাঁধলেই সংগ্রহ ও বাজারজাত করা যায়। এতে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। পরের দিকে এটি বেশ ভালোভাবে বেঁধে দৃঢ় হলে দ্রুত সংগ্রহ করা উচিত। বাঁধাকপি ঠান্ডা গুদামে বেশ কিছুদিনের জন্য রাখা যায়। সচরাচর হিমাগারে ৩২০ ফাঃ তাপমাত্রায় ৩ সপ্তাহ বাঁধাকপি সংরক্ষণ করা যায়। স্বাভাবিকভাবে হেক্টরপ্রতি ২০-২৫ টন পর্যন্ত ফলন হতে পারে, তবে মিশ্র চাষে অতিরিক্ত ফসলসহ সাকুল্যে অন্তত ৩০ টন সবজি পাওয়া যেতে পারে।

২০২২

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. ফুলকপির ১টি দেশী জাতের নাম লেখ।
২. ৩ × ১ মিটার বীজতলায় কত গ্রাম ফুলকপির বীজ বপন করা হয় ?
৩. ফুলকপির চারার কয়টি পাতা হলে রোপণ করতে হয় ?
৪. ফুলকপির ১টি জাতের নাম লেখ।
৫. উৎপাদনের সময় অনুসারে ফুলকপি কয়ভগে বিভক্ত?
৬. রূপা কোন দেশের ফুলকপির জাত ?
৭. ফুলকপি চাষের জন্য ১টি আদর্শ বীজতলায় কত গ্রাম বীজ বুনতে হয় ?
৮. ফুলকপির চারা লাগানোর কতদিন পর প্রথম উপরি প্রয়োগের সার দিতে হয় ?
৯. বাংলাদেশে উদ্ভাবিত বাঁধাকপির কয়টি জাত আছে?
১০. অগ্রদূত বাঁধাকপি বারি উদ্ভাবিত কত নং জাত ?
১১. বাঁধাকপির চারা কতদিনে রোপণ উপযোগী হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বোতামায়ন বলতে কী বোঝায় ?
২. ফুলকপি চাষে সারের পরিমাণ উল্লেখ কর।
৩. ফুলকপির বোতামায়ন প্রতিকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।
৪. বাঁধাকপির জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে লেখ।
৫. বাঁধাকপির রোগ ও পোকা দমন এবং সেচ ও নিষ্কাশন সম্পর্কে লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ফুলকপির জাত, রোপণ দূরত্ব, সার প্রয়োগ ও বালাই দমন সম্পর্কে বর্ণনা কর।
২. বাঁধাকপির রোপণ দূরত্ব, সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি এবং অন্তবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

টিকা লেখ

১) বোতামায়ন
২) মখমলায়ন

নবম অধ্যায়
মূলা, লালশাক, ডাঁটাশাক, পালংশাক চাষাবাদ

মূলার জাত

আগামজাত-মিনো আর্লি, গ্লো হোয়াইট, রেড বোম্বাই, খাসি কাটা লাল, বারি মূলা-৩ (দ্রুতি) ইত্যাদি।
মাধ্যমজাত- তাসাকি সান, মিনো আর্লি, বারি মূলা-২, পিংকি ইত্যাদি।
নাবিজাত-মিনো আর্লি ইত্যাদি।

জমি তৈরিকরণ ও সার প্রয়োগ

মূলার জমি খালোমেলা ও আলোকিত পরিবেশের হতে হবে। গভীরভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাটি মোলায়েম করে তৈরি করতে হয়। জমি মোলায়েম করার জন্য প্রয়োজনবোধে ৭-৮টি চাষ দিতে হয়। মূলার জমির মাটি যত মিহি হবে তত মূলার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। জমি সমতল হতে হবে। জমির চারদিক দিয়ে জুলি রাখা যেতে পারে। আবার বেড করে চাষ করা যায়।

মূলা বাড়ন্ত অবস্থায় প্রথম বয়সে বেশি পরিমাণে নাইট্রোজেন এবং শেষ বয়সে বেশি পরিমাণে পটাশিয়াম গ্রহণ করে। মূলা চাষের হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো।

			উপরি প্রয়োগের মাত্রা ও সময়		
সারের নাম	মোট পরিমাণ	মৌল সার	৪/৫ পাতা	৮/১০ পাতা	১৪/১৫ পাতা
গোবর/কম্পোস্ট	১০ টন	১০ টন	-	-	-
ইউরিয়া	২০০ কেজি	১০০ কেজি	৫০ কেজি	৫০ কেজি	-
টি.এস.পি	১২৫ কেজি	১২৫ কেজি	-	-	-
এমওপি	২০০ কেজি	৫০ কেজি	২৫ কেজি	৭৫ কেজি	৫০ কেজি

সার প্রয়োগের নিয়ম- মূলা চাষে ছিটানো প্রথায় বীজ বপন করলে মৌল সার শেষ চাষের পূর্বে সম্পূর্ণ জমিতে ছিটিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

সমতল জমিতে লাইন করে বীজ বপন করলে- ইউরিয়া এবং এমওপি সার উপরি প্রয়োগ হিসেবে মাটিতে প্রয়োগের সময় হাত লাঙ্গল দিয়ে দু'সারির মাঝখান দিয়ে লাইন টানতে হবে। লাঙ্গল দিয়ে নালা তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছের শেকড় ছিড়ে না যায়। লাইন টেনে লাইনে সার দেয়ার পর মাটি সমান করে দিতে হবে।

সারি বা নালা প্রথায় বীজ বপন করলে- জমিতে নালা কেটে নালার মধ্যে সার প্রয়োগ করতে হবে। নালা মাটি দিয়ে ভরাট করে তার উপর হালকা উচু বেড তৈরি করতে হবে। বেডের মাঝখান দিয়ে লাইন টেনে বীজ রোপণ করতে হবে। এরপর সার উপরি প্রয়োগের সময় বেডের পাশ্ববর্তী নালায় ছিটিয়ে দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া যেতে পারে।

মূলার বাড়– বাড়তি ভালো থাকলে এবং গাছ যথেষ্ট সতেজ থাকলে দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া দেয়া উচিত নয়। জৈব সার মৌল হিসেবে পূর্বে (জমি তৈরির সময়) দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় মূলার গায়ে শেকড় গজানোর প্রবণতা বাড়ে এবং কাঁচা সারের সংস্পর্শে মূলার পচন ধরে।

বীজ বপন ও অন্তবর্তী পরিচর্যা

জমিতে ১ মিটার চওড়া বেড করে ৩ সারি করে ৪০ সেমি. দূরে দূরে সারি করে বীজ বুনতে হয়। জোড়া সারি প্রথায় বীজ বপন করলে বেডের উপরে ২৫-৩০ সেমি. দূরত্বে সারি করতে হয়। সারিতে ১০-১২ সেমি. পর পর ২-৩টি করে বীজ বুনতে হয়। চারা গজানোর ৭-১০ দিন পর প্রতি স্থানে ১টি করে সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলতে হয়। অনেক সময় সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে বীজ না বুনে লাইনে এক নাগাড়ে বীজ বুনা যায়। চারা গজানোর ৭-১০ দিন পর নির্দিষ্ট দূরত্বে ১টি করে চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলতে হয়।

এছাড়া বীজ বপনের আগে সারি বরাবর ১৫ সেমি. গভীর নালাকেটে তার উপরে বেড তৈরি করা যায়। ঐ বেডে বীজ বুনলে মুলা ভালভাবে বড় হতে পারে ও ফলন বেশি হয়। ছিটিয়ে বপন করলে গাছের ঘনত্ব বেশি হলে মুলা বড় হতে পারে না এবং ফলন কমে যায়। ভাল ফসলের জন্য ছিটিয়ে বপন করা জমিতে ১০-১২ সেমি. দূরে দূরে গাছ রাখতে হয়। জমিতে সেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখা উচিত। এজন্য জমির চার ধার দিয়ে সেচ নিকাশের জন্য ৩০ সেমি. চওড়া ও ২০ সেমি. গভীর নালা তৈরি করতে হয়। মূলার জমিতে ভাসানো সেচ দেওয়া উচিত নয়। সেচের পরে মাটির চটা ভেঙ্গে আগলা করে দিতে হয়। অনেক সময় মুলা তিতা ও বিবাদ হওয়ার কথা শোনা যায়। পোকার আক্রমণ এর প্রধান কারণ নয়। উষ্ণ জলবায়ুতে চাষ করা হলে বা নাইট্রোজেনের চরম ঘাটতিতে বা কিউকার বিটাসিনের উপস্থিতির জন্যও এরূপ হতে পারে।

চিত্র : তাসাকি সান মূলার জাত

মূলার জমি সর্বদা আগাছামুক্ত, ঝুরঝুরে ও পর্যায়ক্রমে দুর্বল ও নিস্তেজ গাছ তুলে পাতলা করে দিতে হয়।

মূলার বীজ উৎপাদন– মূলার বীজ উৎপাদনের জন্য ফুল বের হওয়ার ঠিক আগে মূলা তুলে নিতে হয়। এরপর মূলার শাঁশালো অংশ ৪-৫ সেমি. ও পাতার গোড়ার ৫ সেমি, পাতাসহ ডঁটা রেখে অন্যান্য অংশ কেটে দিতে হয়। ঐ কাটা মূলা ১ দিন ছায়ায় রেখে কাটাস্থান শুকিয়ে নিতে হয়। পরবর্তী দিন বেড় আকারের তৈরি জমিতে রোপণ করতে হয়। এছাড়া অন্যভাবেও বীজ উৎপাদন করা যায়। যেমন- ফুল আসার সাথে সাথে মাটির উপরে মূলার সম্পূর্ণ অংশ (পাতার নিচে) দুপাশ থেকে মাটি তুলে ঢেকে দিতে হবে। বীজের জন্য দুলাইনের মাঝখান দিয়ে হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া ও ১০০ কেজি পটাশ সার ছিটিয়ে দিতে হয়। সার দেওয়ার পর মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিয়ে প্রয়াজনমত সেচ দিতে হয়।

বীজের মান ঠিক রাখার জন্য ৫০০ মিটারের ভেতরে অন্যজাতের মূলা চাষ করা যাবে না। ভালোমত যত্ন নিলে হেক্টর প্রতি ২.৫ থেকে ৩.৫ টন বীজ উৎপাদন করা সম্ভব।

পোকামাকড় দমন- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।
জাব পোকা- এ পোকা পাতার কঁচি অংশের রস শুষে খেয়ে গাছের সমূহ ক্ষতি করে। এ পোকা পাতার নিচে, কাণ্ডে বসে রস খায়। দমনের জন্য ১.১২ সিটার ডাইমেথোয়েট ঔষধ ৫৬০-৭০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে এক হেক্টর জমিতে স্প্রে করতে হবে। ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ঔষধ ৬০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে এক হেক্টর জমিতে স্প্রে করতে হবে।

বিছা পোকা- এ পোকার রং গোলাপী থেকে হালকা সবুজ হতে পারে। তবে কীড়ার গায়ে কালো কালো ডারো দাগ দেখা যায়। কীড়াগুলো কাণ্ডের কচি অংশ খেয়ে নষ্ট করে। জাব পোকা দমন পদ্ধতির ন্যায় এ পোকা দমন করা যায়।

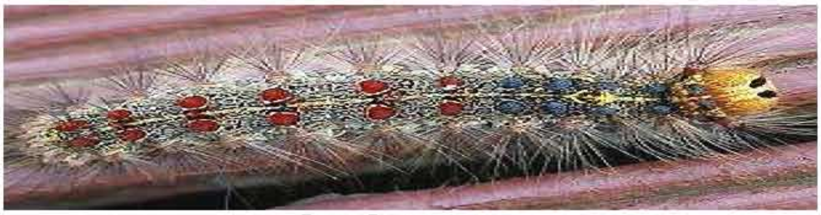

চিত্র ঃ বিছা পোকা

রোগবালাই- মূলার রোগবালাই তেমন হয় না। মূলার অন্তসার কালো এবং অন্তসার ফাঁপা রোগ- সাধারণত মূলার বৃদ্ধির সময় নাইট্রোজেন সারের আধিক্য এবং পটাশিয়ামের অভাবে এ রোগ হতে পারে। এটি রোগ হিসেবে গণ্য করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি দেহক্রিয়াগত সমস্যা।

সেচ ও নিকাশ- মাটিতে রস কম থাকলে ৭-১০ দিনের মধ্যেই সেচ দিতে হয়। মূলার জমিতে পাবন সেচ দিলে জমিতে চটা পড়ে ও মাটি তাড়াতাড়ি শুকায়ে যায়। জমিতে পানি জমে থাকলে মূলার চারা নষ্ট হয়ে যায়। কোন সময় মূলার জমিতে যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য মাঝে মাঝে নালার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ- বীজ বপনের তিন সপ্তাহ পর থেকে মূলাশাক উঠানো যায়। কিন্তু মূলা উঠানোর উপযোগী হতে প্রায় ৬-৭ সপ্তাহ সময় লাগে। এ সময়ে প্রতিটি মূলার ওজন প্রায় ৮০০-৯০০ গ্রাম হয়ে থাকে। তাসাকী সান মূলা ৬০-৬৫ দিনের মধ্যেই না উঠালে ফাঁপা ও আঁশযুক্ত হলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। মূলার উদ্দেশে চাষ করা হলে ৬০-৮০ দিনে মূলা উঠাতে হয়। আর বীজ তৈরির উদ্দেশে মূলা চাষ করলে ১২০-১৫০ দিনে বীজ উঠানোর উপযোগী হয়।

২০২২

ফলন- জাতভেদে ও যত্নের ওপর নির্ভর করে হেক্টর প্রতি ৩০-৫০ টন হতে পারে।

লাল শাকের চাষ

লাল শাকের জাত- আলতা পেটি, বারি লালশাক-১, পিংকি কুইন, রক্তলাল ইত্যাদি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

প্রথমে ৫-৬টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে এবং আগাছা পরিষ্কার করে জমির মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। রবি মৌসুমে লালশাকের বীজ সরাসরি জমিতে বপন করা যেতে পারে। তবে খারিফ মৌসুমে লালশাকের বীজ অবশ্যই বেড করে বপন করা উচিত। এক মিটার প্রশস্ত বেডের পাশে ৩০ সেমি. প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সেমি. গভীর করে নালা করতে হবে। এতে সেচ ও পানি বিকাশের সুবিধা হবে। বেড আকারে তৈরি করা না হলে জমিকে কয়েক খন্ডে বিভক্ত করে নিতে হবে। প্রতি খন্ডের পাশ দিয়ে লাঙ্গল দ্বারা হালকা নালা তৈরি করতে হবে। প্রত্যেকটি জুলি জমির চারিদিক দিয়ে পানি বের হওয়ার ড্রেনের সাথে সংযোগ করে দিতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ হেক্টর	সার দেওয়ার সময়
গোবর	১০,০০০ কেজি	মৌল হিসেবে সম্পূর্ণ সার
ইউরিয়া	৬০ কেজি	মৌল হিসেবে অর্ধেক, উপরি প্রয়োগ হিসেবে। একবারে বাকী অর্ধেক
টিএসপি	৬০ কেজি	-ঐ-
এমওপি	৬০ কেজি	-ঐ-
জিপসাম (প্রয়োজনে)	৫০ কেজি	-ঐ-
পচা খৈল	২৫০ কেজি	-ঐ-

প্রতি হেক্টর জমিতে ১০ টন গোবর সার এবং ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম (প্রয়োজনে) ও পঁচা খৈল যথাক্রমে ৬০, ৬০, ৬০, ৫০ ও ২৫০ কেজির প্রয়োজন হয়। অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যসবগুলো সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার মিশানোর পর জমির উপরিভাগ সমান করে দিতে হয়। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া সার বীজ গজানোর ১০-১৫ দিন পর ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সারের উপরি প্রয়োগের পর মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে হালকা সেচ দিতে হবে।

খৈল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন- খৈল গুড়া করে হালকাভাবে ভিজিয়ে প্রায় ২-৩ সপ্তাহ জাগ দিয়ে রাখতে হবে। এরপর খৈল পঁচে দুর্গন্ধমুক্ত হলে একমাত্র তখনই জমিতে প্রয়োগ করা যাবে। অন্যথায় শাকের অনেক ক্ষতি করতে পারে। পঁচা খৈল ছিটানোর সুবিধার্থে ছাই বা দোঁ-আশ মাটি মিশিয়ে ঝুরঝুরে করে নেয়া যেতে পারে।

বীজ বপন ও অন্তবর্তী পরিচর্যা- রবি মৌসুমে-আশ্বিন থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়।

কার্তিকের শেষে (নভেম্বরের প্রথমে)- এ সময় বপন করলে লাল শাকের সবচেয়ে বেশি ফলন হয়, তবে লাল শাকের উৎপাদন আমাদের দেশের জলবায়ুতে বছরের যেকোন সময় হয়ে থাকে। লাল শাক উৎপাদনে প্রতি হেক্টর জমিতে বীজের পরিমাণ নিচে দেয়া হল। যথা-

২০২২

(ক) ছিটিয়ে বপন করলে-৪ থেকে ৫ কেজি এবং (খ) সারিতে বপন করলে-২ থেকে ২.৫ কেজি।

সাধারণত সম্পূর্ণ জমিকে কয়েক খন্ডে ভাগ করে নেয়া উচিত। তারপর সমস্ত জমিতে একবারে বীজ না বুনে ২-৩ সপ্তাহ পর পর বিভিন্ন খণ্ডে বীজ বপন করলে সব সময় শাক উঠানোর সুযোগ হয়। রসের ঘাটতি থাকলে বীজ বপনের পূর্বে সেচ দিয়ে জো' আসার পর বীজ বপন করা উচিত। বীজ বপনের পর সেচ দিলে বীজ মাটির গভীরে চলে যায়। এতে বীজ গজানোর হার হ্রাস পায়।

জমিতে সমানভাবে বীজ বপনের সুবিধার জন্য একভাগ বীজ এবং নয় ভাগ বালি বা ছাই এক সাথে মিশিয়ে নিতে হয়। এরপর বালি মিশ্রিত বীজ সমভাবে ছিটিয়ে হালকাভাবে কুপিয়ে বা আঁচড়া দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। আঁচড়া দেওয়ার পর হালকাভাবে মই দিয়ে জমি সমান করে দিতে হয়।

পরিচর্যা- বীজ গজানোর ১ সপ্তাহ পরেই ঘন জায়গা হতে অতিরিক্ত চারাসহ দূর্বল চারাগুলো তুলে ফেলতে হয়। সারিতে বপন করা হলে সারিতে ৩-৪ সেমি. দূরে দূরে ১টি করে গাছ রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলতে হয়। ছিটিয়ে বপন করা জমিতে প্রতি বমি. এ ১০০-১৪০টি গাছ রাখতে হবে। নিড়ানি দিয়ে জমি আগাছামুক্ত ও মাটি আগলা রাখতে হবে। পানি সেচ ও নিকাশের সুবিধার্থে ৭-১৫ মিটার দূরে দূরে আড়াআড়িভাবে নালা করে দিতে হয়। সেচ দেয়ার বা বৃষ্টি হওয়ার পর পরই 'জো' আসার সাথে সাথে মাটি আগলা করে ঝুরঝুরে করে দিতে হয়। এর ফলে মাটি শক্ত হয় না, রস থাকে এনং আগাছা হতে পারে না।

পোকামাকড়- শুয়া পোকা ও শাকের পাতা খেয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলে। ফেনিট্রোথিয়ন ১-২ মিলি, প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে দমন করা যায়।

রোগবালাই- মরিচা রোগ- গাছের শিকড় ছাড়া সকল অংশেই মরিচা রোগ আক্রমণ করে। এর আক্রমণে নিচে সাদা অথবা হালকা হলুদ দাগ দেখতে পাওয়া যায়। পরে সেগুলো লালচে বা মরিচা রং ধারণ করে এবং পাতা মরে যায়। এ রোগ দমনের জন্য ১০০০ লিটার পানিতে ১৫০০ গ্রাম ডায়াথেন এম-৪৫ বা কপারঘটিত বালাইনাশক মিশিয়ে স্প্রে করা যায়।

সেচ ও নিকাশ- লালশাকের জমিতে রস বা জো থাকলে শাক নরম ও রসালাে থাকে। লালশাক যেহেতু অল্প দিনের ফসল, তাই বিশেষ প্রয়োজন হলে ১ বার সেচ দিলেই যথেষ্ট। সেচের পানি কোথাও জমে থাকলে সেখানকার শাক ফ্যাকাশে লালচে হয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং বাড়ন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তাই সেচের বা বৃষ্টির পানি যাতে সহজে নিকাশ হতে পারে সেজন্য চারিদিক দিয়ে নালা করে রাখতে হয়। এছাড়া বেড় করে চাষ করলে জমিতল অপেক্ষা ৫-৭ সেমি. উচু করলে আর পানি বন্ধ হয়ে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ- ছায়ার সময় বা বিকালে শাক উঠিয়ে ২৫০ গ্রাম হতে ৫০০ গ্রাম করে মুঠি বেধে হালকা পানি ছিটিয়ে দিতে হয়। বাজারে পাঠাতে বিলম্ব হলে রাতে বাঁধন খুলে শিশিরে রাখতে হয়। হেক্টর প্রতি ফলন ১০-১৫ টন।

ডাটা শাকের চাষ

ডাটা বাংলাদেশের একটি প্রধান পাতা ও কাষ্ঠজাতীয় সবজি। এটি বর্ষজীবী উদ্ভিদ। সারা বছরই বিশেষ করে বর্ষাকালে সবজির চাহিদা মেটাতে এর অবদান যথেষ্ট। এর কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও পাতা সবজিরূপে ব্যবহৃত হয়। উঁটায় ক্যারোটিন, ভিটামিন 'সি' আয়রণ, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়াম রয়েছে।
ডাঁটার জাত ঃ ডঁটার জাতসমূহের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো।
(১) প্রেয়সী (২) বাসপাতা (৩) কাটুয়া (৪) আমনী (৫) সুরেশ্বরী (৬) ছত্রভাগে (৭) রূপসী

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ ঃ বেলে দোঁআশ থেকে এঁটেল দোঁআশ মাটি ডাঁটা চাষের জন্য উপযাগী। ডাঁটা চাষে আইলের আকার ঃ দৈর্ঘ্য ২২ মিটার এবং প্রস্থ ৪৫ সেন্টিমিটার। তবে দৈর্ঘ্য প্রয়াজনে বেশি হতে পারে। আইল নির্বাচন ও মধ্যম চওড়া ধরনের উচু আইল বেশি উপযোগী।
আইল তৈরি ও আইল কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি নরম করে তৈরি করতে হয়। আইলে কোনো ঢেলা রাখা যাবে না। কারণ বীজ ক্ষুদ্র বিধায় ঢেলার নিচে পড়লে বীজ গজাতে পারবে না।
সারের পরিমাণ ঃ আইল বা হেক্টর প্রতি নিচে উল্লেখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	পরিমাণ/হেক্টর	আইল প্রতি
গোবর	১০ কেজি	১০ কেজি
ইউরিয়া	১৫০ টন	৭৫ গ্রাম
টিএসপি	৫০০ কেজি	০০১ গ্রাম
এম ও পি	১০ কেজি	১০০ গ্রাম
জিপসাম	১০০ কেজি	১০০ গ্রাম
দস্তা	১০ কেজি	১০ গ্রাম

সার ব্যবহারের নিয়ম- আইল তৈরির সময় সব গোবর, টিএসপি, এমওপি সার জিপসাম ও দস্তা সার আইলের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সার বীজ বপনের ১০-১৫ দিন পর পর দুই কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগের পর মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয় এবং পানি সেচ দিতে হয়।

বীজ বপন হার ঃ প্রতি আইলে ৫ গ্রাম বীজ বপন করতে হয়। ২০ × ২২ ফিট (১ শতক) জমিতে ১ তোলা বীজ লাগে।
বীজ বপন সময় ঃ সারা বছরই ডাঁটাশাক চাষ করা যায়। তবে বর্ষাকালে ভালো জন্মে। বীজ একবারে না বুনে ৩ ৪ সপ্তাহ পর পর আইলে কয়েক দফায় বুনলে সব সময় ডাঁটা শাক উৎপাদনের সুযোগ থাকে।
বীজ বপন ও অন্তবর্তী পরিচর্যা- আইলের মাটির উপরিভাগে ছিটিয়ে বপনের পর হালকা করে মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়। ডাঁটাশাকের বীজ আকারে ছোট ও পিচ্ছিল বলে বপনের পূর্বে বীজের সাথে শুকনো গুঁড়া মাটি ১৪৯ অনুপাতে মিশিয়ে নিতে হয়। বীজ বপনের পর হালকাভাবে আঁচড়া টেনে দিলেও বীজ মাটিতে মিশে যায়।
অঙ্কুরোদগমের সময় ঃ ৪-৫ দিন।
বীজ বপনের গভীরতা ঃ বীজ বপনের গভীরতা ১-২ সেন্টিমিটার।

২০২২

আগাছা দমন ঃ লালশাকের বীজ গজাননার সাথে সাথে আগাছাও জন্মে। তাই শাকের ২-৩টি পাতা গজানোর পর হাত দিয়ে ছোট ছোট আগাছা তুলে ফেলতে হয়।

সেচ - আইলের মাটি জো' ধরে রাখার জন্য পানি সেচ দিতে হয়। বীজ গজানোর সময় পর্যন্ত মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকতে হয়।

মাটি আগলাকরণ ঃ সেচ প্রয়োগর ফলে বা বৃষ্টির কারণে মাটির উপরিভাগে শক্ত করে চটা বাঁধতে পারে। এতে শাকের গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এজন্য মাঝে মাঝে চটা ভেঙে দিয়ে মাটি আগলা করে দিতে হয়।

গাছ পাতলাকরণ ঃ অতিরিক্ত ঘন হয়ে চারা গজালে ২-৪টি পাতা গজাননা অবস্থাতেই কিছু চারা উঠিয়ে ফেলতে হয়। এরপর চারা যত বড় হতে থাকে শাক হিসেবে মাঝে মাঝে তা উঠিয়ে পাতলা করে দিতে হয়।

মরিচা রোগ ঃ এ রোগ ডাঁটা গাছের শেকড় ব্যতিত আর সকল অংশেই আক্রমণ করে। এ রোগের আক্রমণের ফলে পাতার নিচে সাদা অথবা হলুদ দাগ দেখা যায়। পরে ডাটা লালচে বা মরিচা রঙ ধারণ করে ও পাতা মরে যায়। গাছ পত্রহীন হয় ও ঝাড়ুর ন্যায় হয়ে যায়।

গোড়া পচা ও সেঁকড় পচা রোগ ঃ এ রোগের আক্রমণে ডাঁটা গাছের মাটির সংলগ্ন কাণ্ড ও শেকড় পঁচে যায়। ফলে গাছ মরে যায়।

সেচ ও নিকাশ ঃ লালশাকের ন্যায় ডাঁটা বপনের পর বৃষ্টিতে জমির উপর চটা হলে দ্রুত তা ভেঙ্গে দিতে হবে। অন্যথা চটার নিচে বীজ গজায়ে মারা যাবে। বৃষ্টির পানি ২/১ দিন বেঁধে থাকলে গজাননা বীজ হালকা হলুদাভ হয়ে মারা যাবে। এমনকি মারা না গেলেও ছোট হয়ে থাকে এবং শক্ত হয়ে যায়। তাই ডাঁটা বীজ বপনের আগেই জমির চারদিক দিয়ে লাঙ্গল দিয়ে নালার ন্যায় জুলি টেনে দেয়া দরকার। এতে পানি সহজেই জমি থেকে বের হয়ে যেতে পারবে।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ঃ বীজ বানোর ২০-২৫ দিন পর শাক খাওয়া যায়। তবে শাক হিসেবে এক থেকে দেড়মাস পর খাওয়া যায়। গাছে ফুল বা আঁশ হওয়ার আগেই ডাঁটা সংগ্রহ করা দরকার। কাটুয়া উটি বা বাঁশপাতা ডাঁটার ফুল হলেও চটচটি হিসেবে তরকারিতে ব্যবহার করা যায়। বয়ক ডাঁটা উঠায়ে ১-২ দিন পর্যন্ত ছায়ায় রেখে বাজারজাত করা যায়। হেক্টর প্রতি ২০-৪০ টন পর্যন্ত ফলন হয়।

পালং শাকের চাষ

পালং শাকের জাত

সাধারণত মিষ্টি পালং ও টক পালং দেখা যায়। শীত প্রধান দেশের শীনাহ ও সুইস চার্ড জাতের মিষ্টি পালং উচ্চ ফলনশীল ও উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন। এ জাতের পালং এ এদেশে বীজ উৎপন্ন হয় না। যার ফলে এখনো চালু হয় নাই। তবে সর্বত্র চাষকৃত কফি পালং, মিষ্টি পালং, পুষা জয়তী, গ্রিন, সবুজ বাংলাজাত চাষ হচ্ছে।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

পালংশাক উর্বর জমিতে চাষ করা উচিত। জমি ৫-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটির ঢেলা গুড়া ও ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হয়। পালং শাকের জমি সমতল হতে হয়। অন্যথা কোথাও পানি জমে থাকলে সেখানের পালং-এর বৃদ্ধি দারুণভাবে ব্যাহত হয়।

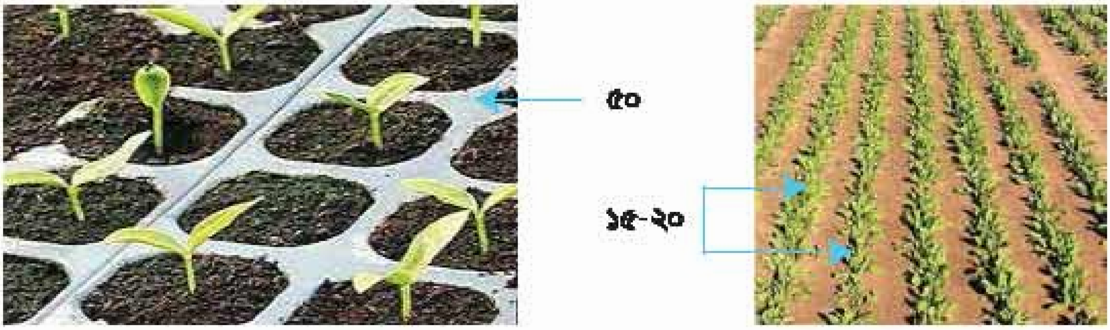

চিত্র ঃ পালং শাকের বীজ বপনের নকশা

হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিচে দেয়া হলো-

পচা গোবর- ৫ টন	টি.এস.পি-৭৫ কেজি
ইউরিয়া- ২০০ কেজি	এমওপি-৬০ কেজি।

অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক পটাশ বাদে অন্যান্য সার শেষ চাষের আগে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও পটাশ সার সমান ২ থেকে ৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। উপরি প্রয়োগের সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০ দিন পর পর ২-৩ কিস্তিতে দেওয়া যেতে পারে। চারা গজানোর ৪০-৫০ দিন পর শাক সংগ্রহের উপযোগী হয়। বেশিদিন ধরে শাক পেতে হলে প্রতি ৩ সপ্তাহে একবার শাক মাটির সমতল হতে ৩-৫ সেমি. উপরে কর্তন করতে হয়। শাক কাটার পর অবশিষ্ট সারের উপরি প্রয়োগ করা হলে শাক দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তবে সার উপরি প্রয়োগের পর সেচ দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হয়।

বীজ বপন ও অন্তবর্তী পরিচর্যা- পালংশাকের বীজের বহিরাবরণ শক্ত ও খসখসে। তাই তাড়াতাড়ি গজানোর জন্য ভিজিয়ে নিতে হয়। পালং বীজ সারিতে বা ছিটিয়ে বপন করা যায়। বীজ বপনের পূর্বে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে সহজে গজায়। শীতকালীন সবজির জন্য সরাসরি জমিতে ১ মিটার বেড তৈরি করে ৭.৫ ঢ ২০ সেমি. দূরত্বে সারি ও লাইন করে বীজ বপন করা যায়। সারিতে ছিটিয়ে বপন করলে চারা গজানোর পর ধাপে ধাপে পাতলা করে দিতে হয়। বহুসারি পদ্ধতিতে ১৫ সেমি. পর পর সারি করে বীজ বপন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি ৫ সারি পর পর ৫০ সেমি. ফাঁকা রাখতে হয়। এতে পরিচর্যার কাজ সহজে করা যায়।
পানি নিকাশের ব্যবস্থা থাকলে গ্রীষ্মকালে পালংশাক চাষ করা যায়। কিন্তু ফলন ভালো হয় না। এ সময় ১ মিটার বেড তৈরি করে ভিন্ন ভিন্ন বেডে ১৫ থেকে ২০ সেমি. দূরে দূরে সারিতে বীজ বপন করতে হয়।

বীজের পরিমাণ- প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ কেজি বীজ লাগে। বীজ সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে বা সারিতে ছিটিয়ে বপন করা যায়। তবে বহুসারি পদ্ধতিতে বপন করলে হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি বীজ লাগে। সারিতে প্রতি গর্তে ২/৩টি করে বীজ দিতে হয়। পরিমিত সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হয়। মাটি সব সময় আলগা রাখতে হয়। সারের উপরি প্রয়োগ দেওয়ার সময় জমি আগাছামুক্ত করতে হয়। তাতে শাক তাড়াতাড়ি বাড়ে ও সতেজ থাকে।

রোগ ও পোকামাকড়- মাঝে মাঝে পিপড়া, উরচুলা, উইপোকা এবং পাতা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ হয়। পালং শাকে তেমন কোন মারাত্মক রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না। তবে গোড়া পচা, পাতায় দাগ ও পাতা ধসা রোগ মাঝে মাঝে দেখা যায়। রোগ ও পোকা দমন সম্পর্কে অন্যান্য সবজিতে উল্লেখ আছে।

সেচ ও নিকাশ- এ শাকে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। বীজ গজানোর পর মাটি শুকনাভোব থাকলে হালকা সেচ দিতে হয়। পানিবদ্ধ হলে চারা নষ্ট হয়ে যায়। তাই পালংশাকের জমি হতে দ্রুত পানি নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

ফসল সগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ- চারা গজানোর ৪০-৪৫ দিন পর হতে শাক সংগ্রহ করা যায়। চারার গোড়া হতে ৩-৫ সেমি. উপরে কাটলে কুঁশি গজায় এবং একবার রোপণ করে একই জমি হতে ৩-৪ বার ফসল পাওয়া যায়। এর পাতা খুব রসালো ও নরম তাই উঠানোর পর আলতোভাবে রেখে দ্রুত বাজারে পাঠাতে হবে। গাদা করে গরম স্থানে রাখলে দ্রুত পচন শুরু হয়।

ফলন- প্রতি হেক্টরে ১৫-২০ টন শাক ও ৫০০-৭০০ কেজি বীজ জনে।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. তাসাকিসান কী সবজির জাত ?
২. মূলা চাষে কোন সার মৌল হিসেবে না দিলে মূলার গায়ে শেকড় বেশি হয় ?
৩. মূলার বীজের মান ঠিক রাখার জন্য কত মিটারের মধ্যে অন্য জাত চাষ করা উচিত নয়?
৪. কোন জাতের মূলা ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে না উঠালে ভেতরে ফাঁপা হয়ে যায়?
৫. পিংকি কুইন কোন শাকের জাত ?
৬. লালশাক ছিটিয়ে বপন করলে ১ হেক্টরে কত কেজি বীজ লাগে?
৭. ডাঁটাশাকের একটা জাতের নাম লেখ।
৮. ডাঁটাশাকের বীজ গজাতে কতদিন সময় লাগে ?
৯. পালংশাক কয় জাতের পাওয়া যায়?
১০. গ্রীষ্মকালে পালংশাক চাষের কী সুবিধা থাকা প্রয়োজন ?

সংক্ষিত প্রশ্ন

১. মূলা চাষের জমি তৈরি সম্পর্কে লেখ।
২. মূলার বীজ উৎপাদনের কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা কর।
৩. মূলার জাব ও বিছা পোকার দমন ব্যবস্থা বর্ণনা কর।
৪. লালশাক চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি সারের পরিমাণ উল্লেখ কর।
৫. ডাঁটাশাকের কয়েকটি জাতের নামসহ বীজ বপন ও রোপণ সময় সম্পর্কে বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মূলার চাষ পদ্ধতি আলোচনা কর।
২. লালশাকের জাতসহ জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা কর।
৩. ডাঁটা শাকের বীজ বপন, পরিচর্যাসহ রোগ ও পোকামাকড় দমন সম্পর্কে বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়
লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া ও শশার চাষাবাদ

লাউ-এর চাষ

লাউয়ের জাত- সাধারণত হাজারী লাউ, ক্ষেত লাউ ও দেশি লাউ চাষ করা হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে চাষের জন্য ভারতীয় দুটি জাত সামার পলিফিক লং ও রাউন্ড জাতের চাষ হচ্ছে। এছাড়া উন্নত জাত যথা পুষা মেঘদূত, পুষামঞ্জুরী, দেশি গোল, দেশী লম্বা, বর্তুলাকার, বারি লাউ, বিকন লম্বা লাউ চাষ হচ্ছে।
বীজের হার- প্রতি হেক্টরে ৮০০-১০০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

পর্যাপ্ত সূর্যালোক পড়ে এমন জমি নির্বাচন করা উচিত। জমিতে ৫-৬টি চাষ ও মই দিয়ে ভালভাবে তৈরি করে নিতে হয়। তারপর ৫-৬ মিটার দূরে দূরে সারি ও মাদা তৈরি করে প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বুনতে হয়। মাদায় রোপণ করলে বেড তৈরি করে প্রতি বেড়ে এক সারি করে মাদা তৈরি করা যায়। চারা গজালে প্রতি মাদায় ২টি সবল ও সতেজ চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলতে হয়। জমিতে সরাসরি বীজ বপন না করে পলিব্যাগে চারা তৈরি করে রোপণ করা যায়। লাউয়ের জমিতে মাদা হতে মাদার মধ্যে ৪০ সেমি. চওড়া ও ২০ সেমি. গভীর নালা করা ভালো। সার প্রয়োগ-ভালো ফলন পেতে হলে সার প্রয়োগ করা দরকার। হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো।

সারের নাম	মোট পরিমাণ/হেক্টর	মৌল প্রয়োগ (কেজি)		উপরি প্রয়োগ (কেজি)	
		বেডে	মাদায়	১ম কিস্তি	২য় কিস্তি
ইউরিয়া	১৫০ কেজি	-	-	৭৫	৭৫
টিএসপি	১২০ কেজি	৪০	৮০	-	-
এমওপি	১৩৫ কেজি	৪৫	৯০	-	-
জিপসাম	৬০ কেজি	২০	৪০	-	-
জিংক সালফেট	১০ কেজি	৩	৭	-	-
গোবর	১৫০০ কেজি	৫০০০	১০০০০	-	-

বর্ণিত সারের মধ্যে টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক এবং গোবর সারের ১-৩ অংশ জমি তৈরির সময় বেড়ে দিতে হবে। বাকী ২-৩ অংশ মাদাতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

প্রথম উপরি প্রয়োগ হিসেবে-ইউরিয়া সার মাদায় চারার গোড়ার চারিদিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে গাছের বৃদ্ধি বেশি হলে এবং পাতা ঘন সবুজ হলে ২য় কিস্তি উপরি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।
১ম উপরি প্রয়োগ-চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর।
২য় উপরি প্রয়োগ- চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর।

বপন বা রোপণের পূর্বে বীজ প্রস্তুতকরণ- লাউয়ের বীজ গজাতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে। তবে বীজ বুনার আগে ১০-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে আরও তাড়াতাড়ি গজায়। অনেক সময় বীজ জাগ দিয়ে গজায়ে নেয়া যেতে পারে। তবে বীজ ভেজানো বা রোপণের পূর্বে বীজের মুখ দাঁত দিয়ে বা নখের নিচে চাপ দিয়ে ফাটায়ে নেয়া যেতে পারে।

লাউয়ের বীজ রোপণ- মাদায় সার দেয়ার ৭-১০ দিন পর প্রতি মাদায় ৩/৪টি বীজ বপন করতে হয়। চারা রোপণের জন্য আইলও ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে আইলের মাদায় ১টি করে চারা রোপণ করতে হয়। বীজ ২.০ ২.৫ সেমি. গভীরে রোপণ করা ভাল। বীজ রোপণের পর মাদায় মালচিং করা হলে সহজে বীজ গজায়। কোনস্থানে বীজ না গজালে বা মরে গেলে তাড়াতাড়ি শূণ্যস্থান পূরণ করে দিতে হয়। মাদায় ৩/৪টি চারা গজালে সতেজ ১টি রেখে অন্যগুলো উঠায়ে পাতলা করে দিতে হয়।

অন্তবর্তী পরিচর্যা- লাউ গাছের জন্য মাচা অপরিহার্য। কেননা এর ডগা মুক্তভাবে চলতে না পারলে ফলন ব্যাহত হয়। লাউ যখন বেশি করে চাষ করা হয় তখন মাচা দেয়া খুব কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এজন্য সহজ পদ্ধতি হলো জমিতে খড় বিছিয়ে দেওয়া। প্রথমে গাছের গোড়ার দিকে এবং আস্তে আস্তে গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে সারা জমিতে খড় বিছিয়ে দিতে হবে। লাউ গাছ মাচায় দিতে হলে চারা ১৫-২৫ সেমি, লম্বা হলেই মাচা করে দিতে হবে। এছাড়া ঘরের চালে বা গাছে উঠায়ে দেয়া যেতে পারে। এতে মাচার খরচ কমে যায়।

লাউগাছ প্রচুর পানি শোষণ করে। বেশি পরিমাণ পানির জন্য প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া সুবিধাজনক। কারণ সারা জমিতে লাউয়ের শেকড় তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায়।

লাউ গাছের শেকড় সারা জমিতে মাটির উপরের স্তরের সামান্য নিচ দিয়ে ছড়ায়ে থাকে। প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দিলে সমস্ত জমি হতে রস গ্রহণ করতে পারে। বাড়ির আশেপাশে ১-২টি গাছ লাগানো হলে মাদায় চারিদিকে ২ মিটার জুড়ে পানি দেয়া যেতে পারে।

পরাগায়ন- মৌমাছির অভাবে পরাগায়ন ঠিকমত হয় না। বিকেলের দিকে একটি সদ্য ফোটা পুরুষ ফুল তুলে এর পুংকেশর ঠিক রেখে ফুলের পাপড়িগুলো ছিড়ে ফেলতে হবে। তারপর প্রতিটি স্ত্রী ফুলের গর্ভমুন্ডে ঐ পুংকেশর খুব আস্তে আস্তে ২-৩ বার ছুঁয়ে দিলে পরাগায়ন হয়ে যাবে। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে সাধারণত ৫-৬টি স্ত্রী ফুলের পরাগায়ন করা সম্ভব।

চিত্র ঃ ফুলের কৃত্রিম পরাগায়ন

পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন

জাব পোকা- এ পোকা গাছের কচি পাতা ও ডগার রস চুষে খেয়ে গাছকে দূর্বল করে ফেলে। গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। এ পোকা দমনে ১১২৫ মিলি, ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা সাইপারমেথ্রিন ৬০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ফসলে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

লাউয়ের মাছি পাকা- স্ত্রী পোকাগুলো লাউয়ের খাসোর নিচে ডিম পাড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই ডিম হতে কীড়া বেরিয়ে আসে এবং লাউয়ের কচি অংশ খেয়ে নষ্ট করে। প্রায় ক্ষেত্রে আক্রান্ত লাউ পচে নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিকার-হেক্টর প্রতি বালাইনাশক প্রয়োগের পরিমাণ নিচে দেয়া হলো-

বালাইনাশকের নাম	বালাইনাশকের মাত্রা (মিলি)	পানির মাত্রা (লিটার)
এ্যাগ্রোথিয়ন ৫০ ইসি	১১২০	৬০০
প্রোফেনোফোস	১১২০	৬০০
ফলিথিয়ন ৫০ ইসি	১০০০	৬০০
ডিপটেরেক্স ৫০ এসপি	৫৬.০ গ্রাম	১০০০

গাছে যাতে পরাগায়নের কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য কীটনাশক বিকেলের দিকে স্প্রে করা ভাল। ফলের মাছি পোকা দমন করার জন্য পোকা ধরার ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাউডারী মিলডিউ- এ রোগের লক্ষণ মিষ্টি কুমড়া রোগের অনুরূপ। প্রতিকারের জন্য ২.২৫ কেজি ম্যাকুপ্রাক্স ৫% প্রতি এক হেক্টর জমিতে সেপ্র করা যায়।

সেচ ও নিকাশ- পানি সেচ লাউয়ের জন্য খুব প্রয়াজন। লাউ ফসলে পানি চাহিদা বেশি। এতে পাবন সেচ দেওয়া ফলপ্রসূ। চারা অবস্থায় মাদায় বা চারার গোড়ায় পানি জমে থাকলে চারা দুর্বল ও লিকলিকে হয় এবং চারা মারা যায়। বড় গাছের গোড়ায়ও পানি জমে থাকলে গাছ মারা যায়। তাই মাদা জমি তল হতে ৭-৮ সেমি. উঁচু করে করা উচিত। অথবা বেড় করে করা হলে দুই বেডের মাঝখান দিয়ে সেচ ও নিকাশের নালার ব্যবস্থা করা যায়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ- চারা গজানোর ৬০-৭০ দিন পর গাছে ফুল আসা শুরু হয়। ফুল আসার ১২-১৫ দিনের মধ্যেই লাউ তুলে খাওয়া যায়। লাউয়ের খাসোয় যে পর্যন্ত সহজেই চিমটি কাটা যায়, ততদিন পর্যন্ত লাউ সবজি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া লাউয়ের গায়ে সুক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম থাকলে এবং ফলের পিছনে ফুল থাকলে সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। লাউ কচি থাকা অবস্থায় গা কোমল ও চকচকে দেখায়। এর পরবর্তী সময় থেকে লাউ পাকা অবস্থা পর্যন্ত সাধারণত আর সবজি হিসেবে ব্যবহার করা যায় নাএবং ত্বক রক্ষা হতে থাকে। পরিবারের চাহিদা মোতাবেক গাছে থাকা অবস্থায় লাউয়ের অংশবিশেষ কেটে সবজি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে লাউয়ের কোন অংশবিশেষ কাটার পর ক্ষতস্থান যাতে শুকিয়ে যেতে পারে সেজন্য অন্তত ২ ঘন্টা রোদ পাওয়ার সুযোগ দিতে হয়। অথবা কাটাস্থানে যাতে পোকামাকড় আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য বড় পলিথিন ব্যাগ দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। লাউ কাটার পর ছায়া ও ঠান্ডায় ২/৩ দিন পর্যন্ত হালকা পানি ছিটা দিয়ে রাখা যায়। কার্টুন প্যাকেটে খাড়াভাবে সাজায়ে বাজারজাত করা শ্রেয়। তাতে লাউয়ের গুণাগুণ ও ভৌত অবস্থা ভাল থাকে।

ফলন- প্রতি মাদায় ১৫০-২০০ কেজি অথবা প্রতি হেক্টরে ৩০-৪০ টন লাউ পাওয়া যায়। ২০২২

মিষ্টি কুমড়ার চাষ

মিষ্টি কুমড়ার জাত

বাংলাদেশে ছোট বা বড়, গোল বা লম্বাটে আকারের এবং ধূসর, কালো বা লালচে বর্ণের মিষ্টি কুমড়া বারো মাসই জন্মে। বর্তমানে বিদেশী জাত যথা-ইয়োলো ক্রেপ, রেড ক্রেপ, টেবিল, কুইন, গ্রীন হার্বাড, বাটার বল ইত্যাদি চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশী কোন সুনির্দিষ্ট জাত নেই। তবে উৎপাদনের সময় অনুসারে মিষ্টি কুমড়াকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- বৈশাখী (গ্রীষ্ম মৌসুম), হেমন্ত ও মাঘী (শীত মৌসুম)।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

কুমড়া চাষের জন্য পানি জমে না বা সহজে নিষ্কাশনযোগ্য এমন স্থান নির্বাচন করা উচিত। অল্প পরিমাণে মিষ্টি কুমড়া চাষের জন্য বসতবাড়ির আশে পাশে ছায়াহীন স্থানে মাদা করে বীজ বোনা যেতে পারে। তবে ব্যবসাভিত্তিক মিষ্টি কুমড়া চাষ করতে হলে সম্পূর্ণ জমি চাষ ও মই দিয়ে ভালভাবে তৈরি করে নিতে হবে। প্রচুর আলোবাতাস। যুক্ত এমন জমি কুমড়া জন্মানোর জন্য উত্তম।

সার প্রয়োগ- মিষ্টি কুমড়া চাষের জন্য প্রতি হেক্টরে নিম্নলিখিত পরিমাণে সার ব্যবহার করা যেতে পারে।

গোবর বা আবর্জনা পচা সার	১০-১৫ টন
টি.এস.পি	১২ কেজি
এমওপি	১০০ কেজি

গোবর ও টি.এস.পি সারের অর্ধেক পরিমাণ জমি চাষ করার সময় ভালভাবে সম্পূর্ণ জমির মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী অর্ধেক সার বীজ বোনার জন্য তৈরি মাদায় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া এবং এমওপি সার চারা গজানোর পর সমপরিমাণে দু'কিস্তিতে মাদার চারিদিকে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা ২৫-৩০ সেমি. লম্বা হওয়ার পর মাদার চারদিকে অগভীর নালা কেটে প্রথম কিস্তির সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী দ্বিতীয় কিস্তির সার ফুল আসার সময় একইভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ ও অন্তর্বর্তী পরিচর্যা- মিষ্টি কুমড়া চাষে হেক্টর প্রতি ১২০০ থেকে ১৫০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়। ঝোপালো জাতের জন্য ২-২.৫ মিটার দূরত্বে এবং লতানো জাতের জন্য ৩ থেকে ৪ মিটার দূরত্বে মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতি মাদায় ৩-৪টি করে বীজ বুনতে হবে। এছাড়া রবি ও খরিফ মৌসুমের ভিত্তিতে কুমড়া চাষে দূরত্বের তারতম্য হয়। মাদার দূরত্ব এমন হতে হবে যাতে গাছ পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে মাদা বা সারির মধ্যকার স্থান ঢেকে যায়। কুমড়ার বীজ ডিবলিং পদ্ধতিতে লাগানো যায়।

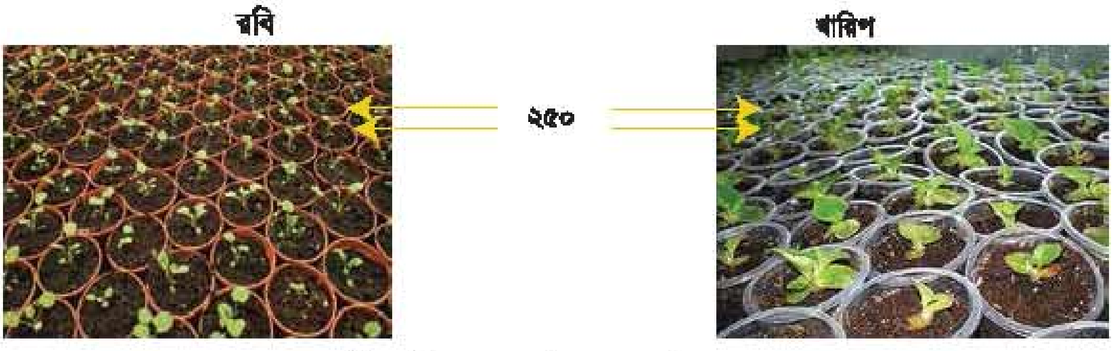

চিত্র ঃ বীজ বপনের/চারা রোপণের নকশা

২০২২

ডিবলিং পদ্ধতি হলো হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে বীজ মাটিতে চেপে বসিয়ে দেয়া। বীজ বপনের কাজ তিনভাবে করা যেতে পারে। যেমন-

(ক) বীজতলায় চারা তৈরি করে, (খ) মাদায় বীজ বপন করে এবং (গ) পলিব্যাগে চারা তৈরি করে।

চিত্র ঃ পলিব্যাগে মাটি ভরা, মাঝখানে গর্ত করা, বীজ রোপণ, মাটি দিয়ে ঢাকা

বীজ বপনের সময় বীজের সরু দিকটা নিচের দিকে ধরতে হবে। এরপর মাদায় বা পলিব্যাগের মাটিতে ২.৫-৫ সেমি. গভীরে চেপে ঢুকিয়ে দিয়ে হালকাভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পলিব্যাগে চারা তৈরি করতে হলে পূর্বে সার মিশ্রিত মাটি পলিব্যাগে ভরে একটি কাঠি দিয়ে মাঝখানে নিচু করে গর্ত করে নিতে হয়। শীতকালে মাদার উপরিতল কিছুটা নিচু এবং গ্রীষ্মকালে কিছুটা উঁচু রাখতে হয়। কারণ শীতকালে পানি সেচ দিলে মাদায় পানি ধরে রাখতে পারবে। আর গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির পানি সহজে গড়িয়ে যেতে পারবে। মাদা তৈরি করতে হলে ১ মি. × ১ মি. × ১মি. সাইজের গর্ত করলে ভাল হয়। প্রতি দুসারি মাদার পর পানি সেচ ও নিকাশের জন্য নালা রাখতে হয়। চারা গজানোর পর প্রতি মাদায় দুটি সুস্থ ও সবল চারা রাখলেই চলে।

চিত্র ঃ মাদায় বীজ বপন

ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি ও ফলন বেশি পাওয়ার জন্য বাউনি তৈরি করে বাউনির উপর কাণ্ড তুলে দেয়া দরকার হয়। বর্ষাকালীন ফসলের জন্য এ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

শুষ্ক মৌসুমে জমিতে ফসল হিসেবে লতানো জাতের কুমড়া চাষ করলে ফল ধরার সময় ফলের নিচে খড়কুটো বিছিয়ে দিতে হয়। কৃত্রিম পরাগায়নের দ্বারা মিষ্টি কুমড়ার ফলন বাড়ানো যায়। এজন্য ভোরেবেলা পুরুষ ফুলের পরাগধানী হাতে নিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে-আস্তে করে ঘষে দিতে হয়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

বপোকা-কুমড়া গাছের কচি পাতা ও ডগার রস চুষে খেয়ে গাছকে দুর্বল করে ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। এ পোকা দমন করার জন্য ১০ লিটার পানিতে (এক স্প্রেয়ার) ১২ মিলি. ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি বা সাইপারমেথ্রিন মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর স্প্রে করা যায়।

ফলের মাছি পোকা- এ পোকা কুমড়ার অন্যতম ক্ষতিকারক পোকা। এ পোকা কুমড়া ফলের উপরের খোসার নিচে ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে কুমড়ার ভিতরে ঢুকে কচি অংশ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। প্রায়ক্ষেত্রে আক্রান্ত ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়। দমন পদ্ধতি জাব পোকার দমন পদ্ধতির অনুরুপ। এছাড়াও ফাঁদের সাহায্যে মাছি পোকা দমন করা যায়। পোকা ধরার ফাঁদ তৈরি করার জন্য প্রথমে কুমড়া কুচি কুচি করে কেটে পিষে নিতে হয়। এরপর ৫ গ্রাম ডিপটেরেক্স ৮০ ডব্লিউপি ঔষধ ১০০ গ্রাম পিষানো কুমড়ার সাথে মিশিয়ে বিষ টোপ তৈরি করতে হবে। উক্ত বিষ টোপ মাটির পাত্রে নিয়ে মাচার কিছুটা উঁচুতে জমির বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করতে হবে। ফলের মাছি বিষ টোপে আকৃষ্ট হবে এবং পরবর্তীতে মারা যাবে। বিষ টোপ প্রতি ৩-৪ দিন অন্তর অন্তর বদলাতে হবে।

চিত্র : ফলের মাছি পোকা

চিত্র : মাছি মারার বিষ টোপ

চিত্র : ইপিলাকনা বিটল গ্রাব

চিত্র : রেড পাম্পকিন বিটল

চিত্র : রেডমাইট

চিত্র : পূর্ণাঙ্গ মিষ্টি কুমড়ার গাছ

কুমড়ার লাল বিটল

কুমড়ার খুবই ক্ষতিকর পোকা। বয়ষ্ক পোকা পাতা ও ফল খেয়ে ফেলে। পূর্ণ বয়ষ্ক পোকা পাতা খেয়ে গোলাকার ছিদ্র করে। এ পোকা দমন করার সহজ উপায় হলো প্রতিদিন সকালে হাতে ধরে মেরে ফেলা।

ইপিল্যাকনা বিটল-ইপিল্যাকনা বিটলের পূর্ণবয়ষ্ক পোকা ও কীড়া পাতার সবুজ অংশ খেয়ে শুধু পাতার শিরা বাদ রাখে। পাতা জালির ন্যায় দেখার আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে মারা যায়। এ পোকা দমনের জন্য ১০ মিলি ডায়াজিন ৬০ ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রেড স্পাইডার (মাইট)- মাইট এক ধরনের খুবই ছোট মাকড়সা। এ মাকড়সা পাতার নিচে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ হতে রস চুষে খেয়ে ফেলে। পরে পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং হলুদ হয়ে মারা যায়। এ মাকড় দমনের জন্য থিয়াভিট ৮০ ডবিউ জি ৩৫ কেজি ১০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি হেক্টর জমিতে স্প্রে করতে হবে।

পাউডার মিলডিউ- এ রোগে পাতার উপরে সাদা সাদা পাউডার এর ন্যায় দেখা যায়। এই দাগ সাদা গুড়ায়ে আবৃত। কোন কোন ক্ষেত্রে সমত পাতা গুড়ায়ে ঢেকে যায়। বয়ষক পাতায় দাগ বাদামী রং এর হয়। অধিক আক্রান্ত পাতা মারা যায়। দমনের জন্য ২ গ্রাম থিওভিট প্রতি ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ডাউনি মিলডিউ- এ রোগের আক্রমণে পাতার নিচে গোলাপী এবং পাতার উপরে ছোট ছোট হলুদাভ দাগ পড়ে। পাতায় ধূসর রং এর পাউডার দেখা যায়। দমন পদ্ধতি পাউডারি মিলডিউ রোগের মতই।

অন্তবর্তী পরিচর্যা- শুষ্ক মৌসুমে মিষ্টি কুমড়ার চাষ করলে অধিকাংশ স্থানে সেচের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে বর্ষাকালে চাষ করা হলে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে আগাছা বাছাই, সেচ বা বৃষ্টি পর মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সেচ ও নিকাশ- শুষ্ক মৌসুমে মিষ্টি কুমড়ার চাষ করা হলে অধিকাংশ স্থানে সেচের প্রয়োজন হয়। জমিতে লতানো হিসেবে চাষ করা হলে জমিতে পাবন সেচ দেওয়ার পর এবং ফল ধরা শুরু হলে ফলের নিচে খড়কুটা বিচিয়ে দিতে হয়। তবে খড়কুটা সেচের পানিতে ভিজে থাকলে গাছ ও ফলের ক্ষতি করতে পারে। জমিতে লতানাভোবে চাষ করলেও বেড় করে রাখলে সেচের পানি দেয়া ও নিকাশ করার সুবিধা হয়। মাচা বা বাউনিতে দিয়ে চাষ করলে মাদায় গাছের গোড়ায় ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দেয়া দরকার হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

মিষ্টি কুমড়া কাঁচা পাকা উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পর থেকে গাছে ফল ধরা আরম্ভ করে। চাহিদা মাফিক কচি ফুলও সংগ্রহ করা চলে। ফল পরিপুষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সংগ্রহ করলে গ সংখ্যক ফল ধরে। তবে ঘরে সংরক্ষণের উদ্দেশে সংগ্রহ করতে হলে কুমড়াকে অবশ্যই ভালভাবে পাকিয়ে নেয়া উচিত। পাকার সাথে সাথে ফল হলুদ বা কমলা রঙ ধারণ করে ও বোটা শুকিয়ে আসে। মিষ্টি কুমড়া পাকায়ে উঠানো হলে ৩/৪ মাস পর্যন্ত ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখা যায়। পাকা মিষ্টি কুমড়া খাঁচায় করে দূরের বাজারেও পাঠানো যায়।

ফলন- হেক্টর প্রতি মিষ্টি কুমড়া ১৫-২০ টনের মত পাওয়া যায়।

চাল কুমড়ার চাষ

চাল কুমড়ার জাত

বাংলাদেশে চাল কুমড়ার বিভিন্ন জাত রয়েছে, কিন্তু জাতসমূহের বৈশিষ্ট্য সুনির্দিষ্ট নয়। এ উদ্ভিদের লতানোর মাত্রা, ফলের আকৃতি ও আকার ইত্যাদির ব্যাপারে জাতসমূহের মধ্যে কিছু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

বাংলাদেশে কুমড়ার অনুমোদিত জাতগুলো প্রাথমিকভাবে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (ক) লম্বাটে জাত, (খ) গোলাকার ডিম্বাকার জাত ও (গ) মাঝারি লম্বাটে জাত।

(ক) লম্বাটে জাত ঃ ইপসা চালকুমড়া-১, পুবালী এফ-১,

(খ) ডিম্বাকার জাত ঃ জালী কুইন, হীরা-৪৫১ এফ-১।

(গ) মাঝারি লম্বাটে জাত ঃ বাসন্তী এফ-১ দূরত, দুর্বার, জুপিটার এফ-১

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

পারিবারিক বাগানে চাল কুমড়ার চাষ করতে হলে মাদায় বীজ বুনে গাছ মাচা, ঘরের চাল কিংবা কোনো বৃক্ষের উপর তুলে দেয়া যায়।

বাণিজ্যিকভাবে চাষের ক্ষেত্রে প্রথমে ভালোভাবে জমি তৈরি করে মাদায় অথবা সারিতে বীজ বুনতে হয়। মাদা হতে মাদা ৪-৫ মিটার করতে হয়। প্রতি মাদায় ২-৩টি গাছ রাখতে হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ ও মাদা প্রতি নিম্নবর্ণিত সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ	সারের নাম ও পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
মাদা তৈরির সময়ঃ বীজ বপনের ৭-১০ দিন পূর্বে	২	-	৫০	-
১ম উপরি প্রয়োগঃ চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর	-	১৫	-	১৫
২য় উপরি প্রয়োগঃ চারা গজানোর ৪৫-৫০ দিন পর	-	১৫	-	১৫

চারা রোপণ ও অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

বীজ বপন ঃ মাদায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ মৌল সার দিয়ে ভালোভাবে মাদা তৈরি করার পর প্রতি মাদায় ৩-৪টি করে বীজ বপন করতে হয়। ফেব্রুয়ারি-মে মাসে বীজ রোপণ করা যায়।

বীজ বপনের গভীরতা- ১.৫-২ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ রোপণ করতে হয়।

অঙ্কুরোদগমের সময়কাল- বীজ গজাতে ৫-৭ দিন সময় লাগে। সারের উপরি প্রয়োগ ও সময়মতো সারের উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

সেচঃ ফসলের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনে আইলের মাটির অবস্থা বুঝে মাদা বা উঁচু জায়গায় যেখানের মাটি শুকিয়ে গেছে সেখানে সেচ প্রদান করতে হয়।

গাছ পাতলাকরণ ঃ চারা ১০-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা হলে প্রত্যেক মাদা বা উঁচু জায়গায় ১টি করে সুস্থ-সবল চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হয়।

শুন্যস্থান পূরণ ঃ কোনো কারণে চারা মারা গেলে সেখানে নতুন করে সেই একই বয়সের চারা রোপণ অথবা বীজ বপন করতে হয়।

বাউনি বা মাচা দেয়া ঃ গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে বাউনি এবং ছোট করে মাচা দিতে হয়।

কুমড়ার যৌন অভিব্যক্তি ও যৌনরূপ ঃ ফুল ধরার ব্যাপারে কুমড়া গাত্রের উদ্ভিদ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

এরা ভিন্ন প্রকার ফুল উৎপাদন করে, যথা-স্ত্রী ফুল ও দ্বি-লিঙ্গিক ফুল। একই গাছে সুনির্দিষ্ট প্রকারের ফুল থাকার কারণে বিভিন্ন যৌনরূপের সৃষ্টি হয়। যৌনরূপ অনুযায়ী কুমড়া গোত্রের উদ্ভিদসমূহকে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

উভয় লিঙ্গ ঃ গাছের সব ফুল দ্বি-লিঙ্গিক। এ জাতীয় যৌনরূপ বিরল, তবে কেবল, লাফা, কুকুবিস ও বেনিনকাসা গণের কয়েকটি জাতে দেখা যায়।

এক লিঙ্গ ঃ একই উদ্ভিদের পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদা উৎপন্ন হয়। এটাই প্রধান যৌনরূপ এবং সর্বাধিক সংখ্যক প্রজাতিতে বিদ্যমান।

পুরুষ দ্বি-লিঙ্গিক ঃ একই গাছে পুরুষ ও দ্বি-লিঙ্গিক ফুল থাকে।

স্ত্রী দ্বি-লিঙ্গিক ঃ একই গাছে স্ত্রী ও দ্বি-লিঙ্গিক ফুল থাকে।

সকল লিঙ্গিক ঃ একই গাছে পুরুষ-স্ত্রী আলাদা আলাদা এবং দ্বি-লিঙ্গিাক ফুল পাওয়া যায়।

ভিন্নবাসী ঃ প্রতিটি গাছ জীবনকালে যতগুলো ফুল উৎপাদন করে তা বেশিরভাগই পুরুষ জাতের ফুল। পুরুষ ও সত্রী। ফুলের অনুপাতকে যৌন অনুপাত বলা হয়। জাত ও পরিবেশ অনুযায়ী পুরুষ ও স্ত্রী ফুলের অনুপাত ৪ঃ১ থেকে শুরু করে ৬০ঃ১ পর্যন্ত হতে পারে।

যৌন অভিব্যক্তির পরিবহণ ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় কুমড়া গোত্রের উদ্ভিদের যৌন অভিব্যক্তি তথা, ফুল ধরার আগামত্ব, ফুলের প্রকার ও সংখ্যা যৌন অনুপাত ইত্যাদি পরিবেশের নিয়ন্ত্রণাধীন। তবে ফুল ধরার বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভিদ দেহে বিভিন্ন হরমানের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং উদ্ভিদের অঙ্গে প্রয়োগ করে ফুল উৎপাদনে সফলতা আনা যায়।

পরাগায়ন ও ফল ধারণ ঃ ভিন্নবাসী জাতসমূহে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে থাকার কারণে ফল ধারণের জন্য পর-পরাগায়ন অপরিহার্য। মৌমাছি জাতীয় পোকা পরাগায়ন ঘটিয়ে থাকে। মৌমাছির অভাবে পরাগায়ন হয় না তাই প্রচুর স্ত্রী-ফুল থাকা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল উৎপাদিত হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই কার্যকরভাবে পরাগায়ন না হওয়া এজন্য দায়ী। এসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম পরাগায়নের মাধ্যমে ফল ধারণ বৃদ্ধি করা যায়। পরাগায়ন অসম্পূর্ণ হলে ফলের আকৃতি অনিয়মিত হতে পারে।

পোকা দমন

ফলের মাছি পোকা ঃ এ পোকার কীড়া ফল ছিদ্র করে ঢুকে ফলের ভিতরের অংশ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। বিষটোপ ব্যবহার করে ফাঁদের সাহায্যে এ পাপোকা দমণ করা যায়।

লাল কুমড়া বিটল ঃ চারা গাছের জন্য এ পোকা ক্ষতিকর। পাতা খেয়ে সম্পূর্ণ পাতা ছিদ্র করে ফেলে।

ইপিল্যাকনা বিটল ঃ পূর্ণবয়স্ক পোকা ও গ্রাব পাতার সবুজ অংশ খেয়ে শুধু পাতার শিরা বাদ রেখে দেয়। আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে মরে যায় এবং জালির মতো হয়ে যায়।৫ফেনথিয়ন বা ম্যালাথিয়ন ১ মিলি. প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

লাল মাকড় ঃ এক ধরনের খুব ছোট মাকড় পাতার নিচে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ রস চুষে খেয়ে ফেলে। যার ফলে পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং পরে পাতাটি হলুদ হয়ে মরে যায়। কুইনালফস ৩ মিলি. ? লিটার পানি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোগ দমন- পাউডারি মিলডিউ ও পাতার উপরে সাদা সাদা পাউডার এর ন্যায় দেখা যায় যা পাতা নষ্ট করে দেয়।

২০২২

ডাউনি মিলডিউ ঃ পাতার নিচে ধূসর বেগুনি রং ধারণ করে। আক্রান্ত পাতা ও গাছ দুর্বল হয়ে মারা যায়। হেক্সাকোনাজোল ১-২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সেচ ও নিকাশ ঃ চারা রোপণকালে মাদায় মাটির জো বুঝে ৮-১০ দিন পর পর সেচ দিতে হয়। পাবন সেচ দিলে কুমড়ার চারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরপর চারার বা বড় গাছের গোড়ায় পানি জমলে তাড়াতাড়ি গাছ মারা যায়। এমনকি বেশি বৃষ্টিপাতের কারণেও ফলন কমে যায়। তাই কুমড়ার মাদায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য নিকাশ ব্যবস্থা আগেই করে রাখতে হয়।

ফসল সগ্তাহ ঃ বীজ বপনের ২-৩ মাস পর থেকে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়।

ফলন : প্রতি আইলে ৪০-৫০ কেজি।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ঃ বীজ বানোর দু'মাসের মধ্যে চাল কুমড়ার গাছে ফল আসা শুরু করে এবং ৬০-৭৫ দিন পর্যমত ফল দিতে থাকে। পরাগায়নের ১০-১৫ দিনের মধ্যে ফল সকজি হিসেবে খাওয়ার উপযোগী হয়। সবজি হিসেবে ব্যবহার করতে হলে ওজন আধা কেজি হতে না হতেই ফল সংগ্রহ করা দরকার। কিছু সংখ্যক ফল পাকাতে চাইলে শেষের দিকে উৎপাদিত ফল গাছে রেখে দিতে হয়। কচি ফল সংগ্রহ করা হলে চাল কুমড়ার প্রতি হেক্টর এ ফলন ১৫ টন পর্যন্ত হওয়া সম্ভব।

শশার চাষ

শশা একটি অতি প্রাচীন সবজি। বর্তমানকালে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে শশার চাষ হচ্ছে। কচি শশা সালাদরূপে ও সরাসরি খাওয়া যায়। ভালো পরিপক্ক রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। পাশ্চাত্যে খুব কচি শশার আচার তৈরি করে। গাছে ভালোভাবে পাকানাে শশা কিছুদিন সংরক্ষণ করা চলে।

শশার জাত

ছোট, বড়, দীর্ঘ, বেঁটে, গাঢ় সবুজ ও হালকা সবুজ, প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের শশা আছে। উৎপাদনের সময় অনুসারে শশা দু'টি প্রধান জাতে বিভক্ত। যথা-খুঁয়ে শশা ও বর্ষাতি শশা। স্কুয়ে শশা ফেব্রুয়ারি-মার্চ মসে বপন করে এপ্রিল-জুন মাসে সংগৃহীত হয় এবং ভূমির উপরেই গাছ থাকে। গাছ ও ফল ক্ষুদ্রাকার। বর্ষাতি শশা এপ্রিল-জুন মাসে বপন করে জুন হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত পাওয়া যায়। এ শশা মাচায় তুলে দেওয়া হয়। খিরা এক প্রকারের শশা। আকারে ছোট এবং কাঁচা অবস্থায় সরাসরি কিংবা সালাদরূপে খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ শশা খুঁয়ে শশার মতো ভূমির উপর লতায়ে থাকে। এ শশা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস বপন করা হয়।

শশার কয়েকটি জাত ঃ মার্কেটার, নায়াগ্রা, কলোরেডো, বাপী হাইব্রিড, পামটো, ন্যাশনাল পিকলিং, সিকাগো পিকলিং, মডেল ও ইয়ার্ক টেস্ট পিকলিং ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যান্য জাতগুলো হচ্ছে বিউটিফুল এফ-১, এভার-গ্রীন এফ-১, নীবজা এফ-১, জয়েন্ট লং, শাহী-৫৫০, ওরিয়েন্ট ইতাদি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ ঃ হেক্টর প্রতি ৪-৫ টন গোবর, ১৭০-১৮৫ কেজি ইউরিয়া এবং ১২০-১৫০ কেজ টিএসপি ও ১০০-১৫০ কেজি এমওপি সার ব্যবহার করা চলে।

মাঝারি উর্বর হতে উর্বর জমি শশা চাষের জন্য উত্তম। জমিতে ৪/৫ বার চাষ ও মই দিয়ে তারপর বেড/মাদা তৈরি করতে হয়। মাদায়/গর্তে বীজ রোপণের ৮/১০ দিন আগে গর্তের মাটির সাথে সার মিশাতে হবে। শুধু ইউরিয়া সার চারা গজানোর ২০ দিন ও ৪০ দিন পর দুইভাগে মাদার উপরে ছিটিয়ে দিয়ে মাটি আলগা করে মিশায়ে দিতে হবে। মৌল সার হিসেবে খৈল হেক্টর প্রতি ২৮০ কেজি দেওয়া যায়।

চিত্র : পূর্ণাঙ্গ শশা গাছ

চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা- ঝুঁয়ে শশার জন্য ১.৫-১.৮ মিটার দূরত্বে সারি ও সম দূরত্বে ঐ সারিতে বীজ রোপণ করা যায়। পালা বা বর্ষাতি শশার জন্য ১১-২.৪ মিটার দূরত্বে সারি ও সম দূরত্বে ঐ সারিতে বীজ রোপণ করা যায়। হেক্টর প্রতি ৬০০-৭০০ গ্রাম বীজ লাগে। তবে ২-২.৫ দূরত্বে মাদা করা হয় এবং এর গভীরতা ৫০-৮০ সেমি. হলে ভালো হয়। এক একটি মাদায় প্রথমে ৬/৭টি করে বীজ পুঁতে চারা গজানোর পর সুস্থ ও সবল দেখে ২টি করে চারা রেখে অন্যগুলো তুলে ফেলতে হয়। বর্ষাতি শশার জন্য মাচা বা ইংরেজি 'এ' আকৃতির বা তাবু আকৃতির ন্যায় করে কাঠি দিয়ে বাউনি তৈরি করা যায়। মাঝে মাঝে মাটি খুঁচিয়ে আলগা করে রাখতে হয় এবং আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হয়। বৃষ্টির পানিতে বা সেচের কারণে মাটিতে চটা হলে তা নিড়ানি দিয়ে ভেঙে দিতে হয়।

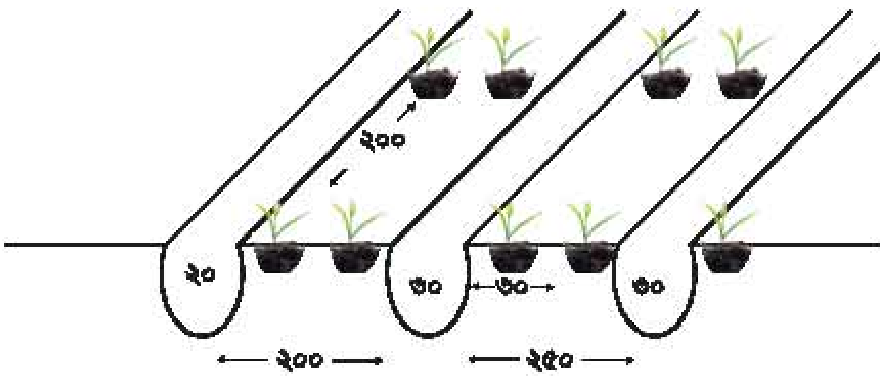

চিত্র : শশা রোপণের নকশা

পোকা দমন- লাল পোকা, কাঁটালে পোকা, মাছি পোকা ও মাজরা পোকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাজরা পোকার কীড়া কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে। এসব পোকা দমনের জন্য ডাইব্রোম কিংবা ডিপটেরেক্স ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া ফেনিট্রোথিয়ন, ফেনভেলারেট ১.১২-১.২৫ মিলি./লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোগ দমন- ডাউনি মিলডিউ, পাউডারি মিলিডিউ, এনথ্রাকনাজে বা ফল পচা রোগ এবং মোজাইক প্রভৃতি প্রধান রোগ। এদের দমনের জন্য আগাছা ও আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করা ভাইরাস বহণকারী পাকা বিনষ্ট করা এবং প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা দরকার। যেমন- নায়াগ্রা, বাপী হাইব্রিড, ইয়র্ক স্টেট পিকলিং, ওহাইও এম আর ১৭ প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধী জাত। বালাইনাশক হিসেবে ম্যানকোজেব, কপারঘটিত, ইপ্রোডিয়োন যথাক্রমে ২-৩.৫ গ্রাম/লিটার, ১-২ গ্রাম/লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে গাছ ভিজিয়ে দিতে হবে।

পানি সেচ ও নিকাশ - বসন্ত ও শীতকালীন শশা, যথা-খুঁয়ে শশা ও খিরা ইত্যাদিতে প্রচুর পানি সেচের প্রয়োজন। অতিরিক্ত পানি ভীষণ ক্ষতি করে তাই পানি নিকাশের জন্য নালা রাখতে হয়। আগাছা বাছাই ও পরিচর্যা কাজের দিকে লক্ষ রাখতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ - চাকু দ্বারা বোঁটা কেটে শশা সংগ্রহ করতে হয়। সালাদ, আচার ইত্যাদির জন্য ব্যবহার্য শশা বেশ কচি অবস্থায় তোলা উচিত। প্রতিদিনই বা দু একদিন পর পরই সংগ্রহ করা যায়। শশা কার্টুন বা অন্য গাছের সবুজ পাতাসহ খাচায় করে সাজায়ে বাজারে নেওয়া যায়। কুচি অবস্থায় শশা সংগ্রহ করা হলে গাছে অধিক সংখ্যক ফলে। হেক্টর প্রতি শশার ফলন ৭-১৫ টন।

শশার তরকারী করতে হলে সেগুলো কিছু বয়ষ্ক করে তালো যায়। পাকা শশা প্রায় সপ্তাহখানেক সংরক্ষণ করা যায় এবং এগুলো পায়েস ও মোরব্বা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

২০২২

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. রাউজাতের লাউ কোন দেশের?

২. লাউ বীজ মাদা সার দেওয়ার কতদিন পর রোপণ করা উচিত?

৩. লাউয়ের ১টি পুরুষ ফুল দিয়ে সাধারণত কয়টি স্ত্রী ফুলের পরাগায়ন করা যায়?

৪. মিষ্টি কুমড়া রোপণের মাদায় গর্ত কি আকারের করা ভাল?

৫. মিষ্টি কুমড়ার ব্যবহৃত বিষটোপ কতদিন পর পর বদলাতে হয় ?

৬. বাসনিত এফ-১ চালকুমড়া কোন আকারের জাত ?

৭. কুমড়া জাতীয় কোন সবজিতে দ্বি-লিঙ্গিক ফুল থাকে ?

৮. উৎপাদনের সময় অনুসারে শশার জাত কয়টি ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. লাউ চাষে সারের মাত্রা উল্লেখ কর।

২. লাউয়ের পরাগাণ কিভাবে করা হয় তা বর্ণনা কর।

৩. মিষ্টি কুমড়ার মাছি পোকা দমন কৌশল বর্ণনা কর।

৪. চাল কুমড়ার যৌন অভিব্যক্তি ও যৌনরূপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

৫. শশা চাষে জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ সম্পর্কে লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. লাউ চাষে জমি তৈরি সার প্রয়োগ ও বীজ রোপণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা কর।

২. মিষ্টি কুমড়া চাষে সারের মাত্রা, চারা রোপণ ও পরবর্তী পরিচর্যাসহ ১টি পোকা ও ১টি রোপণ দমন সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৩. চালকুমড়ার জাতসহ চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা এবং ফল ধারণে পরাগায়নের ভূমিকা বর্ণনা কর।

৪. শশার চাষ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

একাদশ অধ্যায়
ঝিঙা, চিচিংগা, পটল ও করলার চাষাবাদ

ঝিঙার চাষ

ঝিঙার জাত ঃ ভুঁয়ে বা চৈতালী ঝিঙা উত্তরবঙ্গের কোন কোন জেলায় চাষ হয়। গ্রীষ্মকালে চাষ হলে তাকে খুঁয়ে এবং বর্ষাকালে চাষ হলে তাকে পালা বা মাচার ঝিঙা বলে। তবে ঝিঙার অনুমোদিত ও উন্নত কয়েকটি জাত আছে। যেমন- ফিল্ড চ্যাম্পিয়ন, লম্বা ঝিঙা, বার পাতা ইত্যাদি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ- ঝিঙা চাষের জন্য দোঁআশ মাটি বেশি উপযোগী। তবে সব ধরনের মাটিতেই চাষ করা যায়। ঝিঙা চাষের জমির আইল ভালোভাবে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটি ঝুরঝুরে ও নরম করে নিতে হয়। আইল চিকন হলে আইল হতে ১ মিটার দূরে অর্থাৎ জমিতে মাদা তৈরি করে মাদায় সার দিতে হয়। আইল উঁচু ও চওড়া করে ঝিঙা চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করা যায়। জমি ছোট ছোট খণ্ড হলে চারকোণায় ঝিঙা চাষের জন্য উপযোগী করা যায়।

সার মাত্রা ও প্রয়োগের নিয়ম ও প্রতিটি মাদা যে পরিমাণ সার দিতে হয় তা উল্লেখ করা হলো।

সারের নাম	প্রয়োগের পরিমাণ (গ্রাম)
পচা গোবর সার	১০০০
ইউরিয়া	৫০
টিএসপি	৩০
এমওপি	৩০
বোরণ	২-৩

জমির আইলে মাদা বা জমির ভিতরে মাদা তৈরির সময় গোবর সার, টিএসপি এবং তিন ভাগের একভাগ এমওপি সার আইলের মাটি বা মাদার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমওপি সার সমান দুভাগে ভাগ করে ১ম ভাগ বীজ গজানোর ১৫ দিন পর এবং ২য় ভাগ চারার বয়স ৪-৫ সপ্তাহ হলে উপরিপ্রয়োগ করে মাটি খুচিয়ে আগলা করে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ ও অতবর্তী পরিচর্যা

মাদার আকার হবে ২০ × ২০ × ২০ ঘন সেন্টিমিটার। তবে মাদা তৈরির জন্য নির্বাচিত উঁচু জায়গা এবং গর্তের আকার ৩০ × ৩০ × ৩০ ঘন সেন্টিমিটার হলে ভালো হয়। ঝিঙার বীজ গজাতে সময় লাগে। তাই বীজ বপনের পূর্বে ১ মিনিট ভিজিয়ে নিতে হয়। এতে বীজ তাড়াতাড়ি গজায়। প্রতি মাদায় ৩-৪টি করে বীজ বপন/রোপণ করতে হয়। মাদা হতে মাদায় গাছের দূরত্ব ১ মিটার রাখতে হয়। মাদায়/আইলে আগাছা জন্মানোর সাথে সাথেই দমন করতে হয়। কোন স্থানে বীজ না গজালে সেখানে পুনরায় তাড়াতাড়ি নতুন করে বীজ রোপণ করতে হয়। গাছ লতানোর ভাব শুরু হলেই মাচা/বাউনি করে দিতে হয়। তবে ঝিঙার জন্য মাচা বেশি উঁচু করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত ৩ ফিট উঁচু করে মাচা করলেই যথেষ্ট।

পোকা দমন বিটল পোকা- গাছের পাতা খেয়ে ক্ষতি করে। হাতজাল দিয়ে ধরে গরম বাষ্প দিয়ে বা গরম পানিতে দিয়ে মারা যায়। ফেনিট্রোথিয়ন ৫০ তরল ২ মিলি লিটার ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করে দমন করা যায়।

চিত্র ঃ গান্ধী পোকা

চিত্র ঃ বাউনিতে ঝিঙা গাছ

গান্ধী পোকা- পাতার রস চুষে খায়। আলোর ফাঁদ/হাতজালের সাহায্যে সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলা যায়। হেক্টর প্রতি ১-১.২ লিটার ম্যালাথিয়ন - ৫৭ ইসি তরল বা ফেনিট্রোথিয়ন ৫০ তরল ৫০০-৭০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করে দমন করা যায়।

মাছি পোকা- ফল নষ্ট করে দেয়। আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে পুঁতে ফেলতে হবে বা ফুটন্ত পানিতে ডুবিয়ে পোকা মেরে ফেলতে হবে। ফল ধরা গাছে বিষটোপ ব্যবহার করা যায় (১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি কুচি করে কেটে থেতলিয়ে তাতে ০.৫ গ্রাম ডিপটেরেক্স ৮০ এসপি ও ১০০ মিলি. পানি মিশিয়ে ছোট মাটির পাত্রে রেখে তিনটি খুটির সাহায্যে ০.৫ মিটার উঁচুতে স্থাপন করা)।

রোগ দমন- পাউডারি মিলডিউ রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার উপরে কাণ্ডে এবং ফলে সাদা সাদা পাউডার এর ন্যায় দেখা যায়। এতে পাতা নষ্ট হয়ে যায়, ফল ছোট হয়। ফলন কমে যায়।
ডাউনি মিলডিউ রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার নিচের দিকে ধূসর বেগুনি রঙ ধারণ করে। আক্রান্ত গাছ দুর্বল হয়ে আস্তে আস্তে মারা যায়। এ রোগ দমনে ম্যানকোজের/কপার ঘটিত বালাইনাশক স্প্রে করে রোগ দমন করা যায়।

সেচ ও নিকাশ ঃ গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য জমি তল অপেক্ষা ৭-৮ সেমি. উঁচু করে মাদা তৈরি করে সেখানে বীজ রোপণ করতে হয়। বিশেষ করে বর্ষাতী ঝিঙার জন্য আগে হতেই নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। যদি একটানা ১০-১৫ দিন খরা হয় তাহলে ঝাঁঝরি দিয়ে সেচ দিয়ে মাটিতে জো আসলেই খুচিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

ঝিঙা বীজ রোপণের সাধারণত ৪৫-৫৫ দিন পর হতে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ঝিঙার গায়ের শিরাগুলো নষ্ট হলে দেখতে খারাপ দেখায় এবং মান নষ্ট হয়ে যায়। তবে কচি থাকা অবস্থায় সংগ্রহ করে বাজারে পাঠাতে হয়। ঝিঙা উঠাতে বিলম্ব হলে ভিতরে আঁশ হয়ে যাওয়ায় খাওয়ার অনুপোযোগী হয়ে যায়। বাঁশের খুঁটিতে সবুজ ও সতেজ পাতা বা চট বিছিয়ে ঝিঙা বাজারে দূরে পাঠাতে হয়। বস্তায় করে বাজারে পাঠালে গায়ে দাগ পড়ে যায়।

সংগ্রহের পর ঝিঙা, চিচিংগা, পটল ও করলার চাষাবাদ ঝিঙা ১ দিনের বেশি রাখলে স্বাভাবিক রঙ নষ্ট হয়ে যায়। গায়ে দাগ পড়ে যা দেখতে হলদে/বাদামি মত হয়। এতে মান নষ্ট হয়ে যায়। ফলন-হেক্টর প্রতি ১০-১২ টন সবজি হয়।

চিচিংগা চাষ

চিচিংগার জাত- চিচিংগার বিভিন্ন জাতের মধ্যে ঝুমলং জাত বেশি জনপ্রিয়। কেননা ঝুমলং বেশি ফলন দেয়। চট্টগ্রাম ও ঢাকা অঞ্চলে প্রচলিত জাতটি সাদাটে বা হালকা সবুজ বর্ণের। এটি কিছুটা আগাম চাষ করা যায়। তবে এ জাতটি খাটো, তাই পরিবহণ ও বিক্রয়ে সুবিধা হয়। চিচিংগার বিভিন্ন জাতের মধ্যে সাভারি সাদা, সাদা ডোরাকাটা, সবুজ ডোরাকাটা বাংলাদেশে চাষ হচ্ছে।

চিত্র : বাউনিতে চিচিংগা গাছ

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি ঃ বেশি পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করে যেকোন ধরনের জমিতে চিচিংগা চাষ করা যায়। তবে কম সূর্যের আলো ও বেশি বৃষ্টিতে ফলন কম হয়। চিচিংগার জন্য সুনিষ্কাশিত দোঁআশ মাটি সবচেয়ে ভালো। জমি ৩/৪টি চাষ আড়াআড়িভাবে দিয়ে প্রতিবার মই দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙে ফেলতে হয়। এরপর কোদাল দিয়ে আইলের ন্যায় তৈরি করতে হয়। এ আইল কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে ঝুরঝুরে করে নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা তৈরি করতে হয়। আইল তৈরির সময় প্রয়োজনীয় সার মাদায় বা গর্তে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। এছাড়াও আইলের মাথায় ২দিকে ৪ কোণার উঁচু স্থানে মাদা করে চিচিংগা চাষ করা যায়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ ঃ মাদা/গর্তপ্রতি সারের পরিমাণ

সার প্রয়োগের সময়	সারের নাম ও পরিমাণ			
	গোবর	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি
আইল তৈরির সময়, তবে বীজ বপনের ৭-১০ দিন আগে	২ কেজি	-	১৮ গ্রাম	৫ গ্রাম
চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর ১ম উপরি প্রয়োগ	-	৫ গ্রাম	-	-
চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর ২য় উপরি প্রয়োগ	-	১০ গ্রাম	-	১০ গ্রাম

চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা- চিচিংগা বীজ রোপণের জন্য জমিতে মাদার আকার হবে ২০ × ২০ × ২০ ঘন সেমি. এবং উঁচু স্থানে তৈরিকৃত মাদার আকার হতে ৩০ × ৩০ × ৩০ ঘন সেমি.। প্রতি মাদায় ৩-৪টি সুস্থ বীজ রোপণ করতে হয়। বীজের আবরণ শক্ত বিধায় রোপণের আগে প্রায় ২-৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে ভালো হয়। মাদায় বীজ রোপণের সময় ১.৫-২ সেমি. গভীরে বীজ স্থাপন করতে হয়। চারা গজানোর পর ১২-১৫ সেমি. লম্বা হলে প্রতি মাদায় ১টি করে সুস্থ সবল চারা রেখে বাকি চারাগুলো উঠিয়ে দিতে হয়। এ চারাটি প্রায় ২০ সেমি. লম্বা হলে বাঁশের কঞ্চি, অন্য গাছের ডাল বা ধৈঞ্চা দিয়ে আরাহেন করার সুযোগ করে দিতে হয়, যাতে মাচায় সহজে উঠতে পারে। আবার কোদাল দিয়ে কুপিয়ে তৈরি মাটির আইলের ওপর মাচা বানায়ে তাতে চাষ করা যায়। মাচার প্রস্থ ১.৫ মিটার এবং জমির প্রাপ্যতার ভিত্তিতে সুবিধামত লম্বা করা যায়।

পোকা দমন

রেড় পাম্পকিন বিটল- পূর্ণ বয়ক পোকা পাতা খেয়ে পাতায় গোলাকার ছিদ্র তৈরি করে। এতে গাছ মারা যেতে পারে। এর শুককীট মাটিতে থাকে এবং বড় গাছের শিকড় কেটে ক্ষতি করে থাকে। ঝিঙার অনুরূপ দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ইপিলাকনা বিটল- এর গ্রাব বা পূর্ণ বয়স্ক পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতা বিবর্ণ ও জালির ন্যায় করে ফেলে। এ পোকা দমনে ফেনিট্রোথিয়ন/ম্যালাথিয়ন/ডায়াজিনন যে কোন ১টি ২ মিলি. হারে ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চিত্র ঃ পূর্ণাঙ্গ ইপিলাকনা বিটল   চিত্র ঃ ফলের পূর্ণাঙ্গ মাছি পোকা ও ম্যাগোট

ফলের মাছি পোকা- এ পোকা কচি ফলে ছিদ্র করে এবং আক্রান্ত ফল পচে ঝরে যায়। আক্রান্ত ফল বিকৃত হয়। ঝিঙ্গার অনুরূপ দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

রোগ দমন

পাউডারি মিলডিউ- এ রোগের আক্রমণে পাতার উপরিভাগে সাদা পাউডারের ন্যায় আবরণ পড়ে। অনেক সময় গাছ মারা যায়। এর দমন-ঝিঙ্গার অনুরূপ।

সেচ ও নিকাশ- চিচিংগা জলাবদ্ধতা ও স্যাঁতসেঁতে অবস্থা সহ্য করতে পারে না, তাই উঁচু আইল চওড়া দেখে নির্বাচন করতে হয়। মাদায় সার প্রয়োগের পর পানি সেচ দিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ- চিচিংগার গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং বীজ রোপণের ২ মাসের মধ্যেই ফল ধারণ করে। শাস নরম ও কচি থাকা অবস্থায় সংগ্রহ করতে হয়। একবার ফল ধরা শুরু করলে প্রায় দেড়মাস ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। চিচিংগা জমি হতে উঠানোর পর ২ দিন পর্যন্ত সজীব থাকে। চিচিংগা গাছে বয়স্ক হলে ফেটে ফেটে যায়। সবজি সংগ্রহের সময় যাতে আঘাত না পায় সেজন্য প্লাষ্টিকের বাক্স বা ছালার বস্তা ব্যবহার করা যায়। বাজারে নিতে সমস্যা বা বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ঠান্ডা বাতাসের সাহায্যে শীতলীকরণ করার জন্য পানিতে ডুবিয়ে বা বায়ুশূন্য ঘরে রাখার পর পানি ছিটিয়ে দিতে হয়। উপরে খড়ের ছাউনি এবং বাঁশ/পাটখড়ির বেড়া দিয়ে ঘর তৈরি করে মাঝে মাঝে তার দেয়াল ও ছাদ পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে সে ঘরে ২/১ দিন রাখা যায়, কেননা তাতে ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ঠান্ডা হয়।

ফলন- হেক্টর প্রতি ১৫-২০ টন সবজি হয়।

পটল চাষ

পটলের জাত: ফলের আকার, আকৃতির ও রঙ এর ওপর ভিত্তি করে পটলের অনেক জাত পাওয়া যায়। সুনির্দিষ্টভাবে পটলের জাত বাছাই করা না হলেও অঞ্চলভেদে অনেক জাত চাষ হয়ে থাকে। যেমন- কাজলী, সাদা খলি, দামুড়া, বাউই ঝাঁক, খুলি, বোম্বাই, মুর্শিদাবাদী, বালি, কানাইবাঁশী ইত্যাদি।।

২০২২

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি- দোঁআশ মাটি ও জমি বিশেষভাবে সুনিষ্কাশিত করে তৈরি করতে হয়। পটল চাষের জন্য উঁচু জমির প্রয়োজন। তবে চরাঞ্চলেও এর চাষ করা যায়। জমি ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়। জমি চাষের পর ১.৫ মিটার চওড়া করে বেড তৈরি করতে হয়। প্রতি বেডের মাঝখান দিয়ে ১৫-২০ সেমি. গভীর করে নালা কেটে ঐ নালার মধ্যে পটলের বীজ (লতা/গেঁড়) রোপণ করতে হয়। প্রতি দুই বেডের মাঝখান দিতে প্রায় ৩০ সেমি. চওড়া করে নালা রাখতে হয়, যাতে ঐ বৃষ্টি বা সেচের পানি বের হয়ে যেতে পারে। পটলের জমি ২ ভাবে তৈরি করা হয়। যেমন-মাটিতে লতানো এবং মাচাতে গাছের জন্য বেড দুই ধরনের করা হয়। মাটিতে লতানো গাছের জন্য পটলের লতা রোপণের জন্য একটানা লম্বা নালা তৈরি করা হয়। আর মাচার জন্য বেডের মাঝে নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা তৈরি করা হয়।

সার প্রয়োগ- পটলের জমি নরম ও আগাছামুক্ত রাখা দরকার। তবে নরম রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণ জৈব সার ব্যবহার করতে হয়। এজন্য হেক্টর প্রতি ৯-১০ টন গোবর সার বা কম্পাষ্টে সার, ১৭০-১৮৫ কেজি খৈল, ৮০ ১০০ কেজি ইউরিয়া, ১২০-১৫০ কেজি টিএসপি এবং ৪০-৫০ কেজি এমওপি সার দেয়া যেতে পারে। ইউরিয়া ও এমওপি সার বাদে অন্যগুলো মৌল সার হিসেবে শেষ চাষের সাথে সম্পূর্ণ জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা গজাননার পর যখন ৬০-৯০ সেমি. বা লতা হবে তখন ৫০% ইউরিয়া ও এমওপি সার ছিটিয়ে দিয়ে মাটি আগলা করে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর লতা যখন মাচায় উঠায়ে দেওয়া হবে বা তার নিচে খড় বিচালি বিছানাে হবে সে কী ৫০% ইউরিয়া ও এমওপি সার ২য় উপরিপ্রয়োগ হিসেবে দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও জিপসাম ৬০ কেজি, দস্তা ৮ কেজি ও বারেণ সার ২-৩ কেজি জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করা হলে ভাল ফল পাওয়া যায়। ইউরিয়া ও এমওপি সারের ১ম ও ২য় উপরিপ্রয়োগ বেডে সারির বা মাদার পাশে মাটিতে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

চারা রোপণ অন্তবর্তী পরিচর্যা

চাষের সময় ঃ অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত যে কোনো সময় পটল লাগানো যায়। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে লাগানো গাছ থেকে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায়। মার্চে লাগানো গাছে জুনের পূর্বে ফল আসে। তবে কয়েক দফায় গাছ লাগালে সারা বছরই পটল পাওয়া যায়।

রোপণ ঃ পটল চাষে ২৬০ সেমি. চওড়া বেড় করে ২০০ সেমি. দূরে দূরে সারি করতে হয়। দুই বেডের মাঝখানে ৩০ সেমি. চওড়া ও ২০ সেমি. গভীর করে নালা তৈরি করতে হয়। অক্টোবর হতে নভেম্বর মাসে লতা ফেব্রুয়ারি মাসে শিকড় ও বীজতলায় কাটিং রোপণ করা যেতে পারে, যা থেকে ফেব্রুয়ারি হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পটল উৎপাদন হয়। সাধারণত ১৫-২০ সেন্টিমিটার গভীর করে ভেলি খনন করে তাতে প্রায় ৫০-৬০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গাছ রোপণ করা হয়। রোপণের জন্য ব্যবহৃত গাছ তিন প্রকারের যথা- ক. শেঁকড়, খ, লতা ও গ. লতার গোছা।

রোপণের সময় ঃ শিকড়ের একদিকের অগ্রভাগ মাটির বাইরে রেখে গোড়ার অংশ খননকৃত ভেলি বা গভীর নালাতে। এরপর অগ্রভাগ খড় বা বিচালি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। প্রায় দুই সপ্তাহ পর সাকার বের হয়। রোপণের জন্য প্রস্তুতকৃত লতাগুলোকে একত্রে জড়িয়ে গাছো বাঁধা হয়। কোনো কোনো লতা অফলন্ত থেকে যায়। লক্ষ রাখতে হয় যেন লতা সংগ্রহের সময় ফলন্ত গাছ চারা হতে সংগ্রহ করা হয়। ২০২২

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই আগাম ফসল করতে হলে সেচের প্রয়োজন। তবে ফসলের চাহিদা বুঝে সেচ দিতে হয়। পটল একটি লতানো উদ্ভিদ। বাউনি দিলে গাছের ফলনশীলতা বেশি হয়। কিন্তু পটল মাটির উপরে বেয়েও খুব ভালো ফলন দিতে পারে। এজন্য বাউনির পরিবর্তে মাটির উপরে খড়, আখের শুকনো পাতা অথবা কচুরিপানা বিছিয়ে দেয়া যায়। এতে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয়।

পটল বীজ গাছের অসুবিধা

ক. বীজের অঙ্কুরণ অনিয়মিত।

খ. বীজের গাছের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ পুরুষ জাতের হয়।

গ. আসল বীজের গাছ থেকে ফল পেতে অনেক বেশি সময় লাগে।

পটলের বংশবিস্তারের জন্য কাণ্ডাংশসহ কন্দাল মূল অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। কাণ্ডের শাখা (কলম) থেকেও নতুন গাছ পাওয়া যায়। ১২০ থেকে ১৫০ সেন্টিমিটার দূরত্বে সারি করে সারিতে ১ মিটার পর পর চারা রোপণ করা হয়। সুষ্ঠু পরাগায়নের জন্য ক্ষেতে ১০% পুরুষ জাতের গাছ লাগাতে হয়।

মুড়ি বা রেটুন ফসল ঃ একবার ফল দেয়ার পর দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ বা এগুলোর গুড়িচারা যথাস্থানে রেখে দিয়ে দ্বিতীয়বার যে ফসল নেয়া হয় তাকে রেটুন ফসল বলা হয়। পটলের গাছও ফল দেয়ার পর মারা যায় বা কাণ্ড রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রথমবারের ফসল সংগ্রহের পর কাণ্ড কেটে ফেলে দিলে কিছুদিন পর কন্দমূল থেকে নতুন কাণ্ড বের হয়। সঠিকভাবে যত্ন নিলে এ রেটুন ফসল থেকেও ভালো ফলন পাওয়া যায়।

পোকামাকড় ও রোগ দমন

পোকামাকড় দমন- লালপোকা ঃ এ পোকা পাতা খায় ও পাতা ছিদ্র করে।

কাঁঠালে পোকা- এ পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে জালির ন্যায় তৈরি করে। সেভিন, নেক্সিয়ন, ডায়াজিনন-৬০ ইসির যে কোন একটি ১ - ১.২ মিলি. লিটার বিষ ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

উইপোকা ঃ এ পোকা মাটিতে বাস করে। গাছের মাথা বা লতা বা শৈত্ত খেয়ে গাছের ভীষণ ক্ষতি করে। কার্বোফুরান ৩/৫ জি ১০-১২ কেজি হারে প্রতি হেক্টর জমিতে ছিটিয়ে কোপায়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলে উইপোকা দমন হয়।

চিত্র ঃ পূর্ণাঙ্গ উইপোকা

রোগ দমন পাউডারি মিলডিউ ঃ এ রোগ কাণ্ডে ও পাতায় সাদা দাগ সৃষ্টি করে। ফলে আস্তে আস্তে এ রোগে আক্রান্ত গাছ মারা যায়। থিয়োভিট, রিডোমিল বা কপার মিশ্রিত ছত্রাকনাশক ৩ - ৩.৫ কেজি ৬০০-৭০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি হেক্টর জমিতে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

সেচ ও নিকাশ ঃ পটলের চারা গজানোর পর হালকা সেচ দিলে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়। তবে সেচের পর মাটির চটা ভেঙে দিতে হয়। পটল দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। কিন্তু উষ্ণ ও আর্দ্র অবস্থায় পটল ভালো হয়। পটলের জমিতে ১ দিন পানি দাঁড়ানো থাকলেই সমস্ত গাছ ও গাছের পাতা লালচে হয়ে মারা যায়। তাই সেচ বা বৃষ্টি পানি যাতে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য ভাল নিকাশ ব্যবস্থা করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

ফসল সংগ্রহ ঃ ফুলের পরাগায়নের সপ্তাহ খানেকের পটলের ফল সগ্রহের উপযোগী হয়। কাঁচা ফল সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে আন্তঃজেলা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পটল একটি উল্লেখযাগ্যে পণ্য। এজন্য দূরে চালান দিতে হলে মধ্যম পরিপক্ক ফল পাঠানাই উত্তম। তবে চটের ব্যাগে করে ঠান্ডা অবস্থায় প্রেরণ করা শ্রেয়। পটল চাপ খেলে দ্রুত লাল হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

ফলন ঃ হেক্টর প্রতি ৮-১৫ টন পটল জন্মে থাকে। একই পটলের গাছ দুই তিন বৎসর পর্যন্ত ফল প্রদান করে থাকে। যদি রেটুন ফসল হিসেবে পরিচর্যা করে চাষ করা হয়।

করলার চাষ

বাংলাদেশে বৃহাদাকার ও সবুজ বর্ণের গজ করলা চাষ হচ্ছে। কিছুটা লম্বা ও বোঁটার দিক সরু এবং বাকানো আকৃতির করলা যা কাঠবিড়ালী নামে প্রচলিত। দেশি ও ভারতীয় অনেকগুলো জাত চাষ হচ্ছে। যেমন দেশি জাত: হীরা ৩০৪ এফ-১, হীরক এফ-১, মানিক এফ-১, মনি এফ-১, গুডবয়, জাম্বো, গজ করলা, হারমুনি, প্রাইফ এফ-১ ইত্যাদি। ভারতীয় জাত: পুষা দু মৌসুমী, কয়েমেটর, হোয়াইট লং, কালিয়ানপুর প্রভৃতি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি: করলা বেলে দোঁআশ, পলিদোঁআশ ও দোঁআশ মাটিতে ভালো জন্মে। জমি চাষ ও মই দিয়ে পরিপাটি করে দুই মিটার চওড়া করে বেড় তৈরি করতে হয়। পরে বেডের উপর ১ মিটার ব্যবধানে জোড়া সারি করে ১ মিটার পর পর মাদা তৈরি করে মাদায় সার প্রয়োগ করতে হয়।

সার প্রয়োগের সময়	সারের নাম ও পরিমাণ / মাদা			
	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
বীজ রোপণের ৭-১০ দিন। পূর্বে প্রতি মাদায়	১	-	২৫	১০
চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর ১ম উপরি প্রয়োগ।	-	১০	-	১০
চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর ২য় উপরি প্রয়োগ।	-	১০	-	১০

২০২২

প্রতিবার সারের উপরিপ্রয়োগ করার সময় মাটি খুচিয়ে সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

সারের উপরিপ্রয়োগ ঃ গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির সাথে সাথে তার খাদ্য চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। খাদ্যের অভাবে ফুল-ফল উৎপাদন কম হয়। সাধারণত ইউরিয়া এবং এমওপি সার গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি শুরু হলে পার্শ্ব প্রয়োগের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়।

ক. গাছের খাদ্য ঘাটতি পূরণ হয়।
খ. জৈব পদার্থকে পঁচনে সহায়তা করে।
গ. গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ভালো হয়।
ঘ. মাটির পুষ্টি ভারসাম্য বজায় থাকে।
ঙ. ফলন বেশি হয়।

চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা

বীজ বপনের হার ঃ প্রতি মাদায় ৩-৪টি বীজ রোপণ করতে হয়। মাদায় দুই বা এক সারি পদ্ধতিতে করলা চাষ করা হয়। এক্ষেত্রে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ১ মিটার।

সাধারণত দুই সময়ে বীজ বপন করা যায়। জানুয়ারি-মার্চ মাস এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর মাস।

বীজ বপন পদ্ধতি ঃ সার প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর প্রতি মাদায় বা উঁচু জায়গায় গর্ত তৈরি করে ৩-৪টি করে বীজ বপন করতে হয়। করলা বীজের বীজত্বক খুব পুরু বিধায় বপনের পূর্বে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয়। এতে বীজের অঙ্কুরোদগম সহজ হয়। মাদায়/গর্তে ২ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ রোপণ করতে হয়। তবে করলা বীজ ৮ ১০ দিনে গজায়।

গাছ পাতলাকারণ ঃ বীজ্জ গজানোর পর চারা ৮-১০ সেন্টিমিটার লম্বার হলে প্রতি মাদায় বা গর্তে ১টি করে সুস্থ-সবল চারা রেখে বাকি চারা উঠায়ে ফেলতে হয়।

মাটি আগলাকরণ ঃ মাদার মাটি শক্ত হয়ে গেলে তা নিড়ানির সাহায্যে নরম ও ঝুরঝুরে করে দিতে হয়।

শূন্যস্থান পূরণ ঃ মাদায় চারা রোপণের পর কখনো কখনো সবজির চারা কিছু কিছু মারা যায়। অনেক সময় বপনকৃত বীজ গজায় না। সেসব শূন্যস্থানে নতুন করে সেই একই জাতের, একই বয়সের চারা লাগানো বা বীজ বপন করতে হয়। এজন্য চারা রোপণের সময়ই মাদার মধ্যে কিছু কিছু অতিরিক্ত চারা রাখতে হয়, যাতে সেসব চারা দিয়ে শূণ্যস্থান পূরণ করা যায়। সাধারণত চারা রোপণের ৭-৮দিনের মধ্যে এ কাজ করা উচিত। শূন্যস্থান পূরণের উপকারিতা

ক. জমিমাদার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়,
খ. আগাছা কম হয়,
গ. উৎপাদন বৃদ্ধি পায়,
ঘ. সারের সদ্বব্যবহার হয়।

খুঁটি বা বাউনি দেয়া ঃ লতানো ফসল চাষাবাদের ক্ষেত্রে গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির সময় খুটি বা বাউনি দেওয়া প্রয়োজন। খুঁটি বা বাউনি না দিলে গাছের আজ বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এছাড়া গাছ মাটিতে নুয়ে পড়ে। বাঁশ, কঞ্চি পাটকাঠি, ধৈঞ্চা ইত্যাদি দিয়ে এ কাজ করা হয়। এ ছাড়া মাদায় পাতলা করে ধৈঞ্চা গাছ জন্মিয়ে সেগুলোকেও খুটি বা বাউনি হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

খুটি বা বাউনির উপকারিতা

ক. গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি ভালো হয়,
খ. গাছ পচনের হাত থেকে রক্ষা পায়,
গ. অন্যান্য পরিচর্যা এবং ফসল সংগ্রহ,
ঘ. গাছ পরিমিত আলো বাতাস পায়,

২০২২

ঙ. গাছকে দাঁড়িয়ে থাকতে সহায়তা করে,
চ. ফলন বেশি হয়,
ছ. গাছ খুঁটি বা বাউনি বেয়ে উপরের দিকে উঠতে পারে।

মাচা দেয়া ঃ লতানো ফসল মাটির উপরে মুক্তভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। এ সব ফসল মাটিতে থাকলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, গাছ ও ফল পঁচে যেতে পারে। এসব গাছ মাটির উপরে কোনো অবলম্বন পেলে তাতে খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠে। এজন্য লতানো প্রকৃতির ফসল চাষাবাদ করতে হলে বাঁশ, কঞ্চি, পাটকাঠি, ধৈঞ্চা দিয়ে মাচা তৈরি করে দিতে হয়।

মাচা দেয়ার উপকিরিতা

ক. গাছ সহজে বৃদ্ধি পায়,
খ. ফলন বেশি হয়,
গ. গবাদি পশু সহজে গাছ নষ্ট করতে পারে না,
ঘ. গাছের ফল নষ্ট হয় না,
ঙ. ফসলের অন্যান্য পরিচর্যার সুবিধা হয়,
চ. আইলের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

ছাঁটাইকরণ ঃ ফসলের অঙ্গজ বৃদ্ধি বেশি হয়ে গেলে ফল উৎপাদন কম হয়। এজন্য গাছের দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও ফলায়নকে উৎসাহিত করার জন্য অতিরিক্ত শাখা-প্রশাখা কেটে দিতে হয়। এছাড়া রোগ ও পোকা আক্রান্ত ডাল পালা, লতা-পাতা কেটে গাছ ছাঁটাই করে দিতে হয়।।

পরাগায়নকরণ ঃ কুমড়া গোত্রের অধিকাংশ সবজির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গাছে স্ত্রী ফুল ফোটার কিছুদিন পর ফল পচে যায় বা ঝরে যায়। পোকা ও মৌমাছির অনুপস্থিতিতে পরাগায়ন না হওয়ার ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই কৃত্রিম উপায়ে এসব ফসলের পরাগায়ন করা দরকার। ফল ধারনের জন্য হাত দিয়ে ফুলের পরাগায়ন করতে হয়। সকালের অথবা বিকেলের দিকে একটি সদ্য ফোটা পুরুষ ফুল নিয়ে পুংকেশর ঠিক রেখে পাঁপড়িগুলো ছিড়ে ফেলতে হয়। তারপর সেই পুংকেশর দিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভকেশরের উপর আলতাভোবে কোমলভাবে ২-৩ বার ছুয়ে দিলেই পরাগায়নের কাজ হয়। এভাবে একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ৮-১০টি স্ত্রী ফুলের পরাগায়ন করা যায়। পরাগায়ন করা হলে দেখা যায় যে গাছে

ক. ফল নষ্ট হয় না;
খ. বেশি ফল পাওয়া যায়।

ফল পাতলাকরণ করা হলে দেখা যায় যে গাছ -

ক. পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো-বাতাস পায়,
খ. গাছের খাদ্যোপাদানের ঘাটতি হয় না,
গ. ফলের বৃদ্ধি ভালো হয়,
ঘ. ফলের আকার-আকৃতি সঠিক থাকে,
ঙ. ফলন ভালো হয় এবং
চ. রোগবালাই কম হয়।

২০২২

পোকা মাকড় ও রোগ দমন

পোকাদমন : সকালের দিকে বালাইনাশক স্প্রে করলে সবজিতে পরাগায়ন ব্যাহত হয় বিধায় সকালের দিকে স্প্রে করা উচিত নয়। ফলের মাজরা পোকা ও পোকার কীড়া ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস বা ফল খেয়ে নষ্ট করে দেয়। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত হয়ে ফলগুলো পঁচিয়ে দেয়।

চিত্র : বালাইনাশক স্প্রে করার পদ্ধতি

চিত্র : মৌমাছি পরাগায়নে সাহায্য করা

ফলের মাছি পোকা : পূর্ণবয়স্ক পোকা হুল ফুটিয়ে বাকল বা ছালের নিচে বা ভিতরে ডিম পাড়ে। মাছির কীড়াগুলো ডিম ফুটে বের হয়ে ফলের নরম অংশে খেয়ে ফল নষ্ট করে দেয়।

বিছাপোকা : এ পোকার কীড়া গাছের পাতার সবুজ অংশে খেয়ে কেবল শিরা রেখে দেয়। গাছ দুর্বল হয় ও ফলন কমে যায়।

ইপিলাকনা বিটল : পূর্ণবয়স্ক পোকা এবং গ্রাব পাতার সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে ঝাঝরা করে ফেলে। পাতা জালির ন্যায় হয় এবং শুকিয়ে মারা যায়।

জাবপোকা : এ পোকা গাছের কচি ডগা ও পাতার রস চুষে ক্ষতি করে।

রোগ দমন

পাউডারি মিলডিউ : এ রোগের আক্রমণে পাতা সাদা বা ধুসর বর্ণের পাউডার দ্বারা ঢেকে যায় এবং পাতা নষ্ট হয়ে। গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে, ফুল ও ফল কমে যায়।

ডাউনি মিলডিউ : এ রোগের আক্রমণের ফলে পাতার নিচে ধূসর বেগুনি বর্ণের দাগ দেখা যায়। উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় এ রোগ ছড়ায়। রোগের বেশি আক্রমণে গাছ মরে যায়। এ জাতীয় পোকা ও রোগ দমনে অন্যান্য সবজি চাষে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেচ ও নিকাশ- করলা উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে ভাল জন্মে। কিন্তু জলাবদ্ধতায় তাড়াতাড়ি গাছ মারা যায়। ফুল আসার সময় বৃষ্টিপাত হলে ফল ধরা ব্যাহত হয়। চারার বাড়ন্ত অবস্থায় সেচের উপকারিতা বেশি দেখা যায়। কেননা এতে গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। করলার জমিতে যাতে কোনভাবেই সেচের বা বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে সেজন্য ভালো নিকাশ ব্যবস্থা করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পর থেকে ফসল সংগ্রহ শুরু করা যায় এবং মাস দুয়েক অব্যাহত থাকে। বীজ শক্ত হওয়ার পূর্বেই ফসল সংগ্রহ করা উচিত। হেক্টরে ৫-৭ টন করলা সংগ্রহ করা যায়।

ছালার বস্তা, বাঁশের ঝুড়ি, কাগজের বাক্স ইত্যাদিতে প্যাকেটজাত করে ২০-৩০ কেজি ওজনের মধ্যে রাখা উচিত। তবে প্যাকেটে ভর্তি করার আগে পরিষ্কার করে, ছোট বড় বাছাই করে, আকার আকৃতি ও রং দেখে নিতে হয়। প্যাকেট পরিবহণের সময় নিচে ও পাশে খড়ের স্তর বিছিয়ে নিতে হবে এবং প্যাকেট সাজানোর সময় স্তুপ না করে উপর দিয়ে ভর নেয়ার জন্য সাপোর্ট দিতে হয়। বাজারের দূরত্ব কাছাকাছি হলে মাথায় বা কাধে বা সাইকেলে করে বহন করা যায়।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. চৈতালী ঝিঙা বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে চাষ হয় ?

২. ঝিঙা উঠানোর পর কতদিন রাখলে স্বাভাবিক রঙ নষ্ট হয়ে যায়?

৩. বীজ রোপণের কতদিনের মধ্যে চিচিংগার ফল ধারণ করে ?

৪. পটল চাষের জন্য জমি কয়ভাগে তৈরি করা যায়?

৫. পটলের বীজের গাছে শতকরা কতভাগ পুরুষ জাতের গাছ হয় ?

৬. পটল চাষে ব্যবহৃত গাছ কত প্রকারের হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পটল চাষে বীজ ব্যবহারের সমস্যা ও মুড়ি ফসল সম্পর্কে ব্যাখ্যা কর।

২. ঝিঙা চাষে পোকা ও রোগ দমন সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৩. চিচিঙা চাষে জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৪. পটল চাষে সার প্রয়োগ ও চারা রোপণ এবং অন্তবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫. করলা চাষে শূন্যস্থান পূরণ ও বাউনি দেয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পটল চাষে সার প্রয়োগ, রোপণ কৌশল ও পোকামাকড় দমন সম্পর্কে বর্ণনা কর।

২. করলা চাষে চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা, পোকামাকড় ও রোগ দমন এবং ফসল সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে বর্ণনা কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

শিম, বরবটি, ঢেঁড়শের চাষাবাদ

শিম চাষ

বাংলাদেশে আনাচে কানাচে অনেক জাতের শিম চাষ হয়। এদের অনেকগুলো আঞ্চলিক নামে পরিচিত। শিমের ফুল ধারণের ভিত্তিতে (আগাম/নাবী) শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বীজ বপন করতে হয়।

শিমের জাত ও ফুল ধারনের ভিত্তিতে

(ক) আগাম জাত ও ঝুম স্পেশাল, ঢাকাই মটর, আয়মী, মীরেশ্বরাই, বাটা, কুমিল্লা, সিলেট পার্পল, কার্তিকা, কাজলগৌরি ইত্যাদি।

(খ) নাবি জাত ঃ কইভাজা, শ্বেতকন্যা, হাটহাজারী মাখন, সবুজ নলডগা, শিরডোরা নলডগা, ঘৃতকাঞ্চন, কন্যাসুন্দরী, হাতিরকান, কাশিমপুর গ্রীন, খৈয়া ইত্যাদি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

দেশি শিম সাধারণত মাদায় রোপণ করে বসতবাড়ির আশেপাশে, পুকরপাড়ে, পথের ধারে, জমির আইলে, ছোট গাছে, চালায়/বেড়ায় উঠিয়ে দিয়ে চাষ করা হয়। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষের জন্য প্রথমে জমি চাষ ও মই দিয়ে সেচ, নিকাশের সুবিধার্থে পুরো জমি কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে নিতে হয়। ৩ মিটার দূরত্বে সারি করে সারিতে ১.৫ মিটার পর পর মাদায় ১.৫ মিটার চওড়া বেডের উপর ১মিটার ব্যবধানে জোড়া সারিতে ৩০ সেমি. পর পর গর্ত করে জমি তৈরি করতে হয়। সমস্ত জমিতে সার না দিয়ে মাদা বা গর্তে মৌল সার দিয়ে তা সমান করে রাখতে হয়। মাদা পদ্ধতির চাইতে বেড পদ্ধতিতে বেশি সংখ্যক গাছের সংকুলান হয়।

সার প্রয়োগ- শিম চাষের জন্য হেক্টর প্রতি ১০ টন গোবর সার, ১৫০ কেজি টিএসপি মৌল হিসেবে ৫০% শেষ চাষের সময় দিতে হয়। বাকী ৫০% মাদা বা গর্তের মাটিতে নিমোক্ত হারে মিশিয়ে দিতে হয়।

সারের নাম	প্রতি মাদায় দেয় সারের পরিমাণ (কেজি/গ্রাম)	মন্তব্য
গোবর সার		১০ টনের ৫০% চাষের সাথে জমিতে প্রয়োগ।
গোবর/কম্পোষ্ট	১০ কেজি	-
খৈল (পঁচানো)	২০০ গ্রাম	-
টিএসপি	১০০ গ্রাম	-
এমওপি	৭৫ গ্রাম	-

চারা গজানোর ১ মাস পরে ও গাছে ২/৪টি ফুল দেখা দেওয়ার পরে ২ কিস্তিতে ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম করে এমওপি সার উপরিভপ্রয়োগ করতে হয়।

চারা রোপণ ও অতবর্তী পরিচর্যা

বীজ বপন ও বপনের সময়- মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। পারিবারিক বাগানে চাষে ৯০ সেন্টিমিটার চওড়া ও ৭৫ সেন্টিমিটার গভীর করে ২-৩ টি মাদা তৈরি করে নিয়ে মাদা প্রতি ৪-৫টি বীজ বুনলেই চলে। মাঠে চাষের জন্য ১.৬ মিটার চওড়া বীজতলা ৬ বেড তৈরি করে ১ মিটার দূরত্বে সারি করে সারিতে ১ মিটার দূরত্বে।

২০২২

একইভাবে তৈরি মাদায় ৩-৪টি বীজ বপন করতে হয়। চারা গজালে মাদাপ্রতি ১-২টি সবল চারা রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হয়। বীজের হার ৪ হেক্টর প্রতি ৫–৭ কেজি।

অন্তবর্তী পরিচর্যা

শিম চাষে পানি নিষ্কাশন ও বাউনির ব্যবস্থা করতে হয়। বাঁশের মাচায়, রশি দিয়ে তৈরি জালিতে ঘরের চালা, গাছের ডালপালায় উঠিয়ে দেয়া যায়। সারিতে গর্ত করে খুবরী করে চাষ করা হলে বাঁশের চটা বা কঞ্চি দিয়ে ইংরেজি 'এ' অক্ষরের ন্যায় কাঠামো তৈরি করে তাতে বাউনি দেওয়া যায়। মাদা পদ্ধতিতে চাষ করলে মাচা বা জাংলা করে দিতে হয়। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে জমির আইলে বাঁশের আগা কঞ্চিসহ পুঁতে এবং যশোর ও ঝিনাইদহের কিছু এলাকায় পাতলা করে ধৈঞ্চা গাছ জন্মায়ে কৌশল করে শিমের গাছের বাউনি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শিমের বীজ রোপণকালে গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়।

পোকামাকড় ও রোগ দমন- বরবটি চাষে শিমের পোকা ও রোগ সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো। কেননা এ দু ফসলের রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রায় একই ধরনের।

পোকামাকড়- জাব পোকা- এ পোকা শাখা ও শিমের রস শোষণ করে খায়। ম্যালাথিয়ন বা এফিডান ডাষ্টিং প্রয়োগ করে দমন করা যায়।

মাকড়- মাকড় পাতা, ডগা ও শিমের রস চুষে খায়। ফেনিট্রোথিয়ন ৫০ তরল ১ মিলি লিটার হিসেবে ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়।

পাতা খাদক- শুয়া পোকা পাতা খেয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলে। ডায়াজিনন বা সাইপারমেথ্রিন তরল ২ মিলি লিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হয়।

রোগ- কাণ্ড পচা-বর্ষাকালে ছায়াযুক্ত স্থানে ছাতা রোগে কাণ্ড পচে এবং গাছ মারা যায়। বোর্দোমিক্সার বা কপার ঘটিত বালাইনাশক ১৫ দিন পর পর ২ বার স্প্রে করতে হয়। পানি নিকাশ ও শুকনা চাষ অবস্থা তৈরি করতে হয়।

সেচ ও নিকাশ- শিম চাষের জন্য দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ মাটি সবচেয়ে ভালো। কিন্তু শিমগাছ দাঁড়ানো পানি মোটেই সহ্য করতে পারে না। ভালো নিকাশ ব্যবস্থাসহ ছায়াযুক্ত জমি ভালো। নদীর তীরবর্তী পলি মাটিতে ভালো ফলন দেয়। ফুল ও ফল ধরার সময় প্রচুর রসের প্রয়োজন হয়। তাই এ সময় সেচ দেয়ার ব্যবস্থা রাখলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

শিম ধাপে ধাপে সগ্রহ করতে হয়। জাতভেদে কার্তিক-চৈত্র মাস পর্যন্ত শিম সংগ্রহ করা যায়। পরিপুষ্ট সবজি সংগ্রহ করে ঠান্ডা ও আর্দ্র অবস্থায় রাখতে হবে। ছালার বস্তা, কাগজের কার্টুন বা বাঁশের খাঁচায় খড় বা কাঁচা পাতা দিয়ে স্তর করে তাতে ১০-২০ কেজি শিমের প্যাকেট করে দূরে পাঠানো যায়। তবে প্যাকেট ঠান্ডা পরিবেশে করলে বেশি ভালো হয়। কাছের বাজারের জন্য ডালা বা ভারায় করে মাথায়/ভ্যানের সাহায্যে নেয়া যায়।

ফলন- হেক্টর প্রতি ১৫-২০ টন হয়।

২০২২

বরবটির চাষ

বরবটির জাত

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ দেশি ও চায়নিজ জাতের বরবটি চাষ হচ্ছে। দেশি জাত- পুষা বর্ষাতি, পুষা ফালগুনী, ঘৃতসুন্দরী, বনলতা, লালবেনী ইত্যাদি। চায়নিজ জাত-কেগরনাটকি, ইয়ার্ড লং, গ্রীন লং, তকি, সামুরাই এফ-১ ইত্যাদি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

প্রায় সব ধরনের মাটিতে বরবটি চাষ করা যায়। তবে দোঁআশ এবং বেলে দোঁআশ মাটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী। জমি ভালোভাবে ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে কোদাল দিয়ে আইল বানাতে হবে। বরবটি গাছ দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। বরবটি চাষে মাদা পদ্ধতি তেমন সুবিধাজনক নয়। আইল তৈরি করে তাতে বীজ রোপণ করে ইংরেজি 'এ' অক্ষরের মত কাঠামো করে বাউনি বানাতে হয়।

আইলের আকার ঃ দৈর্ঘ্যে-২২ মিটার ও প্রস্থে ৪৫ সেন্টিমিটার করতে হয়। দৈর্ঘ্য প্রয়োজন বড় করা যাবে। আইল উঁচু অথবা মাঝারি উঁচু এবং চওড়া করতে হয়। পানিতে ডুবে না এবং স্যাঁতসেঁতে থাকে না এমন আইল নির্বাচন করতে হয়।

আইল তৈরি ঃ পুরাতন আইলের ক্ষেত্রে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট দূরত্বে খুবরি বা মাদা তৈরি করতে হয়। তবে নতুন করে উঁচু করা আইল সম্পূর্ণ না কুপিয়ে শুধু গর্ত প্রস্তুত করলেই চলে (আইলে বীজ রোপণের গর্ত হচ্ছে খুবরি)।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ ঃ আইল প্রতি নিচে উল্লেখিত হারে সার প্রয়োগ করা দরকার।

সারের নাম	হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ
গোবর/কম্পোস্ট	১০-১৫ টন
ইউরিয়া	৩০ কেজি
টিএসপি	২৫ কেজি
এমওপি	২৫ কেজি

সার ব্যবহারের নিয়ম ঃ এমওপি ও ইউরিয়া সার ব্যতিত সম্পূর্ণ গোবর ও টিএসপি সার আইল তৈরির সময় সম্পূর্ণ জমির মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয় অথবা মাদায় প্রয়োগ করতে হয়।

সারের উপরিপ্রয়োগ- মৌল সার ব্যতিত উপরি প্রয়োগের সারের পরিমাণ ও নিয়ম নিচে দেয়া হলো।

সার ব্যবহারের সময়	সারের নাম ও পরিমাণ/মাদা/খুবরি	
	ইউরিয়া	এসওপি
১ম উপরি প্রয়োগ ঃ বীজ স্বপনের ১৫-২০ দিন পর	৫০ গ্রাম	২৫ গ্রাম
২য় উপরি প্রয়োগ ও বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর	৫০ গ্রাম	২৫ গ্রাম

আইলের মাঝখানে খুঁটি দিয়ে লম্বালম্বি করে লাইন টেনে সেখানে সার দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয় অথবা গাছের চতুর্দিকে গোল করে খুড়ে নিয়ে তাতে সার প্রয়োগ করতে হয়।

চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা- বীজ রোপণের সময় ফেব্রুয়ারি-জুলাই মাস। তবে মার্চ-এপ্রিল মাস বীজ রোপণের উপযোগী সময়। বীজ রোপণের ৩-৫ দিনে চারা বের হয়।

বীজ রোপণের দূরত্ব ঃ এক গাছ থেকে আরেক গাছের দূরত্ব ২০-২৫ সেন্টিমিটার। সাধারণত, আইলে এক সারি পদ্ধতিতে বরবটি চাষ করা হয়। তবে আইল অধিক চওড়া হলে দুই সারি পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। বীজ বপনের গভীরতা হলো ২-৩ সেন্টিমিটার।

চিত্র ঃ পূর্ণাঙ্গ বরবটি গাছ

চিত্র ঃ পূর্ণাঙ্গ থ্রিপস পোকা

মালচিং ঃ রবি মৌসুমে জমির আর্দ্রতা সংরক্ষণ ও আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য খড়কুটা, লতাপাতা অথবা শুকনো কচুরিপানা ইত্যাদি দিয়ে মালচিং করলে ভালো হয়।

চারা পাতলাকরণ ও শূন্যস্থান পূরণ ঃ প্রতি মাদায় সর্বোচ্চ ২টি চারা রাখাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং চারা ৪-৫ পাতা। বিশিষ্ট হলে ২টি সুস্থ সবল চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হয়। প্রয়োজনে শূন্যস্থান পূরণ করতে হয়। চারা ১৫-২০ সেমি. লম্বা হলে বাউনি দিতে হয়।

আগাছা দমন ঃ চারা গজানোর পর থেকেই হাতের সাহায্যে ছোট ছোট আগাছা উঠিয়ে ফেলতে হয়। বীজ বপনের ২০-৩০ দিন পর্যন্ত কোনো আগাছা জমিতে থাকতে দেওয়া যাবে না।

মাটি আলগাকরণ ঃ আগাছা নিড়ানির সময় আইলের মাটি নিড়ানি দিয়ে ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে দিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয়ে যেন মাটি আলগাকরণের সময় গাছের শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। সার প্রয়োগের পর মাটি আলগাকরণের কাজ করতে হয়।

গাছের গোড়ায় মাটি দেয়া ঃ আগাছা দমন ও সারের উপরি প্রয়োগের সময় গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হয়।

খুঁটি দেয়া ঃ গাছ লতাতে শুরু করলে যাতে ভালোভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে সে জন্য ১৫-২০ সেন্টিমিটার লম্বা হলেই বাঁশ বা বাঁশের কঞ্চি অথবা কাঠি দিয়ে খুঁটি দিতে হয়।

পোকামাকড় ও রোগ দমন ঃ পোকা দমন- জাবপোকা দমন: জাবপোকা দলবদ্ধভাবে গাছের কচি পাতা ও ডগা, ফুল ও ফলের বোঁটা এবং ফলের রস চুষে খেয়ে ক্ষতি করে। এর আক্রমণের ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছ ফুল দিতে পারে না। অনেক সময় ফুলের কুঁড়ি ও কচি ফল ঝরে পড়ে। জাবপোকা মোজাইক ভাইরাসের বাহক হিসেবে কাজ করে।

বিছাপোকা ঃ বিছাপোকা বরবটি গাছের পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ক্ষতি করে থাকে। আক্রমণের ফলে পাতার শিরাগুলো শুধু থেকে যায়। গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফলন কম হয়।

শিমের মাছি পোকা ঃ শিমের মাছি পোকা আক্রমণের ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। গাছ হলুদ রঙের হয়ে পড়ে। মাটির সামান্য উপরে গাছের কাণ্ড মাটো হয়ে যায়। গাছ লম্বালম্বি কাটলে কাণ্ডের ভিতর শুককীট অথবা মূককীট দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ মরে যায়।

থ্রিপস ঃ এ পোকা পূর্ণাঙ্গ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় জাবপোকার মতো গাছের কচি পাতার রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। আক্রমণের ফলে ফুল ঝরে যায়।

ফলের মাজরা পোকা ঃ পোকার কীড়া বরবটি গাছের কাণ্ড, মুকুল এবং ফল ছিদ্র করে নষ্ট করে দেয়। কীড়া আক্রান্ত ফলের বীজ ও শাঁস খেয়ে ক্ষতি করে। আক্রান্ত ফল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

রোগ দমন- নেতিয়ে পড়া রোগ দমন : বীজ বপনের পর থেকে চারা অবস্থায় এ রোগের আক্রমণ হয়। এ রোগের আক্রমণে আক্রান্ত বীজ পচে যায়। চারারগোড়া চিকন, লিকলিকে হয়ে ধ্বসে পড়ে ও গাছ মারা যায়।

পাউডারি মিলডিউ ঃ এ রোগ হলে পাতা ও গাছের গায়ে উপরের দিকে সাদা পাউডারের মতো আবরণ দেখা যায়। আক্রমণের মাত্রা খুব বেশি হলে গাছ ফ্যাকাশে হয়ে মারা যায়।

হলুদ মোজাইক ঃ পাতায় হলদে সবুজের ফোটা ফোটা নকশা দেখা যায়। পরে ধীরে ধীরে পাতা হলদে হয়ে যায়, পাতার আকারের বিকৃতি ঘটে এবং আয়তনে ছোট হয়। আক্রান্ত গাছগুলোর বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফলে গাছ ছোট হয়, ফল কম ধরে এবং মাটিতে বীজের সংখ্যা কম হয়।

অ্যানথ্রাকনোজ ঃ রোগের জীবাণু প্রথমে পাতায় আক্রমণ করে। পাতায় বিভিন্ন আকারের দাগ পড়ে, স্বাভাবিক অবস্থায় পাতার ক্ষতি হয় সীমিত। পাতা থেকে ফলে আক্রমণ হয়। কচি অবস্থায় আক্রমণ হলে গোটা ফলটির ক্ষতি হতে পারে। আক্রমণ দেরিতে হলে ফল ছোট হয় এবং পঁচে যায়।

শেঁকড় পঁচা বা গোড়া পঁচা ঃ এ রোগ চারা অবস্থা থেকে গাছের পরিণত অবস্থা পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। এই রোগের আক্রমণে পাতার ক্ষতি হয় সীমিত। পাতা থেকে ফলে আক্রমণ হয়। কচি অবস্থায় আক্রমণ হলে গোটা ফলটির ক্ষতি হতে পারে। আক্রমণ দেরিতে হলে ফল ছোট হয় এবং পঁচে যায়।

সেচ ও নিকাশ ঃ গাছের গোড়ায় যাতে পানি দাঁড়াতে না পারে সেজন্য আইল উঁচু করতে হয়। জমির 'জো বুঝে ডালপালা ছাড়তে থাকলে এবং ফুল শুরু হলে সেচ দিতে হয়। সেচের পানি দ্রুত গড়িয়ে বের হতে পারে সে ব্যবস্থা করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ঃ বীজ বপনের ৪০-৫০ দিনের মধ্যেই বরবটি সগ্রহ শুরু করা যায়। কচি বরবটি খুব সাবধানে হাত দ্বারা অথবা ধারালো ছোট খুর বা কাঁচি দিয়ে বোঁটাসহ কেটে সগ্রহ করতে হয়। ফল ধরার ৪-৫ দিনের মধ্যেই বরবটি সগ্রহ করার উপযোগী হয়। বরবটি সংগ্রহ ও বাছাই করে মোঠা বেঁধে (১ কেজি) পলিথিন মাড়েকে পুরে বাজারে পাঠানো উচিত। হেক্টরপ্রতি ১০-১২ টন পর্যন্ত ফলন হতে পারে।।

ঢেঁড়শের চাষ

ঢেঁড়শের জাত ঃ বারি ঢেঁড়শ-১, ইপসা ঢেঁড়শ-১, আলেয়া, নিরিবিলি, গ্রীণ স্টার, প্রিন্স, হাই সফট, সিরাজউদ্দৌলা, লাকি-৭ ইত্যাদি। এছাড়াও আরও কয়েকটি উন্নত জাতের ঢেঁড়শ চাষাবাদ হচ্ছে। যেমন: পেন্টাগ্রিন, অনামিকা, পুষ শাওনী, পার্বণি কান্তি, বর্ষাতি, লাল ঢেঁড়শ ইত্যাদি। বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু স্থানীয় জাত বিদ্যমান। যেমন: পুস, সুলকমাটি, টি-১, টি-২, টি-৩, টি-৪। তবে বাংলাদেশে যে সমস্ত জাত চাষ হচ্ছে তার মধ্যে ওকে ০৯৮৫ জাতটি মোজাইক ভাইরাস রোগ কম আক্রান্ত হয়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

সারাদিন সুর্যের আলো পড়ে এমন জমি ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে উঁচু নিচু সমান করতে হয়। সেঁচ নিকাশের সুবিধা করে বেড তৈরি করতে হয়। কেননা জমিতে পানি বেঁধে থাকলে ভাইরাস রোগ বিস্তার লাভ করে। বেডগুলো সাধারণত উত্তরে-দক্ষিণে লম্বা লম্বি করতে হয়।

সারের নাম	প্রতি শতক জমিতে প্রদানকৃত সারের পরিমাণ
পঁচা গোবর সার	৭৫-৮০ কেজি
খৈল (পচা)	২ কেজি
ইউরিয়া	২৩০-২৪০ গ্রাম
টিএসপি	৩৫০-৩৬০ গ্রাম
এমওপি	২৩০-২৪০ গ্রাম

২০২২

জমি তৈরির সময় গোবর, খৈল ও টিএসপি সম্পূর্ণ যৌগ সার হিসেবে শেষ চাষের পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়। চারা ২০-২৫ সেমি. লম্বা হলে গাছের গোড়া হতে ১২-১৫ সেমি. দূর দিয়ে বৃত্তাকারে ৩-৪ সেমি. গভীর করে নালা কেটে তাতে ইউরিয়া ও এমওপি সার প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা

জমি চাষের পর মাদা বা আইল তৈরি করে নির্দিষ্ট দূরত্বে বীজ রোপণ করতে হয়। প্রতি মাদায় ২-৩টি বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে তাড়াতাড়ি গজায়। মাদা বা আইলের দূরত্ব হতে হবে ৫০×৫০ সেমি.। অর্থাৎ লাইন ও চারার মধ্যে উভয় দিকে দূরত্ব হবে ৫০ সেমি.। বীজ ১-২ সেমি. গভীরে স্থাপন করলে ৪/৫ দিনে চারা বের হয়। চারার বয়স ৮/১০ দিন হলে প্রতি মাদায় ১টি সুস্থ ও সবল চারা রেখে অন্যগুলো উঠিয়ে দিতে হয়। তবে গাছ হতে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেমি. পর্যন্ত রাখা যায়। জমি তৈরির সময় আইলগুলো যেন চওড়া হয়, তাতে পানি নিকাশের সুবিধা হয়। আইলের প্রস্থ ৪৫ সেমি. করে তা কুপিয়ে নরম ও ঝুরঝুরে করতে হয়।

চিত্র ও পূর্ণাঙ্গ ঢেঁড়স গাছ

অন্তবর্তী পরিচর্যা ঃ গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটির উপরিভাগ আলগা করে দিতে হয়। মাঝে মাঝে হালকা সেচ দিয়ে 'জো' অবস্থায় কোদাল দিয়ে পাতলা করে কুপিয়ে দিয়ে চটা মাটি ভেঙ্গে দিতে হয়।

আগাম হিসেবে ঢেঁড়শ চাষ করলে পানি সেচ দিতে হয়। মাটির প্রকারভেদে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয়। বর্ষাকলে গাছের বৃদ্ধি যাতে ঠিকমত হতে পারে সেজন্য ২৫-৩০ সেমি. উঁচু করে বেড় করে দিতে হয়। অন্যথা পানি জমে গাছের ক্ষতি করতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগ দমন

পোকা দমন

এক প্রকারের শুয়াপোকা ডগকীট কচি কাণ্ডে ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে ও গাছের ক্ষতি সাধন করে। এর দমনের জন্য শতকরা কার্বোসালফান ২০ ইসি বেশ কার্যকর। ব্যবহারের পরে অন্তত ১০ দিন পর্যন্ত গাছের ঢেঁড়শ ব্যবহার করা উচিত নয়।

জ্যাসিড পোকা ঃ এ পোকা গাছের পাতার রস চুষে খায় এবং ভাইরাস রোগ ছড়ায়। পোকার আক্রমণে পাতায় ছোট ছোট হলদে সাদাটে দাগ পড়ে। এর আক্রমণে ফলন অনেক কমে যায়। এ পোকা দমনে ২ মিলি. জোলন/নগস ১লি পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচে স্প্রে করতে হবে।

পাতা মোড়ানো পোকা ঃ পোকার কীড়া পাতা মুড়ে তার ভিতরে বাস করে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। এজন্য ম্যালাথিয়ন ১.১২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। ডগার কাণ্ড ও ফল ছিদ্রকারী পোকা ও প্রজাপতি গাছের কাণ্ড বা ফলের গায়ে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে গাছে কচিকাণ্ড এবং ফল ছিদ্র করে ঢুকে পড়ে এবং সেইসব অংশ কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। এক সময় কচি ডগা শুকিয়ে যায়। এর ফলে ফলন কমে যায়। এজন্য আলফা সাইপারমেথ্রিন, ল্যামডা সাইহ্যালোথ্রিন ১-১.২ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়।

চিত্র ঃ পূর্ণাঙ্গ জ্যাসিড পোকা

চিত্র ঃ পাতা মোড়ানো মথ ও উঁরা পোকা

রোগ দমন- মোজাইক ভাইরাস ঃ এ রোগে ঢেড়সের পাতা হলুদ ও সবুজ মোজাইকের মতো দেখা যায়। পাতা কুঁকড়ে যায়। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা যাবে না। এ্যাফিড/জ্যাসিড পোকা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ রোগ দমন করা যায়।

উইল্ট রোগ ঃ ছত্রাকের আক্রমণে গাছ হলদে ও বামণাকৃতির হয় এবং পরে গাছ ঢলে পড়ে। ফরমালিন বা ক্লোরোপিক্রিন দ্বারা মাটি শোধন করে এ রোগ দমন করা যায়।

গোড়া ও কাণ্ড পচা রোগ ঃ এ রোগের আক্রমণে মাটি সংলগ্ন গাছের নরম হয়ে পড়ে যায়। আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো বর্ণের দাগ পড়ে। ডায়াথেন এম-৪৫, রিডোমিল/কপার ঘটিত ছত্রাকনাশক দ্বারা এ রোগ দমন করা যায়।

পানি সেচ ও নিকাশ ঃ শুষ্ক ঋতুতে ঢেঁড়শের চাষ করলে বীজ বপনের পর থেকে নিয়মিত পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। গাছের বৃদ্ধি স্তিমিত হলে ঢেঁড়শ দ্রুত শক্ত হয়ে যায়। নিয়মিত সেচ দেওয়া সম্ভব না হলে, খড়, ঘাস, কচুরিপানা দিয়ে মাটি ঢেকে (মালচ) রাখতে হয়, তাতে রস সংরক্ষণ হয়। ঢেঁড়শের জমিতে পানিভেজা বা স্যাঁতসেতে অবস্থা থাকলে সারের উপরি প্রয়োগ করলে ক্ষতি হয়। জমিতে বৃষ্টির পানি জমার সম্ভাবনা থাকলে আগে হতেই দু সারির মাঝখান দিয়ে নালা কেটে পানি বের করার ব্যবস্থা রাখতে হয়।।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

ফসল সংগ্রহ ও গাছের একমাস বয়সের মধ্যে ঢেঁড়শের ফুল দেখা দেয়। ফুল আসার ৫-৬ দিনের মধ্যেই ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়ে উঠে। একবার বাগানের ঢেঁড়শ সংগ্রহ শুরু হলে হলে গেলে প্রতিদিনই তোলার প্রয়োজন হয়। ঘন ঘন ঢেঁড়শ তুললে ফলন বেশি হয়। ঢেঁড়শ উঠানোর পর গরমে, রোদে বা শুষ্ক পরিবেশে রাখলে খুব তাড়াতাড়ি মান নষ্ট হয়ে যায়। তাই বিকালে উঠায়ে রাত্রে শিশিরে রেখে দিয়ে ভোরে বা ভোরে উঠায়ে সাথে সাথে ছালার বস্তায় প্যাক করে বাজারে প্রেরণ করতে হয়। তবে ১৫-২০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রা ও ৮৫% আর্দ্রতায় ৩/৪ দিন সংরক্ষণ করা যায়।

ফলন- হেক্টরপ্রতি ৮-১০ টন।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. শিমের একটি আগাম জাতের নাম লেখ।

২. শিম চাষে হেক্টর প্রতি কত কেজি বীজ লাগে?

৩. শিমের জাব পোকা কী দিয়ে দমন করা যায় ?

৪. কেগরনাটকি কোন দেশের বরবটির জাত?

৫. বরবটির একটি রোগের নাম লেখ।

৬. ওকে ০৯৮৫ জাতের ঢেঁড়শ কোন রোগ প্রতিরোধী ?

৭. জ্যাসিড পোকা কোন রোগ ছড়ায় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফুল ধারনের ভিত্তিতে শিমের জাতগুলো উল্লেখ কর।

২. বরবটি চাষে সারের মাত্রা উল্লেখ কর।

৩. বরবটি একটি রোগ ও একটি পোকার আক্রমণ ও দমন সম্পর্কে লেখ।

৪. ঢেঁড়শ চাষে জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ সম্পর্কে লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিম চাষে সার প্রয়োগ, অন্তবর্তী পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

২. বরবটি চাষে চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যাসহ তিনটি রোগ ও তিনটি পাকার আক্রমণ ও দমন সম্পর্কে বর্ণনা কর।

২০২২ ৩. ঢেঁড়শ চাষে জমি তৈরি ও সার প্রয়োগসহ চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে বর্ণনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
গোল আলুর চাষ

আলুর জাত

বাংলাদেশের চাষ করা আলুর স্থানীয় জাতসমূহ হচ্ছে -

ক.	আউশা	ঞ.	শিল বিলাতি
খ.	চলিশা	ট.	সূর্যমুখী
গ.	দোহাজারি লাল	ঠ.	দেশি সাদা
ঘ.	ফেস্টা শিল	ড.	দোহাজারি সাদা
ঙ.	হাগরাই	ঢ.	পাকড়ি লালিতা
চ.	লাল পাকড়ি	ণ.	সাদা পাকড়ি
ছ.	লাল শিল	ত.	ঝাউ বিলাতি
জ.	পাটনাই	থ.	লাল সাদা
ঝ.	সাদা গুটি		

বাংলাদেশে গবেষণা থেকে কয়েকটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন- হীরা, আইলসা, ধীরা, গ্রানোলা, বিনেলা, রাজা, চমক ইত্যাদি। তবে উচ্চ ফলনশীল কয়েকটি জাত দীর্ঘদিন যাবৎ চাষ হচ্ছে। যেমনঃ ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, মুল্টা, কুফরি সিন্দুরী, ওয়াইলো, বেলজি, মন্ডিয়াল ইত্যাদি।

চিত্র ঃ গোল আলুর বীজকন্দ থেকে উৎপন্ন রাইজোম ও বৃদ্ধিশীল কন্দ এবং পাতা

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি ঃ বেলে দোঁআশ মাটি আলু চাষের জন্য সবচেয়ে উত্তম। বর্ষার পর জমিতে জো আসলে ৫/৬টি চাষ ও মই দিয়ে জমি উত্তমরূপে তৈরি করতে হয়। মই দিয়ে জমি সমতল করে সারির মাথা বরাবর লম্বা নালা তৈরি করতে হয়, যাতে সেচে পানি সহজে গড়ায়ে বের হয়ে যেতে পারে। আলুর জমি ১৫-২০ সেমি. গভীর চাষ হওয়া উচিত। মাটিতে যাতে পিঁপড়া বা উই পোকা না থাকে সেজন্য ফিপরোনিল, ইমিডাক্লোপিড, পামেথ্রিন তরল ১.৫ লিটার/দানাদার ১৬-২০ কেজি প্রতি হেক্টর জমিতে প্রয়োগ করতে হয়।

সার প্রয়োগ ও সারের পরিমাণ ঃ আলু চাষে নিচে উল্লেখিত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর	৭-১০ কেজি
ইউরিয়া	২২০-২৫০ কেজি
টিএসপি	১২০-১৫০ কেজি
এমওপি	২২০-১৫০ কেজি
জিপসাম	৮-১০ কেজি
জিঙ্ক সালফেট	১০০-১২০ কেজি
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৮০-১০০ কেজি
বোরন	৮-১০ কেজি।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ ইউরিয়া ব্যতিত সব গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট রোপণের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ শেষ চাষের সময়-৫০% ইউরিয়া বীজ গজানোর ১৫-২০ দিনপর এবং বাকি ইউরিয়া এর ৩০ দিন পর অর্থাৎ বীজ গজানোর ১.৫ মাস পর দ্বিতীয় বার মাটি তোলার সময় প্রয়োগ করতে হবে। অম্লীয় বেলে মাটির জন্য ম্যাগনেসিয়াম সালফেট এবং বেলে মাটির জন্য বোরন প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

বীজ/চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা

বীজ রোপণের জন্য সঠিক আকারের নিরোগ বীজ আলু বাছাই করা, তা গজানো ও সঠিক নিয়মে রোপণ করতে হয়। বৈজ্ঞানিক মতে ২-৩ সেমি, (২০ গ্রাম) আকারের বীজ আলু আস্ত, ৩-৪ সেমি. (৩০ গ্রাম) আকারের বীজ দু'টুকরা এবং ৪ সেমি (৪০ গ্রাম)- এর বড় আলুকে দু'এর অধিক টুকরা ছুরি বা দা দিয়ে লম্বালম্বিভাবে করতে হয়। বীজ কাটার পর দু'তিন দিন ছায়াময়, পরিষ্কার ও ঠান্ডা স্থানে রেখে খড়ের ছাই মাখিয়ে ক্ষত শুকিয়ে রোপণ করা ভালো। কাটা দিকে ছাই লাগায়ে শুকিয়ে নিলে সেখানে পচনের বা পিঁপড়ার আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। বীজ কাটা ছুরি বা দা মাঝে মাঝে রোগ নিরোধক ঔষধ বা ডেটল/সেভলন দিয়ে শোধন করে নিতে হয়। বীজের পুরাতন বড় অঙ্কুরে শক্তিশালী গাছ জন্মায় না। তাই কাটার সময় পূর্বে গজানো অঙ্কুরগুলো ভেঙ্গে দেওয়া এবং খড়কুটা দ্বারা জাগ দিয়ে নতুন ও শক্তিশালী অঙ্কুর গজানোর ব্যবস্থা করা উচিত। বীজ আলুর আকার ও রোপণ দূরত্ব যে হেক্টরে এক থেকে দেড় টন বীজ রোপণ করা হয়। তবে মাঝারি আকারের বীজ লাগানো উত্তম।

বীজ রোপণ- গোটা বা টুকরা আলু বীজ নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে লাগাতে হয়।

দূরত্ব : সারি থেকে সারি ঃ ৬০ সেমি.- ৭৫ সেমি.

আলু বীজ থেকে আলু বীজ ও ২০ সেমি.-২৫ সেমি.

নালার গভীরতা ঃ ৫-৭ সেমি,

রোপণ পদ্ধতি ঃ সাধারনত সমতল ও তেলি পদ্ধতিতে আলু বীজ রোপণ করা হয়ে থাকে।

(ক) সমতল পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে চারা গজানোর পর জমিতে সেচ ও সার প্রয়োগ এবং গোড়ায় মাটি উঠায়ে দিতে হয় না। বীজ রোপণের সময়েই সবটুকু সার প্রয়োগ করা হয়। মাটিতে রস সংরক্ষণ ও আগাছা দমনের

উদ্দেশ্যে বীজ লাগানো পর পরই খড় বা শুকনা কচুরীপানা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। সেচ সুবিধাহীন নিচু জমিতে এ পদ্ধতি বেশি অনুসরণ করা হয়। এতে গাছের আলো বাতাস পেতে ও অন্তবর্তী পরিচর্যার অসুবিধা হয় এবং রোগ বালাই ও জলাবদ্ধতার সম্ভাবনা থাকে। তবে যেসব জমি হতে দেরিতে পানি সরে যায় এবং জমি প্রস্তুতের সময় থাকে না সে সব জমিতে এ পদ্ধতিতে আলু বীজ রোপণ করা হয়।

(খ) ভেলী পদ্ধতি ঃ এটি আধুনিক পদ্ধতি ও পৃথিবীর সব দেশে অনুসরণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে চারা গজানোর পর দু'সারির মাঝখানের মাটি ২-৩ কিস্তিতে উঠায়ে গাছের গোড়ায় ভেলি তৈরি করা হয়। এতে দু'সারির মাঝখানে নালার সৃষ্টি হয়। পানি সেচ ও নিষ্কাশন, সারের উপরি প্রয়োগ এবং অন্তবর্তী পরিচর্যার সুবিধা হয়। তাছাড়া গাছকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে ও পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেতে সহায়তা করে এবং ফলন বাড়ায়। চারা বা গাছ ১০-১৫ সেমি. উচু হলে প্রথমবার এবং এর ১৫-২০ দিন পর দ্বিতীয়বার মাটি উঠায়ে দেয়া উত্তম।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা ঃ ২-৩ বার গোড়ায় মাটি দেওয়া প্রয়োজন। বপনের সময় ভেলি করে মাটি তুলে দিতে হয়। ১ম বার চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর এবং ২য় বার ১ম উপরি প্রয়োগের ১ মাস পর ২য় উপরি প্রয়োগ করতে হয়। তবে প্রতিবার সার প্রয়োগের পর সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। গাছের সারির দু পাশ দিয়ে সার দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে আবার ভেলি বেঁধে দিতে হয়।

দেশি আলুর উন্নয়ন কৌশল ঃ অতীতে বিদেশে থেকে যেসব আলুর জাত এদেশে এসেছে তা কালক্রমে পরিবর্তিত হয়ে এখনো চাষাবাদে আছে। এসব জাতই বর্তমানে দেশি জাত হিসেবে পরিচিত।

পোকামাকড় ও রোগ দমন

পোকামাকড় দমন ঃ আলুর কাটুই পোকার আক্রমণ ও কাটুই পোকার কীড়া বেশ শক্তিশালী এবং এর পিঠ কালচে বাদামি। কাটুই পোকার কীড়া চারা গাছ কেটে এবং আলুতে ছিদ্র করে ফসলের ক্ষতি করে থাকে।

কাটুই পোকা দমন

ক. কাটা আলু গাছ দেখে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলা উচিত।

খ. প্রতি লিটার পানির সাথে ডারসবান ২০ ইসি ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটি ভিজিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

আলুর সুতলি পোকার আক্রমণ ও কীড়া আলুর মধ্যে লম্বা লম্বা সুড়ঙ্গ করে আলুর ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশে কেবল বাড়িতে সংরক্ষিত আলুতে এ পোকা ক্ষতি করে।

সুতলি পোকা দমন

ক. বাড়িতে সংরক্ষিত আলু শুকনা বালি, ছাই, তুষ অথবা কাঠের গুড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

খ. আলু সংরক্ষণ করার আগে সুতলি পোকা দ্বারা আক্রান্ত আলু বেছে ফেলে দিতে হয়।

আলুর মোজাইক রোগ ঃ পাতায় উজ্জ্বল হলুদ ছিটে দাগ পড়ে, পাতা বিকৃত ও ছোট হয়ে যায়।

২০২২

মোজাইক রোগ দমন

ক. জাবপোকা দমন করতে হয়।

খ. টমেটো, তামাক এবং কতিপয় সোলানেসি গোত্রভুক্ত আগাছা এ ভাইরাসের বিকল্প পোষক। সুতরাং আশেপাশে এ ধরনের আগাছা থাকলে ধ্বংস করতে হবে।

আলুর হলদে রোগ ঃ স্থানীয় জাতের আলুতে এ রোগ হয়। পাতা কুঁচকে মুড়িয়ে যায় ও ছোট ছোট দাগ দেখা যায়।

হলদে রোগ দমন

ক. রোগিং করে আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলতে হয়।

খ. কীটনাশক প্রয়োগে পাতা ফড়িং দমন করা, ডায়াজিনন-৬০ ইসি ৭-১০ দিন পর পর ছিটানো হয়।

আলুর মড়ক বা নাবি ধ্বসা রোগ ঃ পাতায়, ডগায় এবং কাণ্ডে ছোট ভেজা দাগ পড়ে। ক্রমে দাগ বড় হয়ে সমগ্র পাতা, ডগা এবং কাণ্ডের কিছু অংশ নষ্ট হয়। পরিবেশ অনুকূল হলে, অর্থাৎ বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকলে ২-৩ দিনের মধ্যেই জমির সমস্ত ফসল আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

ক. রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা অথবা যে জমিতে মড়ক রোগ হয়েছে সে জমির আলুর বীজ হিসেবে ব্যবহার না করা।

খ. জমির যে এলাকায় এ রোগ মারাত্মক হয়, সে জায়গায় গাছ মাটির উপর থেকে কেটে অন্যত্র পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

গ. ছত্রাকনাশক ১০-১২ দিন পর পর ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। যেমন- রিডোমিল (০.২%) ডাইথেন এম ৪৫ (০.২%) ইত্যাদি।

চিত্র ঃ আলুর মড়ক রোগ

আলুর আগাম ধ্বসা বা আর্লি ব্লাইট রোগ ঃ নিচের পাতায় ছোট ছোট বাদামি দাগ পড়ে। গাছ হলুদ হওয়া, পাতা ঝরে পড়া এবং অকালে গাছ মরে যাওয়া এ রোগের লক্ষণীয় উপসর্গ। আক্রান্ত টিউবারে গাঢ় কালচে বাদামি রঙের দাগ পড়ে।

২০২২

প্রতিকার

ক. সুষম সার প্রয়োগ এবং সময়মতো সেচ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হয়।

খ. রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর প্রয়োগ করতে হয়। ডাইথেন এম-৪৫, ০.২% হারে প্রয়োগ করতে হয়।

গ. আগাম জাতের আলু চাষ করতে হয়।

আলুর সগ্রহোত্তর এবং গুদামজাত রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

আলুর শুকনো পচা রোগ ঃ আলুর গায়ে কিছুটা গভীর কালো দাগ পড়ে। আলুর ভেতরে গর্ত হয়ে যায়।

শুকনা পঁচা রোগ দমন

ক. শতকরা ২ ভাগ ডাইথেন এম-৪৫ দ্রবণ দ্বারা বীজ আলু শোধন করতে হয়।

খ. প্রতি কেজিতে ২ গ্রাম টেকটো ২% গুড়া দিয়ে আলু শোধন করতে হয়।

আলুর নরম পঁচা রোগ ঃ আক্রান্ত অংশ পচে যায়। পচা আলুতে এক ধরনের উগ্র গন্ধ সৃষ্টি হয়।

নরম পঁচা রোগ দমন

ক. উচ্চ তাপ এড়ানোর জন্য আগাম চাষ করতে হয়।

খ. ভালোভাবে বাছাই করে আলু সংরক্ষণ করতে হয়।

গ. শতকরা ১ ভাগ বিচিং পাউডার দ্রবণে বীজ আলু শোধন করতে হয়।

আলুর রোগ

আলুর গাছ অনেক সংক্রামক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। নিচে এগুলোর বিবরণ দেয়া হলো।

ভাইরাসজনিত রোগ ঃ আলুর ভাইরাস জনিত রোগের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে পোকাবাহিত পাতা মোড়ানো ভাইরাস, ভাইরাস ওয়াই, ভাইরাস এ, ভাইরাস এম খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিকার ঃ রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ ও ভাইরাসবাগী পোকা দমন করতে হয়।

আলুর পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ ঃ আক্রান্ত গাছের পাতা খসখসে, খাড়া ও উপরের দিকে গুটানো হয়। আগার পাতার রঙ হাল্কা সবুজ হয়ে যায়। কখনো আক্রান্ত পাতার কিনারা লালচে বেগুণী রঙের হয়।

২০২২

রোগ দমন ঃ কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে জাবপোকা দমন। এজোড্রিন, সাইপারমেথ্রিন, ক্লোরোপাইরিফস মেনোড্রিন ইত্যাদি ২ মিলি প্রতি লিটারে অথবা ১ মিলি ডায়াজিনন প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

সেচ ও নিকাশ ঃ বীজ আলু বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (স্টোলন বের হওয়া মাত্র) প্রথম সেচ দিতে হয়। ২য় সেচ বীজ আলু বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে এবং আলু বীজ বপনের ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ৩য় সেচ দিতে হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি ফলন পেতে হারে ৮-১০ দিনপর পর সেচ দিতে হয়। সেচের পর মাটি আগলা করে দিতে হয়। আলুর জমিতে সেচ দেওয়ার সময় ভেলির মাঝখান দিয়ে পানি দিয়ে আস্তে আস্তে চোষনের ন্যায় ভিজালে বেশি ভাল হয়।

রোপণের বীজ ঃ র‍্যাপিড মাল্টিপ্লিকেশন পদ্ধতিতে তৈরি।

স্প্রাইট কাটিং ঃ বীজ আলু জমিতে লাগানোর ৪০-৪৫ দিন পূর্বে হিমাগার থেকে বের করে প্রথম ৩০ দিন অন্ধকারে এবং ১০-১৫ দিন ছায়াযুক্ত স্থানে রাখলে ৪-৭টি কুঁড়ি পাওয়া যাবে। এসব স্প্রাইট এর প্রতিটির গায়ে ৩-৫টি পর্ব সন্ধি পাওয়া যায়। সবগুলো কুঁড়ি কর্তন করে বীজতলায় লাগালে ৪-৭ দিনের মধ্যে শিকড়সহ লম্বা গাছ পাওয়া যায়।

রোপণের বীজ তৈরির জন্য টপ শুট কাটিং ঃ আলু লাগানোর ২০-২৫ দিন পরে ৩-৫ সেন্টিমিটার লম্বা করে মাথা কেটে নিতে হয়। এসব কাটিং নেওয়ার সাথে সাথে ইনডোল বিউটারিক এসিড (IBA) (২৫ পিপিএম)ও নেপথালিনএসিটিক এসিড (NAA)(১২.৫ পিপিএম) মিশ্রিত রুটিং হরমোন দ্রবণে কর্তিত মাথা কয়েক সেকেন্ড ডুবিয়ে বেডে লাগাতে হয়। বীজতলা থেকে ১০ দিনের মধ্যেই শিকড়সহ কাটিং জমিতে লাগাতে হয়।

বিনা চাষে আলু উৎপাদন ঃ বাংলাদেশের আবহাওয়ার আলু চাষ মৌসুম খুবই ছোট এবং ভূমির বন্ধুরতা বিভিন্ন রকম। যেমন-উঁচু, সমতল, ঢালু, নিচু ইত্যাদি। কোথাও কোথাও বর্ষার পানি সরে যেতে অনেক সময় লেগে যায়। সে সব জায়গায় দেরিতে আলু রোপণ করতে হয়। ফলে অনেক সময় ফলন খুব কম হয়। এ ধরণের নিচু জমিতে বিনা চাষে আলু উৎপাদন করা যায়। তবে জমিতে খুব বেশি রস থাকলে বীজ বেশি গভীরে রোপণ করা উচিত নয়।

রোপণের দূরত্ব ও পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে বীজ আলু মাটিতে ৬০ × ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হয়। রোপণের পর কচুরিপানা দিয়ে ৭-১২ সেন্টিমিটার পুরু করে ঢেকে দিতে হয়। তাতে বীজ অঙ্কুরোদগমে কোনো অসুবিধা হয় না। এ পদ্ধতিতে আলু সাধারণত মাটির উপরই উৎপন্ন হয়। কার্ডিনাল, ডায়মন্ট প্রভৃতি উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহার করতে হয়।

সারের মাত্রা ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে জমিতে প্রতি হেক্টরে ইউরিয়া ৩০০-৩৩০ কেজি, টিএসপি ১৮০-২০০ কেজি এবং এমওপি ৩০-৪০ কেজি সার রোপণের পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়। বীজ আলু রোপণ সারির উভয় পার্শ্বে লাইন টেনে তাতে সার ব্যবহার করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

জাতভেদে বীজ রোপণের ৭০-১২০ দিন পর আলু সংগ্রহ করা যায়। আলু পরিপুষ্ট হলে গাছের পাতা হলদে হয়ে গাছ আস্তে আস্তে শুকায়ে যায়। এসময় আলুর গায়ের ছাল পুরু হয়। শুষ্ক দিনে কোদাল বা লাঙ্গলের সাহায্যে ভেলিসারির মাটি সরিয়ে সাবধানে আলু সংগ্রহ করতে হয়, যাতে আলু আঘাত না পায়। আলু উঠায়ে ছায়া ও ঠান্ডা জায়গায় বিছিয়ে রাখতে হয়। তারপর থেতলানো, কাটা, পোকায় আক্রান্তগুলো বাছাই করে বায়ু চলাচলের

উপযোগী স্থানে রেখে সপ্তাহখানেক শুকাতে হয়। শুকানো শেষ হলে ছোট বড় আলাদা করে পাতলা চটের বস্তায় ভর্তি করে শুকনো ও ঠান্ডা স্থানে রাখতে হয়। আগাম বাজার ধরার জন্য পুরোপুরি পরিপক্ক হওয়ার আগেই সংগ্রহ করা চলে। বস্তা ভর্তি করা আলুতে যেন রোদে না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। উন্নত জাতের আলু হেক্টরে ২০-৩০ টন এবং দেশি জাত ১০-১২ টন জন্মে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ৪০ টন পর্যন্ত ফলন হতে দেখা গেছে। যখন আলু স্তূপীকৃতভাবে ঝুড়িতে সংরক্ষণ করা হয়, নিশ্চিত হতে হবে যে সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণের বায়ু চলাচল এবং গুদামে নিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে।

গুদামজাতকালে ব্যবস্থাপনা

গুদামজাত করার সময় রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হয়। নিম্নের উপায়গুলোর মাধ্যমে সাধারণত গুদামজাতকরণ অবস্থায় রোগাক্রান্ত ফসলের ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভবঃ

(১) আগাম বীজ বপন, ফসল উত্তোলন এবং সংরক্ষণ।

(২) মাটি যখন ভেজা থাকে না তখন ফসল উত্তোলন করতে হয়। ফসল উত্তোলনের পূর্বে অধিক বৃষ্টিপাত হলে যদি সম্ভব হয় তবে মাটি শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। যদি ফসল উত্তোলন কোনক্রমেই এড়ানো সম্ভব না হয়। তাহলে আলু ওঠাবার পর প্রচুর বায়ু চলাচল স্থানে ছায়ায় ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। আলুর গুদামজাত করার সময় যেগুলো ভেজা থাকে এমনকি ভালোভাবে শুকাবার পরও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় সে সব খাবার হিসেবে ব্যবহার করে ফেলাই উচিত।

(৩) কখনো আলু বা কন্দসমূহকে রৌদ্রে দীর্ঘ সময়ের জন্য ফেলে রাখা উচিত নয়।

গুদামজাতকরণ ও গুদামের ধরণ

আলু সুপ্তাবস্থায় গুদামজাতকরণ সাধারণত ঃ প্রাকৃতিক বায়ু সঞ্চালিত গুদামে সুপ্তাবস্থায় থাকাকালে টিউবার সমূহকে সাধারণভাবেই গুদামজাত করা যায়, যেখানে শ্বসন তাপ বের হওয়ার জন্য বায়ু চলাচল উপযোগীব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রচলিত পাত্র যেমন-ঝুড়ি বা ডালে ব্যবহার করা যেতে পারে। সংরক্ষণ পাত্রের তলদেশ এমনভাবে তৈরি হতে হবে যাতে আলুর ভেতর বায়ু সহজে চলাচল করতে পারে।

চিত্র ঃ আলু সংরক্ষণের জন্য আদর্শ ডোল

ঘরের মেজেতেও আলু রাখা যায় যদি আলুর স্তূপ ১ মিটার পুরু ও ২ মিটারের বেশি প্রশস্ত না হয় এবং যথেষ্ট বায়ু চলাচলের সুযোগ থাকে। রাত্রে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করে নিতে হবে যখন তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে।

মনে রাখতে হবে যে, আলুর সুপ্তাবস্থা আরম্ভ হয় যখন শস্য মাঠে পরিপক্ক হয়ে উঠে। ইহা। আলু গুদামজাত রাখার কিছু দিন পূর্বেও হতে পারে। অবশিষ্ট সুপ্তাবস্থার সময় নির্ধারিত হয়ে থাকে আলুর গুদামজাতকরণের সময়কাল। অঙ্কুরিত আলু প্রায় ১ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায় এবং খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২০২২

চিত্র ঃ আলু সংরক্ষণের চিত্র

বীজ আলুর গুদামজাতকরণ

বীজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য টিউবারসমূহকে অঙ্কুর গজানো শুরু হওয়া থেকেই আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। সেগুলোকে তাকে অথবা মেঝেতে রাখতে হবে, ২টি বা ৩টি টিউবার একটি স্থানে প্রবিষ্ট করতে হবে যেখানে সরাসরি সূর্যের আলো না পড়ে। দিবালোকে অঙ্কুরকে ১০-১৫ মি. মি. বেশি দীর্ঘ হতে বাধা দেয়। বীজ টিউবারগুলো এইভাবে কিছু দিনের জন্য রাখা হয় এবং গুদামজাত ও রোপণের জন্য প্রস্তুত করা হয়। পোকার আক্রমণ দমন করতে হবে। বীজ আলু হিমাগারে রাখতে হলে ২-৩ক্ক সে. তাপমাত্রা প্রয়োজন হয় এবং খাবার আলুর জন্য ১০-১৫ক্ক সে. তাপমাত্রা প্রয়োজন।

গুদামজাত অবস্থায় পোকামাকড় দমন

আলুর মথ সুতলী পোকা দমন-

* টিউবার সংগ্রহের পর টিউবারগুলো সুতলী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য তাড়াতাড়ি মাঠ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।
* গুদামজাতকরণের পূর্বে টিউবারগুলোকে সতর্কতার সাথে পরখ ও বাছাই করতে হবে। সুতলী পোকা আক্রান্ত সকল আলুকে সরিয়ে ফেলতে হবে। একমাত্র আক্রমণমুক্ত আলু গুদামে রাখতে হবে।
* সকল গুদামজাতকরণের আধারের তলদেশে কীট দূরীভূতকারক উদ্ভিদের একটা স্তর বিছিয়ে রাখতে হবে (নিম পাতা, তামাকগুড়া, বিষকাঁটালী)।
* কীট দূরীভূতকারক উদ্ভিজ্জ চারিদিকে বিছিয়ে দেয়া যায়। যেমন-নিম পাতা, নিম তেল, বিশ কাটালী এবং নিশিন্দা ইত্যাদি।
* গুদামজাত আলু নিয়মিতভাবে পরখ করতে হবে। যদি পোকার আক্রমণ অনুমিত হয় তাহলে পিরিমিফস মিথাইল নামক (যেমন-এসিটেলিক) কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

২০২২ বিঃ দ্রঃ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃতব্য আলুতে কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. শিল বিলাতি কোন দেশের আলুর জাত?

২. ইমিডাক্লোপিড দ্বারা কোন পোকা দমন করা হয় ?

৩. কত সেমি. সাইজের আস্ত আলু বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয় ?

৪. কাটা বীজ আলু কী দিয়ে শোধন করে নেয়া হয় ?

৫. আলু চাষে কোন রোপণ কৌশল পৃথিবীর সব দেশে অনুসরণ করা হয় ?

৬. আলুর মোজাইক রোগের জন্য ১টি বিকল্প পোষক গাছের নাম লেখ।

৭. আলুর নরম পঁচা রোগ হলে কী ধরনের গন্ধ সৃষ্টি হয় ?

৮. গুদামে আলু সংরক্ষণে কীট দূরীভূতকারক হিসেবে কিসের পাতা ব্যবহার করা হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আলু চাষে সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে লেখ।

২. আলু বীজ রোপণের জন্য প্রস্তুতকরা ও রোপণ দূরত্ব সম্পর্কে লেখ।

৩. আলু রোপণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. আলুর মড়ক রোগ ও তার দমন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৫. বিনা চাষে কীভাবে আলু উৎপাদন করা যায় তা উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. আলু চাষে জমি তৈরি, সার প্রয়োগ, রোপণ দূরত্ব, অনন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

ফ্রুট এ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১

নবম শ্রেণি (প্রথম পত্র)

ব্যবহারিক

২০২২

ব্যবহারিক
প্রথম পত্র (নবম শ্রেণি)
বিভিন্ন জাতের সবজি শনাক্তকরণ

ব্যবহারিক পাঠ-১ঃ মৌসুমভিত্তিক সবজি আলাদা করা

প্রাথমিক তথ্য

বাংলাদেশে উৎপাদন মৌসুমভিত্তিক সকল সবজিসমূহকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা

(ক) রবি মৌসুমভিত্তিক সবজি

(খ) খারিফ মৌসুমভিত্তিক সবজি

(গ) বারমাসি/সারা বছর জন্মানো সবজি।

(ক) রবি সবজি বলতে শীতকালে জন্মে এরূপ সবজিগুলোকে বোঝায়। যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, লাউ, পালংশাক, মূলা, লেটুস ইত্যাদি।

(খ) খারিফ সবজি বলতে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকলে জন্মে এরূপ সবজিগুলোকে বোঝায়। যেমন-চালকুমড়া, চিচিংগা, । ঝিঙা, ধুন্দল, করলা, ডাটা, পুঁইশাক, বরবটি, কাঁকরোল ইত্যাদি।

(গ) বারমাসী সবজি বলতে সারা বছর জন্মে এরূপ সবজিগুলোকে বোঝায়। যেমন-বেগুন, পেঁপে, কাঁচকলা, মিষ্টিকুমড়া, শশা ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় উপকণ

১. খাতায় মৌসুমভিত্তিক সবজির নামের ছক তালিকা।

২. বিভিন্ন ধরণের সবজি, বাজারে পাওয়া যায় বা মাঠে চাষ হয়।

৩. মৌসুমভিত্তিক সবজির তালিকা, যা এদেশে জন্মে।

৪. মৌসুমভিত্তিক সবজি পৃথক পৃথকভাবে রাখার পাত্র।

৫. হ্যান্ড গোব।

৬. কাগজ, কলম, পেন্সিল।

কাজের ধাপ

১. মাঠ হতে বা বাজার হতে সবজি সংগ্রহ করে আনতে হবে। অথবা সবজির ক্ষেতের মাঝে যেতে হবে।

২. প্রতিটি সবজিকে একটি একটি করে উঠায়ে ছকে নির্দেশিত ঘরে নাম তালিকাভুক্ত করে পৃথক করে রাখতে হবে। অথবা মাঠে হলে চিহ্নিত করতে হবে।

৩. ছকে তালিকাভুক্ত করার সময় মৌসুমভিত্তিক সবজির তালিকার সাথে একটি একটি করে মিলিয়ে নিতে হবে। এবং ঠিক চিহ্ন দিতে হবে।

৪. এভাবে সব সবজিকে মৌসুমভিত্তিক আলাদা করা যাবে।

৫. সকল সবজিকে গড় করে কোন মৌসুমে কত সংখ্যক সবজি পাওয়া যায় তা শনাক্ত করা/নির্ণয় করা যাবে।

সবজির শ্রেণি	রবি	খারিফ	বারমাসি
পাতাজাতীয়			
ফরজাতীয়			
কন্দজাতীয়			
মূলজাতীয়			
ফুলজাতীয়			
অন্যান্য			

২০২২

ব্যবহারিক পাঠ-২ঃ প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী সবজি চিহ্নিতকরণ।

প্রাথমিক তথ্য

বাংলাদেশে সবজির প্রকৃতি অনুযায়ী বিরুৎ, লতানো, গুল্ম ও বৃক্ষজাতীয় এসব ভাগে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়।

(ক) বিরুৎজাতীয় সবজি-এরা লতানো হয় না, কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির সময় অবলম্বন নিয়ে থাকে। যেমন ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলু, টমেটো ইত্যাদি।

(খ) লতানোজাতীয় সবজি-এরা লতানো হয়। যেমন-শশা, মিষ্টি কুমড়া, চালকুমড়া, ঝিঙা, চিচিংগা, ধুন্দল, করলা ইত্যাদি।

(গ) গুল্মজাতীয় সবজি-গাছ ছোট , সামান্য শক্ত হয়। যেমন- বেগুন, পেঁড়শ, মরিচ ইত্যাদি।

(ঘ) কাষ্টলজাতীয় সবজি-গাছ বড় এবং কাঠ হয়। যেমন- সাজিনা, বকফুল ইত্যাদি।

বাংলাদেশের সবজিসমূহের ধরন বা খাওয়ার উপযোগী হিসেবে কয়েক ভাগে বিভক্ত। যেমন-

(ক) পাতাজাতীয় সবজি- পুঁইশাক, লালশাক, ধনেপাতা, পিঁয়াজ পাতা, লেটুস, কলমি শাক, পালং শাক, মূলা শাক ইত্যাদি।

(খ) ফলজাতীয় সবজি- বেগুন, কুমড়া, পেঁপে, টমেটো, ঢেঁড়শ ইত্যাদি।

(গ) কন্দালজাতীয় সবজি- আলু, কচু, মেটে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি

(ঘ) ফুলজাতীয় সবজি- ফুলকপি, বা কলি, বকফুল, শাপলা ইত্যাদি।

(ঙ) কাণ্ডজাতীয় সবজি- ডাঁটা, পানি কচু, মানকচু ইত্যাদি।

(চ) বীজজাতীয় সবজি- শিম বীজ, কাঁঠাল বীজ ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. খাতায় প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী সবজির নামের ছক (পৃথক পৃথক)।

২. ল্যাবরেটরীতে সবজিগুলো আনতে হবে অথবা বাজার প্রয়োজন।

৩. সবজিগুলো বিছানোর টেবিল।

৪. সবজির প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী তালিকা।

৫. সবজিগুলো পৃথকীকরণের পর রাখার পাত্র।

৬. হ্যান্ড গোব, খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. বাজার হতে সবজিগুলো ক্রয় করে আনতে হবে অথবা বাজারে যেতে হবে।

২. সবজির তালিকা দেখে সবজি চিহ্নিত করে খাতায় ছকে লিখতে হবে। সে সময় সবজির বৈশিষ্ট্যও লিখতে হবে।

৩. এভাবে সবজিগুলোকে প্রকৃতি ও ধরন অনুযায়ী চিহ্নিত করে বাজারে সবজির প্রাপ্যতা শতকরা হারে বের করা যাবে।

ছক-১ সবজির প্রকৃতি

প্রকৃতি	পাতাজাতীয়	ফলজাতীয়	কন্দালজাতীয়	ফুলজাতীয়	কান্ডজাতীয়	বীজজাতীয়
বিরুৎ						
লতানো						
গুল্ম						
কাষ্ঠল						

ছক-২ সবজির ধরন-

ধরন	সবজির নাম						
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পাতাজাতীয়							
ফলজাতীয়							
কালজাতীয়							
ফুলজাতীয়							
কাণ্ডজাতীয়							
বীজজাতীয়							

সবজি চাষের সমস্যাবলি সমাধানের তালিকা প্রস্তুত করার দক্ষতা অর্জন করা

ব্যবহারিক পাঠ-৩ঃ সবজি চাষের সমস্যাবলি চিহ্নিতকরণ

প্রাথমিক তথ্য

সবজি চাষে অনেক ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। যার মধ্যে কিছু সমস্যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে। কিছু সমস্যা অঞ্চল পর্যায়ে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এবং কিছু সমস্যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রয়েছে। যেমন-

(ক) ব্যক্তিগত পর্যায়ের সমস্যা- অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার জন্য সময়মত বীজ, সার, বালাইবাশক, সেচ ইত্যাদি। সংগ্রহ করতে না পারা, জমির উন্নয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা, বাজার চাহিদার তথ্য সংগ্রহ করা, কারিগরি বিষয়ে সজাগ হওয়া ইত্যাদি।

(খ) অঞ্চল পর্যায়ের সমস্যা- সেচ ব্যবস্থার জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তাদান, বাজার ব্যবস্থায় যোগসূত্র তৈরি, সবজিভিত্তিক এলাকা গড়ে তালো ইত্যাদি।

(গ) রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সমস্যা- তথ্য প্রযুক্তি সহজীকরণ ও সম্প্রসারণ, গবেষণা জোরদারকরণ, বাজার ব্যবস্থা যোগসূত্র স্থাপনে আইনী সহায়তাদান, সবজি বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তাদান ইত্যাদি।

(ঘ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমস্যা- আবহাওয়ার পরিবর্তন, বীজসহ অন্যান্য উপকরণ- একদেশ হতে অন্য দেশে সরবরাহে চাহিদাভিত্তিক সহায়তাদান, গবেষণা জ্ঞান সরবরাহ আমদানি/রপ্তানী শুল্ক ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কৃষককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমস্যাবলির প্রশ্নপত্র।

২। খাতা, কলম, ইরেজার।

২০২২

কাজের ধাপ

১. প্রশ্নপত্র নিয়ে কৃষকের কাছে যেতে হবে।

২. সবজি চাষে কৃষক কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় তা প্রশ্নপত্রে ঠিক দিতে হবে। সমস্যা নতুন হলে তা। লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩. কৃষকের সমস্যাগুলো সংগ্রহ করে ক্যাটাগরি অনুযায়ী সাজাতে হবে।

৪. সমস্যাগুলোর মধ্যে কোনগুলো কোন পর্যায়ের তা শ্রেণিভূক্ত করতে হবে।

৫. সমস্যার সংখ্যার ভিত্তিতে গ্রেডিং করতে হবে। অর্থাৎ কৃষকরা যে সমস্যার কথা বেশি বলবে সেটি গ্রেড-১, যেটি তার চাইতে কম সেটি গ্রেড-২ এভাবে ক্রমাণুক করতে হবে।

ছক-১

কৃষকের নাম :

পিতার নাম :

গ্রাম :

ডাকঘর :

উপজেলা :

জেলা :

ক্রমিক	সমস্যাসমূহ	কৃষক						
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	সারের মূল্য বেশি							
২.	সারে ভেজাল							
৩.	সার দরকারের সময় দুস্প্রাপ্যতা							
৪.	উন্নত জাতের বীজের অভাব							
৫.	বীজের মূল্য বেশি							
৬.	বালাইনাশকে ভেজাল							
৭.	প্রশিক্ষণের অভাব							
৮.	বাজার ব্যবস্থা নাই							
৯.	মধ্যস্বত্বভাগীদের দৌরাত্ব							
১০.	খনন জটিলতা							
১১.	সেচ যন্ত্রের অভাব							
১২.	ভূপৃষ্ঠস্থ পানির অভাব							
১৩.	পানিতে দূষণ							

ব্যবহারিক পাঠ-৪ ঃ সবজি চাষের সমস্যাবলী গুরুত্ব ক্রমানুসারে সাজানো

প্রাথমিক তথ্য

সবজি চাষের সমস্যাগুলোর মধ্যে যেমন- ভাল জাতের ও উন্নতমানের বীজের অপ্রতুলতা, বীজ সময়মত পাওয়া যায়, বীজের মূল্য বেশি, সবজি চাষের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের অভাব, আবহাওয়ার সমস্যা, বাজারজাতকরণে সমস্যা, পরিবহণ সমস্যা, সার ও বালাইনাশকের মূল্য বেশি এবং ভেজাল, কোল্ড স্টোরেজের অভাব, পোকামাকড় ও রোগবালাই সম্পর্কে তথ্যগত সহায়তার অভাব ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। সবজি চাষের সমস্যাবলির তালিকা

২। সবজি চাষের সমস্যাগুলোর জন্য টালি শিট।

৩। কাগজ, কলম।

কাজের ধাপ

১. সবজি চাষের সমস্যাসমূহ কৃষকদের (কমপক্ষে ১০ জন) সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংগ্রহ করতে হবে।

২. কৃষকদের সমস্যা চিহ্নিতকরণের জন্য সমস্যার তালিকা ব্যবহার করতে হবে।

৩. কৃষকদের সমস্যাগুলো সংগ্রহ করার পর সমস্যাভিত্তিক টালি শিটে চিহ্নিত করতে হবে।

৪. টালি শিটে যে সমস্যা বেশি সংখ্যক কৃষকদের নিকট হতে পাওয়া গেছে তারপর ক্রমান্বয়ে কম সংখ্যক সমস্যা। হিসেবে পাওয়া গেছে সেভাবে ক্রমানুসারে গুরুত্বভিত্তিতে হিসেবে সাজাতে হবে।

৫. এভাবে সবজি চাষের সমস্যাগুলোর গুরুত্ব ক্রমানুসারে সাজানো যাবে।

৬. গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা পরিকল্পনা প্রণয়নে এসব কর্মতালিকা ব্যবহৃত হতে পারে।

ব্যবহারিক পাঠ-৫ ঃ সবজি চাষে সমস্যা সমাধানে করনীয়/পরামর্শদান।

প্রাথমিক তথ্য

আবহাওয়া সবিজ চাষে যথেষ্ট প্রভাব রাখে। শুধু ভাল বীজ, ভাল জাত, বীজ সময়মত সরবরাহ, বীজের মূল্য কম, সেচ সুবিধা, খানের সুবিধা দেওয়া হলেই সবজি চাষের সমস্ত সমাধান হবে না। তাই জাতের বৈশিষ্ট্য, পারিপার্শ্বিক চাহিদা, স্থানীয় আবহাওয়ায় সফলভাবে জন্মাবে কীনা তা নির্ধারণ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. বিভিন্ন সবজি চাষের জন্য সবজির পছন্দনীয় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, মাটির অবস্থা, দিবস দৈর্ঘ্যতা, বাতাসের। আর্দ্রতা ইত্যাদির তথ্য ও অঞ্চলভিত্তিক কোন ধরনের কোন সময় কি ধরনের আবহাওয়া বিরাজ করে তার ম্যাপ।

পাঠ-৫

১. সবজি চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ, উপকরণের প্রাপ্যতা, বাজার ব্যবস্থা ইত্যাদির তথ্য সম্বলিত তালিকা।

২. গবেষণা হতে উদ্ভাবিত উপযোগী জাত সম্পর্কে চাষাবাদ কৌশল সংগ্রহ।

৩. খাতা, কলম।

কাজের ধাপ

১. সবজি চাষের উপযাগীতা আছে কিনা তা এই জেড/মৃত্তিকা পরীক্ষা করে জানতে হবে। ২০২২

২. সবজির চাষের জন্য ১২ মাসের পঞ্জিকা তৈরি করতে হবে।

৩. যে সবজি চাষ করা হবে তার বাজার ব্যবস্থা ও চাহিদা আছে কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে।

৪. যে সবজি চাষ করা হবে তার উন্নতজাত ও ভাল বীজ প্রাপ্তির সুবিধা না থাকলে তা কীভাবে সংগ্রহ করা যাবে তার ব্যবস্থা পূর্ব হতে করতে হবে।

৫. সবজি চাষের প্রয়োজনীয় সবগুলো উপকরণ সংগ্রহ বা প্রাপ্তির আগাম ব্যবস্থাকরণ (বীজ, সার, বালাইনাশক, ঘেরা-বেড়ার উপকরণ, সেচ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি)।

৬. বাজার ব্যবস্থার জন্য কোন কোন পথে কোন বাজারে পণ্য নেওয়া হবে তার পরিকল্পনা করতে হবে।

৭. দূর্যোগ বা বিশেষ পরিবর্তিত অবস্থায় বিকল্প কাজ করার প্রস্তুতি রাখতে হবে। যেমন- হঠাৎ কপি বা বেগুনের চারা বীজতলায় বৃষ্টিজনিত কারণে নষ্ট হয়েছে। তাৎক্ষণিক ট্রেতে বীজ ফেলে বারান্দায় রাখা, পানি সরে যেতে দেরি হলে তখন বিনা চাষে আলু লাগাতে হবে বিলম্বের কারণে ইত্যাদি।

৮. যাতায়াত ব্যবস্থায় সমস্যা থাকলে বিকল্প রাস্তা জানতে হবে বা সবজি উঠাতে ২/১ দিন দেরি করা যেতে। পারে। সংরক্ষণের সুবিধা থাকলে সে পথ অবলম্বন করতে হবে।

৯. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সবজি চাষের জমি প্রস্তুত করার দক্ষতা অর্জন করা

পাঠ-২ ঃ সবজি চাষের জন্য উপযুক্ত সথান ও মাটি নির্বাচন করা।

প্রাথমিক তথ্য- সবজি চাষের জন্য আলো বাতাস চলাচলের সুবিধাযুক্ত, সেচ নিকাশের ব্যবস্থাসহ উঁচু, জমি নির্বাচন করা উচিত। সবজির মধ্যে অধিকাংশই উর্বর বেলে দোঁআশ হতে দোঁআশ মাটি বেশি পছন্দ করে। জলাবদ্ধতা প্রায় সবজি সহ্য করতে পারে না। আবার একনাগাড়ে দীর্ঘ খরা হলেও উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সবজি চাষের জমি যেন ছায়াযুক্ত না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। শুধু মৌসুমি সবজি চাষ করতে হলে মাঝারি নিচু বা নিচু জমিও নির্বাচন করা যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. উঁচু (বন্যায় বা বৃষ্টিতে পানি উঠে বা জমে না) জমি।

২. মাটির বুনট সম্পর্কিত তথ্য বা মাঠভিত্তিক মৃত্তিকা ম্যাপ।

৩. কী ধরনের সবজি চাষ করা হবে সে পরিকল্পনা।

কাজের ধাপ- সবজির ধরন অনুযায়ী জমি ও স্থান নির্বাচন করতে হবে। যেমন- আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, কুমড়া জাতীয় ইত্যাদির জন্য উঁচু বা মাঝারি উঁচু এবং বিনা চাষে আলু রোপণ ও পানি কচু ইত্যাদির জন্য নিচু জমি নির্বাচন করা যাবে।

১. বেলে দোঁআশ হতে দোঁআশ মাটির জমিতে আলু, মূলা ভালো হয়। এঁটেল দোঁআশ মাটিতে কপিজাতীয় সবজি ভালো হয়। তাই সেভাবে ফসল অনুযায়ী জমি নির্বাচন করতে হবে।

২. বাড়ীর বা গাছের ছায়া পড়েনা এমন আলোবাতাসমুক্ত জমিতে প্রায় সব ধরনের সবজিরই ফলন ভালো হয়।

৩. বৃষ্টির পানি যাতে না জমতে পারে বা সেচের পানি তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারে এমন স্থান সবজির জন্য। উত্তম। তাই এ ধরনের সুবিধা দেখে সবজির জমি নির্বাচন করতে হবে।

৪. সবজিভিত্তিক মাটি, জমির অবস্থান ও অন্যান্য সুবিধা বিবেচনা করে সবজির জমি ও স্থান নির্বাচনের জন্য খাতায় সকল উপাদানগুলো লিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

২০২২

পাঠ-৩ঃ সবজি চাষের বেড তৈরিকরণ

প্রাথমিক তথ্য-সবজি সাধারণত চারা তৈরি করে চাষ করা হয়। অনেক সবজির বীজ সরাসরি বপন বা রোপণ করা হয়। ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ, টমেটোর চারা তৈরি করা হয়। গাজর, মূলা, ধনিয়া, সিলারির বীজ সরাসরি জমিতে বপন করা হয় (লাইনে/ছিটিয়ে)। চালকুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, ঝিঙা, চিচিংগা, শশা, কাঁকরোল, শিম মাদা করে বীজ রোপণ করা হয়। তবে চারা তৈরি করে, বীজ বপন/রোপণ করে, মাদায় বা লাইনে বীজ রোপণ করে সবজি চাষে সবক্ষেত্রেই বেড তৈরি করা হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. এক খন্ড জমি যা কর্ষণ করে প্রস্তুত করা।
২. বিভিন্ন সবজি রোপণের/বপনের জন্য বেডের মাপ সম্পর্কিত তালিকা/চার্ট
৩. মাপার টেপ/ফিতা।
৪. বাঁশের খুটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক।
৫. কোদাল, রশি।
৬. কাগজ, কলম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. সবজি চাষের জন্য চাষ করা জমি নিতে হবে বা জমি চাষ করে প্রস্তুত করতে হবে।
২. যে সবজি চাষ করা হবে সে সবজির জন্য নির্ধারিত মাপ দিয়ে জমি চিহ্নিত করে খুটি পুঁতে দিতে হবে। প্রয়োজনে সুতলি টেনে লাইন সমান করে নিতে হবে।
৩. সবজি এক সারি, দুই সারি, তিন সারি বা চার সারি পদ্ধতিতে রোপণ/বপন করা হলে সেভাবে জমিতে নকশা করতে হবে।
৪. নির্দিষ্ট দূরত্ব পরে পরে ২৫-৩০ সেমি, চওড়া ও ১৫২০ সেমি. গভীর করে নালা কেটে পাশে মাটি উঠায়ে দিতে হবে। এতে বেড জমি সমতল হতে কিছুটা উঁচু হবে। নালা সেচ, নিকাশ ও চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হবে।
৫. নালার মাটি উঠায়ে দিয়ে বেড তৈরি করে তা সমতল ও পরিপাটি করতে হবে, যাতে লাইন টেনে, মাদা তৈরি বা গত তৈরি করে বীজ/চারা রোপণ/বপণ করা যায়।

পাঠ-৩ ঃ সেচ ও নিকাশ নালা তৈরিকরণ

প্রাথমিক তথ্য- ফসলের জমিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সেচ দেয়া হয়। যেমন নালা যা ভূপৃষ্ঠ ও ভূনিম্নস্থ হতে পারে। পানির উৎস্য হতে (ডিপ বা স্যালো পাম্পের সাহায্যে, এলএলপির সাহায্যে বা কোন উচু জলাধার হতে) বিভিন্ন ধরনের নালা তৈরি করে জমিতে সেচ দেয়া হয়। জমি হতে অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত পানি বের করে দেয়ার জন্য নালা ব্যবহার করা হয়। এ নালা ২ ধরনের হয়। যথা- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। আবার কার্যপদ্ধতি অনুসারে নিকাশ নালা ৩ ধরনের হয়। যথা ভূপৃষ্ঠ নিষ্কাশন নালা, ভূনিম্নস্থ নালা ও সম্মিলিত ভূপৃষ্ঠ ও ভূনিম্নস্থ নালা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। মাপ ফিতা, ২। কোদাল, ৩। রশি, ৪। কাঠি, ৫। খুটি, ৬। ঝুড়ি, ৭। শ্রমিক, ৮। কাগজ, কলম, পেন্সিল, ইরেজার, ১০। সেচ বা নিকাশের জন্য নালার ডিজাইন লে-আউট।

কাজের ধাপ

১. সেচ নালা বা নিকাশ নালার ডিজাইন বুঝে নিয়ে মাঠে লেআউট দিতে (খুটি পুঁতে রশি টেনে) হবে।

২. নালা কাটার আগেই মাটির ধরন, পানি প্রবাহের উৎস ও পরিমাণ এবং জমির অবস্থান বুঝে নিতে হবে।

৩. সেচ পদ্ধতি নির্ধরণ করে নালা তৈরি করতে হবে। যেমন- মুক্ত পাবন পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রিত পাবন পদ্ধতি, ফারো বা খাদ সেচ পদ্ধতি, বেসিন ও রিং বেসিন পদ্ধতি।

৪. মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে সেচের জন্য যে জমিতে সেচ দেয়া হবে সে জমির আইল শক্ত করতে হবে এবং নালা দিয়ে পানি প্রবাহিত করে সম্পূর্ণ জমি একপ্রান্ত হতে প্লাবিত হতে হতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যাবে।

৫. নিয়ন্ত্রিত প্লাবন পদ্ধতি সমতল জমিতে প্রয়োগ করা হয়। এতে জমির প্রত্যেকটি খন্ড আইল দ্বারা পৃথকীকরণ থাকে এবং প্রতি আইল পর মাঠ নালার সাথে যুক্ত থাকে। সেখান দিয়ে জমিতে পানি প্রবেশ করানো হয়। জমি খণ্ডগুলো ৩-১৫ মিটার এবং লম্বা ৬০-৩০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।

৬. সারিতে বা আইল করে বীজ বা চারা রোপণ করা সবজির জমিতে অগভীর খাদ বা নালা তৈরি করা হয়। সকল নালার একদিক দিয়ে সরবরাহ লাইন নালা তৈরি করা হয়। সরবরাহ নালা দিয়ে পানি প্রবাহিত করলে সকল খাদ বা অগভীর নালায় পানি প্রবেশ করে।

৭. কাষ্ঠল সবজির বাগানে রিং পদ্ধতিতে সেচ দেয়া হয়। গাছের চারিদিকের মাটি বৃত্তাকার করে হালকা নিচু করা হয় এবং বাহির দিক উঁচু আইলের মত করে দেয়া হয়। প্রতি ২ সারি পর পর সরবরাহ নালা করা হয়। এ নালার সাথে গাছের বৃত্তাকারের সংযোগ করে দেয়া হয়। প্রধান নালা দিয়ে পানি প্রবাহিত করা হলে প্রতি গাছের গোড়ার বৃত্তাকারে পানি চলে যায়।

৮. সবজির বেডের ফাঁকে, আইলের ফাঁকে বা মাদার কাছে পানি বদ্ধতা হলে সবজি জাতীয় ফসল ২-৪ ঘন্টা সহ্য করতে পারে। সবজি ক্ষেতে পানি বদ্ধ হলে পানি তলের গভীরতা নিচে নামানোর জন্য প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক নিকাশ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে। অর্থাৎ পানি বের হওয়ার প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। সরবরাহ নালার পানি উপরে উঠে আসলে জমির আইল শক্ত করে কৃত্রিমভাবে নিকাশ করতে হবে। অর্থাৎ পাম্প ব্যবহার করতে হবে।

২০২২

পাঠ-৪ ঃ প্রাথমিক সার প্রয়োগ করা

প্রাথমিক তথ্য

মাটির প্রকার, ভৌত রাসায়নিক অবস্থা, আবহাওয়া, সারের প্রকার ও পরিমাণ, ফসলের প্রকার ও শেকড়ের প্রকৃতি, খাদ্য পরিশাষেণ ক্ষমতা ইত্যাদি ভেদে সার প্রয়োগ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। তবে সার প্রয়োগ যখন জমি তৈরির শেষ সময়ে করা হয় তাকে মৌল বা প্রাথমিক প্রয়োগ ধরা হয় এবং পরবর্তীতে যতবারই দেয়া হয় তাকে উপরি প্রয়োগ ধরা হয়। প্রাথমিক প্রয়োগ করা সারগুলোকে ফসলের শেকড়ের নাগালের মধ্যে দেয়া দরকার এবং ধীরে ধীরে দ্রবণের জন্য আগাম প্রয়োগ করে ফসলের প্রয়োজনের সময় পরিশাষেণ উপযোগী করা। এর ফলে সারের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে বীজ/চারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে না।

প্রাথমিক সার প্রয়োগ বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে। যেমন ঃ

(ক) ছিটিয়ে প্রয়োগ,

(খ) স্থানীয় প্রয়োগ

১। চারার গর্তে

২। মাদায় প্রয়োগ

৩। লাঙ্গল স্তরে প্রয়োগ

৪। বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ ও

৫। সিরিঞ্জের ন্যায় প্রবিষ্ঠকরণ পদ্ধতি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ-

১। সার, ২। আগার/নিড়ানী/খতা/কোদাল, ৩। সাবল, ৪। লাংগল, ৫। মই, ৬। বীজ বপন যন্ত্র, ৭। সার প্রবিষ্ঠকরণ যন্ত্র, ৮। সার, ৯। খাতা কলম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. জমি চাষের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ শেষ চাষের পূর্বে জমিতে মই দেওয়ার আগে ধীরে ধীরে পরিশাষেণ উপযোগী হয়। এ সমস্ত সারগুলোকে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। যেমন-ফসফরাস, এমওপি, জিপসাম, জৈব সার, চুন, ডিএপি, জিংক ইত্যাদি। এসমত সার প্রয়োগ করাকে মৌল/প্রাথমিক প্রয়োগ বলা হয়।

২. প্রাথমিক/মৌল সার প্রয়োগের পর আড়াআড়িভাবে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। স্বল্প মেয়াদি ও ঘন করে ছিটিয়ে যে সমস্ত শাক-সবজি বপন করা হয় সেক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বেশি প্রযাজ্যে।

৩. অনুর্বর জমি হলে ফসলের শিকড়ের কাছাকাছি সার দেয়ার জন্য মৌল সারের ৫০% চারা বা বীজের কাছাকাছি। দিতে হবে। যেমনঃ ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটোর চারা রোপণের গর্তে মিশিয়ে দিতে হবে।

৪. লাউ, শশা, কুমড়া জাতীয় গাছের মাদায় বীজ রোপণের পূর্বে মাটির সাথে ৫০% মৌল সার মিশিয়ে দিতে হবে।

৫. ধনে, মূলা, সিলারী, গিমা কলমির বীজ বপনের পূর্বে লাংগল দিয়ে অগভীর নালা করে সেখান দিয়ে সার ছিটিয়ে। হালকা মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এর উপর দিয়ে বীজ বুনে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৬. বীজ বপন যন্ত্রে বীজের সাথে পাশাপাশি বাক্সে সার দিতে হয়।

৭. বীজ বপন যন্ত্র টেনে নিলে বীজ বপনের পাশাপাশি সারও আতে আতে ফারায়োর বা নালার মধ্যে পড়বে। এর পিছনে মই টেনে বা পা দিয়ে মাটি টেনে দিলে বীজ ঢেকে যাবে। এতে বীজের কাছাকাছি সার থাকবে এবং বীজ গজানোর পর শেকড় ছাড়ার সাথে সাথে সার হতে পুষ্টি উপাদান পরিশাষেণ করতে পারবে। ২০২২

৮. সিরিঞ্জ বা প্রবিষ্ঠকরণ যন্ত্রের ভিতর সার ভর্তি করা হয়। রোপিত অথচ কিছুটা বড় গাছ/চারার গোড়া হতে ৭/৮ সেমি. হতে ১০/১৫ সেমি. দূরে সিরিঞ্জের ফলা/মাথা মাটিতে প্রবেশ করানো হয়। এরপর উপরের হাতলে চাপ দিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সার প্রবেশ করানারে পর ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে দিতে হয়।

আধুনিক বীজতলা তৈরির দক্ষতা অর্জন করা

পাঠ-১ ঃ বীজতলার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন

প্রাথমিক তথ্য-শাক সবজির চারা উৎপাদনের জন্য যে স্থান বা পাত্র ব্যবহার করা হয় ঐ স্থান/পাত্র হচ্ছে। বীজতলা। বীজতলা করতে হলে জমির অবস্থান, মাটির প্রকৃতি, জমির উর্বরতা, আলো বাতাসের প্রাপ্যতা, সেচ ও বীজতলার স্থান নির্বাচনে পোকামাকড়, রোগবালাই, পশুপাখীর আক্রমণ ও নিরাপদ পরিবেশ বীজতলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। উপযুক্ত জমি, ২। সেচ/নিকাশ পাম্প, ৩। কাগজ-কলম, ৪। জমির অবস্থান ম্যাপ এবং আশে পাশে বাড়ি, গাছপালার তথ্য ৫। যোগাযোগ ব্যবস্থা।

কাজের ধাপ

১. বীজতলার জন্য উর্বর দোঁআশ বা বেলে দোঁআশ মাটির জমি নিতে হবে।

২. বীজতলার জমি উঁচু ও বন্যা বা জলাবদ্ধমুক্ত হতে হবে। এ ব্যাপারে বিগত কয়েক বছরের তথ্য সংগ্রহ করা উচিত।

৩. বীজতলায় পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে কিনা এবং ঘর-বাড়ি বা গাছপালার ছায়া পড়ে কি-না তা পর্যবেক্ষণ করে প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত জমি হলে তা নির্বাচন করতে হবে।

৪. বীজতলায় পুশু-পাখির আক্রমণ হওয়ার সুযোগ থাকলে বা বিষাক্ত গ্যাস, কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য প্রবেশের সম্ভাবনা থাকলে সে জমি বাদ দিতে হবে।

৫. বীজতলার মাটিতে প্রচুর বাতাস প্রবেশের জন্য গোবর সার, কম্পাস্টে সার বা আবর্জনা পঁচা সার দেয়ার সুযোগ থাকলে সে স্থান বীজতলার জন্য উত্তম, যা বিবেচনা করতে হবে।

৬. জীব জন্তু, পশুপাখি চলাচল করে যেখান দিয়ে সেরূপ স্থান বাদ দিতে হবে।

পাঠ-২ঃ আদর্শ বীজতলার আকার আকৃতি নির্ধারণ করা

প্রাথমিক তথ্য- অনেক সবজির চারা উৎপাদন করে মূল জমিতে পরে রোপণ করা হয়। এ চারা প্রথমে উৎপাদন করা হয় বীজতলায়। বীজতলা যদি সঠিক আকৃতরি ও সঠিক মাপের না হয় তাহলে চারা উৎপাদনে সমস্যা হয়। সাধারণত কপি জাতীয়, বেগুন, টমেটো, পেঁপে ইত্যাদি সবজি রোপণের জন্য বীজতলায় চারা উৎপাদন করা হয়। বীজতলা প্রয়োজন ও অবস্থাভেদে অনেক সময় স্থায়ী, অস্থায়ী বা স্থানান্তরযোগ্য করা হয়।

২০২২

বীজতলার আকার ৩ ×১ মিটার চওড়া, ৭-৮ সেমি. (রবি মৌসুমে) বা ১০-১৫ সেমি. (বর্ষা মৌসুমে উঁচু ও একাধিক বীজতলা হলে দুই বীজতলার মাঝখানে ৩০ সেমি. চওড়া ফাঁকা জায়গা রাখতে হয়, যা সেচ-নিকাশ ও পরিচর্যার জন্য চলাফেরার কাজে প্রয়োজন হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। কোদাল, ২। আচড়া/বিদা, ৩। মাপার টেপ, ৪। লাঙ্গাল, ৫। মই, ৬। খুটি। ৭। খাতা কলম।

কাজের ধাপ

১. কোন ছায়া পড়ে না এরুপ উঁচু জমি বীজতলার জন্য নিতে হবে।

২. জমি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরি করে সমতল করতে হবে।

৩. চাষ-মই দেয়ার পর আগাছা, ঢেলা পরিস্কার করতে হবে।

৪. টেপ ধরে বীজতলার ও নালার জায়গা মেপে খুঁটি পুঁতে চিহ্নিত করতে হবে। প্রতিটি বীজতলার আকার হবে প্রস্থ। বা চওড়া ১ মিটার ×দৈর্ঘা বা লম্বা ৩ মিটার অথবা প্রয়োজন অনুযায়ী আরও দৈর্ঘ্য (সাধারণত ৩ ×১ মিটার)।

৫. সেচ-নিকাশ ও পরিচর্যা কাজে চলাচলের জন্য ২টি বীজতলার মাঝে ৩০ সেমি, ও বীজতলার চারপাশ দিয়ে ১৫-২০ সেমি. চওড়াভাবে স্থান রেখে দিতে হবে। -

৬. দুটি বীজতলার মাঝখানের ও চারপাশের মাটি কোদালের সাহায্যে তুলে বীজতলার উপরে ছিটায়ে দিয়ে জমি সমতল হতে বীজ তলাকে ৭-১৫ সেমি. (সময়ভেদে) উচু করতে হবে। এতে মাঝ খানে নালা তৈরি হবে।

৭. বীজতলা শুকনা ধরনের হলে বৃষ্টিতে যাতে পাশে ভেঙ্গে না পড়তে পারে সেজন্য বাঁশের চটা দিয়ে ছোট খটি পুঁতে দিতে হবে।

৮. বীজতলা কাদাময় হলে জমির উপর দিয়ে লাঠির সাহায্যে সমান করে দিতে হবে।

পাঠ-৩ ঃ বীজতলার আন্ত পরিচর্যা করতে পারা/করা

প্রাথমিক তথ্য বীজতলার তৈরির পর সাধারণত বীজতলায় বীজ গজানোর আগে সেচ দিতে হয় না। তবে চারা গজানোর পর সকাল বিকাল ঝাঁঝরি দিয়ে খুব নিচু হতে হালকা করে সেচ দিতে হয়। বীজতলার মাটিতে চটা বেঁধে গেলে চারার ক্ষতি হয়। তাই খুঁচিতে চটা ভেঙ্গে দিতে হয়। বৃষ্টি হয়ে চারার গোড়া বেঁকে গেলে সোজা করে ২-৩ সেমি পর্যন্ত পুরু করে গুড়ো মাটি দিতে হয়। সারি করে বীজ বুনলে সারির মাঝখান দিয়ে মাটি দিতে হয়। চারা কচি অবস্থায় রাদে হতে বাঁচানোর জন্য চালা করে দিতে হয়। রাতে কুয়াশা পাওয়ার জন্য চালা বিকেলেই সরিয়ে দিতে হয়। বীজতলার চারায় অনেক সময় পোকার আক্রমণ ও রোগ দেখা যায়। বীজতলায় কিছু কিছু আগাছাও জন্মে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ- ১। ঝাঁঝরি, ২। বাঁশের চটা, ৩। ছোট খুটি, ৪। কাঠি লাঠি, ৫। ঝুরঝুরে বা গুড়ো শুকনো মাটি, ৬। নিড়ানি, ৭। বাঁশের চাটাই/চালা, ৮। বালাইনাশক, ৯। স্প্রে মেশিন, ১০। বালতি, ১১। মাক্স হ্যান্ড গোব, এ্যাপ্রোন, ১২। খাতা কলম।

কাজের ধাপ

১. বীজতলায় বীজ বপনের পর বীজ গজানোর আগে সেচ দেওয়া উচিত নয়। তবে বীজতলায় জো অবস্থা না থাকার সম্ভাবনা থাকলে বীজ বপনের আগেই সেচ দিয়ে নিতে হবে।

২. চারা গজানোর পর বীজতলা শুকায়ে গেলে ঝাঝরি দিয়ে নিচু হতে হালকা সেচ দিতে হয় এবং বীজতলায় চটা। ধরলে কাঠি বা নিড়ানি দিয়ে চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

৩. বৃষ্টিজনিত কারণে বা বৈরী আবহাওয়ায় গজানো চারা অনেক সময় বেঁকে যেতে পারে। এরূপ অবস্থা হলে শুকনো ঝুরঝুরে মাটি নিয়ে কাঠি দিয়ে চারা সোজা করে পাশ দিয়ে গুড়ো মাটি ছাড়ায়ে দিতে হবে, তাতে চারা সোজা হয়ে থাকবে।

৪. রোদে সদ্য গজানো চারা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাই দিনে রোদের সময় বীজতলার উপরে প্রায় ১.৫ ফিট উচু করে চালা দিয়ে দিতে হয়। চালাটা একদিকে একটু ঢালু করে দিতে হয়। চালার প্রস্থ হবে বীজতলার প্রস্থের চাইতে ৫-৭ সেমি. বেশি।

৫. বীজতলায় আগাছা দেখা দিলে তা উঠায়ে ফেলতে হবে।

৬. পোকামাকড় বা রোগবালাই বিশেষত চারার গোড়া পঁচা রোগ দেখা দিলে প্রতিরোধক হিসেবে মাটি শোধনকারী ও কপার মিশ্রিত বালাইনাশক স্প্রে করে মাটি ও চারা সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিতে হয়। পোকা-মাকড় ও রোগ দেখা মাত্র দমন করতে হবে।

সবজি চাষের জন্য মাদা তৈরির দক্ষতা অর্জন করা

পাঠ- ৪ ঃ সবজি চাষের জন্য মাদার স্থান নির্বাচন করা, মাদায় পরিচর্যা করা, মাদায় চারা লাগানো ও মাদায় চারার পরিচর্যা করা।

প্রাথমিক তথ্য- যে সব সবজির কাণ্ড ও শেকড় বেশি ছড়ায় এরূপ সবজির জন্য ফাঁক ফাঁক করে গর্ত বা মাদা তৈরি করে সবজি বীজ রোপণ করা হয়। বেড তৈরি করেও বেডের উপর মাদা তৈরি করা হয়। সবজি বীজ রোপণের জন্য সেচের সুবিধাযুক্ত, উঁচু ও বন্যামুক্ত জমি নির্বাচন করা হয়। এরপর বেডে বা জমিতে সবজিভেদে নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা তৈরি করা হয়। মাদায় যাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস লাগে সে বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। এক খন্ড জমি বা বেড, ২। টেপ মাপার, ৩। নিড়ানি/শাবল/খন্তা, ৪। মাদা চিহ্নিতকরণ খুটি, ৫। কাগজ, কলম।

কাজের ধাপ

জমি তৈরির পর বেডে সবজি ভেদে এক বা একাধিক সারি করে নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদারস্থান চিহ্নিত করতে হবে।

১. চিহ্নিত স্থানের মাটি ঝুরঝুরে করে উল্টো থালার ন্যায় অর্থাৎ জমি তল হতে একটু উচু করে পরিপাটি করতে হবে। এই স্থানটি মাদা হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

২. বৃষ্টিজনিত বা অন্যকোন কারণে মাদার স্থানটি জমির সাথে একাকার হতে পারে। তাই পরবর্তীতে মাদার স্থানটি বোঝার জন্য কাঠি পুঁতে রাখতে হবে।

৩. সবজিভেদে মাদার ব্যাস ৫০-৬০ সেমি. ও গভীরতা ৪০-৫০ সেমি. গর্ত করে তাতে পরিমাণমত সার মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে।

৪. গর্তে সার দিয়ে ৫-৭ দিন রেখে দিতে হয়। এরপর বীজ বা চারা রোপণের সময় পুনরায় মাটি আগলা করে নিতে হবে।

৫. বর্ষাকালে মাদার স্থানটি অবশ্যই জমিতল হতে উঁচু করতে হবে।

৬. পানি সেচ ও নিকাশের সুবিধার্থে মাদার চারদিক দিয়ে জুলি/নালা কেটে রাখতে হয়।

৭. মাদায় চারা গজানোর আগে দেখতে হবে যেন মাদায় চটা অবস্থা না থাকে। যদি চটা ধরে তাহলে তা জো আসা মাত্র সাথে সাথে ভেঙ্গে দিতে হবে।

৮. চারা গজানোর পর ২ পাতা হওয়া থেকে ৫-৭ সেমি. হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার আগাছা গজাতে দেওয়া যাবে।

৯. অন্য স্থানে গজানো চারা মাদায় রোপণ করতে হলে মাদার মাটিতে চারার শেকড়ের দৈর্ঘ্য পরিমাণ গভীর করে গর্ত করতে হয়। গর্তে চারা স্থাপনের পর চারার গোড়ার মাটি হালকা চেপে দিয়ে ঝাঁঝরি দিয়ে খুব কাছে থেকে সামান্য পানি দিতে হবে।

১০. চারা সব সময় বিকেলে রোপণ করা উচিত। পর পর ২-৩ দিন চারায় ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. শূন্যস্থান পূরণের জন্য বেডের/মাদার পাশে কিছু চারা রোপণ করে রাখতে হবে।

বীজের অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা করা

পাঠ-১ঃ মাটির পাত্র, কলার খোল, ভিজাচট, নারকেলের মালা ও পেট্রিডিসে বীজ অঙ্কুরোদগম করা

প্রাথমিক তথ্য

ফসল উৎপাদনে ভালমানের বীজ ব্যবহার করা হলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বীজ ভাল কিনা তা অঙ্করের হার হার দেখে বোঝা যায়। বীজ গজানোর হার পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি আছে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। মাটির পাত্র, ২। কলার খালে, ৩। ভিজা চট, ৪। নারকেলের মালা, ৫। পেট্রিডিস, ৬। কাঁচি, ৭। পানি, ৮। বাটারিং পেপার, ৯। কাঁচি/চাকু ইত্যাদি, ১০। খাতা কলম।

কাজের ধাপ

(ক) মাটির পাত্র ও মাটির পাত্রে পরিমাণ মত ধূলা/মাটি দ্বারা ভর্তি করতে হবে।

(খ) নারিকেলের মালা ঃ নারিকেলের মালাতে পরিমাণমত ধূলা/মাটি দ্বারা ভর্তি করতে হবে। ক ও খ উভয়টিতে। পরিমাণমত পানি দ্বারা ভিজিয়ে নিতে হবে।

(গ) কলার খোল ঃ কলার পাতার বোঁটার দিকটার মোটা অংশে ১ ফিট পরিমাণ টুকরো করে কেটে নিতে হবে।

(ঘ) ভেজা চট ঃ ৩০ বর্গ সেমি. পরিমাণ চট টুকরো করে কেটে নিতে হবে।

(ঙ) পেট্রিডিস ও পেট্রিডিসের তলায় বটিং পেপার বিছিয়ে নিতে হবে ঘ ও ঙ উভয়টিতে অর্থাৎ চট ও বটিং পেপার অল্প অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে সম্পূর্ণ ভিজিয়ে নিতে হবে।

কাজের পদ্ধতি

১. এরপর বীজ লট হতে নমুনা বীজ সংগ্রহ করে সেখান হতে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে দৈবচয়নের মাধ্যমে ১০০ টি বীজ আলাদা করে নিতে হবে।

২. নমুনা বীজ ১০০ টি মাটির পাত্রে বা নারিকেলের মালায় সারি করে বসাতে হবে।

৩. তারপর মাটির পাত্র বা নারিকেলের মালা আলোবাতাসযুক্ত ছায়া স্থানে রাখতে হবে।

৪. মাটির পাত্র বা নারিকেলের মালায় প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অল্প পানি দিতে হবে।

৫. কলার ডাঁটা বা কাণ্ড বা পাতার বোঁটায় মোটা অংশ যা ১ ফিট আকারে নেয়া হয়েছে, তার ১ দিক হতে বাঁশ ফালি করা বা ফাঁড়ার ন্যায় সমান্তরালভাবে দুই পাশ হতে ফাঁড়তে হবে। এতে মাঝখানের অংশ দন্ডের ন্যায় থেকে যাবে।

৬. কলার ডাঁটার দুইদিক হতে প্রায় ২০ সেমি. ইঞ্চি পরিমাণ করে কাটা ফালি ২টি দুদিকে ভাঁজ করতে হবে, ঠিক যেভাবে কলা ছিলা হয়।

৭. চটটি বিছিয়ে একপাশে সারি করে ১০০টি বীজ সাজাতে হবে এবং একটা কাঠি চটের মাথায় ধরে আস্তে আস্তে চটটি কাঠির সাথে রোল করে পেচিয়ে নিয়ে ঠান্ডা ও অন্ধাকার স্থানে রেখে দিতে হবে। চটটি শুকায়ে গেলে মাঝে মাঝে ভেজায়ে দিতে হবে।

৮. কলার ডাঁটার ভিতরের দন্ডের খাঁজে খাঁজে ১০০টি বীজ সাজায়ে ফালি করা অংশ ২টি সোজা করে নিলে বীজ ঢেকে যাবে। এখন ডাঁটাটি সুতা/চিকন সুতলি দিয়ে পেঁচায়ে বেঁধে ঠান্ডা ও অন্ধকার স্থানে রেখে দিতে হবে।

৯. পেট্রিডিসেও বীজ ১০০টি সাজায়ে ডিসের ঢাকনা দেওয়ার আগে পিপেটের সাহায্যে পানি দিয়ে বীজগুলো ভিজিয়ে নিয়ে জানালার কাছে। টেবিলে রেখে দিতে হবে।

অঙ্কুর গনণা

চারার শ্রেণিভেদ	কতবার/রেপিকেশন (কমপক্ষে ৩ বার)	অঙ্কুরিত বীজের সংখ্যা ও দিন										গড়%
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
স্বাভাবিক চারা												
অস্বাভাবিক চারা												
না গজানো বীজ সংখ্যা												

(ক) সাধারণত বীজ বসানোর ৩য় দিন হতে অঙ্কুর গণনার কাজ শুরু এবং ৭ম দিনে শেষ করতে হয়। প্রতিদিন বীজ (অঙ্কুরিত) গণনার পর পাত্র হতে সেগুলো ফেলে দিতে হয় এবং তা ছকে লিখে রাখতে হয়।

২০২২

(খ) যে বীজের মূল ও কাণ্ড স্পষ্টভাবে গজাতে দেখা যায় সে বীজকেই গজানো বীজ হিসেবে গণ্য করা হয়। এভাবে কমপক্ষে ৩টি পাত্রের (একই জাতীয় অঙ্কুরিত বীজের হিসাব নিয়ে গড় করে শতকরা হারে প্রকাশ করা যায়। উদাহরণ- মাটির পাত্রে বসানো বীজের অঙ্কুর হার নির্ণয়।

মাটির পাত্র	প্রতি পাত্রে বীজের সংখ্যা	গজানো বীজের সংখ্যা	বীজ গজানোর শতকরা হার	গড় হার
১ম পত্র	১০০ টি	৭৯টি		
২য় পাত্র	১০০ টি	৯০টি		
৩য় পাত্র	১০০ টি	৯০টি		৮২.২৫%
৪র্থ পাত্র	১০০ টি	৮৩টি		
মোট ৪ টি পাত্র	মোট = ৪০০ টি	মোট ৩৩০ টি	৩৩০ ÷ ৪ = ৮২.২৫%	

বীজতলার মাটি শোধন

পাঠ-১ ঃ তাপ ও রাসায়নিক পদ্ধতিতে মাটি শোধনের উপকরণ শনাক্তকরণ

প্রাথমিক তথ্য

বীজতলায় বা জমিতে অনেক সময় বীজ বপন করার পর কিছু বীজ গজায় না। অনেক সময় চারা রোপণ করার পর ঢলে পড়ে ও পরে মারা যায়। বীজতলা বা জমির মাটিতে অসংখ্য জীবাণু থাকে। এসব জীবাণুর মধ্যে কিছু আছে উপকারী, আবার কিছু আছে ক্ষতিকর। ক্ষতিকর জীবাণুর মধ্যে হলো-ফিউজিরিয়াম, রাইজোকটনিয়া, পিথিয়াম, সারকোসপোরা ইত্যাদি। মাটিতে নানা ধরনের কীট পতঙ্গ থাকে। যেমনঃ ইউপোকা, পিঁপড়া, কাটুই পোকা, মোল্ড ও ফিল্ড ক্রিকেট ইত্যাদি। এগুলো দমন না করা হলে এরা ফসলের ভীষণ ক্ষতি করে থাকে। এদের বসবাস মাটিতে। তাই মাটি শোধন করা হলে এগুলো অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। লোহার কড়াই, ২। হাতা ৩। চুলা ও লাকড়ি, ৪। খড়কুটা, ৫। দিয়াশলাই, ৬। ক্লোরিপিক্রিন, ফরমালডিহাইড, মিথাইল ব্রোমাইড ইত্যাদি, ৭। পলিথিন শিট, ৮। ইনজেক্টর ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. বড় লোহার কড়াই সংগ্রহ করতে হবে।

২. কড়াইতে মাটি দিয়ে ওলটপালট করার হাতা নিতে হবে।

৩. মাটি জ্বাল দেয়ার জন্য চুলা, লাকড়ি নিতে হবে।

৪. জমির উপর দিয়ে বিছায়ে দেয়ার জন্য খড়কুটা বিচালি নিতে হবে।

৫. রাসায়নিক পদার্থ ফরমালডিহাইড, ক্লোরাপেক্রিন, মিথাইল (ব্রোমাইড, ভ্যাপাম ইত্যাদি) কাঁচের পাত্রে করে নিতে হবে।

৬. রাসায়নিক পদার্থ- মাটিতে দেয়ায়/প্রবেশের জন্য ইনজেক্টর নিতে হবে।

৭. রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের পর মাটি ঢেকে রাখার জন্য পলিথিন শিট নিতে হবে।

৮. খড়কুটা/বিচালি জ্বালানারে জন্য দিয়াশলাই নিতে হবে।
এসব উপকরণ সংগ্রহ করে প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য, রঙ, ভৌত অবস্থা ইত্যাদি খাতায় লিখতে হবে।

পাঠ-২ ঃ তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মাটি শোধন করা

প্রাথমিক তথ্য- বীজতলা বা জমির মাটি তাপের সাহায্যে বিভিন্ন ভাবে জীবানুমুক্ত করা যায়। যেমন- মাটির মধ্যে গরম বাষ্প দিয়ে, কড়াইতে মাটি নিয়ে জ্বাল দিয়ে, পলিথিন শিট জমির উপর দিকে ঢেকে রেখে সুর্যের তাপে মাটি গরম করে, জমির উপর খড়কুটা/বিচালি বিছায়ে আগুন ধরায়ে, জমির নাড়া, আবর্জনা পুড়ায়ে ইত্যাদি।

প্রয়াজনীয় উপকরণ

১। ছিদ্রযুক্ত ধাতব পাইপ ২। লোহার কড়াই, ৩। পলিথিন শিট, ৪। খড়কুটা বিচালি, ৫। দিয়াশলাই, ৬। লম্বা লাঠি, ৭। খাতা-কলম ইত্যাদি।

কাজের ধাপ

১. ছিদ্রযুক্ত ধাতব পাইপ (ছোট ছিদ্রযুক্ত) মাটির মধ্যে প্রবেশ করায়ে গরম জলীয় বাষ্প পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করাতে হবে।

২. লোহার বড় কড়াইতে জমির উপরিস্তরের (১০-১৫ সেমি. গভীর) মাটি কড়াইতে নিয়ে ১ ঘন্টাকালে তাপ দিতে হবে এবং নড়াচাড়া করতে হবে।

৩. জমির উপর দিয়ে সাদা পলিথিন শিট বিছিয়ে পলিথিন শিটের চারদিক দিয়ে ভারা দিয়ে দিতে হবে প্রখর রোদের সময় এভাবে একাধারে ৫-৭ দিন জমি ঢেকে রাখলে তাপে অনেক জীবাণু মারা যাবে।

৪. জমির উপর দিয়ে খড়কুটা/বিচালি সমভাবে বিছায়ে দিয়ে প্রখর সূর্যতাপের সময় আগুন ধরিয়ে পুড়ায়ে দিতে হবে। এতে জমির উপরিতরের রোগ-জীবাণু মারা যাবে।

৫. জমি ফসল কাটার পর বিশেষত আমন ধান, গম, ভূট্টা, আখ ইত্যাদির নাড়া/পাতা যথেষ্ট সারা জমি বিছায়ে থাকে। শুকনা অবস্থায় এগুলোতে আগুন লাগায়ে দিয়ে তা পুড়ে দিলে মাটি শোধন হবে।

পাঠ-৩ঃ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগর মাধ্যমে মাটি শোধন করা

প্রাথমিক তথ্য- বীজতলা বা জমির মাটি জীবাণুমুক্ত করণের (শোধন) জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আছে। যেমন- ফরমালডিহাইড, ক্লোরোপিক্রিন, মিথাইল ব্রোমাইড, ভ্যাপাম ইত্যাদি। এগুলো মাটিতে প্রয়োগ করে পলিথিন শিট দিয়ে বীজতলা/জমির মাটি ঢেকে রাখলে মাটির রোগ জীবাণু মারা যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। রাসায়নিক পদার্থ, (মাটি শোধনকারী), ২। ইনজেক্টর, ৩। পলিথিন শিট, ৪। হ্যান্ড গোব, ৫। মাক্স ৬। খাতা কলম।

কাজের ধাপ

১. ১ লিটার ফরমালডিহাইডের সাথে ৫০ লিটার পানি মিশিয়ে নিতে হবে।

২. প্রতি বর্গমিটার জমিতে ১২ লিটার এই মিশ্রণ সমানভাবে ছিটিয়ে বা স্প্রে করে পলিথিন ত্রিপল শিট দিয়ে প্রায় সপ্তাহখানেক ঢেকে রাখতে হবে।

৩. এরপর পলিথিন শিট/ত্রিপল সরায়ে ১০-১৫ দিন খোলা রাখতে হবে।

৪. জমি ওলটপালট করে ফরমালিনের গন্ধ চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে বীজ বপন/রোপণ করতে হবে।

৫. ক্লোরোপিক্রিন ইনজেক্টরে করে নিয়ে ৪০ সেমি. পর পর মাটিতে ১৫ সেমি. গভীর প্রবেশ করায়ে সাথে সাথে। ত্রিপল মোটা পলিথিন শিট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৬. ক্লোরোপিক্রিন দিয়ে ভেজানো মাটি প্রায় ১ সপ্তাহ থেকে রেখে পরে শিট সরায়ে মাটি ওলট পালট করে দিতে হবে। এতে মাটির বহু রোগজীবাণু মারা যাবে।

দ্বিতীয় বীজতলা তৈরি ও চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বাড়ানো

পাঠ- ২ঃ দ্বিতীয় বীজতলা তৈরি ও চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বাড়ানো

প্রাথমিক তথ্য- চারা তৈরি করে মূল জমিতে রোপণের পর অনেক চারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই চারাকে পর্যাপ্ত আলো বাতাস পাওয়ার জন্য ও পাতা, কাণ্ড, শেকড় সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে দেয়ার জন্য দ্বিতীয় বীজতলায় অল্প বয়সেই চারা স্থানান্তর করতে হয়। চারা বীজতলায় থাকা অবস্থায় প্রখর রৌদ্রের তাপ ও শীতের প্রভাব এবং পানির অভাব কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করে চারাকে টিকে থাকতে অভ্যস্ত করতে হয়। চারাকে কষ্ট সহ্য করে টিকে থাকার সংগ্রামই হচ্ছে কষ্ট সহিষ্ণুতা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। বীজ গাজানো অবস্থার বীজতলা বা পাত্রে গজানো বীজতলা, ২। অগার/নিড়ানি, ৩। দ্বিতীয় বীজতলা তৈরি অবস্থায়, ৪। পানি, ৫। ঝাঁঝরি, ৬। চালা ৭। খাতা কলম।

কাজের ধাপ

১. ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকোলী , বেগুন, টমেটো, মরিচ, শশা ইত্যাদির চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরের জন্য প্রথম বীজতলা তৈরির অব্যহিত পরেই তৈরি করতে হবে।

২. প্রথম বীজতলার ন্যায় দ্বিতীয় বীজতলাও ৩ ×১ মিটার চওড়া এবং ৭-১৫ সেমি. উঁচু (শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে) করে তৈরি করতে হবে।

৩. বীজতলায় ২০ কেজি গোবর সার, ৬ গ্রাম ইউরিয়া, ৪ গ্রাম টিএসপি, ৬ গ্রাম এমওপি সার এবং তৎসঙ্গে ১ গ্রাম সেভিন মিশিয়ে নিতে হবে।

৪. এ পদ্ধতিতে প্রথম বীজতলার চারা গজানোর ৫-৭ দিন পরে ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট হলে প্রথম বীজতলা হতে বিকালের দিকে কাঠি দিয়ে চারা উঠায়ে দ্বিতীয় বীজতলায় ৬-৮ সেমি. দূরে দূরে সারিতে ৪-৫ সেমি. দূরে দূরে। চারা রোপণ করতে হবে।

৫. বীজতলা হতে চারা উঠায়ে মূল জমিতে রোপণ করার পর অনেক সময় কষ্ট সহ্য করতে পারে না তাই বীজতলায় থাকা অবস্থায় চারার ছায়া থাকলে তা সরায়ে রৌদ্র পড়তে দিতে হবে, মাঝে মাঝে বীজতলা শুকাতে দিতে হবে। এতে চারার ওপর চাপ সৃষ্টি হবে এবং কষ্ট কাটিয়ে উঠতে সহ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৬. প্রথম যে দিন চারাকে কষ্ট দেয়া হবে, ক্রমান্বয়ে কষ্ট বাড়ায়ে দিতে হবে। তাতে কষ্ট সহিষ্ণুতাও বৃদ্ধি পেতে

থাকে। তবে একনাগাড়ে চারাকে কষ্ট দিতে হয় না। মাঝে মাঝে সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়।
৭. এ প্রক্রিয়া চারায় শ্বেতসার বৃদ্ধি পাবে এবং মূল জমিতে রোপণের পর দ্রুত লেগে যেতে পারে এবং বেশি সংখ্যক নতুন শিকড় গজাতে পারে।

মিষ্টি কুমড়া, লাউ, শশা, চিচিংগা, ঝিংগা ও পটল চাষাবাদে দক্ষতা অর্জন করা

পাঠ-৩ ঃ মিষ্টি কুমড়া, লাউ, শশা, চিচিংগা, ঝিংগা ও পটল চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জমি ও মাচা তৈরি ও জমিতে ও মাদায় সার প্রয়োগ, জমিতে ও মাদায় চারা রোপণ, রোপিত চারার পরিচর্যা, সবজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

প্রাথমিক তথ্য- সবজি চাষের জন্য বাড়ির আশেপাশে উঁচু বন্যামুক্ত স্থান বেছে নিতে হবে। জমি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভালো। পানি সেচের ও নিকাশের সুবিধা থাকতে হবে। জমিতে আলোবাতাস ও রৌদ্রমুক্ত হওয়া দরকার। বেশি বৃষ্টির পানি দাড়াবে না এমন জমি হওয়া উচিত। দোঁআশ মাটি সর্বোত্তম, তবে উর্বর হতে হবে। বেলে দোঁআশ হতে এঁটেল দোঁআশ মাটিতেও সবজি ভালো হয়। তবে সবজি চাষে জৈব সার পর্যাপ্ত ব্যবহার করতে হয়। সবজি চাষের মাটির পিএইচ ৬-৭ বেশি উপযোগী। মাটি বেশি অম্ল বা বেশি ক্ষার হলে কিছু কিছু উপাদান গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি, ২। বীজ/চারা, ৩। দেদাল, ৪। লাঙ্গল, ৫। মই, ৬। নিড়ানী, ৭। আঁচড়া, ৮। খুটি, ৯। রশি, ১০। সার, ১১, ঝুড়ি, ঝাঁঝরি, ১২। টেপ, ১৩। খাতা কলম।

কাজের ধাপ

১. রৌদ্র ও আলোবাতাসমুক্ত উর্বর দোঁআশ মাটি সবজি চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

২. জমিতে পর্যাপ্ত জৈব সার প্রয়োগ করে জমি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

৩. তত্ত্বীয় অংশ হতে সবজিগুলো চাষে বীজ/চারা রোপণের দূরত্ব, বেড ও বেডে মাদা তৈরির দূরত্ব জেনে নিতে হবে।

৪. প্রতিটি সবজির জনাই তৈরিকৃত জমিতে বেড় করে বেডে মাদা করতে হবে। তবে পটলের নির্দিষ্ট দূরত্ব দিয়ে ফোরা/নালা তৈরি করতে হবে।

৫. মাদার মাটি কুপিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ সার মাদার মাটিতে মিশিয়ে মাদাগুলোকে জমি সমতল অপেক্ষা কিছুটা উচু করতে হবে।

৬. সবজি চাষের তত্ত্বীয় অংশে সারের মাত্রা ও সার প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। সেভাবে সার জমিতে ও মাদায় প্রয়োগ করতে হবে।

৭. সবজির চারা মাদায় বিকেলে রোপণ/বপন করতে হবে এবং ঝাঁঝরি দিয়ে নিচু করে হালকাভাবে সেচ দিতে হবে।

৮. পটলের লতা নালা/ফারোতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রোপণ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৯. চারার গোড়ায় যাতে বৃষ্টির পানি দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুরূপ মাটি শুকায়ে গেলে সেচ দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০. বৃষ্টি বা সেচজনিত কারণে মাটিতে চটা হলে সাথে সাথে ভেঙে দিতে হবে। মাদায় বা বেডে আগাছা জন্মানোর সাথে সাথে নিড়ানি দিয়ে উঠায়ে দিতে হবে।

১১. মাদার চারায় যাতে পোকা মাকড় ও রোগ না হতে পারে সেজন্য ম্যালাথিয়ন/সাইপারমেথ্রিন/ ফেনিট্রোথিয়ন ১.২ মিলি. ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

১২. তত্ত্বীয় অংশে আলোচিত নিয়ম ও সময় অনুসারে সবজি সংগ্রহ করতে হবে এবং গুণগত মান বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. প্রতিটি সবজির জন্য সমস্ত কার্যক্রম ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।

টমেটো, আলু, বেগুন চাষাবাদে দক্ষতা অর্জন করা

পাঠ-৪ ঃ টমেটো, আলু, বেগুন চাষাবাদের জমি নির্বাচন, জমি তৈরি, সেচ ও নিষ্কাশন, প্রাথমিক সার প্রয়োগ, রোপিত চারার পরিচর্যা এবং সারের উপরি প্রয়োগ, সবজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা

প্রাথমিক তথ্য- বেগুন গোত্রের সবজি চাষের জন্য মাটি উর্বর ও সুনিষ্কাশিত হওয়া প্রয়োজন। সব ধরনের মাটিতে চাষ করা গেলেও দোআশ মাটিতে ফলন বেশি হয়। বেগুন গোত্রের সবজিগুলো কিছুটা অম্ল মাটিতে ভালো হয়। বেগুন কিছুটা উষ্ণ জলবায়ুর ফসল। কিন্তু টমেটো ও আলু ঠান্ডা জলবায়ুর ফসল। বেগুন গোত্রের সবজিতে পানিবদ্ধতা হলে বিশেষত বেগুন ও টমেটো খুব ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বেগুন ও টমেটোর বীজ বীজতলায় বপন করে চারা তৈরির পর মূল মাঠে চারা রোপণ করতে হয়। তবে চারা গজানোর পর ২-৩ পাতা বিশিষ্ট হলে দ্বিতীয় বীজতলায় রোপণ করে চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে নিলে ভালো হয়। চারা অবশ্যই বিকালে লাগায়ে হালকা সেচ দিতে হয় এবং রোপণ পরবর্তী প্রায় ১ সপ্তাহ ছায়ার ব্যবস্থা করা হলে চারা দ্রুত লেগে যায়। ৩৫-৪০ দিন বয়সে চারার ৫/৬টি পাতা হলে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। মাটির উর্বরতার ওপর নির্ভর করে রোপণ দূরত্ব কম বেশি করতে হয়। চারা রোপণ পরবর্তী দুই সারির মাঝখান হতে দফায় দফায় মাটি তুলে দিয়ে চারার সারি উঁচু করতে হবে এবং মাঝখান দিয়ে পানি সেচ ও নিকাশ করা যাবে। চারা লাগানোর পর হতে ২-৩ কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতিবার সার প্রয়োগের সময় মাটি আগলা করে সার মাটিতে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হয়। এতে আগাছা দমন হয়, গাছের শেকড়ে আলাবাতাস লাগে, সেচ নিকাশের নালা উপযুক্ত গভীর হয়। চারা রোপণের পর বেগুন প্রায় ৯০ দিনে, টমেটো ৮০ দিনে এবং আলু ১০০ দিনে সংগ্রহ করা যায়। বেগুন সংগ্রহে বিলম্ব হলে খাবার অনুপযোগী হয়ে যায়। অথচ টমেটো ও আলু পরিপুষ্ট হওয়ার পরও কিছুটা বিলম্বে সংগ্রহ করলে কোন ক্ষতি হয় না।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। জমি, ২। লাঙ্গল, ৩। কোঁদাল, ৪। আঁচড়া, ৫। মই, ৬। টেপ, ৭। সুতলি, ৮। সার, ৯। ঝুড়ি, ১০। নিড়ানি, ১১। কাঠি, ১২। সবজি রাখার পাত্র।

কাজের ধাপ

১. উঁচু, রৌদ্রযুক্ত, উর্বর ও দোঁআশ মাটির জমি নির্বাচন করে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হবে।

২. জমি একদিকে সামান্য ঢালু করে নিলে সেচ ও নিকাশের সুবিধা হবে।

৩. বেগুন, টমেটো ও আলু রোপণের জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে লাইন টেনে লাইন/সারিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা/আলু। রোপণ করতে হবে। তত্বীয় অংশে রোপণ/বপন দূরত্ব উল্লেখ আছে।

৪. জমি তৈরির সময় বিভিন্ন প্রকার সারের মধ্যে মৌল (প্রাথমিক) সার সম্পূর্ণ জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তত্বীয় অংশে সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ আছে।

৫. উপরি প্রয়োগের সার ধাপে ধাপে চারার সারির পাশ দিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে কোদাল বা নিড়ানির সাহায্যে মাটি নড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিতে হবে।

৬. মাটিতে সার মেশানোর পর কোদাল দিয়ে মাটি হালকাভাবে সারিতে তুলে দিতে হবে এবং এতে দুই সারির মাঝখান দিয়ে নালা তৈরি হবে।

৭. টমেটো গাছের জন্য ইংরেজি 'এ' অক্ষরের ন্যায় করে বাঁশ দিয়ে বাউনি করে দিতে হবে।

৮. খারিফ মৌসুমে বেগুনের জমি হতে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. রবি মৌসুমে সবগুলো সবজির জমিতেই শুষ্ক অবস্থায় ১০ দিন পর পর প্রয়োজনে সেচ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. উপরি প্রয়োগের সার দেয়ার পর পরই হালকা সেচ দিলে সারের কার্যকারিতা দ্রুত শুরু হয় সেজন্য সেচ দিতে হবে।

১১. বেগুন প্রায় ৮০-৯০ দিন হতে, টমেটো ৭০-৮০ দিন হতে এবং আলু আগাম ও স্বল্প মেয়াদি জাত ব্যতিত অন্যান্য জাতগুলো ১০০-১২০ দিন হতে ফল তোলার উপযোগী হয়।

১২. সবজির স্থায়ীত্ব অনেকটা নির্ভর করে পরিপক্কতার ওপর। তাই টমেটোর রঙ হালকা হলুদাভ/লালচে দেখার সাথে সাথেই তুলতে হবে। বেগুন কচি অবস্থায় গুণগত মান ভাল থাকে তাই কচি অবস্থায় তুলতে হবে।

১৩. পরিপুষ্ট ফল রং ধরার আগে সংগ্রহ করে পরিষ্কার ও বাছাই করে টমেটো ঠান্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ৮-১০ দিন রাখা যায়।

১৪. আলু ঘরে মাচায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৩-৪ মাস এবং হিমাগারে ৩.৩°-৩.৪° সে. তাপমাত্রা ও ৮০-৯০% আদ্রতায় ৭-৮ মাস ভালো রাখা যাবে। আলুর জন্য প্রতি ৩ টনে ১ কেজি সেভিন পাউডার ছিটিয়ে দিলে আলু স্বাভাবিক পরিবেশে ভালো থাকে।

১৫. সমস্ত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখতে হবে।

বাঁধাকপি, ফুলকপি, বরবটি, শিম, মূলা, ঢেঁড়শ, পালংশাক ও লালশাক চাষাবাদে দক্ষতা অর্জন করতে পারা

পাঠ-১ ঃ ফুলকপি, বাঁধাকপি, বরবটি, শিম, মূলা, ঢেঁড়শ, পালংশাক, লালশাক চাষাবাদের জন্য জমি। নির্বাচন, জমি তৈরি ও প্রাথমিক সার প্রয়োগ, রোপিত চারা পরিচর্যা এবং সার উপরি প্রয়োগ, সবজি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

প্রাথমিক তথ্য- সবজি চাষে কী ধরনের জমি প্রয়োজন তার বৈশিষ্ট্য

ফসলের নাম	জমির ধরন
ফুলকপি	দোঁআশ-এঁটেল দোঁআশ, উঁচু, মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু।
বাঁধাকপি	দোঁআশ-এঁটেল দোঁআশ, উঁচু, মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু।
বরবটি	দোঁআশ-বেলে দোঁআশ, উঁচু, মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু।
শিম	দোঁআশ-বেলে দোঁআশ, উঁচু, মাঝারি উঁচু।
মূলা	দোঁআশ-বেলে বা এঁটেল দোঁআশ, উঁচু, মাঝারি উঁচু।
ঢেঁড়শ	দোঁআশ-বেলে বা এঁটেল দোঁআশ, উঁচু, মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু।
পালংশাক	দোঁআশ-বেলে বা এঁটেল দোঁআশ, উঁচু, মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু।
লালশাক	দোঁআশ-বেলে বা এঁটেল দোঁআশ, উঁচু, মাঝারি উঁচু ও মাঝারি নিচু।

এ ধরনের জমি নির্বাচন করে উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে বেড় বা সারি করে নিতে হয়। সারের প্রাথমিক ও উপরি প্রয়োগ প্রতি হেক্টরে।

ফসলের নাম	প্রাথমিক সার প্রয়োগ	উপরি প্রয়োগের সার ও প্রয়োগের সময়
	গোবর টিএসপি এমওপি	
ফুলকপি	১০ টন ৪০ কেজি ৪০ কেজি	ইউরিয়া ৮০ কেজি চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর
বাঁধাকপি	৭ টন ৯০ কেজি ৫৫ কেজি	ইউরিয়া ১৩২ কেজি, এমওপি ৫৫ কেজি
শিম	১০ কেজি	সমান ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১০ দিন ১২৫ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি মাথা বাঁধার সময় ও ৭৫ গ্রাম এমও পি দিতে হবে।
মূলা		চারা গজানোর ২৩ সপ্তাহ পর পর ২ বার ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ইউরিয়া ৫০ কেজি ৪৫ পাতা এবং ৫০ কেজি ৮১০ পাতা হলে দিতে হবে। এমওপি ২৫ কেজি ৪৫ পাতা এবং ৭৫ কেজি ১০১২ পাতা হলে দিতে হবে।
ঢেঁড়শ		ইউরিয়া ৬০ কেজি এমওপি ৬০ কেজি চারা লাগানোর ১৫ দিন। পর হতে ২ সপ্তাহ পর পর ৩ বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
পালংশাক		ইউরিয়া ৮০ কেজি চারা গজানোর ১০ দিন পর হতে ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
লালশাক		ইউরিয়া ৪৫ কেজি বীজ বপনের ১০ দিন পর পর ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

২০২২

সার প্রাথমিক ও উপরি প্রয়োগের পরিমাণ প্রতি হেক্টরে এবং উপরি প্রয়োগকৃত সার কত কিস্তিতে দেয়া হবে তা উল্লেখ করা হলো।

বীজ/ চারা রোপণের কতদিন পর হতে ফসল সংগ্রহ করা যায় তা দেয়া হলো

ফসলের নাম	সংগ্রহ সময়
ফুলকপি	রোপণের ৬৫-৭০ দিন হতে
বাঁধাকপি	রোপণের ৭০-৭৫ দিন হতে
শিম	রোপণের ৪০-৪৫ দিন হতে
মূলা	রোপণের ৪০-৫০ দিন হতে
ঢেঁড়শ	রোপণের ৪০-৫০ দিন হতে
পালংশাক	রোপণের ৩০-৩৫ দিন হতে
লালশাক	রোপণের ৩০-৩৫ দিন হতে

প্রয়োজনীয় উপকরণ ১। জমি, ২। বীজ/চারা, ৩। লাঙ্গল, ৪। মই, ৫। আঁচড়া, ৬। কোদাল, ৭। নিড়ানি, ৮। রশি, ৯। টেপ, ১০। ঝুড়ি, ১১। সার, ১২। ঝাঁঝরি, ১৩। খুঁটি, ১৪। খাতা কলম।

কাজের ধাপ

১. উর্বর, সুনিষ্কাশিত, বেঁলে-দোঁআশ, দোঁআশ বা এঁটেল দোঁআশ মাটি উঁচু হতে মাঝারি উঁচু বা মাঝারি নিচু, আলোবাতাসযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

২. জমি উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে সমতল করে আঁচড়া দ্বারা আগাছা বেছে ফেলতে হবে।

৩. প্রাথমিক সার জমির শেষ চাষের পূর্বে সম্পূর্ণ জমিতে সমভাবে ছিটিয়ে চাষের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৪. জমি তৈরির পর সবজিভেদে বেড/মাদা/সারি তৈরি করে চারা রোপণ বা বীজ বপন করতে হবে (তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখ আছে)।

৫. চারার গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেজন্য নিষ্কাশন নালার ব্যবস্থাসহ শুষ্ক অবস্থায় সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. সার উপরি প্রয়োগকালে প্রতিবারই মাটির সাথে নিড়ানি/কোদাল দিয়ে সার মিশিয়ে দিতে হবে এবং সেই সাথে আগাছা উঠায়ে দিতে হবে।

৭. সার দেওয়ার পর মাটিতে 'জো' এর ঘাটতি থাকলে হালকা সেচ দিতে হবে।

৮. শাক সবজি উপযুক্ত অবস্থায় তুলতে হবে এবং তোলার সময় মাঠে জমিতে না রেখে পাত্রে নিয়ে ছায়ায় রাখতে হবে।

৯. খুব ভোরে বা বিকেলে ছায়া সময়ে শাক সবজি সংগ্রহ করতে হবে।

১০. শাক সবজি ঠান্ডা আর্দ্র অবস্থায় ১-২ দিন রাখা যাবে।

১১. সমস্ত কার্যক্রম ব্যবহারিক খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।

সবজি চাষাবাদে পানি সেচ ও নিকাশনের দক্ষতা অর্জন করা

পাঠ-১-২ ঃ সবজি চাষে চাহিদা অনুযায়ী সেচ দেয়া ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করা

প্রাথমিক তথ্য-সবজির জন্য পানি সেচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে খরার সময় সেচ অপরিহার্য। তবে খারিফ সিজনে বিনা সেচে চাষ করা যায়। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের পানি বের করে দিতে হয়।

সবজি চাষে চারা গজানো হতে ফুল ধরা পর্যন্ত সবজির পানির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টি না হলে সবজিতে ফুল না আসা পর্যন্ত ১০ দিন পর পর সেচ দিতে হয়। বেলে দোঁআশ মাটিতে ঘন ঘন সেচ দিতে হয়। মাটি শুকাতে থাকলে মাটির রং হালকা হয়, অন্যথায় গাঢ় থাকে। পানির অভাব হলে গাছের পাতা নেতিয়ে পড়ে। তাই মাটি হালকা রং ধারণ করলে এবং পাতা নেতিয়ে পড়লে সেচ দিতে হয়। গভীর মলী সবজিতে মাটির পানি ধারণ সবজি ক্ষেতে জলাবদ্ধতা হয়, এতে গাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গাছের নিচের পাতা লাল হয়ে ঝরে পড়ে। তাই সেচের বা বৃষ্টির জন্য জমিতে জমা অতিরিক্ত পানি নালা কেটে বের করার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। সেচযন্ত্র, ২। কোদাল, ৩। টেপ, ৪। সুতলি, ৫। কাঠি, ৬। মাটি রাখার পাত্র, ৭। ক্যালকুলেটর, ৮। খাতা কলম।

কাজের ধাপ

১. সবজির ২ সারি বা ২ বেডের মাঝখান দিয়ে নালা করতে হবে। যেখান দিয়ে সেচের পানি প্রবাহিত করা হবে।। নালা একদিকে সামান্য ঢালু হবে।

২. পানি সরবরাহের প্রধান নালা জমি তল অপেক্ষা উচু হতে হবে।

৩. জমি হতে অতিরিক্ত পানি (সেচির বা বৃষ্টির) বের করার নিষ্কাশন নালা তৈরি করতে হবে। যাতে সবজি ক্ষেতে পানি জমে পানিবদ্ধতা হতে না পারে।

৪. সবজির জমির মাটি ভিজিয়ে নিয়ে নলাকার করে তা রিং বানানোর সময় যদি ভেঙ্গে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে, বেলে দোঁআশ। আর যদি ফেটে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে দোঁআশ। আর যদি চল যাটা হয় বুঝতে হবে যে এঁটেল দোঁআশ। ভিজা দোঁআশ মাটির নলাকার তৈরি করলে কোনরুপ দাগ পড়বে না এবং এটেল মাটিতে কোন দাগ পড়ে না এবং চকচকে দেখায়।

৫. বেলে দোঁআশ হতে দোঁআশ, দোঁআশ হতে এঁটেল দোঁআশ, এঁটেল দোঁআশ হতে এঁটেল মাটির ক্রমান্বয়ে পানি। ধারণ ক্ষমতা বেশি।

৬. মাটির ধরন দেখে পানি ধারণ ক্ষমতা দেখে সেচ দিতে হবে। মাটি এঁটেল হতে ক্রমান্বয়ে যত বেলে দোঁআশের দিকে যাবে তত ঘন ঘন সেচ দিতে হবে।

৭. নিচের এ সূত্র দ্বারা জমিতে বিদ্যমান রসের পরিমাণ জেনে, যদি ৭০%-এর কম হয় তাহলে সেচ দিতে হবে। তবে ৫০% এর কম হলে অবশ্যই সেচ দিতে হবে। নোটঃ মাঠ হতে নেওয়া মাটির ওজন = ১০০০ গ্রাম (ফসলের শেকড় গভীরতা হতে ধরা যাক শুকানোর পর প্রাপ্ত ওজন = ৬০০ গ্রাম

সূত্রঃ মাটিতে পানির পরিমাণ

$$(\%) = \frac{\text{মাঠ হতে নেয়া ১ কেজি মাটির ওজন} - \text{চুলায় শুকানোর পর ঐ মাটির ওজন}}{\text{শুকানো মাটির ওজন}} \times \text{১০০}$$

$$\text{যেমন} = \frac{\text{১০০০ গ্রাম - ৬০০ গ্রাম}}{\text{৬০০ গ্রাম}} \times \text{১০০} = \frac{\text{৪০০}}{\text{৬০০}} \times \text{১০০} = \text{৬৬.৬৬}\%$$

মাটিতে রসের পরিমাণ ৬৬.৬৬%। এমতাবস্থায় সেচ দিতে হবে।

৭। মাটির রঙ হালকা বা সাদাটে দেখা গেলে সেচ দিতে হবে।

৮। মাটিতে দৃশ্যত পানি বন্ধ হলে বা গাছের গোড়ায় পানি জমা দেখলে পানি বের করে দিতে হবে।

৯। সমস্ত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখতে হবে।

কুমড়াজাতীয় সবজির রোগবালাই আক্রমণের লক্ষণ দেখে রোগ শনাক্ত করা

পাঠ-১-৩ঃ কুমড়াজাতীয় সবজির রোগবালাই আক্রমণের লক্ষণ দেখে রোগ শনাক্ত করা, আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ ও হার্বোরিয়াম তৈরি করা।

প্রাথমিক তথ্য- কুমড়াজাতীয় সবজি মোট সবজির একটি বিরাট অংশ দখল করে আছে। সব সবজিগুলোর রোগসমূহ প্রায় একই ধরনের। রোগগুলো হলো পাউডারি মিলডিউ, ডাউনি মিলডিউ, পাতার দাগ, এনথ্রাকনোজ, নেতিয়ে পড়া, মোজাইক, ফল পচা ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞের মতে সবজিতে বাংলাদেশে প্রায় ২০০ ধরনের রোগ দেখা যায় এবং শুধু রোগের কারনে ১২-১৫% সবজি ও ফল প্রতি বছর নষ্ট হয়।

পাউডারি মিলডিউ রোগে পাতায় উপরের দিকে সাদা পাউডারের ন্যায় আস্তর পড়ে। শেষে পাতা শুকিয়ে যায়। ডাউনি মিলডিউ রোগে পাতার নিচ দিকে ধূসর, বেগুনী গোলাপী দাগ পড়ে। আক্রান্ত পাতা ও গাছ দুর্বল হয়ে মারা যায়, ফল পাকে না। পোড়াভাব হয়। নেতিয়ে পড়া রোগে পাতা আংশিক নরম হয় এবং পুরো গাছ হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত গাছের পাতায় বাদামি বা কাল দাগ পড়ে, শাখা-প্রশাখায় সরু গাঢ় কাল দাগ পড়ে, যা কান্ডের চারিদিকে ঘিরে ফেলে। এর ফলে আক্রমণের স্থান হতে উপরের দিকের অংশ মারা যায়। মোজাইক রোগ পাতায় হালকা ও গাঢ় সবুজের সংমিশ্রণে মোজাইক সৃষ্টি হয়। পাতা নিচের দিকে গুটিয়ে কুঁকড়িয়ে যায়। ফল কুঁচকায়ে যায়।

এ সমস্ত লক্ষণ দেখার জন্য কুমড়ার জাংলায় বা মাঠে কুমড়ার গাছে লক্ষণ মিলিয়ে রোগাক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত রোগাক্রান্ত পাতা নেতিয়ে নিয়ে টানটান/সোজা করে ড্রইং শিট বা মোটা অথচ শক্ত কাগজের পাতা দিয়ে সমতল টেবিলের উপর চাপ দিয়ে ২-৩ দিন রেখে দিতে হবে। পাতা শুকায়ে গেলে ব্যবহারিক খাতায় শুকানো সোজা করা পাতাটি আটকে নির্দেশনা লিখতে হবে। এটাকে হার্বোরিয়াম শীট বলে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। রোগাক্রান্ত কুমড়া গাছের পাতা, ২। চাকু/কাঁচি, ৩। চিমটা বা ফরসেপ, ৪। স্বচ্ছ গাম টেপ, ৫। কাঠ পেন্সিল, ৬। ড্রইং শিটযুক্ত ব্যবহারিক খাতা, ৭। ডাল/ট্রে, ৮। ট্যাগ, ৯। হার্কোরিয়াম শীট, ১০। কাগজ কলম।

কাজের ধাপ

১। কুমড়া চাষের জমিতে যেতে হবে এবং পাতায় রোগের লক্ষণ দেখে মেলাতে হবে।

পাউডারি মিলডিউ	পাতার উপরের দিকে সাদা সাদা পাউডারের ন্যায় ছোট ছাপে দেখা যাবে। বেশি আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে যাবে।
ডাউনি মিলডিউ	পাতার নিচ দিকে ধূসর, বেগুনী বা গোলাপী দাগ দেখা যাবে। আক্রান্ত পাতা ও গাছ দূর্বল হবে এবং মারা যাবে। আক্রান্ত গাছের ফল শক্ত হয়ে থাকে, ফল বাড়ে না এবং পাকে না।
এনথ্রাকনোজ	আক্রান্ত গাছের পাতায় বাদামি বা কাল দাগ পড়ে, দাগ দেখতে চোখের ন্যায়, দাগের কিনারা উচু এবং মাঝে বসা হয়।
মোজাইক	পাতায় হলুদ ও সবুজ এর সংমিশ্রিত ছিট ছিট দাগ পড়ে।
নেতিয়ে পড়া	পাতা হলুদ হয়ে কিনারা দিয়ে পোড়াভাব হয়। পাতা নেতিয়ে পড়ে এবং পুরো গাছ মারা যায়।

২। রোগের লক্ষণের সাথে মিলিয়ে পাতার বোঁটাসহ চাকু বা কাঁচি দিয়ে কেটে ডালা/ট্রেতে করে টান টান অবস্থায় ছায়ায় রাখতে হবে। তবে রোগের লক্ষণ অনুসারে পাতার বোটায় ট্যাগ লাগাতে হবে।

৩। ছায়ায় পাতাটি ১৫-২০ মিনিট রাখলে নেতিয়ে নরম হবে। রোগের লক্ষণ দেখে খাতায় লিখতে হবে।

৪। নরম পাতাটি ২টি ড্রইং শিট বা শক্ত কাগজের মাঝখানে ফেলে সমতল টেবিলের উপর ভারা দিয়ে ২/৩ দিন রাখলে শুকায়ে টান টান হয়ে থাকবে। পাতাটি অবশ্যই ছায়ায় রাখতে হবে। প্লাইউড, পাতলা কাঁচ ভারা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ভারা/ওজন বেশি হলে পাতা/নমুনা থেতলে যেতে পারে।

৫। এরপর শুকনো, সবুজ রঙের পাতাটি ব্যবহারিক খাতায় ড্রইংশিটে রেখে স্বচ্ছ টেপ দিয়ে আটকাতে হবে বা। হার্বোরিয়াম শীটে স্বচ্ছ টেপ দিয়ে আটকাতে হবে।

৬। পাতা আটকানোর পর নিচে রোগের নামসহ ফসলের নাম সংগ্রহ স্থান, তারিখ ও ঠিকানা লিখতে হবে।

৭। পাতা সংগ্রহ ও দুই কাগজের শিটের মাঝখানে রেকে প্লাইউডের ন্যায় করার সময় খুব সতর্ক থাকতে হবে, যাতে পাতাটি ছিড়ে না যায় এবং রোগের নামসহ ট্যাগটি লাগানো হয়।

৮। মাঠে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি তা জানা যাবে।

৯। সমস্ত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখতে হবে।

বেগুণ, টমেটো, গোলআলুর রোগবালাই আক্রমণের লক্ষণ দেখে রোগ শনাক্ত করা

পাঠ-১-২ ঃ বেগুন, টমেটো, গোলআলুর রোগবালাই আক্রমণের লক্ষণ দেখে রোগ শনাক্ত করা ও রোগাক্রান্ত পাতা সগ্রহ করা।

প্রাথমিক তথ্য- বেগুনের গোড়া পঁচা একটি মারাত্মক রোগ। এ রোগে বেগুনের পাতা ফ্যাকাশে থেকে হলুদাভ এবং পরবর্তীতে শুকিয়ে বাদামি রঙ ধারণ করে। গাছের গাড়া বিবর্ণ হয় ও পঁচে যায়। টমেটোর নেতিয়ে পড়া রোগের লক্ষণ কুমড়া জাতীয় সবজিতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তারই মত। আলুর মড়ক হলে গাছের পাতার কিনারা বা আগা হতে নিচের দিকে পোড়াভাব ধারণ করে এবং পাতা মারা যায়। এমনকি কাণ্ড, শাখা প্রশাখাসহ সম্পূর্ণ গাছ কালো হতে থাকে এবং পোড়াভাব ধারণ করে। পরবর্তীতে সম্পূর্ণ ক্ষেত ধ্বংস হয়ে যায়। শুকনো ২০২২

পঁচা রোগে আলুর ত্বক ভাঁজ ভাঁজ বলয় তৈরি করে কুঁচকে যায় এবং আস্তে আস্তে শুকায়ে যায়। আক্রান্ত ত্বকে শাঁসে আক্রমণ করে সেখানে নরম করে সেখানে ফেলে। আলুর শাঁস পঁচা শুরু হলে চাপ দিলে পুঁজের ন্যায় বের হয় ও দুর্গন্ধ ছড়ায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। বেগুন, টমেটো ও আলু গাছের আক্রান্ত পাতা, ২। কাঁচি/চাকু ৩। ট্রে/ডালা ৪। ফরসেফ ৫। খাতাকলম

কাজের ধাপ।

২। বেগুন, টমেটো ও আলুর জমিতে ফসলের বৃদ্ধির বিভিন্ন বয়সে/পর্যায়ে যেতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখে পাতার সাথে মিলিয়ে শনাক্ত করে কাঁচি/চাকু দিয়ে পাতা ভাঁটা কাটতে হবে।

রোগের নাম	রোগের লক্ষণ
বেগুনের গোড়া পঁচা	পাতা ফ্যাকাসে হলুদাভ হয়ে শুকিয়ে যায়, গোড়া বিবর্ণ হয়ে পচে যায়।
টমেটোর নেতিয়ে পড়া	পাতা হলুদ হয়, কিনারা দিয়ে পোড়াভাব হয়, পাতা আংশিক নরম হয় ও পুরো গাছ হঠাৎ মারা পড়ে।
আলুর মড়ক	পাতার কিনারা ও আগা হতে মরে ও পাতা পোড়াভাব হয়। পরবর্তীতে কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা কালো হয় ও পোড়াভাব ধারন করে।
আলুর শুকনো পচা	আলুর ত্বকে ভাঁজ ও বলয় হয়ে কুঁচকে শুকিয়ে যায়। ত্বক আলুর শাঁস থেকে আলাদা হয়ে যায়।
আলুর নরম পচা	আলুর ত্বক পঁচে যায় ও আক্রান্ত স্থানের নিচে আলুর শাঁস নরম হয়ে যায়। চাপ দিরে পুজের ন্যায় বের হয় এবং পচা দুর্গন্ধ বের হয়।

৩। রোগের লক্ষণের সাথে মিলিয়ে প্রতিটি আলাদা করে নিয়ে খাতায় লিখতে হবে। এবাবে রোগাক্রান্ত পাতাগুলো শনাক্ত করবে।

৪। এসব ফসলি জমিতে সম্পূর্ণ উৎপাদন সময়কাল পরিদর্শন করে কোন কোন সময় কোন কোন রোগ আক্রমণ করে এবং কোন সময় তীব্রতা বেশি হয় তা নির্ণয় করা যাবে।

বাঁধাকপি, ফুলকপি, বরবটি, শিম, মূলা, ঢেঁড়শ, পালংশাকে রোগবালাই আক্রমণের লক্ষণ শনাক্ত করা

পাঠ-১-৩ ঃ বাঁধাকপি, ফুলকপি, বরবটি, শিম, মূলা, ঢেঁড়শ, পালংশাকে রোগবালাই আক্রমণের সক্ষণ শনাক্ত করা, রোগাক্রা পাতা সংগ্রহ ও হার্বোরিয়াম তৈরি করা

প্রাথমিক তথ্য- বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলায় অলটারনারিয়া ব্রাইট রোগ পাতায় কাল ও ধূসর দাগ তৈরি করে। কাল দাগ ছোট ও গোলাকার হয়। ধূসর দাগ আয়তনে বড় ও হালকা বর্ণের হয়। উভয় দাগই বলয় তৈরি করে। তীব্র আক্রমণে পাতা, ডাল, ফল ধীরে ধীরে শুকিয়ে মারা যায়। পাতা ঝরে যায়। কপি, বরবটি, শিম, ঢেঁড়শে শেকড় পঁচা রোগে শেকড় এবং কাণ্ড কাল হয়ে পঁচে যায়, পাতার উপর ধূসর বাদামী দাগ পড়ে। আস্তে আস্তে পুরো পাতা আক্রান্ত হয়। পালংশাকে পাতার দাগ রোগে পাতায় ছোট ছোট বাদামী দাগ পড়ে, যা ক্রমান্বয়ে বড় হতে থাকে এবং পাতা হলুদ হতে থাকে। ডাউনি মিলডিউ রোগ শিম, পালংশাক, কপি, কুমড়া জাতীয় সবজিতে আক্রমণ করে (কুমড়াজাতীয় সবজিতে রোগের লক্ষণ উল্লেখ করা হয়েছে।)

২০২২

প্রয়োজনীয় উপরকণ

১. বাঁধাকপি, ফুলকপি, বরবটি, শিম, মূলা ও ঢেঁড়শ ফসলের আক্রান্ত পাতা, ২। চাকু/কাঁচি, ৩। চিমটা বা । ফরসেফ ৪। ট্যাগ ৫। স্বচ্ছ টেপ, ৬। হার্বোবিয়াম শিট, ৭। ডালা/ট্রে, ৮। খাতা- পেন্সিল।

কাজের ধাপ

১। বাঁধাকপি, ফুলকপি, বরবটি, শিম, মূলা ও ঢেঁড়শ ফসলের জমিতে নিয়ে আক্রান্ত পাতা, কাণ্ড বা গাছের সাথে রোগের লক্ষণ মেলাতে হবে।

রোগের নাম	রোগের লক্ষণ
বাঁধাকপি, ফুলকপি ও মূলার অলটারনারিয়া বাইট	পাতায় কাল ও ধূসর দাগ তৈরি করে। কাল দাগ গোলাকার ও ছোট এবং ধূসর দাগ বড় ও হালকা বর্ণের হয়। দাগগুলো বলয় তৈরি করে, ফলে পাতা শুকায় ও ঝরে পড়ে।
কপি, বরবটি, শিম ও ঢেঁড়শে শেকড় পঁচা রোগ	গাছের কাণ্ড ও শেকড় কাল হয়ে পচে যায়, পাতায় ধূসর বাদামী দাগ পড়ে ও পাতা সম্পূর্ণ আক্রান্ত হয়।
পালংশাকে পাতার দাগ রোগ	পাতায় ছোট ছোট বাদামী দাগ পড়ে, দাগ বড় হয়ে পাতা হলদে করে।

২। রোগের লক্ষণ দেখে আক্রান্ত কাণ্ড গাছ বা পাতার বোঁটা কেটে ট্যাগে লিখে তাতে বাঁধতে হবে।

৩। আক্রান্ত সংগৃহীত নমুনা ডালায়/ট্রেতে করে ছায়ায় ১৫-২০ মিনিট রাখতে হবে।

৪। আক্রান্ত নমুনা নেতিয়ে গেলে টান টান করে দুটি শিট কাগজের ভেতরে বা ভাঁজে স্যান্ডউইচের ন্যায় করে সমতল কাঠের উপর রেখে হালকা চাপা দিয়ে ছায়ায় ২-৩ দিন রাখতে হবে।

৫। চাপ দেওয়া নমুনাটি ২/৩দিনে শুকিয়ে গেলে হার্বোরিয়াম শীটে স্বচ্ছ টেপ দিয়ে আটকাতে হবে।

৬। প্রতিটি নমুনার নিচে রোগের নাম লিখতে হবে। সেইসাথে তারিখ, স্থান ও ঠিকানা লিখতে হবে।

৭। হার্বোরিয়াম শিটটি সম্পূর্ণভাবে সেলোফিন কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে দিলে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যাবে।

সবজির রোগ দমনে দক্ষতা অর্জন করা

পাঠ-১-২ ঃ সবজির ফসলের রোগের ঔষধ সম্পর্কে জানা ও দক্ষভাবে সবজি ফসলে ঔষধ প্রয়োগ করা

প্রাথমিক তথ্য- শাকসবজির রোগসমূহ সাধারণত ৩ ভাগে বিভক্ত যথা- ছত্রাকজনিত, ব্যাকটেরিয়াজনিত ও ভাইরাসজনিত। এছাড়াও কৃমিজনিত, শরীরতাত্তিক ও মাইকোপ্লাজমাজনিত রোগ আছে।

ছত্রাকজনিত রোগ- বীজ, পানি, যন্ত্রপাতি, মানুষের কাজকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ায় ও গাছের আক্রান্ত অংশ দিয়ে গাছে আক্রমণ করে।

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ-মাটিতে পঁচনরত জৈব পদার্থে ও খাদ্য বস্তুর মধ্যে থাকে। গাছের কোন ছিদ্র বা আঘাতপ্রাপ্ত স্থান দিয়ে প্রবেশ করে।

ভাইরাসজনিত রোগ-জাবপোকা, লিফ হপার, হোয়াইট ফ্লাই ইত্যাদি রস শোষক পোকার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

ছত্রাকনাশক দ্বারা ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ দমনে আক্রান্ত গাছ নিধন

২০২২

ব্যাকটেরিয়া বিস্তারে সহায়তাকারী গুবরে পোকা, কাটুই পাকা, ক্রিকেট, উই পোকা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অনুরুপ ভাইরাসজনিত রোগ দমনে ভাইরাস বিস্তার করে এমন পোকা যেমন- জাব পোকা, হপার, ফ্লাই ইত্যাদি দমন করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। স্প্রে মেশিন ২। দস্তানা ৩। এপ্রোন, ৪। চশমা, ৫। ক্যাপ, ৬। গামবুট, ৭। বাতাস নির্দেশনা পতাকা, ৮। মাস্ক, ৯। বালতি/চাড়ি, ১০। বালাইনাশক ১১। কাঠি ১২। বালাইনাশক মাপার বিকার

কাজের ধাপ

১. স্প্রে মেশিনটি পরীক্ষা করে নিতে হবে, যাতে স্প্রে করায় সমস্যা না হয়। যেমন- পাম্প ঠিকমত হয় কিনা, নজল। দিয়ে স্প্রে সঠিকভাবে বের হয় কিনা, ঘাড়ে নেয়ার ফিতা ঠিক আছে কিনা।

২. স্প্রে করতে হলে মেশিনের চারভাগের ১ ভাগ পরিষ্কার পানি দিয়ে ভরতে হবে।

৩. বালাইনাশক যতটুকু প্রয়োজন তা মেপে ৪ ভাগের ১ ভাগ মেশিনে ঢেলে কাঠি দিয়ে নড়াচাড়া করতে হবে।

৪. এপর চারভাগের ১ ভাগ পরিষ্কার পানি মেশিনে দিয়ে নড়াচাড়া করতে হবে।

৫. এবার মেশিনের নির্ধারিত দাগ পর্যন্ত পরিষ্কার পানি দিয়ে বাকী বালাইনাশক ঢেলে ভালভাবে মেশাতে হবে।

৬. বালাইনাশকের পাত্রের মুখ ভালভাবে বন্ধ করতে হবে।

৭ স্পে মেশিনে ঠিকমত পাম্প করে নিতে হবে।

৮. এবার স্প্রে মেশিনটি কাঁধে নিয়ে যে জমিতে স্প্রে করতে হয় তার আইলে দাঁড়ায়ে পতাকার কাঠি পুঁতে, ধুয়া দিয়ে বাতাসের দিক জেনে বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করতে হবে।

৯. জমির একপ্রান্ত পর্যন্ত স্প্রে করে নজেল বন্ধ করে যে স্থানটুকু জুড়ে স্প্রে করা হয়েছে তা বাদ দিয়ে আবার বাতাসের অনুকূলে এসে স্প্রে শুরু করতে হবে।

১০. ব্যবহারিক খাতায় স্প্রে মেশিন ব্যবহার করার ধাপসমূহ এবং কখন কোন জমিতে কোন বালাইনাশক কি হারে ব্যবহার করা হলে তা লিখে রাখতে হবে।

সবজিতে পোকার আক্রমণের লক্ষণ দেখে পোকা শনাক্তকরণ

পাঠ-১ ঃ সবজিতে পোকার আক্রমণের লক্ষণ দেখে পোকা শনাক্ত করা

প্রাথমিক তথ্য- সবজিতে বিভিন্ন ধরনের পোকা আক্রমণ করে ক্ষতিগ্রস্থ করে। আক্রমণের লক্ষণ/ধরন বিবেচনা করে পোকামাকড়গুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন-

(ক) মাজরা পোকা মাছি ও প্রজাপতির শুককীট গাছের কচি ডগা, কাণ্ড, ফল ফুটো করে ভিতরে ঢুকে ভিতরের অংশ খায়। এতে ডগা, কাণ্ড, ফল নষ্ট হয়ে যায়। এ জাতীয় আক্রমণকে মাজরা ও ফলের মাছি পোকা বলা হয়।

(খ) শোষক পোকা-গাছের কচি ডগা, পাতা, ফলের রস চুষে খাওয়ার ফলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, পাতা বিবর্ণ হয়, কুঁকুড়িয়ে যায়, ফুল শুকিয়ে যায়। এ জাতীয় আক্রমণ হয় জাব পোকা, গান্ধি পোকা, থ্রিপস, লাল মাকড়, পাতা ফড়িং, ঘোড়া পোকা দ্বারা।

(গ) চিবানো পোকা- গাছের পাতা, ডগা, কাণ্ড , ফল কামড়ায়ে বা চিবিয়ে খায় ও নষ্ট করে। গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, ফলন কমে। এজাতীয় আক্রমণ হয় বিছা/লেদা পোকা, গুবরে পোকা দ্বারা।

(ঘ) মাটিতে বসবাসকারী পোকা-সবজির চারা বা অল্প বয়ক/কচি গাছ মাটি সমতলে কেটে বিনষ্ট করে। এ জাতীয় আক্রমণ হয় উই, কাটুই পাকা, ক্রিকেট পোকা দ্বারা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। পোকা ধরার জাল, ২। আক্রান্ত গাছের চারার/কাণ্ডের/ডগার নমুনা ৩। ইনসেক্ট কিলিং জার ৪। ফরসেপ ৫। ড্রইং পেপার, ৬। পেন্সিল, ৭। রাবার, ৮। স্কেল, ৯। অগার/নিড়ানি, ১০। পোকা রাখার পলিথিন ব্যাগ, গাস/পাস্টিক পাত্র, ১১। খাতা কলম।

কাজের ধাপ

১. পোকা ধরার জাল, কিলিং জার, পলিথিন প্যাকেট, প্লাস্টিক বৈয়াস মাটি খুড়ার জন্য অগার/নিড়ানি নিয়ে সবজি ক্ষেতে যেতে হবে।

২. আক্রমণ দেখে জাল ব্যবহার করে পোকা ধরতে হবে। গাছের গোড়া কাটা থাকলে মাটি খুড়ে পোকা ধরতে হবে।

৩. পোকা ধরে সাবধানে ইনসেক্ট কিলিং জারে রেখে ঢাকনা বন্ধ রাখলে ২/৩ মিনিটের মধ্যে পোকা মারা যাবে। জার থেকে পোকা বের করে আক্রমণের লক্ষণ দেখে পোকাকে শ্রেণিভুক্ত করতে হবে।

৪. পাকাগুলোর আরও পর্যবেক্ষণের দরকার হলে স্বচ্ছ কাঁচের/পাষ্টিকের পাত্রে রাখা যেতে পারে। পাকাগুলো শনাক্ত করে ড্রইং শিটে চিত্র আঁকতে হবে।

৫. প্রয়োজনে পোকার ছবি সংগ্রহ করেও পোকার সাথে মিলিয়ে শনাক্ত করা যাবে।

৬. কাজের প্রতিটি ধাপ ব্যবহারিক খাতায় লিখতে হবে।

সবজিতে পোকা দমনের ব্যবস্থাকরণ

পাঠ-১ ঃ সবজিতে পোকা দক্ষভাবে দমনে ফেরোমেন ও বিষটোপ / ফাঁদ ব্যবহারকরণ

প্রাথমিক তথ্য- ঘ্রান সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থ স্ত্রী পোকারা মিলনের জন্য বাতাসে ছাড়ে যা শুঁকে পুরুষ পোকারা টের পায় এবং চলে আসে, তাই হলো সেক্স ফেরোমানে। কৃত্রিম উপায়ে এটি তৈরি করা হয়েছে। এটি ব্যবহার করে ধোকা দিয়ে বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী এবং কুমড়াজাতীয় সবজির ফলের মাছি পোকাকে আটকানো হয় এবং তারা মারা পড়ে। লাউ, কুমড়া, চালকুমড়া, করলা, কাঁকরোল, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, পটল ইত্যাদিতে ফলের মাছি পোকা কচি ফলের গায়ে ছালের নিচে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কিড়া ভেতরে সুরঙ্গ করে শাঁস খায় এবং ফল নষ্ট করে দেয়। এক্ষেত্রে ছোট মাটির সানকি বা সারা বা ঢাকনিতে ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া কুচি কুচি করে কেটে থেঁতলে বা পিষে কাই করে তার সাথে ১-২ ফোটা ডিডিভিপি বা ডিপটেরেক্স মিশিয়ে ৫০-১০০ মিলি. পানি দিতে হবে। এই পাত্রটি সবজি ক্ষেতে উঁচু স্থানে বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। সবজি ক্ষেত, ২। সেক্স ফেরোমানে ৩। স্বচ্ছ প্লাষ্টিক বয়েম, ৪। একটি রাবার টিউব, ৫। এক টুকরো গুনা (তার) ৬। ৩-৪ ফুট লম্বা দু'টুকরো বাঁশ ৭। চাকু ৮। সাবান গোলা পানি, ৯। মাটির সানকি/সারা ১০। ৩-৪ ফুট লম্বা ৩/৪টি গিটওয়ালা কাঁচা বাঁশ ১১। সূতলি ১২। পাকা মিষ্টি কুমড়া ১৩। পানি ১৪। বালাইনাশক।

কাজের ধাপ

ফেরোমোন ফাঁদ

১. একটি স্বচ্ছ বড় পাষ্টিকের বোয়েম নিয়ে তার দুই পাশে সামনা সামনি ত্রিকোনাকার করে কেটে ফাঁকা জানালার। ন্যায় করতে হবে।

২. বোয়েমের নিচে ৩-৪ ইঞ্চি পরিমাণ সাবান পানি দিতে হবে।

৩. ফেরোমোনটি তুলা ও সুতা দিয়ে পেঁচিয়ে গুটি বানিয়ে রাবার নলের মধ্যে দিয়ে বোয়েমের মুখে ছিদ্র করে গুনা বা তার দিয়ে আটকিয়ে তা ঝুলায়ে দিতে হবে।

৪. বোয়েমের ভিতরে এমনভাবে ঝুলবে যাতে জানালা বরাবর ফেরোমোনটি থাকে।

৫. এই বোয়েমটির যে দুই পাশে কাটা নেই সে দিকে বাঁশের খুঁটির সাথে ধরে গাছের উচ্চতা পর্যায়ে খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে।

৬. পুরুষ পোকা গন্ধ পেয়ে আকৃষ্ট হয়ে এর ভিতরে ঢুকে পানিতে পড়ে মারা যাবে।

বিষ টোপ / বিষ ফাঁদ

১. একটি ছোট মাটির সানকি বা সারা নিতে হবে এবং এর উপরে ঢাকনার ন্যায় কাজ করবে এমন আরও ১টি ঢাকনা নিতে হবে।

২. ৩-৪ ফুট লম্বা ও ৩-৪টি গিটযুক্ত একটি টুকরো কাঁটা বাঁশ নিয়ে উপরের দিকে ২টি গিট পর্যন্ত ৩ ভাগ করে ফাড়তে হবে যাতে ফাঁক করে মাটির সারাটি বসানো যায়। বাঁশের ফাড়া অংশটি সারা /সানকিকে শক্ত করে আটকে রাখবে। এছাড়াও ফাড়া অংশের মাথায় ৩টি ভাগকে সুতা/রশি/গুনা দিয়ে বাঁধতে হবে।

৩. এখন ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়া নিয়ে কুচি কুচি করে কেটে থেঁতলে বা পিষে নিয়ে তার সাথে ১-২ ফোটা ডিডিডিপ বা সামান্য ডিপটেরেক্স মিশিয়ে দিতে হবে।

৪. বিষ মিশানো মিষ্টি কুমড়াকে জমিতে পুঁতে দেওয়া বাঁশের ফাড়া অংশের মধ্যে সানকিতে বসিয়ে তাতে দিতে হবে এবং এর ১৫-২০ সেমি. উপরে ঢাকনা হিসেবে বড় সারাটি দিতে হবে, যাতে বৃষ্টিতে ধুয়ে বা রোদে শুকিয়ে যেতে না পারে।

৫. ছিকা বানিয়েও ৬-১০ মিটার পর পর সবজি ক্ষেতে বিষ ফাঁদ দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হবে।

৬. গরমের দিনে ২ দনি এবং শীতের দিনে ৪ দিন পর পাত্রের বিষ পাল্টায়ে দিতে হয়।

৭. প্রতিদিন সকালে দিয়ে পাত্রে পোকার পরিমাণ দেখে প্রয়োজনে পোকা সংগ্রহ করে ফেলে দিতে হবে। তবে কুঁড়ি ও ফুল আসা শুরু হলেই ক্ষেতে বিষফাঁদ ব্যবহার করা শুরু করতে হয়।

৮. কাজের প্রতিটি ধাপ ব্যবহারিক খাতায় লিখতে হবে।

২০২২

এসএসসি (ভোকেশনাল)

দ্বিতীয় পত্র (দশম শ্রেণি)

তাত্ত্বিক

তাত্ত্বিক
প্রথম অধ্যায়
বাংলাদেশে সবজি চাষের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে বিভিন্ন সবজির বর্তমান ও অতীত পরিসংখ্যান

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ শাক সবজি খেয়ে আসছে। তবুও বাংলাদেশের জনগণ এখনো সবজির খাদ্যমান ও অন্যান্য গুনাগুণ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না। বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনে জমির ব্যবহার ও প্রকৃত উৎপাদন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কেননা মানুষ প্রয়োজন মেটাতে বা সখের বশবর্তী হয়ে বাড়ির আশেপাশে, ঘরের চালে, বাড়ির ধারে, আনাচে কানাচে, গাছের উপর বাইয়ে দিয়ে সবজি উৎপাদন করে থাকে। অনেক সময় জমির আইলে, সাথী ফসল হিসেবে বা মিশ্র ফসল হিসেবে সবজি চাষ হয়। এরূপ অবস্থায় সবজির জমি ও উৎপাদনগত সঠিক তথ্য পাওয়া কষ্টসাধ্য। বাংলাদেশে ঋতু বৈচিত্রের কারণে কিছু কিছু সবজি নির্দিষ্ট মৌসুমে সফলভাবে চাষ হয়। আবার কিছু কিছু সবজি সারাবছরই চাষ হয়। সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ১০০০০ রকমের শাক সবজির পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশে প্রায় ৬০টি শাক সবজি পাওয়া যায়। এগুলোকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য তাদের অংশগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভাজন করা হয়। যেমন- পাতাজাতীয়, মূলজাতীয়, কন্দজাতীয়, কচুজাতীয়, শিমজাতীয়, কপিজাতীয়, কুমড়াজাতীয়, ফলজাতীয় ইত্যাদি। উৎপাদন মৌসুম হিসেবে শাক-সবজিকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- শীতকালীন, গ্রীষ্মকালীন ও বারমাসি। শাক সবজির কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন- দ্রুত বর্ধনশীল, স্বল্প সময়ে উৎপাদন করা যায় এবং সহজে আহারপোযোগী হয়, একর/হেক্টর প্রতি ফলন অন্যান্য খাদ্যশস্য অপেক্ষা অনেক বেশি, অনেক সময় সেচ ছাড়াই জন্মানো যায়, ইত্যাদি।

শাক সবজি আহারের সাথে মানুষের স্বাস্থ্যের বিরাট সম্পর্ক আছে। যারা যত বেশি শাক-সবজি খাবে, তাদের শরীরে রোগবালাই তত কম হবে। প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণ শাক সবজি খেলে পুষ্টিহীনতা দূর হবে এবং অন্ধত্ব, রাতকানা, এ্যানিমিয়া, গলগন্ড, স্ক্যাব প্রভৃতি সমস্যা হতে রেহাই পাবে। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রতিদিন কমপক্ষে ২০০-২২০ গ্রাম সবজি খাওয়া উচিত, কিন্তু বাংলাদেশে এর বিপরীতে খায় মাত্র ৩০-৩৫ গ্রাম। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৩.২৫ লাখ হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হচ্ছে। এ জমি থেকে প্রায় ৪২.৫৫ লাখ মে.টন সবজি উৎপাদন হচ্ছে। অথচ বর্তমানে চাহিদা প্রায় ১১০ লাখ মে.টন। এ চাহিদা পূরণ করতে বর্তমান উৎপাদন প্রায় তিনগুণ বাড়াতে হবে।

চিত্র ঃ ভিটামিন 'এ' র অভাবে অন্ধত্ব

চিত্র ঃ গলগন্ড

সবজি চাষাধীন জমি ও উৎপাদন পরিসংখ্যান

সারণি ঃ সবজি চাষাধীন জমি ও উৎপাদন পরিসংখ্যান।

বছর	সবজি চাষাধীন জমি (হেক্টর)	সবজি উৎপাদন (টন)
১৯৯৮-৯৯	২৩১৫৭৯	১৪৩৩০০০
১৯৯৯-০০	২৪৬৫৫৯	১৫৫৯০০০
২০০০-০১	২৫৩৪৪১	১৫৭৮০০০
২০০১-০২	২৪৮৯৮৮	১৫৬৭০০০
২০০২-০৩	২৭৪১৩৮	১৭৮০৭৬৫
২০০৩-০৪	২৭৪১০০	১৭৪০৮০০
২০০৪-০৫	২৮৪৯৪১	১৮৮৪৮৩০
২০০৫-০৬	৩০২৪৪৯	২০৫৪১৪০
২০০৬-০৭	৩১১০০০	৪১০৫০০
২০০৭-০৮	৩২৫৫০০	৪২৫৫০৫০

আগামীতে সবজির প্রয়োজন ও চাহিদা নিম্নরূপ বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের সবজি খাওয়ার অভ্যাস বাড়ছে। ফলে চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। দেশের বর্তমান ও আগামীতে সবজির চাহিদা নিচের সারণিতে দেয়া হলো।

বৎসর	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	চাহিদা (মিলিয়ন) টন
২০০৫	১৩৯.১০	১০.৪৩
২০১০	১৫৩.৪৪	১১.২০
২০১৫	১৬২.৯০	১১.৮৯
২০২০	১৭২.৯০	১২.৬০

বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে সবজি চাষের অধীনস্থ জমি এবং এর উৎপাদন নির্ভুলভাবে জানার কোনো উপায় নাই। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গৃহস্থালীতে সবজির চাষ হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে উৎপাদিত সবজি ও জমির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। তবুও নিচে একটি তথ্য দেয়া হলো -

সবজি	এলাকা (০০০ একর)	উৎপাদন (০০০ মে. টন)
গ্রীষ্মকালীন	১৭৫	৩৬৯
শীতকালীন	২৭২	৭৯৬
মোটে আলু (% মিষ্টি আলু)	৩২৬	১৪৩৮
মিষ্টি কুমড়া	১১১৪	৪২৭
অন্যান্য	পারিবারিক	প্রায় ১২২

২০২২

উৎপাদন ৩০০ মে. টন)।। ১৭৫

। ২৭২

১৪৩৮ ১৯১৪ পারিবারিক ৪২৭ প্রায় ১২২

অন্যান্য

বিভিন্ন প্রকার সবজি

ক. শীতকালীন সবজি ও আলু, বেগুণ, টমেটো, মূলা, বাঁধাকপি, ফুলকপি, কচু, মিষ্টি কুমড়া, শিম, পালংশাক ইত্যাদি।

খ. গ্রীষ্মকালীন সবজিঃ বেগুন, লাউ, চালকুমড়া, পটল, ঝিঙা, করলা, শশা, চিচিঙ্গা, ডাঁটা, পুঁইশাক, ঢেঁড়শ, বরবটি, পেঁপে, কাঁচা কলা প্রভৃতি। বাংলাদেশে সবজি সরবরাহ বা বাজারে সবজি সরবরাহের অধিক প্রাপ্তি ও স্বল্প প্রাপ্তির সময় সীমা উল্লেখ করা হলো। উন্নত দেশে সংরক্ষণ ও আমদানির মাধ্যমে প্রধান প্রধান সবজি সারা বছরই ক্রেতাদের কাছে সহজলভ্য। বাংলাদেশের সবজির সরবরাহ সুষম নয়। মৌসুম অনুযায়ী এর প্রচুর ব্যবধান রয়েছে, সবজি আমদানির সুযোগও কম। এদেশের মাত্র কয়েকটি সবজি সারা বছর পাওয়া যায়। অন্যান্য সবজির উৎপাদন ও ব্যবহার ঋতুভিত্তিক। নিচে বাংলাদেশের কোন মাসে কি পরিমাণ সবজি বাজারে পাওয়া যায় তা দেয়া হলো।

মাস	% (সবজি ও আলু)	মাস	% (সবজি ও আলু)
জানুয়ারি	৭	জুলাই	৮
ফেব্রুয়ারি	৯	আগস্ট	৭
মার্চ	১৩	সেপ্টেম্বর	৬
এপ্রিল	১৩	অক্টোবর	৫
মে	১১	নভেম্বর	৪
জুন	১০	ডিসেম্বর	৭ = ১০০%

মার্চ-এপ্রিল মাসে সর্বাধিক পরিমাণ সবজি পাওয়া যায় এবং এ সময়ে সবজি সংখ্যায়ও বেশি। তারপর নভেম্বর পর্যন্ত এদের প্রাপ্তি কমতেই থাকে। অক্টোবর মাসে দুষ্প্রাপ্য হয়।

মৌসুমভিত্তিক বাংলাদেশে সবজির উৎপাদন টন/হেক্টর

বছর	খরিফ (টন/হেক্টর)	রবি (টন/হেক্টর)	গড় (টন/হেক্টর)
১৯৯৩-৯৪	৫.২	৭.৩	৬.২
১৯৯৪-৯৫	৫.৩	৭.৩	৬.৩
১৯৯৫-৯৬	৫.২	৭.৪	৬.৩
১৯৯৬-৯৭	৫.২	৭.৫	৬.৪
১৯৯৭-৯৮	৫.২	৭.৪	৬.৩
১৯৯৮-৯৯	৫.৫	৮.০	৬.৮
২০০৬-০৭	৬.৫	৮.৩	১৪.৮
২০০৭-০৮	৭.২	৮.৭	১৫.৯

২০২২

উৎপাদন কাল ঃ ১৯৯৯ সাল			
আফ্রিকা	৩৯৭ লক্ষ টন	বাংলাদেশ	১০-১২ লক্ষ টন
উত্তর আমেরিকা	৪৭৪ লক্ষ টন	চীন	২৩৪৬ লক্ষ টন
দক্ষিণ আমেরিকা	১৮৭ লক্ষ টন	ভারত	৫৫৮ লক্ষ টন
এশিয়া	৪০৫১ লক্ষ টন	জাপান	১৩৬ লক্ষ টন
ইউরোপ	৯১২ লক্ষ টন	ইরান	১৩২ লক্ষ টন
অসনিয়া	৩২ লক্ষ টন	তুরস্ক	২১৭ লক্ষ টন
সৌদি আরব	২৪ লক্ষ টন	ইন্দোনেশিয়া	৪৭ লক্ষ টন

বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতা

বাংলাদেশে সবজি উৎপাদনের প্রতিবন্ধকতা অনেক, যেমন-

(১) জলবায়ুগত সমস্যা ঃ বাংলাদেশে বিরাজমান জলবায়ুর কারণে বছরের সবসময় সব ধরনের শাক-সবজির উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। ঠান্ডা আবহাওয়া ভালো এমন সবজি কেবল রবি মৌসুমে এবং গরম আবহাওয়া উপযোগী সবজিগুলোকে খারিফ মৌসুমে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। বর্ষাকালে অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের দরুণ সবজি উৎপাদন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। মার্চ-মে মাসে বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত ও অনিয়মিত হলেও এ সময়ে বারবার প্রবল ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় যা সবজির জন্য নিরাপদ নয়।

(২) নিম্নমানের ফলন ঃ বাংলাদেশের সবজির গড় ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম, যদিও অন্যান্য দেশের তুলনায় জমির গুণাগুণ এত খারাপ নয়। উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহার না করা এর প্রধান কারণ।

(৩) বীজের সমস্যা ঃ বীজ সমস্যার কারণে এ দেশের সবজি উৎপাদন ভীষণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সবজি বীজ সমস্যার মধ্যে অনেক সবজির বীজ আমাদের দেশে উৎপাদিত না হওয়া, উৎপাদিত বীজের নিম্নমান এবং বিদেশ থেকে বীজ আমদানিতে সমস্যা। বিদেশ থেকে যে বীজগুলো আমদানি করা হয় তা আমাদের দেশের জলবায়ুতে উৎপন্ন হয় না যেমন-বাঁধাকপি, ফুলকপি।

(৪) বাজারজাতকরণ সমস্যা ঃ বাংলাদেশে সবজির বাজারজাতকরণের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। উৎপাদন মৌসুমে চাহিদা আছে এমন স্থানে শাক-সবজির যথেষ্ট মূল্য থাকলেও উৎপাদন এলাকায় এর মূল্য থাকে খুবই কম থাকে।

(৫) সবজির উচ্চ উৎপাদন খরচ ও নিম্নমূল্য ঃ সবজি চাষের উপকরণের মধ্যে বীজ, সার, ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা ও সিঞ্চন যত্র ইত্যাদি উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা, নিম্ন গুণাগুণ ও দাম খুব বেশি।

(৬) সবজির উৎপাদনে যথাযথ ও সমন্বিত প্রচেষ্টার অভাব ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা থেকে অনেক উন্নত জাতের সবজির জাত আবিষ্কার করেছে, কিন্তু এগুলো সকল অঞ্চলের কৃষকদের দ্বার পর্যন্ত সময়মত পৌছায় না।

শাক-সবজির বর্তমান অবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ

সবজির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জাতীয় ও কৃষক পর্যায়ে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে সে সম্পর্কে তেমন কোন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়নি। শাক-সবজির উৎপাদন, ব্যবহার ও সার্বিক উন্নয়নে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঘাটতি মৌসুমে শাক সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ জলবায়ুগত কারণে বছরের সব সময় সবজির উৎপাদন সমান থাকে না যথাযথ উৎপাদন কৌশল ও উপযোগী জাতের ব্যবহারের মাধ্যমে ঘাটতি মৌসুমগুলোতে সবজি উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ২০২২

শাক সবজি উৎপাদনে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে ঃ শীতকালীন শাক-সবজির চাষ অনেকাংশে পানিসেচ সুবিধার ওপর নির্ভরশীল। সেচের সুযোগ বৃদ্ধি করে সবজি চাষাধীন জমি বাড়ানো সম্ভব।

শাক সবজি ফলন বৃদ্ধি ঃ উন্নত ও উপযোগী জাত দ্বারা সবজির ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। সকল কৃষকই যদি উন্নত জাতের সবজি চাষ করে তাহলে সবজির ফলন অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করে ঃ আমাদের কৃষকেরা খুবই কম পরিমাণে সবজি উৎপাদন করে এবং কম জমিতে সবজি চাষ করে। সবজি যদি বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হয় তাহলে সবজি উৎপাদন বেড়ে যাবে।

সবজি বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে ঃ বাংলাদেশে সব ধরনের বীজ সব জায়গায় উৎপাদনের জন্য উপযোগী নয়। তাই যে অঞ্চলে বীজ উৎপাদন ভালো হয়, সেভাবে বীজ উৎপাদন করা যায়। সবজি বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করে সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়।

গবেষণা জোরদারকরণ ঃ সবজির জাত উন্নয়ন এবং প্রতিকূল আবহাওয়ায় ফসল রক্ষার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে সবজির উন্নত জাত উদ্ভাবন করতে হবে। রোগ ও পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাত বের করা খুবই প্রয়োজন।

উৎপাদন উপকরণের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ঃ উন্নত মানের বীজ, নির্ভেজাল বালাইনাশক ও অন্যান্য উৎপাদন উপকরণ কৃষকেরা যাতে সময়মত এবং যুক্তিসঙ্গত দামে ক্রয় করতে পারে, তার ব্যাবস্থা করা। সবজি উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় সবজির উৎপাদন বৃদ্ধিতে করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে সবজি উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশে সবজি চাষকৃত জমির পরিমাণ, সবজি উৎপাদন ও বিশ্বে সবজি উৎপাদন পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য জানা দরকার। সবজির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

(১) সবজির উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন।
(২) পতিত জমিকে অধিক পরিমাণে শাক-সবজির উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা।
(৩) প্লাবনমুক্ত পাহাড়ি এবং টিরেস এলাকায় সবজি উৎপাদন বাড়ানো।
(৪) হিমাগারের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি করে বীজআলু সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
(৫) বর্ষাকালে সবজি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে দেশের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম এলাকায় বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ।
(৬) বাড়ি-ঘর, অফিস, স্কুল-কলেজ এবং রাস্তার পার্শ্ববর্তী পতিত জমিতে শাক-সবজি উৎপাদন।
(৭) সুষম সার ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
(৮) কীট-পতঙ্গ ও রোগ দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৯) শিম, মিষ্টি আলু, শাক ও কচুজাতীয় সবজির উৎপাদন বাড়ানো।
(১০) লবণাক্ত অঞ্চলে চাষাবাদের জন্যে বিভিন্ন সবজির জাত উদ্ভাবন।
(১১) মিশ্র ফসলের চাষ, সাথী ফসলের চাষ।

বর্তমানে সবজি উৎপাদন ব্যবস্থা ৩ ভাগে পরিচালিত হচ্ছে–

ক) বসতবাড়ির আশপাশ ও অনির্ধারিত পতিত স্থানে সবজি উৎপাদন
খ) বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সবজি উৎপাদন এবং
গ) বীজের ব্যবসাকে লক্ষ করে সবজি উৎপাদন।

বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৫০ হাজার খানা আছে। এসব খানায় পারিবারিক চাহিদা পূরণের জন্য ১৫টি গ্রীষ্মকালীন ও ১৩টি শীতকালীন সবজি সারাবছরই চাষ হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক উৎপাদনের উন্নয়ন করা হলে অভ্যন্তরীণ বাজার চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানির জন্য উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ আছে। সাম্প্রতিককালে শহরের আশেপাশে ও শহরতলীতে শাকসবজি উৎপাদন হচ্ছে। সবজি চাষ বৃদ্ধি এবং নিবিড়তার কারণে সবজি বীজের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। তাই উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের জন্য সরকার বিএডিসি ও কৃষি সম্প্রসারণ

অধিপ্তরের মাধ্যমে বীজ সরবরাহ করছে এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলছে। বাংলাদেশে সবজির মধ্যে আলুকে অন্যতম ফসল ধরা হয়। আলু মূলত শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে বেশি পরিমাণে সবজি গ্রহণ করা হলে শরীরের পুষ্টি চাহিদা সুষম হয়। শরীরের মোট ক্যালোরির অন্তত ৫% ফল সবজি হতে আসা উচিত। এতে যে পরিমাণ সবজি খেতে হবে তাতে শরীরের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের চাহিদা পূরণ হবে।

বাংলাদেশে ২০০৬-২০০৭ ও ২০০৭-২০০৮ এ দানা শস্য চাষের অধীন জমি ছিল ১১৯.০৭ ও ১২২.৪৭ লাখ হেক্টর এবং উৎপাদন ছিল ৩৩০.৮১ ও ৩৫২.৯২ লাখ মেট্রিক টন। আমরা খাদ্য হিসেবে শুধু দানাদার শস্য (ধান, গম ও ভুট্টা) বেশি গ্রহণ করে থাকি। অথচ সবজির তুলনায় দানাদার শস্যের হেক্টর প্রতি ফলন অনেক কম। তাই খাদ্য ঘাটতি পূরণে দানাদার শস্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। শাক সবজি যেহেতু অল্প সময়ে বেশি পরিমাণে উৎপাদন করা যায়, তাই খাদ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য শাক সবজির উৎপাদন ও বেশি আহার করা প্রয়োজন। উন্নত বিশ্বের জনগণ মাথাপিছু দৈনিক ৩০০-৫০০ গ্রাম শাকসবজি খেয়ে থাকে। যারফলে তাদের স্বাস্থ্য অনেক ভালো এবং নিরোগ। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের শাকসবজি খাওয়ার হার প্রতিদিন প্রায় ৩০ গ্রাম এবং দানাশস্য গ্রহণের হার প্রায় ৫০০ গ্রাম। এতে খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য দানাশস্য চালের ওপর বেশি চাপ পড়ে। শাক সবজি খাওয়া পরিমাণের প্রতি একটু যত্নশীল হলেই বাড়ানো সম্ভব। তাতে শাক সবজির বার্ষিক খাওয়ার পরিমাণ প্রায় ২৮-৩০ লক্ষ টন হতে প্রায় ২০০ লাখ টনে উন্নিত হবে। অধিকাংশ শাকসবজিই সংগ্রহের পর পরই খেতে হয়। তবুও অনেক সবজি আছে, যা অন্য উপায়ে বা শুকিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

সারণি ঃ বাংলাদেশ, ভারত ও জাপানের জনগণের মাথাপিছু দৈনিক খাদ্য গ্রহণের তুলনামূলক চিত্র

ফসলের নাম	বাংলাদেশ (গ্রাম)	ভারত (গ্রাম)	জাপান (গ্রাম)
দানা শস্য	৪৫৪	৩৭৬	৩১৫
আলু ও কন্দজাতীয়	৫৩	৬৯	৪৯
শাক সবজি	৩৫	১৭৭	৪৫০
ফলমূল	৪০	১১৫	১৭৫
মাছ, মাংস, ডিম	৩৫	৩৮	১৯০
দুধ ও দুধজাতীয় দ্রব্য	১৮	১৮৯	১৯২
চর্বি জাতীয়	২.২	৩৯	৩৫
ডালজাতীয়	৬	৬৪	২৩
চিনিজাতীয়	২১	৩৮	৬৮

একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক খাদ্য তালিকায় যা থাকা উচিত তা হলো–

খাদ্যের নাম	প্রয়োজন (গ্রাম)	গ্রহণ (গ্রাম)
দানাশস্য (চাল)	২৩৫	৩১৫
গম/আটা	১১৫	১৩৯
আলু	২৪০	৫৩
ডাল	১১৫	৭
শাক	১২০	৩০
সবজি	১১৫	০৪
মাছ	০৫	২.২
তেল	১৫	৪০
ফলমূল	৬০	

শাকসবজি উৎপাদন কম, তাই গ্রহণের পরিমাণও কম। অন্যদিকে শাকসবজি ব্যবহারেরও যথেষ্ট ত্রুটি আছে। যেমন-

(ক) শাকসবজি উঠানোর/সংগ্রহকালে অপরিচ্ছন্ন পাত্রে বা মাটিতেই রাখা হয়। শাকসবজি নরম ও রসালে বিধায় অনেক রোগ জীবাণু তাতে সহজে প্রবেশ করে।

(খ) শাক সবজি যতদূর সম্ভব টাটকা অবস্থায় খাওয়া উচিত। কিন্তু একমাত্র পারিবারিক বাগান ছাড়া বাণিজ্যিক-ভাবে উৎপাদিত শাক-সবজি টাটকা পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া সেগুলো নোংরা পানিতে ধুয়ে বা নোংরা পানির ছিটা দিয়ে নোংরা পরিবেশে নোংরা পাত্রে ভরে দীর্ঘসময় গরম পরিবেশে বহন করে বাজারে/আড়তে পৌঁছায়।

(গ) বাজারে শাক সবজি স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নাই, ফলে গুণাগুণ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়।

(ঘ) শাক সবজি চাষকালে মারাত্মক বালাইনাশক ব্যবহার করা হয়, যা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

(ঙ) শাকসবজি রান্নার আগে যখন কেটে প্রস্তুত করা হয় তার পূর্বে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে কাটার পর পানিতে ধুয়ে নেওয়া হয়, ফলে পুষ্টিগুণ বহুগুণে কমে যায়।

(চ) রান্নার সময় যতদূর সম্ভব সবজি কম সেদ্ধ করতে হয়। কিন্তু তা না করে অতিরিক্ত সিদ্ধ বা ভাজা পোড়া করে রান্না করা হয়, তাতে সবজির পুষ্টিমান নষ্ট হয়ে যায়।

(ছ) যতটা সম্ভব কম পানি দিয়ে সবজি সিদ্ধ করতে হয় এবং পানি ফেলে দিতে হয় না। কিন্তু তা না করে সিদ্ধ করার পর পানি ফেলে দিয়ে বেশিরভাগ পরিবারে রান্না করে থাকে।

(জ) যে সব সবজি কাঁচা খাওয়া যায়, সেগুলো কাঁচা অবস্থাতেই খাওয়া উচিত। যেমন- টমেটো, ক্যাপসিকাম, শশা, গাজর, লেটুস, মটরশুটি ইত্যাদি। অথচ টমেটো, শশা, গাজর রান্নার তরকারির সাথে যোগ করে দেওয়া হয়, তাতে অনেক পুষ্টি নষ্ট হয়ে যায়।

(ঝ) ঢেঁড়শ কাঁচা অবস্থায় খাওয়া সম্ভব, যদি কচি সংগ্রহ করা যায়। তবে একটু সিদ্ধ করে তাতে সামান্য লবণ দিয়ে খাওয়া যায়। কিন্তু ঢেঁড়শ সাধারণত ভাজা করে খায়। এতে পুষ্টিমান কমে যায়।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. শাক সবজি উৎপাদন মৌসুম হিসেবে শাকসবজি কয় ভাগে বিভক্ত ?

২. বাংলাদেশে বর্তমানে সবজির চাহিদা কত মেট্রিক টন ?

৩. বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা কত ?

৪. উন্নত বিশ্বের জনগণ মাথাপিছু দৈনিক কত গ্রাম সবজি খায় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সবজি চাষের সমস্যাসমূহ কী কী ?

২. সবজি চাষের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে সবজি চাষের বর্তমান অবস্থা কীভাবে উন্নত করা যায় তা আলোচনা কর।

২০২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

সবজির শ্রেণিবিভাগ

সবজির বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ

শাক-সবজিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন- মৌসুমভিত্তিক, ব্যবহারভিত্তিক, উৎপত্তি ভিত্তিক, ভক্ষণযোগ্য ভিত্তিক, শেকড়ের গভীরতা অনুযায়ী, মাটির উপরে বা নিচে জন্মানোভিত্তিক, উদ্ভিদতাত্ত্বিক ইত্যাদি।

ক) মৌসুম ভিত্তিক শ্রেণি বিভাগ ও মৌসুম অনুযায়ী বাংলাদেশের সবজিগুলোকে ৩টি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- (১) রবি মৌসুমের সবজি- এ সবজি শীতকালে জন্মে থাকে। উদাহরণ- ফুলকপি, বাঁধাকপি, পালংশাক, গাজর, লেটুস, শিম, ওলকপি, মুথা, টমেটো ইত্যাদি।

(২) খারিফ সবজি- এ সবজি গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে জন্মে থাকে। উদাহরণ- চালকুমড়া, চিচিংগা, ঝিঙা, ধুন্দল, ঢেঁড়শ, কলা, ডাঁটা, পুঁইশাক, পটল, কচু, বরবটি ইত্যাদি।

(৩) বারমাসি সবজি- এ সবজি সারা বছর জন্মে থাকে। উদাহারণ বেগুন, মিষ্টি কুমড়া, লালশাক, পেঁপে, শশা ইত্যাদি।

খ) ব্যবহার ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ- সবজি কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার ওপর ভিত্তি করে সবজিগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

১। সালাদজাতীয় সবজি- এ সবজিগুলো সাধারণত সালাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- শশা, গাজর, লেটুস, ক্যাপসিকাম, পেঁপে ইত্যাদি।

২। তরকারিজাতীয় সবজি- এ সবজিগুলো তরকারি রান্নার জন্য শুধু ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- বেগুন, পটল, ঝিঙা, আলু, ধুন্দল ইত্যাদি।

৩। ভর্তাজাতীয় খাবার তৈরির সবজি- এ সবজিগুলো অনেক সময় ভর্তা তৈরি করে খাওয়া হয়। উদাহরণ ওলকচু, কাঁচাকলা, পেঁপে, বেগুন ইত্যাদি।

৪। চাটনী তৈরির সবজি- এ সবজিগুলো চাটনি তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- টমেটো, ধনিয়াপাতা, পুদিনা পাতা ইত্যাদি।

৫। ভাজা খাবার তৈরির সবজি- এ সবজিগুলো ভাজা খাবার তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- বরবটি, করলা, শিম, লালশাক, পুঁইশাক ইত্যাদি।

৬। স্যুপ তৈরির সবজি- এ সবজিগুলো স্যুপ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ- পিঁয়াজ পাতা, পুদিনা পাতা, সিলারি, গাজর, মটরশুটি ইত্যাদি।

গ) উৎপত্তিভিত্তিক সবজি- বাংলাদেশে যে সমস্ত শাকসবজির চাষ হচ্ছে সেগুলোকে উৎপত্তিস্থলের ভিত্তিতে দেশি ও বিদেশি হিসেবে ভাগ করা যায়। যথা

(১) দেশি সবজি- পটল, লালশাক, কলমিশাক, শিম, মিষ্টি কুমড়া, কচুজাতীয়, পাটশাক ইত্যাদি।

(২) বিদেশী সবজি- কপিজাতীয়, লেটুস, সিলারী, গিমা কলমি, বীট, গাজর, ব্রোকলী, চিনা বাধাকপি ইত্যাদি।

২০২২

ঘ) আহারোপযোগী/ভক্ষণযোগ্য ভিত্তিক- ফসলের প্রকারভেদে বিভিন্ন অংশ খাওয়া যায়। এর ভিত্তিতে সবজিগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

(১) পাতাজাতীয় সবজি- লালশাক, পুঁইশাক, লেটুস, পার্সলি, সিলারি ইত্যাদি।

(২) ফলজাতীয় সবজি- বেগুন, টমেটো, কুমড়াজাতীয়, শিম, বরবটি ইত্যাদি।

(৩) কন্দাল সবজি- আলু, মেটে আলু, গাছ আলু ইত্যাদি।

(৪) কাণ্ডজাতীয় সবজি- ডাঁটা, পানিকচুর লতা ইত্যাদি।

(৫) কচুজাতীয় সবজি- মুখীকচু, ওলকচু, মানকচু ইত্যাদি।

(৬) ফুলজাতীয় সবজি- ফুলকপি, ব্রোকলি, মিষ্টি কুমড়া ফুল, শাপলা ফুল, বকফুল ইত্যাদি।

(৭) বীজজাতীয় সবজি- শিম বীজ, কাঁঠাল বীজ, মটরশুটি ইত্যাদি।

ঙ) শিকড়ের গভীরতাভিত্তিক সবজি- এ জাতীয় সবজিকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- অগভীর ও গভীর শিকড়জাতীয় সবজি।

১। অগভীর শেকড়যুক্ত সবজি- বীট, গাজর ইত্যাদি।

২। গভীর শিকড়যুক্ত সবজি- মুলা, মেটে আলু ইত্যাদি।

চ) জীবনকালভিত্তিক সবজি- জীবনকালের ভিত্তিতে সব সবজিকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) বর্ষজীবী (২) দ্বিবর্ষজীবী ও (৩) বহুবর্ষজীবী

১। বর্ষজীবী সবজি-মুলা, গাজর, লেটুস, ওলকপি, বীট ও আলু ইত্যাদি।

২। দ্বিবর্ষজীবী সবজি- কাঁকরোল, করলা, শিম, বরবটি, বেগুন, পটল, পুঁইশাক ইত্যাদি।

৩। বহুবর্ষজীবী সবজি- পেঁপে, মেটে আলু, মানকচু, ওলকচু ইত্যাদি।

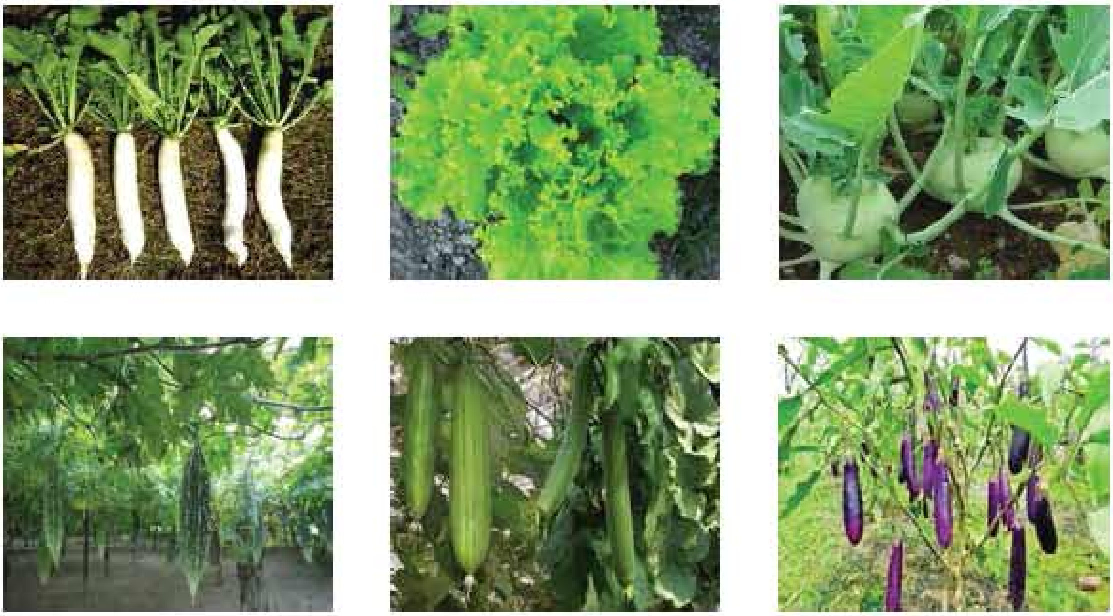

চিত্র ঃ বর্ষজীবী সবজি, মুলা, লেটুস, ওলকপি, করলা, ধুন্দুল ও বেগুন

চিত্র ঃ বহুবর্ষজীবি সবজি-মানকচু, ওলকচু ও পেঁপে

একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী সবজির পরিবার ও উদ্ভিদ তাত্ত্বিক নাম

বীজ বলতে আমরা বীজত্বক দ্বারা আবৃত এবং সুপ্ত ভ্রুণযুক্ত পরিণত, পরিপুষ্ট ও নিষিক্ত ডিম্বককে বীজ হিসেবে বুঝে থাকি। একটি সাধারণ বীজের ২টি অংশ থাকে। যথা- বীজত্বক ও বীজসার বা কার্নেল। একটি বীজে বীজপত্রের সংখ্যা অনুসারে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী।

(১) একবীজপত্রী- ধান, গম, ভুট্টা, কলা, খেজুর, কচু ইত্যাদি।

(২) দ্বিবীজপত্রী- শিম, চিচিংগা, ধুন্দল, বেগুন, ছোলা, কাঁঠাল ইত্যাদি।

এছাড়া আরও এক প্রকারের উদ্ভিদ আছে যথা- বহুবীজপত্রী বীজ। উদাহরণঃ পাইনগাছ। যে কোন বীজেরই একটি বা তার বেশি বীজপত্র থাকে। বীজপত্রের সংখ্যা যখন একটি থাকে তখন তাকে একবীজপত্রী বীজ বলে। আর বীজে বীজপত্রের সংখ্যা যখন দুটি থাকে তখন তাকে দ্বিবীজপত্রী বীজ বলে। একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী বীজের পার্থক্য

একবীজপত্রী বীজ	দ্বি-বীজপত্রী বীজ
১। সাধারণত বীজত্বক ও ফলত্বক পরস্পর যুক্ত থাকে।	১। বীজত্বক ও ফলত্বক যুক্ত থাকে না।
২। ভ্রূণ ছোট ও একটি বীজপত্র থাকে।	২। ভ্রূণ বড় এবং এতে দুটি বীজপত্র থাকে।
৩। ভ্রূণ মূল ও ভ্রূণমুকুল আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে।	৩। কোন আবরণ থাকে না।
৪। বীজপত্র ভ্রূণাক্ষের শীর্ষে এবং ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুল ভ্রূণাক্ষের দু'পাশে থাকে।	৪। ভ্রূণাক্ষের দুপাশে বীজপত্রদ্বয় ও দুপ্রান্তে ভ্রূণমূল ও ভ্রূণমুকুল থাকে।

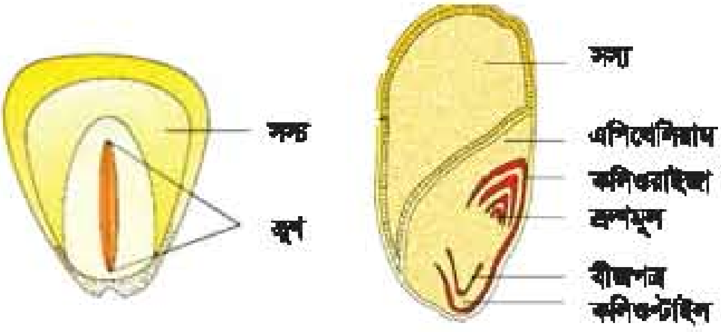

চিত্র: একবীজপত্রী বীজ দ্বিবীজপত্রী বীজ

বাংলাদেশে উৎপাদিত কয়েকটি একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী শাক সবজির বর্গ, পরিবার এবং উদ্ভিদতাত্ত্বিক, বাংলা এবং ইংরেজি নাম উল্লেখ করা হলো।

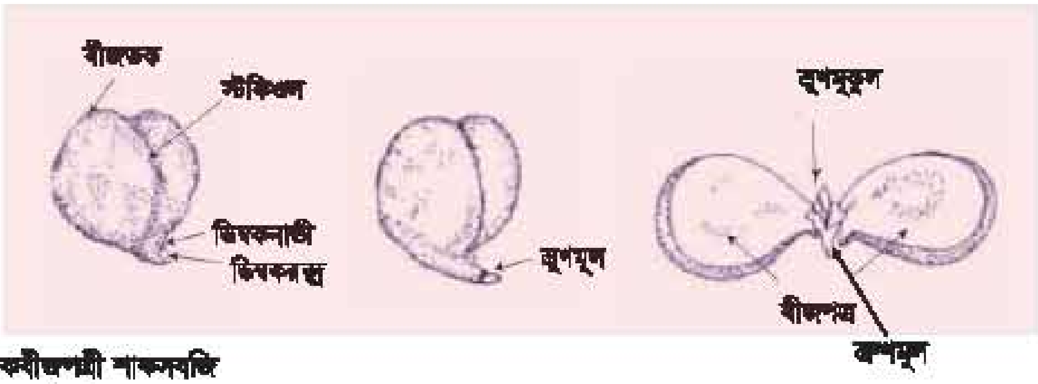

একবীজপত্রী শাকসবজি

১। বর্গ-এরিয়ালেস (Ariales)

গোত্র- এরেসী (Araceae)

<u>Colocasia</u> <u>Esculenta</u> (কোলোকেশিয়া এসকুলেন্টা)- মুখী কচু, পানি কচু, পঞ্চমুখী কচু।

<u>Alocasia</u> <u>macrorhiza</u> বা Indica (এলোকেশিয়া ম্যাক্রোরাইজা/ইন্ডিকা) মানকচু (coco yam)

২। বর্গ-লিলিয়ালেস (Liliales)

গোত্র- লিলিয়েসী (Liliaceac)।

<u>Alium cepa</u> পেঁয়াজ (Onion)

<u>Alium satium</u> রসুন (Garlic)

দ্বি-বীজপত্রী শাক সবজি

১। বর্গ-এমারানথালেস (Amaranthales)

গোত্র- এমারানথেসি (Amaranthacesc)

<u>Amaranthus</u> <u>gangeticus</u> লালশাক (Red amaranthus)

Amaranthus lividus ডাঁটা (Amaranthus)

২। বর্গ-বাসিলালেস (Basellales)

গোত্র- ব্যাসিলেসি (Basellaceac)

Basella alba পুঁইশাক (সাদা) Indian spinach (white)

৩। বর্গ-বোরাজীনালেস (Baragiinales)

গোত্র- কনভুলভুলেসি (Convolvulaceae)

Impomea aquatica কলমিশাক (Swanp cabbage)

৪। বর্গ-রোডালেস (Rhoedales)

গোত্রে- ক্রুসিফেরি (Crucipperae)

Bassica Oleracea Variety-Capitata বাঁধাকপি (Cabbage)

Bassica Oleracea Variety-botrytis ফুলকপি (Cauliflower)

Raphanus Sativus মূলা

৪। বর্গ-কিউকারবিটালেস (Cucurbitales)

গোত্র- কিউকারবিটেসি (Cucurbitaccac)

Cucurbita moschata মিষ্টি কুমড়া (Sweet gourd)

Cucumis Sativus শশা (Cucumber)

৫। বর্গ-লিগুমিনোসালেস (Leguminosales)

গোত্র- লিগুমিনোসি (Leguminosae)

Dolichos Lablab শিম (Country bean)

Vigna Sesquipedalis বরবটি (Yard long bean)

৬। বর্গ-মালভলেস (Malvales)

গোত্র- মালভেসি (Malvaceac)

Hibiscus csculentus ঢেঁড়শ (Okra or Ladys finger)

৭। বর্গ- পোলেমোনিয়ালেস (Polemoniales)

গোত্র- সোলানেসি (Solanaceac)

Solanum tuberosum আলু (Potato)

Solanum melongena বেগুন (Brinjal)

Lycopersicon esculentum টমেটো (Tomato)

উদ্ভিদতাত্ত্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সবজির শ্রেণিবিভাগ

ক. একবীজপত্রী শাকসবজি

গ্রীষ্মকালীন সবজি	গোত্র Araceae	
বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম
১. পানিকচু, মুখীকচু, পঞ্চমুখী কচু,	Taro	Colocasia esculenta
২. মান কচু/ফেন কচু	Giant taro	Alocasia indica Alocasia macrorrhiga
৩. ওল কচু	Elephant foot	Amorphohallus comparulatus
৪. দুধ কচু	Cocoyam	Xanthosoma violaceum
৫. মৌলভী কচু	Tarria	Xanthosoma alrovicens
	গোত্র Liliaceae/Alliaceae	
১. পেঁয়াজ	Onion	Allium cepa
২. রসুন	Garlic	Allium sativum
৩. বানচিং পেঁয়াজ	Bunching onion	Allium fistulosum

খ. দ্বিবীজপত্রী শাকসবজি

গ্রীষ্মকালীন সবজি	গোত্র Malvaceae	
বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম
১. ঢেঁড়শ	Lady's Finger (Okra)	Hibiscus esculentus
২. চুকাই	Red sorrel	Hibiscus sabdariffa
	গোত্র Liliaceae/Alliaceae	
১. মিষ্টি কুমড়া	Sweet gourd	Cucurbita moschata
২. শশা	Cucumber	Cucumis sativus
৩. বাঙ্গি বা ফুটি	Musk melon	Cucumis melo
৪. তরমুজ	Water melon	Citrullus lanatus
৫. চাল কুমড়া	White gourd	Benincasa cerifera B. hispida
৬. ঝিঙ্গা	Ribbed gourd	Luffa rcutangula
৭. ধুন্দল	Sponge gourd	Luffa cylindrica
৮. করলা	Bitter gourd	Momordica charan
৯. কাঁকরোল	Teasle gourd	Momordica cochinchinensis
১০. চিচিঙ্গা	Snake gourd	Trichosanthes anguina
১১. পটল	Pointed gourd	Trichosanthus dioica
১২. পুঁইশাক (সাদা)	Indian spinach (White)	Basella alba
১৩. পুঁইশাক (লাল)	Indian spinach (red)	Basella rubra
	গোত্র Amaranthaceae	
১. লালশাক	Lal shak	Amaranthus gangeticus
২. ডাঁটাশাক	Data shak	A. lividus
৩. নটেশাক	Niole shak	A oleraceus

শীতকালীন সবজি	গোত্র Solanaceae	
১. গোল আলু	Potato	Solanum tuberosum
২. বেগুন	Brinjal	S. melongena
৩. টমেটো	Tomato	Lycopersicon esculentum
	গোত্র Leguminose	
১. মটর	Pea	
২. শিম	Bean	Lablab purpureus
৩. বরবটি	Yard long bean	Vigna sinensis
৪. ফরাসি শিম	French bean	Phaseolus vulgaris
	গোত্র Cucurbitaceae	
১. লাউ	Botlle gourd	Lagenaria vulgris
২. স্কোয়াস	Squash	Cucurbita marina
	গোত্র Cruciferae	
১. বাঁধাকপি	Cabbage	Brassica oleracea varcapitata
২. ফুলকপি	Cauliflower	B. oleraceae varbotrytis sub varcauliflaora
৩. ওলকপি	knolkhol/khalrabe	B. oleracea vargemmifera
৪. ব্রাসেল'স স্প্রাউট	Brussel's sprout	B. oleracea vargenuifera
৫. ব্রকোলি	Broccole	B/Oleracea varitalica sicb var cymosa
৬. শালগম	Turnip	B. Campesttris subsprapifara var. rapa
৭. মূলা	Radish	Raphanus satvus
	গোত্র Solanaceae	
১. পালংশাক	Spinach	Spinacea oleracea
২. বিট	Beet	Beta vulgaris

গোত্র Chenopodiaceae		
১. পালংশাক	Spinach	Spinacea oleracea
২. বিট	Beet	Beta vulgaris
গোত্র Umbelliferae		
বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম
১. গাজর	Carrot	Daucus carota
গোত্র Convolvulaceae		
১. মিষ্টি আলু	Sweet patato	Ipomiea batatus
২. কলমি শাক	Swamp cabbage	I. aquatica
গোত্র Compositae		
১. লেটুস	Lettuce	Lactuca sativa
গোত্র Moringaceae		
১. মাশরুম	Mushroom	Agaricus bisporus
গোত্র Dioscoreaceae		
১. মেটে আলু বা পেস্তা আলু	Dioseorea	Dioscorea alata
গোত্র Liaceae		
১. অ্যাসপারাগাস	Asparagus	Asparagus officinalis
বারমাসি সবজি	গোত্র	
১. পেঁপে	Caricaceae	Carica papaya
২. কাচাকলা	Musaceae	Musa Paradisiaca

শাক-সবজির ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণি বিভাগ– শাক-সবজির ব্যবহারভিত্তিক শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে এ অধ্যায়ে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. মৌসুম অনুযায়ী বাংলাদেশের সবজিগুলোকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ?

২. শেকড়ের গভীরতা ভিত্তিক সবজিগুলোকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

৩. একটি সাধারণ বীজে কয়টি অঙ্গ থাকে ?

৪. একটি বীজে যখন বীজপত্রের সংখ্যা দুটি থাকে তখন তাকে কী বলে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সবজির উৎপাদন মৌসুমভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ করে প্রত্যেকটি ২টি করে উদাহরণ দাও।

২. একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রীর মধ্যে কী কী পার্থক্য আছে?

৩. গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন ২টি করে সবজির ইংরেজি, বাংলা ও উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সবজিকে কিসের কিসের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভক্ত করা হয় তা উল্লেখ পূর্বক যে কোন ৩টি শ্রেণির উদাহরণসহ তার শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে বর্ণনা কর।

২০২৫

তৃতীয় অধ্যায়

পুষ্টি চাহিদা পূরণে সবজির ভূমিকা

বিভিন্ন সবজিতে প্রাপ্ত পুষ্টিসমূহের নাম

দেহের পুষ্টিসাধন, ক্ষয়পূরণ, শক্তি যোগান এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শাক সবজি থেকে পাওয়া যায়। খাদ্য সামগ্রী গ্রহণের পর পাচনতন্ত্রে হজম হয়ে এর যে অংশ শরীরের জীবকোষে শোষিত হয় ও শরীরের পুষ্টি সাধনে অবদান রাখে সেগুলো পুষ্টির মৌলিক উপাদান। বিজ্ঞানীগণ পুষ্টি উপাদানগুলোকে ৭টি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা

ক) আমিষ/প্রোটিনজাতীয় খাদ্য

খ) শ্বেতসার/শর্করা/কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য

গ) স্নেহ/চর্বি/তেলজাতীয় খাদ্য।

ঘ) খাদ্যপ্রাণ/ভিটামিন জাতীয় খাদ্য

ঙ) খণিজ পদার্থ লবণ/মিনারেল জাতীয় খাদ্য

চ) ফাংশনাল/কার্যকর জাতীয় খাদ্য (আঁশজাতীয়)

ছ) পানিজাতীয় খাদ্য।

ক) আমিষজাতীয় খাদ্য-মটরশুটি, বরবটি, শিম, বিভিন্ন রকমের শাক, কচু, গোলআলু, ফুলকপি, ব্রোকলী, কালোকছু, করলা ইত্যাদি।

খ) শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য- পেঁপে, শালগম, কাঁঠাল, আলু, কলা, কাসাভা, মটরশুটি, কাঁকরোল, ফুলকপি, বেগুন, করলা, কচুজাতীয় সবজি ইত্যাদি।

গ) স্নেহজাতীয় খাদ্য-কচু ও কচু জাতীয় সবজি, মটরশুটি, সয়াবিন, গোল আলু, কাঁকরোল, করলা, বেগুন, ফুলকপি ইত্যাদি।

ঘ) খাদ্যপ্রাণজাতীয় খাদ্য-সকল সবুজ ও রঙিন শাক সবজি, আলু, গাজর, মিষ্টিকুমড়া, পেঁপে, লালশাক, কচুশাক, পটল, শালগম, মূলাশাক, ডাঁটাশাক, উচ্ছে, পালংশাক, ক্যাপসিকাম, মরিচ, কাচা মটরশুটি, বাঁধাকপি, গাজর, ফুলকপি ইত্যাদি।

ঙ) খনিজ পদার্থজাতীয় খাদ্য-বীট, শিম, কচুশাক, ডাঁটা, পুঁইশাক, ধনেশাক, ঢেঁড়শ, কলমীশাক, ফুলকপি, রাইশাক, লালশাক, লেটুস, কালো কচুশাক ইত্যাদি।

চ) কার্যকর সবজিজাতীয় খাদ্য-ঢেঁড়শ, ডাঁটা, চিচিংগা, ঝিঙা, ধুন্দল ইত্যাদি (আঁশজাতীয় খাদ্য)।

ছ) পানিজাতীয় খাদ্য-শশা, পেঁপে, কুমড়াজাতীয়সহ সকল শাক সবজিতে শরীরের প্রয়োজনীয় পানি আছে।

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান (খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

২০২২

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পুষ্টি উপাদান (খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

খাদ্যের নাম	জলীয় অংশ (গ্রাম)	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	আঁশ (গ্রাম)	খাদ্যশক্তি (কিলোগ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	ক্যারোটিন (মাইক্রোগ্রাম)	ভিটামিন বি-১ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন বি-২ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন সি (মিলিগ্রাম)
শাকপাতা													
বক ফুল শাক	৭৩.১	৩.১	২.২	৯৩.০	৮.৪	১.৪	১১.৮	১১৩০	৩.৯	৫৪০০	০.২১	০.০৯	১৬৯
বথুয়া শাক	৮৯.৬	২.৬	০.৮	৩০.০	৩.৭	০.৪	২.৯	১৫০	৪.২	১৭৪০	০.০১	০.১৪	৩৫
কন্দজাতীয় সবজি													
কচু	৭০.০	১.৭	১.০	১১৬	৩.০	০.৮	২৪.৪	৪০	১.৭	-	০.১৬	০.১১	৬
গোলআলু	৭৪.৭	০.৬	০.৪	৯৭	১.৬	০.৬	২২.৬	১১	০.৭	-	০.০৩	০.০৩	১০
মিষ্টি আলু	৬৮.৫	১.০	০.৮	১২০	১.২	০.৩	২৮.২	২০	০.৮	-	০.০৬	০.০২	২
পেঁয়াজ	৮৬.৬	০.৬	০.৬	৫০	১.২	০.১	১১.১	৪৭	০.৭	-	০.০৮	০.০১	১১
সবজি বা তরকারি													
ডাঁটা	৯২.৫	১.৮	১.২	১৯	০.৯	০.১	৩.৫	২৬০	১.৮	২৫৫	০.০১	০.১৮	১০
চালকুমড়া	৯৬.৫	০.৩	০.৮	১০	০.৪	০.১	১.৯	৩০	০.৮	-	০.০৬	০.০১	১
উচ্ছে	৮৩.২	১.৪	১.৭	৬০	২.১	১.০	১.০৬	২৩	২.০	১২৬	০.০৭	০.০৬	৯৬
শিম (কচি)	৮৬.১	০.৯	১.৮	৪৮	৩.৮	০.৭	৬.৭	২১০	১.৭	১৮৭	০.১০	০.০৫	৯
লাল শিস	৮৬.৮	০.৬	২.১	৪৪	৩.১	০.৪	৭.০	৫৪	১.৫	৪৫৩	০.০৬	০.০২	১২
চিচিঙা	৯৪.৬	০.৫	০.৮	১৮	০.৫	০.৩	৩.৩	২৬	০.৩	৯৬	০.০৪	০.০৬	-
শশা	৯৪.৯	০.৪	০.৪	২২	১.৬	০.১	৩.৫	১৪	১.৫	অল্প	০.১৬	০.০২	৫
মটর শুটি	৬৭.৫	১.২	৪.০	১২৭	৭.৪	০.৩	২৩.৭	২৬	১.৫	-	০.০১	০.১২	৫
লাউ	৮৩.১	০.৬	০.৬	৬৬	১.১	০.১	১৫.১	২৬	০.৭	-	০.০১	০.০২	৪
টমেটো (কাঁচা)	৯৩.১	০.৬	০.৭	২৩	১.৯	০.১	৩.৬	২০	১.৮	১৯২	০.৭	০.০১	৩১

কাঁচা মরিচ	৭৩.৫	১.০	৬.৮	১০৩	১.৬	০.১	২৩.৭	১১	১.২	২৩৪০	০.১৭	১.১৬	১২৫
সজিনা	৮৩.৩	১.৯	৪.৮	৬০	৩.২	০.১	১১.৪	২১	৫.৩	৭৫০	০.০৪	০.০২	৪৫
ধুন্দল	৯২.৩	০.৭	০.৮	২৩	০.৯	০.২	৫.৯	১৯	০.৬	-	০.০৩	০.০১	৫
বরবটি	৮৭.০	০.৮	৩.৮	৫০	৩.০	০.২	৯.০	৩৩	৫.৯	-	০.১৪	০.৩০	অল্প
বাঁধাকপি	৯.৩	০.৫	১.০	২৬	১.৩	০.২	৪.৭	৩১	০.৮	-	০.০৬	০.০৫	৩
কাঁচা কলা	৭৮.৭	১.০	০.৭	৮৩	২.৬	০.৪	১৭.৩	১১	০.৬	-	০.০৯	০.০৬	৪
বেগুন	৯২.৪	০.৮	১.৩	৪২	১.৮	২.৯	২.২	২৮	০.৯	৮৫০	০.১২	০.০৮	৫
কাঁচা পেঁপে	৯০.৭	১.৩	০.৯	৩৬	০.৯	০.৮	৬.৪	১৩	০.৯	৫৬০	০.৪০	০.০২	৬
ঝিঙা	৯৩.০	০.৩	০.৫	৩০	১.৮	০.৬	৪.৩	১৬	০.৫	৬৭০	০.১১	০.০৩	৩
কাঁকরোল	৭৯.৪	০.৯	-	৮০	২.১	০.৩	১৭.৪	৩৬	-	৪১০	০.০৮	০.০৬	-
ঢেঁড়স	৮৮.৩	১.১	১.২	৪৩	১.৮	০.১	৮.৭	১১৬	১.৫	১৬৭০	০.০৪	০.১৬	১০
পটল	৯২.৪	০.৫	৩.০	৩১	২.৪	০.৬	৪.১	২০	১.৭	৭৯০	০.৩০	০.০৩	২
করলা	৯২.২	০.৯	০.৮	২৮	২.৫	০.১	৪.৩	১৪	১.৮	১৪৫০	০.০৪	০.০২	৬৮
ফুলকপি	৮৯.০	০.৮	১.২	৪১	২.৬	০.১	৭.৫	৪১	১.৫	-	০.০২৭	০.০৩	৯১
মিষ্টি কুমড়া	৯৩.০	০.৭	০.৭	৩০	১.৪	০.৫	৪.৫	৪৮	০.৭	৭২০০	০.০৭	০.০৬	২৬
পাতাজাতীয় সবজি													
লাউশাক	৮৭.৯	১.৭	১.৩	৩৯	২.৩	১.৭	৬.১	৮০	-	-	-	০.২৬	১০
সবুজ কচু শাক	৮২.৭	২.২	২.৯	৫৬	৩.৯	১.৫	৬.৮	২২৭	১০.০	১০২৭৮	০.২২	০.০৬	১২
ধনে পাতা	৮৬.৩	২.৩	১.২	৪৪	৩.৩	০.৬	৬.৩	১৮৪	১৮.৫	৬৯১৮	০.০৫	০.৩১	১৩৫
মেথি শাক	৮৬.১	১.৫	১.১	৪৯	৪.৪	০.৯	৬.০	৩৯৫	১৬.৫	২৩৪০	০.০৪	০.৩১	৫২
লেটুস	৯৩.৪	১.২	০.৫	২১	২.১	০.৩	২.৫	৫০	২.৪	৯৯০	০.০৯	০.১৩	১০
নটে শাক	৯০.০	৩.৩	১.০	২৬	৩.০	০.৭	২.০	২০০	-	-	-	-	-
পুঁদিনা পাতা	৮৬.২	১.৬	২.০	৪৯	২.৯	০.১	৯.১	৮৫	১৫.৬	১৩৩০০	০.০৯	০.০৮	২৮
লালশাক	৮৮.০	১.৬	-	৪৩	৫.৩	০.১	৫.০	৩৭৪	-	১১৯৪০	০.১০	০.১৩	৪৩
কলমি শাক	৮৭.৬	১.১	১.২	৪৬	১.৮	০.১	৯৪	১০৭	৩.৯	১০৭৪০	০.১৪	০.৪০	৪২

পুঁইশাক	৯২.০	১.৪	-	২৭	২.২	০.২	৪.২	১৬৪	১০.০	১২৭৫০	০.০২	০.৩৬	৬৪
ডাঁটা শাক	৯৪.৩	০.৫	১.০	২২	১.৮	০.২	৩.৩	৮০	২৫.৫	১০১০০	০.২৬	০.১৮	৭৮
মিষ্টি কুমড়া শাক	৮৯.৪	১.৪	২.১	৩৮	২.১	০.২	৭.০	৪০	-	১২০০০	০.১২	০.২৪	৬১
পালংশাক	৯০.৮	১.৮	০.৬	৩০	৩.৩	০.১	৪.০	৯৮	১০.০	৮৪৭০	০.০৩	০.০৯	১৫
মূলজাতীয় খাবার													
রসুন	৬২.০	১.০	০.৮	১৪৫	৬.৩	০.১	২৯.৮	৩০	১.৩	-	০.০৬	০.২৩	১৩
শালগম	৯২.৯	০.৬	০.৯	২১	১.৪	অল্প	৩.৮	২৪	০.৪	-	০.০৩	০.০২	১৫
গাজর	৮৫.০	০.৯	১.২	৫৭	১.২	০.২	১২.৭	২৭	২.২	১০৫২০	০.০৪	০.০৫	৬
ওলকপি	৮৮.৫	১.৩	১.৫	৪১	১.০	০.১	৯.১	২৫	০.৪	-	০.০১	০.০৩	৫৩
মূলা	৯২.৭	০.৫	০.৬	২৮	১.৩	০.১	৫.৪	১০	০.৫	-	০.৪৩	অল্প	৩৪

মানুষের পুষ্টিতে সবজির ভূমিকা

মানুষের পুষ্টিতে এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য দৈনন্দিন পুষ্টি উপাদান সরবরাহে সবজির গুরুত্ব অপরিসীম। দেহের স্বাভাবিক কাজ ও সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে মানুষের সব ধরনের খাদ্যোপাদানের প্রয়োজন। যথা- শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান, পানি ও কার্যকর খাদ্য উপাদান। এগুলোকে পুষ্টির মৌলিক উপাদান বলা হয়। দেহের সঠিক বৃদ্ধি, উন্নয়ন, প্রজনন তথা দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার জন্য প্রত্যেকটি জৈব বা অজৈব উপাদান প্রয়োজনীয় পরিমাণে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করতে হয়। এ জন্য উপাদান সমৃদ্ধ বিভিন্ন ধরনের সবজি গ্রহণ করতে হবে। একজন ব্যক্তির দৈনিক কোন উপাদান কতটুকু প্রয়োজন তা নির্ভর করে তার দেহের ওজন, লিঙ্গ, পেশা ও জলবায়ুর ওপর। একজন বয়স্ক ব্যক্তির (মহিলা এবং পুরুষ) জন্য দৈনিক বিভিন্ন উপাদান কতটুকু প্রয়োজন তা নিচে। উল্লেখ করা হলো।

খাদ্যোপাদান	পুরুষ	মহিলা
খাদ্য শক্তি	৩০০০ ক্যালরি	২০০০ ক্যালরি
প্রোটিন	৫৭ গ্রাম	৪৩ গ্রাম
ক্যালসিয়াম	৫০০ গ্রাম	৫০০ গ্রাম
আয়রন	১০ গ্রাম	২৮ গ্রাম
ভিটামিন-এ	২৫০০ আ.ইউ	২৫০০ আ.ইউ
ভিটামিন-বি১	১.৪ গ্রাম	১.৪ গ্রাম
ভিটামিন-বি২	১.৫ গ্রাম	১.৫ গ্রাম
ভিটামিন-বি৩	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম
ভিটামিন-সি	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম

দৈনিক খাদ্য তালিকায় যদি উক্ত পরিমাণ পুষ্টি উপাদানগুলো থাকে তবে তাকে সুষম খাদ্য বলে। উপরাক্তে খাদ্য

একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক খাদ্য তালিকায় যা থাকা উচিত			
চাল	ঃ ২৩৫ গ্রাম	শাক	ঃ ১২০ গ্রাম
গম/আটা	ঃ ১১৫ গ্রাম	সবজি	ঃ ১১৫ গ্রাম
মিষ্টি আলু	ঃ ২৪০ গ্রাম	মাছ	ঃ ৩০ গ্রাম
ডাল	ঃ ১১৫ গ্রাম	তেল	ঃ ১৫ গ্রাম
		ফলমুল	ঃ ৬০ গ্রাম

স্বাস্থ্য রক্ষায় বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের ভূমিকা

বাস্থ্য রক্ষার্থে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের ভূমিকা এবং তাদের চাহিদা মেটাতে শাকসবজির অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক. শর্করা ও রেহ উপাদান ঃ এ জাতীয় খাদ্যসমূহ শরীরের তাপমাত্রা রক্ষা করে এবং দৈনন্দিন শারীরিক ও মানসিক কাজ কর্ম সমাধা করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা সরবরাহ করে। প্রয়োজনে আমিষও শক্তি সরবরাহ করতে পারে।

প্রতি গ্রাম শর্করা ৪.১০ ক্যালোরি শক্তি সরবরাহ করে। প্রতি গ্রাম স্নেহ ৯.৪৫ ক্যালোরি শক্তি সরবরাহ করে। প্রতি গ্রাম আমিষ ৫.৬৫ ক্যালোরি শক্তি সরবরাহ করে। ক্যালোরির অভাবে দেহের ওজন কমে আসে ও কাজকর্ম করার ক্ষমতা লোপ পায়। তাছাড়া এর অভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা কমে যায়, যার ফলে তাদের স্বাভাবিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে না। বিভিন্ন উৎস হতে পাওয়া ক্যালোরির স্থানগত কোন পার্থক্য নেই। তবে মোট চাহিদার অন্তত দশভাগ ক্যালরি স্নেহ হতে আসা উচিত, অন্যথায় রেহের মধ্যে দ্রবণীয় ভিটামিন (ভিটামিন এ, ডি, ই, কে) এর শোষণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্যালোরির প্রধান উৎস উদ্ভিজ ও প্রাণিজ খাদ্য। তবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) মতে, শরীরের চাহিদার কমপক্ষে শতকরা ৫% ক্যালোরি শাকসবজি ও ফলমূল থেকে আসা উচিত, যা ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের ও শারীরিক চাহিদা পূরণ করে থাকে।
নিচে শর্করা ও চর্বি সরবরাহকারী সবজির তালিকা দেয়া হলো।

শর্করা সমৃদ্ধ সবজি		চর্বি সমৃদ্ধ সবজি	
কচু জাতীয় সবজি ঃ ২৪.৪ গ্রাম ১০০ গ্রাম		করলা	ঃ ০.১ গ্রাম/১০০ গ্রাম
মটর শুটি	ঃ ২৩.৭ গ্রাম/১০০ গ্রাম	বেগুন	ঃ ২.৯ গ্রাম/১০০ গ্রাম
গোল আলু	ঃ ১৯.১ গ্রাম/১০০ গ্রাম		
মিষ্টি আলু	ঃ ২১.৬ গ্রাম/১০০ গ্রাম	ফুলকপি	ঃ ০.১ গ্রাম/১০০ গ্রাম
কাঁকরোল	ঃ ১৭.৪ গ্রাম/১০০ গ্রাম	কচুশাক	ঃ ১.৫ গ্রাম/১০০ গ্রাম

খ. প্রোটিন ঃ আমাদের দেহের জলীয় অংশটুকু বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তার অর্ধেকটাই প্রোটিন। দেহের প্রত্যেকটি কোষের মৌলিক কাঠামো প্রোটিন দ্বারা গঠিত। তাই দেহের সর্বত্রই প্রোটিন বিদ্যমান। যদিও মাংসপেশী এবং রক্তে প্রোটিন সর্বাধিক। দেহের মধ্যে প্রাটেনের প্রধান কাজ হলো টিস্যু তৈরির মৌলিক উপকরণ ও কাচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া এবং প্রয়োজনবোধে ক্যালোরি সরবরাহ করা। তাই বর্ধনশীল বালক-বালিকা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন সর্বাধিক। বয়স্ক লোকের দেহে প্রোটিন প্রধানত টিস্যু গঠন, শরীরকে সুরক্ষা ও ক্ষয়প্রাপ্ত টিস্যু পুনর্গঠন করে। প্রোটিনের অভাবে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। যদি শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য যেমন- শর্করা, ভিটামিন 'সি' প্রভৃতির অভাব ঘটে, তবে প্রোটিন শক্তি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্রাণিজ খাদ্য হলো প্রোটিনের প্রধান উৎস। যথা– মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি।

শাক সবজিতে অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম। প্রোটিন হলো এমাইনো এসিডের পলিমার; যেখানে ২০টিরও বেশি এমাইনো এসিড রয়েছে, যার মধ্যে ৮টি মানুষের জন্য অত্যাবশকীয় (শিশুর জন্য ১০টি তবে আরজিনিন, হিষ্টিডিন বেশি প্রয়োজন হয়)। শস্য কণায় যে প্রোটিন পাওয়া যায় তাতে বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড় না পাওয়া গেলেও শাকসবজিতে উক্ত এমাইনো এসিডসমূহ পাওয়া যায়। যেমন- ট্রিপটোফেন, মিথিওনিন, হিষ্টিডিন, ভ্যালিন, লিউসিন, ফিনাইল, এলানিন ইত্যাদি। সুতরাং নিয়মিত সবজি ভক্ষণ করলে এমাইনো এসিডের অভাব অল্প হলেও দূর করা সম্ভব। নিচে প্রোটিন সরবরাহকারী সবজির নাম দেয়া হলো।

মটর	ঃ ৭.৪ গ্রাম/১০০ গ্রাম	পালংশাক	ঃ ৩.৩ গ্রাম/১০০ গ্রাম এবং
শিম	ঃ ৩.৯ গ্রাম/১০০ গ্রাম	করলা	ঃ ১২.৫ গ্রাম/১০০ গ্রাম
কালো কচুশাক	ঃ ৬.৮ গ্রাম/১০০ গ্রাম		

গ. ভিটামিন ঃ ভিটামিন বলতে এমন কতগুলো যৌগিক পদার্থকে বঝায় যেগুলো ব্যতীত দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি সম্ভব নয়। পরিমাণের দিক দিয়ে যদিও ভিটামিনের চাহিদা ততো বেশি নয়, তবুও দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ভিটামিনের সামান্য অভাবে দেহে নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়। ভিটামিন এ-এর প্রধান উৎস হলো শাকসবজি ও ফলমূল। মানব দেহের চাহিদার প্রায় ৯০-৯৫% ভিটামিন সি, ৬০-৮০% ভিটামিন এ, ২০-৩০% ভিটামিন বি এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কে ও ই শাক সবজি ও ফলমূল হতে আসে।

ভিটামিন-এ ঃ উদ্ভিজ্জ ও প্রানিজ উভয় রকমের অনেক খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-এ আছে। প্রাণিজ খাদ্য দুধ, ডিম, মাখন কলিজা, মাছ ইত্যাদি।

উদ্ভিজ্জ খাদ্য ঃ সবুজ শাকসবজি, আলু, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, পাকা পেঁপে ইত্যাদি। ভিটামিন 'এ' এর প্রধান উৎস। উদ্ভিজ খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন 'এ' কতগুলো হলুদ বর্ণের রঞ্জক বিদ্যমান থাকে। এদেরকে ভিটামিন 'এ' এর প্রিকারসর বা ক্যারোটিন বলা হয়। ক্যারোটিন কলিজায় সহজেই সিক্ত হয়ে ভিটামিন 'এ' তে পরিণত হয়। শরীর বৃদ্ধির জন্য বিশেষ করে দাঁত উঠার সময় এবং দাঁতের পুষ্টির জন্য ও দৃষ্টি অক্ষুন্ন রাখার জন্য ভিটামিন 'এ' একান্ত প্রয়োজন। এর অভাবে রাতকানা রোগ হয় এবং 'এ' এর অভাব বেশি দিন ধরে চললে চোখ সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হতে পারে। এছাড়া শরীরে ভিটামিন 'এ' এর অভাব দেখা দিলে সহজেই মানুষ ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়। সবুজ শাকসবজি মানব দেহের চাহিদার ৩০% ভিটামিন এ সরবরাহ করে। বিভিন্ন শাকসবজি থেকে যে পরিমাণ ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ

লালশাক	ঃ ১১.৯৪ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম	ডাঁটাশাক	ঃ ১০.১০ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম
কচুশাক	ঃ ১২.০০ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম	পুঁইশাক	ঃ ১২.৭৫ গ্রাম/ ১০০ গ্রাম;

ভিটামিন বি$_{১}$ ও দেহের মধ্যে শ্বেতসারের বিপাক ক্রিয়ায় থায়ামিণের প্রয়োজন। স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাজ সম্পাদনের ব্যাপারেও এটি জড়িত। এর অভাবে ক্ষুধা কমে যায়, মানসিক অবসাদ বিষন্ন হওয়া ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়, শরীরের তাপ ও ওজন কমে যায় ,স্মরণশক্তি কমে আসে, হজম শক্তি লোপ পায় এবং দুর্বলতা দেখা দেয়। এর অভাব বেশিদিন ধরে চললে বেরিবেরি রোগের সৃষ্টি হয়- যা মানুষকে পঙ্গু করে ফেলে। ভিটামিন বি, -এর উৎস হলো- ঢেঁকিছাটা সিদ্ধ চাল, ডিম, মাছ, কলিজা ইত্যাদি।

শাকসবজিতে ভিটামিন বি-এর পরিমাণ সবুজ কচুশাক ঃ ০.২২ গ্রাম/১০০ গ্রাম।

পটল ঃ ০.৩০ গ্রাম/১০০ গ্রাম ডাটাশাক ঃ ০,২৬ গ্রাম/১০০ গ্রাম। ঝিঙা ৪

০.১১ গ্রাম/১০০ গ্রাম শালগম। ঃ ০.৩১ গ্রাম/১০০ গ্রাম।

ভিটামিন বি$_{২}$, ও সুস্বাস্থ্য ও দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য রিবোফ্লোভিনের দরকার হয়। এর অভাবে- চর্ম রোগ হয়, চোখের জ্যোতিশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, ঠোট ও নাকফোলা দেখা দেয় ইত্যাদি। ভিটামিন বি, পাওয়া যায়- ডিম, কলিজা, দুগ্ধজাতীয় খাবার, শাকসবজি, কালো কচুশাক, কলমিশাক, পুঁইশাক ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে বি, পাওয়া যায়।

ভিটামিন বি$_{৩}$, ৪ হজম শক্তি ও চামড়ার মসৃণতা বৃদ্ধিতে এই ভিটামিনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এর অভাবে পগা রোগ দেখা দেয়। যার ফলে শরীরের অঙ্গসমূহ লাল হয়ে উঠে এবং পরবর্তীতে চর্মরোগ দেখা দেয়। জিহ্বাতেও এ রোগ দেখা দিতে পারে। দুধ, মাছ, মাংস, কলিজা, চীনাবাদাম, মাশরুম এবং শাকজাতীয় খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়াসিন ওয়া যায়।

ভিটামিন বি৬ (পাইরিডক্সিন) ঃ প্রোটিন মেটাবলিজমের জন্য ভিটামিন বি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। এর অভাবে ত্বক, লিভার, রক্ত নালিকা স্নায়ুতন্ত্রে ত্রুটি দেখা দেয়।

ভিটামিন বি১২ ঃ এর অভাবে ডিএনএ- এর গঠন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। ইহা সব পাতাজাতীয় সবজি এবং সবুজ শাক সবজিতে পাওয়া যায়।

ভিটামিন সি (এসকরবিক এসিড) ঃ এ ভিটামিন দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, বিভিন্ন পেশীর কোষসমূহকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত রাখতে সাহায্য করে এবং ক্যালসিয়াম ও লোহার বিপাকে সহায়তা করে। ভিটামিন 'সি'- এর অভাবে স্কার্ভি রোগ দেখা দেয়। এ রোগের আক্রমণে দাঁত ক্ষয় হয়, দাঁতের মাড়ি হতে রক্ত পড়ে এবং হাত পা ফুলে যায়। ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধে 'সি' ভিটামিনের অবদান প্রমাণিত হয়েছে। দেহের চাহিদার ২৪% ভিটামিন সি সবুজ শাকসবজি, ১৫% গোল আলু, ৩৫% টমেটো ও লেবুজাতীয় ফল হতে আসে। ফলের মধ্যে আমলকি, পেয়ারা, লেবু এবং সবজির মধ্যে বিবিন্ন জাতের শাক, বাঁধাকপি, টমেটো ভিটামিন 'সি' এর ভালো উৎস। গাছ থেকে সংগ্রহ করার পর থেকে ফল ও সবজিতে ভিটামিন 'সি' এর পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। ধৌত ও রান্নার সময় ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয় বিধায় টাটকা অবস্থায় ফল ও সম্ভব হলে সবজি অসিদ্ধ অবস্থায় খাওয়া বাঞ্ছনীয়। নিচে বিভিন্ন সবজিতে ভিটামিন 'সি' এর পরিমাণ উল্লেখ করা হলো।

মূলাশাক	ঃ ১৪৮ গ্রাম/১০০ গ্রাম
পালংশাক	ঃ ৯৭ গ্রাম/১০০গ্রাম
ডাটাশাক	ঃ ৭৮ গ্রাম/ গ্রাম/১০০গ্রাম
কাঁচা মরিচ	ঃ ১২৫ গ্রাম/ গ্রাম/১০০গ্রাম
উচ্ছে	ঃ ৯০ গ্রাম/ গ্রাম/১০০গ্রাম।

ভিটামিন ই ঃ এ ভিটামিন টোকোফেরল নামেও পরিচিত। বন্ধ্যাত্ব নিবারণে এ ভিটামিন সহায়তা করে। বাধাকপি, পালং শাক, রসুন, কাঁচা মটরশুটিতে ভিটামিন ই বিদ্যমান।

ভিটামিন 'কে' ঃ রক্তে অবস্থিত প্রোথ্রোম্বিন নামক পদার্থ রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। ভিটামিন 'কে' এই পদার্থটি তৈরি করে। তাই ভিটামিন কে এর অভাব হলে ক্ষতস্থান হতে রক্ত ক্ষরণ সহজে বন্ধ হয় না। প্রসবের সময় যাতে অধিক রক্তপাত না ঘটে সে জন্য গর্ভবতী মাকে ভিটামিন 'কে' বেশি দেওয়া হয়। বাঁধাকপি, গাজর ও ফুলকপিতে ১০ গ্রাম এ ২-৪ গ্রাম ভিটামিন 'কে' পাওয়া যায়।

ঘ. খনিজ পদার্থ- শরীরের সুষ্ঠু গড়নের জন্য খনিজ পদার্থ অপরিহার্য। বিভিন্ন ধরনের প্রধান খনিজ পদার্থগুলো হচ্ছে Ca, Fe, K, Mn, Na, Cl, Cu, Zn ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে কোন কোন উপাদান শরীরের হাড়, রক্ত বা হরমোন তৈরির কাজে নিয়োজিত। অন্যগুলো দেহের তরল পদার্থে লবণরূপে দ্রবীভূত হয়ে থাকে এবং পেশী ও কোষের বাহ্যিক ও রাসায়নিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে। শরীরের মোট ওজনের শতকরা ৪.৩ থেকে ৪.৪ ভাগ খনিজ পদার্থ থাকে।

ক্যালসিয়াম ঃ দেহে Ca এর অভাব হলে হাড় ও দাঁতের গঠন দুর্বল হয় এবং সহজে ভেঙে যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের শাক, তিলের বীজ, নারিকেল, ইলিশ মাছ, ধনিয়া, জিরা, দুধ Ca এর ভাল উৎস। শাকসবজির মধ্যে ঢেঁড়শে ১১৬ গ্রাম/১০০ গ্রাম, কালো কচু শাকে ৪৬০ গ্রাম/১০০ গ্রাম, সবুজ কচু শাকে ২২৭ গ্রাম/১০০ গ্রাম, লাল শাকে ৩৭৪ গ্রাম/১০০ গ্রাম, ডাঁটাতে ২৬০ গ্রাম/১০০ গ্রাম ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়।

২০২২

লোহা ঃ লোহা হিমোগ্লবিন এর একটি উপাদান। হিমোগ্লবিন ফুসফুসে হতে দেহের সর্বত্র O_2 দেয়া এবং দেহের

বিভিন্ন অংশ হতে CO_2 বহন করে নিয়ে আসার কাজ করে। হিমোগ্লবিন সবসময় স্থায়ী থাকে না। অনবরত উৎপন্ন হয় ও ধ্বংস হয়, ফলে এটি উৎপন্ন হওয়ার জন্য দেহে নিয়মিত লোহা সরবরাহ করতে হয়। লোহার অভাবে রক্ত শূন্যতা সৃষ্টি হয়। বাচ্চা এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য লোহার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কালো কচুশাকে ৩৮.৭ গ্রাম/১০০ গ্রাম, সবুজ কচুশাকে ১০ গ্রাম/১০০ গ্রাম, লেটুসে ২৪ গ্রাম/১০০ গ্রাম, পুঁইশাকে ১০ গ্রাম/১০০ গ্রাম, ডাঁটাশাকে ২৫.৫ গ্রাম/১০০ গ্রাম লাহো পাওয়া যায়।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমুহকে বিজ্ঞানীগণ কয়টি ভাগে ভাগ করেছে ?

২. এক গ্রাম শর্করা কত কিলো ক্যালরি শক্তি সরবরাহ করে ?

৩. কোন পুষ্টির অভাবে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় ?

৪. দৃষ্টি অক্ষুন্ন রাখার জন্য কোন ভিটামিন একান্ত প্রয়োজন ?

৫. শরীরে প্রোটিন মেটাবলিজমের জন্য কোন ভিটামিন একান্ত প্রয়াজন?

৬. দেহের চাহিদার কত % ভিটামিনগুস্থি সবুজ শাক সবজি হতে আসে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলোর নাম লেখ।

২. একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক খাদ্য তালিকায় কী থাকা উচিত ?

৩. শরীরে প্রোটিনের কাজ কী তা বর্ণনা কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্বাস্থ্যরক্ষায় বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের মধ্যে প্রোটিন ও ভিটামিনের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

সবজি চাষের সাধারণ নিয়মাবলি

সবজি চাষের জন্য জমি ও মাটি নির্বাচন

শাক সবজি ভেদে শাক সবজি চাষের জন্য যথেষ্ট আলো বাতাসের সুবিধা আছে এমন জমি নির্বাচন করা উচিত। বিশেষ করে ফল জাতীয় সবজির (বেগুন, ঢেঁড়শ, টমেটো, কুমড়া, শশা, পেঁপে, মরিচ, চিচিঙ্গা, ধুন্দল, করলা, কাঁকরোল, বরবটি, শিম ইত্যাদি) জন্য আলোর দরকার হয়। শাক ও মূল জাতীয় সবজি (ডাঁটা, পুঁইশাক, কলমিশাক, সিলারি, লেটুস, বিট, গাজর, মূলা, শালগম) কিছু কম আলোতে এবং কচু, মেটে আলু, গাছ আলু ইত্যাদি সবজি ছায়াতেও ভালোভাবে জন্মাতে পারে।

সারা বছর শাক সবজি চাষাবাদের জন্য সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা আছে এমন উঁচু জমি সুবিধাজনক। পানি সেচ ও নিকাশের জন্য জমি মোটামুটি সমতল ও একদিকে কিছুটা ঢালু থাকলে ভালো হয়। সবজি বাগান এমন জমিতে হওয়া উচিত যেখানে কাছাকাছি পানির উৎস আছে এবং সহজেই পানি সেচ ও নিকাশ করা যায়। সবজি বাগানে ছায়া যত কম পড়বে ততই ভালো। শাক সবজির বাগান যদিও সাধারণত বাড়ির আশে পাশেই করা হয়ে থাকে এবং সহজে দেখাশোনা করা যায়। তবে সবজির চাহিদা ও উৎপাদনের উদ্দেশের ওপর ভিত্তি করে জমির স্থান নির্বাচন করা উচিত। যেমন- গার্হস্থ্য সবজি বাগান, বিক্রয়মূলক সবজি বাগান, সৌখিন সবজি বাগান, বাহির বাণিজ্য বাগান ইত্যাদি।

গার্হস্থ্য সবজি বাগান

এ ধরনের সবজি বাগানের জন্য যে কোন ধরনের যে কোন আকারের খণ্ড জমি হলেই চলে। এ ধরনের সবজি বাগান সাধারণত ছোট আকারের হয়ে থাকে। যতদূর সম্ভব বাড়ির আশে পাশে পতিত বা ফঁকা স্থানগুলোতে এ বাগান করা হয়। এক্ষেত্রে পরিবারের চাহিদা পূরণের জন্য স্বল্প সময়ে বেশি পরিমাণে জন্মে এমন ধরনের সবজি নির্বাচন করে চাষ করা হয়। এ বাগানে কী কী শাক সবজি জন্মানো হবে তা পরিবারের লোকজনদের আবার পছন্দের ওপর নির্ভর করে। বাড়ির আশে পাশের জমিতে বাগান করা হয় বলে পরিবারের মেয়েরা এ ধরনের বাগানের সুযোগ বুঝে কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সবজি সংগ্রহও মহিলারাই করে থাকে।

শাক সবজি যতদূর সম্ভব টাটকা অবস্থায় খাওয়া উচিত। গার্হস্থ্য সবজি বাগান হতে বেশি ফলপ্রসুভাবে টাটকা অবস্থায় পছন্দমত শাক সবজি সহজে সংগ্রহ করা যায়। সারা বাংলাদেশে প্রায় ১.৫ কোটি খানা আছে এবং প্রতি খানাতেই কিছু কিছু করে সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। এতে জমির নিবিড় ব্যবহার, পরিবারের বিভিন্ন জনের শ্রমের ব্যবহার হয় এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়।

সৌখিন সবজি বাগান

অনেকে টমেটো, বেগুন, মরিচ, শিম বা কপিজাতীয় ২-৪টি গাছ বাসার সামনে, টবে, ড্রামে বা ছাদে লাগায় নিতান্তই শখের বসে। অবসর সময়ে, কাজের ফাঁকে বা বিকেলে গাছের যত্ন নিতে আনন্দ বোধ করে এবং গাছে ২-৪টা ফল ধরলে খুব আনন্দ পায়। অনেকে সৌখিন বাগানকে গার্হস্থ্য সবজি বাগান বলে থাকে।

বাণিজ্য সবজি বাগান ঃ বিদেশের চাহিদা মোতাবেক বিশেষ ধরনের সবজি নির্দিষ্ট এলাকায় উৎপাদন করা হয়। বাংলাদেশে সে ধরনের সবজি জোন গড়ে উঠেনি। তবে এ ধরনের বাগান তৈরি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব।

বিক্রয়মূলক সবজি বাগান

বাজারের চাহিদা এবং বেশি মূল্য পাওয়ার ওপর জোর দিয়ে সাধারণ এ ধরনের বাগান করা হয়। আগেকার দিনে যে সমস্ত বিক্রয়মূলক সবজি বাগান ছিল তা শহরের আশে পাশে সীমাবদ্ধ থাকতো। কিন্তু বর্তমানে কৃষি বাণিজ্যিকীকরণসহ বিভিন্ন কারণে শহর বা বাজার হতে অনেক দূরবর্তী স্থানেও শাক সবজি ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে। যেহেতু রাস্তাঘাট ও যানবাহনের সুবিধা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনগণের রুচি পরিবর্তন ও চাহিদা বাড়ছে, অধিক লাভজনক ও নতুন নতুন আকর্ষণীয় সবজি প্রবর্তিত হচ্ছে।

সৌখিন সবজি বাগান

অনেকে টমেটো, বেগুণ, মরিচ, শিম বা কপিজাতীয় সবজির ২-৪টি গাছ বাসার সামনে বা টবে বা ড্রামে বা ছাদে লাগায় নিতান্তই শখের বসে। অবসর সময়ে বা কাজের ফাঁকে বা বিকেলে গাছের যত্ন নিতে আনন্দ বোধ করে এবং গাছ বড় হলে ২-৪টা ফল ধরলে খুব আনন্দ পায়। অনেকে সৌখিন বাগানকে গার্হস্থ্য সবজি বাগান বলে থাকে।

মাটির বৈশিষ্ট্য বুঝে সবজি চাষের জন্য জমি ও মাটি নির্বাচন

মাটির বৈশিষ্ট্য ঃ জমি মাটি দ্বারা গঠিত যা জৈব পদার্থযুক্ত। গাছপালা সে মাটি হতে গাছের প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। মাটি একটি জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল পদার্থ। মাটির বৈশিষ্ট্য অনুসারে সকল মাটিকে তিনভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা- (ক) ভৌতিক (খ) রাসায়নিক ও (গ) জৈবিক।

(ক) ভৌতিক- মাটি বিভিন্ন প্রকার কণার সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন প্রকার কণার পরিমাণের ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে মাটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এতে মাটির বুনট, সংযুক্তি, ঘনত্ব, মাটিতে রন্ধ্রতা, মাটির রং, দৃঢ়তা ও কমনীয়তা, তাপমাত্রা, পানি ধারণক্ষমতা বৈশিষ্টগুলো থাকবে। বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–
(১) পাথুরে মাটি (২) বেলে মাটি (৩) পলি মাটি (৪) কাদা মাটি (৫) দোঁআশ মাটি।

(১) পাথুরে মাটি- পাথর গুড়ি, কাঁকর ও বালির সমন্বয়ে এ মাটি গঠিত। এ মাটি চাষ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও কৃষি কাজের জন্য অনুপযোগী। এর কণাগুলো খালি চোখে দেখা যায়।

(২) বেলে মাটি- শতকরা ৭০ ভাগ বা তার অধিক বালিকণাযুক্ত মাটি। নদীর চর, চরাভূমি, মরুঅঞ্চল এবং বৃষ্টিবহুল এলাকায় এরূপ মাটি দেখা যায়। এ মাটি সহজে কর্ষণ করা যায়; কিন্তু অনুর্বর ও পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। এ মাটিতে আগাম শীতকালীন সবজি ও মূলজাতীয় ফসল ভালো জন্মে। এর কণাগুলো খালি চোখে দেখা যায়।

(৩) পলি মাটি- নদীর তীরবর্তী ও প্লাবিত অঞ্চলে এ ধরণের মাটি বেশি পাওয়া যায়। এ মাটি উর্বর, তাই সব ধরনের সবজিই জন্মানোর উপযোগী। এর কণাগুলো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ভালোভাবে দেখা যায়।

(৪) কাঁদা মাটি- শতকরা ৪০-৫০ ভাগ কর্দম কণাযুক্ত মাটি। এ মাটিতে পলিকণার পরিমাণ বেশি থাকে এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি। ভিজা অবস্থায় খুবই নরম ও আঁঠালো প্রকৃতির থাকে, কিন্তু শুকালে খুবই শক্ত হয়। সবজি চাষের জন্য এ মাটি খুব বেশি সুবিধাজনক নয়। এর কণাগুলো অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখতে কষ্টকর হয়।

(৫) দোঁআশ মাটি- শতকরা ৭০ ভাগের কম ও ২০ ভাগের বেশি বালিকণা বিশিষ্ট মাটি। কোন কোন ক্ষেত্রে বালিকণার পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ পর্যন্ত নেমে গেলেও মাটি দোঁআশ হতে পারে। তবে আদর্শ দোঁআশ মাটিতে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ বালিকণা এবং অর্ধেক পরিমাণ পলি ও কর্দমকণার মিশ্রণ থাকে।

দোঁআশ মাটিতে বালি ও কর্দম কণার কম বেশির অনুপাত অনুসারে এ মাটিকে আবার দুভাগে ভাগ করা হয়। যথা– (ক) বেলে দোঁআশ ও (খ) এঁটেল দোআশ।

(ক) বেলে দোঁআশ- বেলে দোঁআশ মাটিতে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ হতে ৬৫ ভাগ পর্যন্ত বালি থাকতে পারে।

(খ) এটেল দোঁআশ- এটেল দোআশ মাটিতে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ কর্মকণা এবং একই পরিমাণ পলি কণা থাকতে পারে।

এছাড়া পলি কণার তারতম্য অনুসারে দোঁআশ মাটিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- (১) পলি দোঁআশ ও (২) পলি এঁটেল দোঁআশ।

(১) পলি দোঁআশ- পলি দোঁআশ মাটিতে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ পলি ও ২০ ভাগ কর্দম কণা এবং

(২) পলি এঁটেল দোঁআশ- এ মাটিতে শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ বালি এবং ৩০ ভাগ কর্দম কণা থাকে। দো-আশ মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা বেশি এবং এর অভ্যন্তরে বেশি পরিমাণে বায়ু চলাচল করতে পারে। তাই এ মাটি গভীর তর পর্যন্ত রসালো থাকে। এ মাটি ঝুরঝুরে প্রকৃতির ও উর্বর হয়ে থাকে তাই এ মাটিতে যে কোন ফসল ভালোভাবে জন্মানো যায়।

(খ) রাসায়নিক- রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা মাটির উর্বরতা এবং মাটিতে পুষ্টির অভাব আছে কি না তা জানা যায়। সাধারণত দুই ধরনের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়। যথা- মাটিতে মোট পুষ্টির পরিমাণ ও গাছের খাদ্য হিসেবে উপযোগী প্রয়োজনীয় পুষ্টি। মাটির রাসায়নিক উপাদান তথা গাছের পুষ্টি উপাদানগুলো যথা- নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সালফার, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, বোরণ, কপার, জিংক, আয়োডিন, মলিবডেনাম ইত্যাদি। এগুলো মাটির মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে থাকা দরকার; যেহেতু শাক সবিজর স্বাভাবিকভাবে জন্মানোর জন্য এগুলো প্রয়োজন। এই উপাদানগুলো উপযুক্ত পরিমাণে না থাকলে গাছ গাছড়ার বৃদ্ধিতে নানা ধরনের অসুবিধা হয়। উল্লিখিত উপাদানগুলোর মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও জিংক গাছের জন্য বেশি পরিমাণে দরকার হয়। তাই সুষ্ঠুভাবে ফসল ফলানোর জন্য এগুলো জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। তবে অন্যান্য উপাদানগুলো খুব অল্প পরিমাণে দরকার হয় এবং মাটিতে যে পরিমাণে আছে তাতেই ফসলের প্রয়োজন মিটে যায়। তবে সারা বছর ঘন ঘন ফসল চাষের ফলে অন্যান্য উপাদানগুলোর ঘাটতিও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে।

মাটিতে হাইড্রোজেন আয়রনের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে মাটি অম্ল বা ক্ষার হয়। শস্য উৎপাদন এই অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের (পি.এইচ মানাঙ্ক) ওপর নির্ভর করে। এই অম্লত্ব বা ক্ষারত্বকে পি.এইচ মানাঙ্ক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। পি.এইচ-এর নিরপেক্ষ মানাঙ্ক ৭। এর নিচের মানাঙ্ক অম্ল এবং উপরের মানাঙ্ক ক্ষার। নিরপেক্ষ মানাঙ্ক হতে অম্ল বা ক্ষারের মান যত দূরে হবে মাটি ততবেশি অম্ল বা ক্ষার হবে। বিভিন্ন শাক সবজির চাষ উপযোগী পি.এইচ মানাঙ্ক সারণিতে দেয়া হলো।

২০২২

অম্লমাটি- যে মাটির পি.এইচ মানাঙ্ক ৭ এর চেয়ে কম থাকে তাকে অম্লীয় মাটি বলে। মাটিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বা চুনের অভাব হলে বা জৈব পদার্থ বেশি হলে মাটি অম্লীয় ভাবাপন্ন হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে বেশি বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টির পানির সাথে চুন মাটির অভ্যন্তরে চুয়ায়ে যায়। এর ফলেও মাটিতে অম্লীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া এমোনিয়াম সালফেটজাতীয় সার বেশি পরিমাণে ব্যবহার করলে এবং বৃষ্টিপাত কম হলে মাটিতে অম্লত্ব সৃষ্টি হয়। শাকসবজি সাধারণত অম্লীয় মাটিতে ভালো জন্মে।

ক্ষারীয় মাটি- যে মাটির পি.এইচ মানাঙ্ক ৭ এর উপরে থাকে তাকে ক্ষারীয় মাটি বলে। কোন মাটিতে পানি নিকাশের ব্যবস্থা না থাকলে এবং দীর্ঘদিন ধরে বাষ্পীয়ভবন হলে সেখানে লবণাক্ততা ও ক্ষারীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ ধরনের মাটিতে লৌহের অভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং ক্ষার সহিষ্ণু ফসল ছাড়া অন্য ফসল ভালোভাবে জন্মে না। মাটির পি.এইচ মানাঙ্ক নিরপেক্ষ করার জন্য চুন প্রয়োগের পরিমাণ সারণিতে দেওয়া হলো মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রধান বিক্রিয়ার শ্রেণি]।

সারণি : অম্লীয় মাটি ও ক্ষারীয় মাটির নির্দেশিকা

ক্রমিক	প্রধান বিক্রিয়া	অম্লমান মাত্রা
১.	০-৫.৫	অম্ল মাটি
২.	৫.৫-৫	
৩.	৬.০-৬.৫	প্রশম মাটি
৪.	৬.৫-৭.৫	প্রশম মাটি, তবে নিরপেক্ষ মান ৭.০। ৭.০ এর নিচে অম্ল এবং উপরে ক্ষার বিক্রিয়া।
৫.	৭.০-৮.০	
৬.	৮.০-৮.৫	
৭.	৮.৫- উপরে	ক্ষারীয় মাটি

অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব সংশোধনের উপায়

	অম্লীয় মাটি		ক্ষারীয় মাটি
১.	পানি নিকাশ ব্যবস্থা ও সেচের পানির উন্নয়ন	১.	পানি নিকাশের ব্যবস্থা করা
২.	চুন বা ক্যালসিয়াম প্রয়োগ	২.	পাবন সেচের দ্বারা জমি ধৌত করা
৩.	উপযুক্ত শস্যচক্র অনুসরণ	৩.	জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জিপসাম বা ক্যালসিয়াম সালফেট ব্যবহার করা
৪.	কাঠের ছাই প্রয়োগ, জৈব সার প্রয়োগ, সুষম মাত্রার সারের ব্যবহার	৪.	মাটির উপরিভাগে খড়কুটার মালচিং দ্বারা পানির বাষ্পীভবন রোধ করা
৫.	মাটিতে চুন প্রয়োগের একমাসের মধ্যে গোবর, খৈল, ইউরিয়া ব্যবহার না করা এবং বীজ/চারা রোপণ বা বপন না করা	৫.	জমির উপরিভাগের মাটি ৫-১০ সে.মি. গভীর করে অপসারণ করা

সারণি ঃ বিভিন্ন শাক-সবজির চাষ উপযোগী পি, এইচ মানাঙ্ক

সবজির নাম		যে পি এইচ মানাঙ্কে জন্মানো সম্ভব	সর্বোত্তম পি.এইচ মানাঙ্ক	মন্তব্য
১.	বাঁধাকপি	৫.৮-৭.৫	৬.৫	১। কপি জাতীয় সবজির ক্লাবরট প্রতিরোধ হয় পি.এইচ নিরপেক্ষ মানাঙ্কে বা তার কিছু উপরে
২.	ফুলকপি	৫.৫-৬.৬	৬.২	
৩.	ব্রকোলী	৫.৫-৬.৬	৬.২	
৪.	চিনা বাঁধাকপি	৫.৫-৭.০	৬.৪	
৫.	মটরশুটি	৫.৯-৭.২	৬.৫	
৬.	ওলকপি	৫.৯-৭.২	৬.৫	
৭.	টমেটো, মরিচ, মূলা, ডাটা, লালশাক, লাউ, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা	৫.৫-৭.৫	৬.৫	
৮.	বেগুন, মিষ্টিআলু	৬.০-৭.৬	৬.৪	
৯.	চালকুমড়া, গাজর, মুখীকচু, কীম, শশা করলা, বরবটি	৫.৫-৭.৩	৬.৩	
১০.	গোল আলু, শালগম, পেঁয়াজ, পালংশাক, ভুট্টা, বীট, লেবু	৪.৬-৭.৪ ৬.০-৭.০	৬.২ ৬.২	গোল আলু স্ক্যাব রোগ পি.এইচ মানাঙ্ক ৫.৫ এ প্রতিরোধ হয়।

সারণি ঃ পি.এইচ মানাঙ্ক সংশোধনের জন্য চুন প্রয়োগের পরিমাণ

মাটির রকম	বিভিন্ন পি.এইচ মানাঙ্ককে নিরপেক্ষ করতে চুনের চাহিদা (কেজি/হেক্টর)						
	৫.২	৫.৪	৫.৬	৫.৮	৬.০	৬.২	৬.৪
বেলে দোঁআশ	৯৭৫	৮২৫	৬৭৫	৫২৫	৩৭৫	২৫৫	৭৫
দোঁআশ	১৪৬২	১২৩৭	১০১২	৭৮৭	৫৬২	৩৩৭	১১২
এঁটেল দোঁআশ	২২৭৫	১৯২৫	১৫৭৫	১২২৫	৮৭৫	৫২৫	১৭৫

মাটি যত ভারী হবে চুনের পরিমাণ তত বেশি লাগবে। দোঁআশ বেলে মাটির চেয়ে এঁটেল মাটিতে চুন প্রয়োজন প্রায় দ্বিগুণ। কোন মাটির অম্লমান ৬.০ থেকে ৬.৫-এ বাড়াতে যে পরিমাণ চুন প্রয়োজন, অম্লমান ৪.৫ থেকে ৫.০ -তে উন্নীত করতে প্রায় ৩ গুণ বেশি চুন প্রয়োজন।

(গ) জৈবিক- মাটিতে অনেক প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু আছে। যথা- নানা রকম ব্যাকটেরিয়া, মোল্ড, ইষ্ট, প্রটোজোয়া এবং ফানজাই। এই সমস্ত জীবাণুসমূহের রাসায়নিক কার্যাবলির ফলে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ অংশ পঁচে জৈব সারে রূপান্তরিত হয়। কতকগুলো ব্যাকটেরিয়া শিম বা ডাল জাতীয় শস্যের শিকড়ে বাতাস হতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে জমা করে। কতগুলো ব্যাকটেরিয়া এমোনিয়া এসিডকে এমোনিয়াতে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করে। কিছু কিছু গাছপালা কেবল নাইট্রোজেন এমোনিয়া রূপে থাকলে তা গ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশে সবজি চাষের জমির অবস্থা

বাংলাদেশের সবজি উৎপাদন পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গেলে সবজি চাষের আওতায় জমির পরিসংখ্যান জানা দরকার। তবে সবজি চাষের আওতায় জমি ও উৎপাদনের সঠিক তথ্য নিরূপণ করার খুব কঠিন। কারণ দু'একটি ফসল ছাড়া প্রায় ফসলই ব্যাপকভাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাষ করা হয় না। যেমন- তরমুজ, আলু, গাজর, শিম ইত্যাদি।

তাছাড়া বাংলাদেশে জমির আইল ও বসতবাড়ির এলাকায় জন্মানো সবজির পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবুও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে জমির ব্যবহার ও সবজি চাষের পরিসংখ্যান সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি ঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে জমির ব্যবহার

ফসলের নাম	আবাদকৃত জমি (হাজার হেক্টরে)			
	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
দানাজাতীয় শস্য	১০৬৯৮	১০৬৬০	১৭৯৮৮	১৮২২৯
ডালজাতীয়	৭০৯	৭১১	৬৪৬	৫৮৯
তৈলজাতীয়	৫৫৯	৫২৯	৫৬৯	৭৫২
মশলাজাতীয়	১৪৪	১৪৩	১৫০	১৫৩
তুলা	৩২	৩৩	২৬	২৭
পাট	৪৭৯	৩০০	৪৭১	৪৭৩
চা	৪৮	৪৮	৫০	৫১
চিনিজাতীয়	১৯৪	১৯৪	১৭৪	১৭৪
তামাক	৩৭	৩৬	৩২	৩৩
ফল	১৭৪	১৭৭	১৯০	১৯২
শাক সবজি	১৮১	১৮৫	৬৪১	৬৫১

সারণি ঃ বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ ও বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ

জমির ব্যবহারের ধরণ	জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টরে)		
	১৯৯২-৯৩	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮
মোট এলাকা	১৪৮.৪৬	১৪৮.৪৬	১৪৮.৪৬
মোট আবাদযোগ্য জমি	৭৯.০	৭৭.২৮	৯০.৯৪
চাষের অযোগ্য জমি	৪.১	৪.২	৪.১
চাষযোগ্য পতিত	৩.১২	৩.২৩	২.৭৮
চলতি পতিত	৩.৭৬	৪.০৭	৪.০৪
বনাঞ্চল	১.৮	১.৯	১.৫২
এক ফসলী জমি	৩০.০২	২৮.৭৩	১৮.৫৫
দুই ফসলী জমি	৩৮.৭২	৪১.৩৪	৪৪.৪২
তিন ফসলী জমি	৯.৯০	১০.২৭	১৮.৭১
মোট ফসলী জমি	১৩৭.০৬	১৪২.২২	১৬৫.০০

বাংলাদেশে সাধারণত ১৫-২৮ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি বিরাজ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে এর পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। খাদ্য বলতে আমরা সাধারণত দানা জাতীয় শস্যকে বিবেচনা করে থাকি। বর্তমানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়ায় ও সচেতনতা বাড়ার সাথে সাথে দানাজাতীয় খাদ্যের সাথে সবজি ও ফসলের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে দানাজাতীয় শস্যের (ধান ও গম উৎপাদন, ঘাটতি এবং আমদানির হিসেব নিচে সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ঃ বাংলাদেশে ধান ও গমের উৎপাদন ঘাটতি এবং আমদানির পরিমাণ।

সন	মোট খাদ্য চাহিদা (০০০ মেঃ টন)	খাদ্য শস্য উৎপাদন (০০০ মেঃ টন)	খাদ্য শস্য ঘাটতি (০০০ মেঃ টন)	খাদ্য শস্য আমদানি (০০০ মেঃ টন)
১৯৯১-৯২	১৮৭০৪	১৭০৮৩	১৬২৬-	১৫৬৩
১৯৯২-৯৩	১৯০৪০	১৭২৫৭	১৭৮৩-	১১৮৩
১৯৯৩-৯৪	১৯৩৭১	১৭১৮৩	২১৮৮-	৯৬৬
১৯৯৪-৯৫	১৯৭০২	১৬২৬৯	৩৪৩৩-	২৫৬৮
২০০৬-০৭	২৪৫২০	৩৩০৮৪	৮৫৬৪+	১৫০০
২০০৭-২০০৮	২৪৮৫৬	৩৫২৯৩	১০৪৩৭+	১০০০

আমাদের দেশে শাকসবজি অপেক্ষা দানাজাতীয় শস্যের হেক্টর প্রতি ফলন অনেক কম। এছাড়া খাদ্যমানের দিক থেকেও সবজির মান অনেক উঁচুতে। কেননা প্রায় সকল সবজিতেই মানুষের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব ধরনের পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়। এমন অনেক সবজি আছে যেগুলো দানাজাতীয় শস্য উৎপাদন সময়কালের মধ্যে ২-৩ বার উৎপাদন করা সম্ভব হয়। যেমন- ধান বা গম উৎপাদন সময়ের মধ্যে লাল শাক, মূলা শাক, ডাটা ২-৩ বার জন্মানো যায়। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের চেয়ে সহজে সবজি জন্মানোর উপযোগী। কিন্তু নানাবিধ কারণে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের চাইতে হেক্টর প্রতি গড় ফলন অনেক কম।
২০২২ সারণিতে কয়েকটি দেশের দৈনিক মাথাপিছু গড় শাক সবজি উৎপাদনের (গ্রাম) পরিসংখ্যাণ দেয়া হলো।

সারণি ঃ বাংলাদেশের তুলনায় বিশ্বের কয়েকটি দেশের মাথাপিছু গড় শাক সবজি উৎপাদন (১৯৮৭)

দেশ	শাক সবজি (গ্রাম)
কয়েকটি উন্নত দেশ	
আমেরিকা	৩১৪
জাপান	৩৪৮
রাশিয়া	৩২৪
ইউরোপ	৩৮৮
এশিয়ার কয়েকটি দেশ	
দক্ষিণ কোরিয়া	৫৪৯
থাইল্যান্ড	১৬১
ফিলিপাইন	৩৯
চীন	২৭৭
ভারত	২৬৮
শ্রীলংকা	১৫১
মালয়েশিয়া	৭৯
পাকিস্তান	৭২
ইন্দোনেশিয়া	৫৩
নেপাল	৪৩
বাংলাদেশ	৩১

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে শুধু দানাজাতীয় শস্য উৎপাদন করে সহজে পুষ্টি সমস্যা ও পুষ্টিযুক্ত খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই শাক সবজি উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টি ঘাটতি ও দানাজাতীয় শস্যের উৎপাদন সমন্বয় করার চেষ্টা করা অপরিহার্য। বাংলাদেশ শাক সবজি ও দানাজাতীয় শস্যের গতিধারায় দেখা যায় যে দানাজাতীয় শস্যের চেয়ে শাক সবজির জমির পরিমাণ ও উৎপাদন বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৯৪-৯৫ সনে শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি একত্রে ৩৬২০০০ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়, যা মোট ফসলি জমির শতকরা ২.৬৯ ভাগ। ঐ একই সময়ে মোট ১০৫৬৬০০০ হেক্টর জমিতে দানাজাতীয় শস্য চাষ হয়, যা মোট ফসলি জমির শতকরা ৭৮.১০ ভাগ। বাংলাদেশে অধিকাংশ সবজি শীতকালে এবং সমতল ও উঁচু উভয় ধরনের জমিতে জন্মে থাকে। গ্রীষ্মকালে তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণ এবং কম সংখ্যক সবজি চাষ করা হয়। এক হিসেবে দেখা গেছে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ সবজি শীতকালে এবং ৩০ ভাগ সবজি গ্রীষ্মকালে জন্মে। নিচু এবং পাহাড়ি এলাকায় সবজি একেবারে চাষ হয় না বললেই চলে।

২০০৭-০৮ এ সবজি চাষ হয় ৬.৫১ লাখ হেক্টরে এবং দানাজাতীয় শস্য চাষ হয় ১৮২.২৯ লাখ হেক্টরে যা মোট আবাদি জমির যথাক্রমে ৮০% ও ৩%।

সবজি চাষের জমি তৈরি (কর্ষণ, বেড তৈরি, নালা তৈরি)

জমি তৈরির সুবিধাদি ও প্রস্তুত পদ্ধতি- সবজি চাষের জমি সমতল হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে পানি সেচ ও নিকাশের সুবিধা হয়। চাষের পূর্বে অসমতল জমি ও পূর্ববর্তী ফসলের আইল, কেয়ারী , মাদা ইত্যাদি কেটে সমতল করে নিতে হয়। জো অবস্থায় পুনঃ পুনঃ চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঢেলামুক্ত ও ঝুরঝুরে করতে হয়। শাকের ক্ষেত্রে ২০-২৫ সেমি, এবং মূলজাতীয় সবজির ক্ষেত্রে ৩০-৩৫ সেমি গভীর করে চাষ দিতে হয়। এ কাজ কোদাল, ট্রাক্টর বা রোটোভেটেরের সাহায্যে সহজে করা যায়। এক মৌসুমে জমি গভীরভাবে চাষ না করে কয়েক মৌসুমে অল্প অল্প করে গভীর করে চাষ দেয়া উচিত। একবারে গভীর করে চাষ করলে নিম্নস্তরের মাটি উপরে চলে আসে এবং সেক্ষেত্রে ভালো ফলন আশা করা যায় না। জমি যত ভালোভাবে তৈরি হয়, তত মাটির পানি ধারণ ও বায়ু চলাচল ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এতে গাছের শেকড় তত সহজে বিস্তার লাভ করে। ফলে গাছ অধিক খাদ্যোপাদান গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া মাটির স্বাভাবিক তাপ ও আর্দ্রতা বজায় থাকে। অপরদিকে অনিষ্টকারী কীট ও রোগ জীবাণু এবং আগাছা ইত্যাদি বিনষ্ট হয়। মাটির জীবাণুসমূহের মধ্যে বিশেষতঃ নাইট্রোজেনযুক্তকারী ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতা বেড়ে যায়।

জমি সঠিকভাবে ওলটপালট করে চাষের সময় রোদে উন্মুক্ত রাখতে হয়। মই দিয়ে জমি সমতল করে ঢেলা ভেঙে ঝুরঝুরে করতে হয়। আঁচড়া দিয়ে আগাছা টেনে পরিষ্কার করতে হয়। ভেজা অবস্থায় জমি চাষ দেওয়া ঠিক নয়। বিশেষ করে এঁটেল মাটি ভিজা অবস্থায় চাষ করলে ঢেলা ভাঙ্গা দুরহ হয়ে যায়। দোঁআশ মাটি কিছু ভিজা অবস্থায় চাষ করা গেলেও মাটি শুকানোর পূর্বে মই দেওয়া উচিত নয়। উল্লেখ্য যে চাষ ও মই দেওয়া জমি থেকে বৃষ্টি বা সেচের পরপর প্রায় ১৪% পানি বাষ্পীভুত হয় অথচ চাষহীন জমি হতে ৮০% পানি বাষ্পীভূত হয়ে যায়। তাই জমিতে রস সংরক্ষণের জন্য চাষের পর জোযুক্ত জমিতে মই দিতে হয়। জমিতে চটা তৈরি হলে তা ভেঙ্গে দিতে হয়। তাতে রস ধরে রাখতে পারে। সুতরাং জমি তৈরিকরণের সাথে মাটির তাপ ও রস সংরক্ষণ এবং সবজি আবাদের সাফল্য কতটা নির্ভরশীল তা সহজেই বোঝা যায়। জমি সমতল না হলে ঢাল হয়ে থাকলে ভূমি ক্ষয় বেশি হয় এবং পুষ্টি উপাদান চুয়ায়ে বা গড়ায়ে নিচু স্থানে চলে যায়। এতে জমি অনুর্বর হয়। জমি তৈরিতে শেষ চাষের পূর্বে মৌল সার ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

কোন কোন সবজি চাষ ছাড়া করা যায়। মাটিতে আলু চাষ, মেটে বা গাছ আলু রোপণে জমি চাষের প্রয়োজন হয় না। যে জমিতে ফসলটি শেষ পর্যন্ত জন্মিবে সেখানকার মাটির পরিবেশ তার উপযোগী করে তৈরি করা প্রয়োজন। সাধারণ শস্য অপেক্ষা সবজির জমি উত্তমরূপে তৈরি করতে হয়। বেশির ভাগ সবজির চারা তৈরি করে চাষ করা হয়। চারা তৈরিতে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় এবং বীজতলায় চারার অবস্থাসমূহ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। বীজতলায় সহজে পানি দেওয়া এবং সহজে নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হয়। রৌদ্রের তেজ এবং বৃষ্টি ও ঝড়ের ঝাপটা হতে রক্ষা করার বিশেষ ব্যবস্থাও সবজি চাষের প্রথম ধাপ হিসেবে বীজতলায় রাখতে হয়। তাহলে চারার প্রাথমিক দুর্বল অবস্থায়ও চারা দ্রুত বেড়ে উঠতে পারে।

সবজি চাষে বেড তৈরি- বেডে সবজি চাষ করতে সহজ হয়। অধিকাংশ সবজিই চারা তৈরি করে চাষ করা হয়। এছাড়াও অনেক সবজির বীজ লাইনে বপন/রোপণ করা হয় এবং এতে বীজ কম লাগে, পরিচর্যা সহজ হয়, রোগ পোকামাকড় দমন সহজ হয়, সেচ নিকাশ সুবিধাজনক হয়, ফলন বাড়ে। তাই সবজি চাষে বেড তৈরি করার গুরুত্ব আছে। জমি চাষ করে পরিপাটিভাবে তৈরির পর ফসলের দূরত্বের সাথে সংগতি রেখে চওড়া করে বেডের মাপ দিতে হয়। প্রতিটি বেডের পর ১৫-২০ সে.মি. চওড়া অগভীর নালা কেটে সরু লম্বা ফালিতে বিভক্ত করা হয়। লম্বা ফালির মাটি দুপাশ দিয়ে একটু উঁচু আকারে বেড তৈরি করা হয়। এরপর বেডে মাদা করে বা খুবরী (গর্ত) করে বা লাইন টেনে বীজ/চারা রোপণ করা হয়। নালাগুলো পানি সেচ বা নিকাশ ও কাজের জন্য চলাচলে ব্যবহার করা হয়। বেডগুলো অনেক সময় বীজ/চারা এক বা দুই বা তিন সারিতে রোপণ করা হবে কী না তার
২০২২ ওপর নির্ভর করে চওড়া করা হয়। প্রতি দুই বেডের মাঝখানে ১৫-২০ সে.মি. চওড়া ও ৭-৮ সে.মি. গভীর করে নালা তৈরি করা হয়।

এই নালা তৈরির সময় যে মাটি উঠানো হয় তা বেড়ে দিয়ে বেডকে কিছুটা উঁচু করা হয় যাতে সেচ বা বৃষ্টির পানি সাথে সাথে গড়ায়ে নালায় যেতে পারে। কেননা অধিকাংশ সবজিই দাড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। কিছু কিছু সবজি আছে যেগুলো বেডের পরিবর্তে আইল তৈরি করে তাতে রোপণ করা হয়। যেমন- বরবটি, শসা, টমেটো। জমি উত্তমরুপে তৈরি করে ফসলের দূরত্ব বিবেচনা করে উঁচু উঁচু আইল তৈরি করা হয়। এ আইলে সবজি রোপণ করে ইংরেজি 'এ' অক্ষরের ন্যায় বাউনি তৈরি করে তাতে গাছ উঠায়ে দেওয়া যায়।। যে সব সবজির বীজ সরাসরি ছিটিয়ে বোনা হয় এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জমিকে লাঙ্গল দিয়ে ফালি টেনে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। সাধারণত বীজ ছিটিয়ে বোনার পর জমিতে ফালি টানা হয়। এই ফালিগুলোই পরিচর্যার জন্য চলাচল, সেচ ও নিকাশের কাজে ব্যবহৃত হয়। মূলা, লালশাক, সর্ষে শাক, মটর শাকজাতীয় সবজির বীজ বপণের পর জমিতে ফালি টানা হয়।

নালা তৈরি ঃ সবজি চাষে অঙ্কুরোদগমকৃত এবং রোপণকৃত বীজ বা চারার জন্য পানির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। সবজির ধরন, চাষের সময়, জমির ধরন ও ফসলের বৈশিষ্ট্যের ওপর পানির প্রয়োজন কতটুকু তা নির্ভর করে। এই পানি বিভিন্নভাবে সরবরাহ করা হয়। জমির শোষণ ক্ষমতা ও ফসলের চাহিদার অতিরিক্ত পানি যদি জমিতে দাঁড়ানো থাকে তাহলে ফসলের জন্য ক্ষতিকর। এমনকি জমি দীর্ঘসময় ভেজা থাকলে ফসলের চাহিদাকৃত পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি দেখা যায়। আবার জমি বেশি শুকনা থাকলে বা রসের ঘাটতি থাকলে ফসল উৎপাদনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই এ উভয় অবস্থা থেকে ফসলকে রক্ষার জন্য সেচ বা নিকাশের জন্য নালার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। জমির চারদিক দিয়ে বা ভিতরে নালা করতে হলে জমির এ নালার সাথে অন্যান্য মাঝারি বা বড় নালার সাথে সংযাগে থাকতে হবে। তাহলে জমি থেকে অতিরিক্ত পানি দ্রুত সরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সবজি চাষে সারের ব্যবহার

সবজি চাষে সারের চাহিদা নিরূপণ

চাষের পূর্বে সবজির সারের চাহিদা নিরূপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সবজির চাহিদা মোতাবেক সঠিক পরিমাণ অপেক্ষা কম সার ব্যবহার করলে ফলন কমে যাবে। অন্যদিকে বেশি সার ব্যবহারে সারের অপচয় হবে, খরচ বেড়ে যাবে, ফসলের গুণাবলি ও জমির উর্বরতা নষ্ট হবে। সবজির সারের চাহিদা সঠিকভাবে জানতে হলে চাষাবাদের পূর্বে মাটিতে কতটুকু খাদ্যোপাদান আছে পরীক্ষা করা উচিত। মাটিতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকলে তা প্রয়োগের মাধ্যমে পূরণ করে দিতে হবে। ফসল সংগ্রহের পর আবার পরীক্ষা করে জানা যাবে যে উক্ত ফসল জমি হতে কতটুকু বিভিন্ন খাদ্যোপাদান শোষণ করেছে। শোষণকৃত পরিমাণই হলো উক্ত ফসলের সারের চাহিদা। তবে, সারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে কতগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন-

(১) ফসলের খাদ্যোপাদান চাহিদা ও পরিশোষণ ক্ষমতা

(২) ভূমির উর্বরতা।

(৩) মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক অবস্থা

(৪) আবাদ পদ্ধতি ও মৌসুম

(৫) সারের গুণাবলি এবং

(৬) সার ও ফসলের মূল্যের অনুপাত।

মাটিতে কোন একটি খাদ্যোপাদান ঘাটতি থাকলে এবং অন্যান্য খাদ্যোপাদানের পরিমাণ বেশি থাকলেও গাছ সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তাই ফসলের প্রকৃত চাহিদা নিরূপণ করে কৃত্রিম উপায়ে সার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। কোন ফসলের প্রয়োজনীয় সব খাদ্যোপাদান উপযুক্ত মাত্রাকে একত্রে সুষম মাত্রা বলে।

যেখানে মাটি পরীক্ষার সুযোগ নেই সেখানে সবজির সারের চাহিদা নিরূপণ করতে হয় এর আহারাপেযাগী অংশ বিবেচনা করে। যেমন, পাতাজাতীয় সবজি প্রধানত নাইট্রোজেন, ফুল ও ফল জাতীয় সবজি ফসফরাস এবং মূলজাতীয় সবজি পটাশ সার বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে থাকে। তাই আহারপযাগী অংশের কথা খেয়াল রেখে সবজির সারের চাহিদা ঠিক করতে হবে। এছাড়া সবজি চাষের মেয়াদ বিবেচনা করেও সারের চাহিদা ঠিক করা যেতে পারে। স্বল্পমেয়াদি সবজির বেলায় বেশি মেয়াদি সবজির চেয়ে কম পরিমাণ সারের প্রয়োজন হবে।

সারের চাহিদা পূরণের জন্য রাসায়নিক সারের ওপর পুরোপণরি নির্ভর না করে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে। সবজির প্রধান খাদ্যোপাদানগুলোর মোট চাহিদার অনতুত ১০-১৫ ভাগ জৈব সার হতে আসা উচিত। বিভিন্ন সবজির খাদ্যোপাদান চাহিদা নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি ঃ বিভিন্ন সবজির খাদ্যোপাদান পরিশাষেণের পরিমাণ (জাপানী মি. ইয়ামা জাকীর ফলাফল (১৯৫৮)

সবজির নাম	ফলন টন/একর	মোট খাদ্যোপাদান পরিশোষণ (কেজি একরে)			কখন বেশি পরিশোষণ করে
		নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ	
ফুলকপি	৩.৭	৫৪	২৫	৫০	ফসল তোলার পূর্বের ৪০ দিন
বাঁধাকপি	১২.০	৬৫	২৫	৮৮	মাথা বাঁথা শুরু থেকে ৩০ দিন
চিনাবাঁধাকপি	২০.০	৫০	২৩	৬০	মাথা বাঁথা শুরু থেকে ৩০ দিন
বেগুন	১৮.৫	৭০	১৮	১৩০	ফল ধরা শুরু থেকে ৭০ দিন
টমেটো	১৮.৫	৫৫	৯	১০৫	ফল ধরা শুরু থেকে ৫০ দিন
শালগম	৭.৪	৩০	১২	৪০	ফসল তোলার পূর্বের ২০ দিন
মূলা	২০.০	৫০	১৪	৫৪	ফসল তোলার পূর্বের ৪৫ দিন
গাজর	৫.৫	৪৫	২৩	৫৪	ফসল তোলার পূর্বের ৪৫ দিন
গোল আলু	৭.৪	৩২	১৫	৪০	ফসল তোলার পূর্বের ৪৫ দিন
মিষ্টি আলু	৭.৪	৩৫	১২	৮৫	ফসল তোলার পূর্বের ৪৫ দিন
শিম	৪.৪	৫২	২২	৫০	ফসল তোলার শুরুর পূর্বের ৩০ দিন
মটরশুটি	২.৭	৫০	১৮	৩৬	ফসল তোলার শুরুর পূর্বের ৩০ দিন
শশা	১৮.৫	৩০	২২	৭০	ফল ধরা শুরু থেকে ৩০ দিন
পেঁয়াজ	৮.১	১৪	৭	২০	ফসল তোলার পূর্বের ৪৫ দিন
পালংশাক	৬.৮	৪০	১৪	৩৩	ফসল তোলার পূর্বের ২০ দিন

২০২২

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

সবজি চাষে সার প্রয়োগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সারের প্রয়োগ পদ্ধতি নিম্নোক্ত কারণে বিভিন্ন রকম হতে পারে। যথা- ১) মাটির ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থা, ২) আবহাওয়া, ৩) সারের প্রকার ও গুণাবলি, ৫) ফসলের প্রকার (পাতা, দানা বা ফুলজাতীয় ইত্যাদি), ৬) শিকড়ের প্রকৃতি ও খাদ্যোপাদান গ্রহণ ক্ষমতা, ৭) ফসলের সময়কাল, ৮) সারের ধরন ইত্যাদি। সারের প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর সারের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। সুষ্ঠুভাবে উপযুক্ত পরিবেশে শিকড়ের নাগালের মধ্যে সার প্রয়োগ করা হলে ফসল পুরোপুরি তা গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া সার মাটিতে আবদ্ধ হয়ে, পানিতে ধুয়ে বা বাতাসে উড়ে বিনষ্ট হতে পারে। সার প্রয়োগের পদ্ধতি ও সময়কে বিবেচনা করে সার প্রয়োগ কার্যক্রমকে চারভাগে ভাগ করা হলো। যথা-
(ক) মৌল (খ) উপরি (গ) পাতায় ও (ঘ) বিশেষ প্রয়োগ।

ক) মৌল প্রয়োগ ঃ জমিতে বীজ বপন বা চারা রোপণের পূর্বে সার প্রয়োগ করাকে মৌল প্রয়াগ বলা হয়। যে সব সার ধীরে ধীরে দ্রবণীয় বা গাছের গ্রহণ উপযোগী হয় এবং সহজে বিনষ্ট হয় না সেগুলো, এবং সহজে বিনষ্ট হয় না সেগুলোকে মৌল হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। বিভিন্ন জৈব সার, চুন, ফসফরাস, জিপসাম ইত্যাদি প্রায় পুরোপুরি মৌল হিসেবে প্রয়োগ করা হয় আবার পটাশ, জিংক, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মাটির ও ফসলের প্রকারভেদে ২৫-৫০ ভাগ মৌল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে দ্রবণীয় সার আগাম প্রয়োগ করা হলে ফসলের প্রয়োজনের সময়ে পরিশোষণে উপযোগী হয়। এছাড়া সারের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রভাবে বীজ বা চারার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মৌল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে হলো পরিচালন ক্ষমতাহীন সার ফসলের শেকড়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেয়া।

(১) ছিটিয়ে প্রয়োগ- এ ক্ষেত্রে জমি চাষের পর সমস্ত জমিতে সার ছিটিয়ে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতি খুবই সহজ, কম শ্রম ও স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ এবং সময়ও কম লাগে। গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধিকালীন সময়ে উপরি প্রয়োগ বা পার্শ্ব প্রয়োগের মাধ্যমেও সার ছিটিয়ে দেয়া হয়।

সার ছিটিয়ে উপরি প্রয়োগ করা হলে সাধারণত মাটিতে আবদ্ধ হয়ে যায় ফলে গাছ গ্রহণ করতে পারে না। ছিটিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতে সার গাছের নাগালের বাইরে চলে যায় এতে অপচয় হবার সম্ভবনা বেশি থাকে। ঝড়ো বাতাসের সময় বিশেষ করে গুড়ো সার প্রয়োগ করা অসুবিধাজনক এবং অপচয় হয়। অনুর্বর, সেচবিহীন এবং পাতলা চারা সম্পন্ন ফসলের জমিতে এ পদ্ধতি একেবারেই উপযোগী নয়। ফসলের অঙ্গজ বৃদ্ধির সময় সার ছিটিয়ে উপরি প্রয়োগ করা হলে গাছের পাতা পুড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

স্বল্পমেয়াদি ও ঘন করে ছিটিয়ে বানো শাক-সবজির জমিতে দ্রুত দ্রবণীয় ও পরিচালনশীল সার ছিটিয়ে মৌল হিসেবে প্রয়োগ করা যায়।

চিত্র ঃ সার ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া

(২) স্থানীয় প্রয়োগ- অনুর্বর জমিতে এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী এবং কম সার ব্যবহার করে বেশি ফলন পাওয়া যায়। বীজের কাছাকাছি সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পাশে ও গভীরতায় যথাক্রমে ৮ সেমি. দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। আর গাছের বেলায় শিকড়ের বিস্তৃতি লক্ষ করে সার প্রয়োগ করা উচিত। যৌগ সারের অর্ধেক ছিটিয়ে এবং বাকী অর্ধেক সারি বা শেকড়ের কাছে প্রয়োগ করা উত্তম। নিচে সার প্রয়োগের কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

চিত্র ঃ মাটির নির্দিষ্ট জায়গায় স্থানীয় পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ

(১) চারার গর্তে প্রয়োগ- সবজির চারা রোপণের পূর্বে নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে মাটির সাথে মৌল সারের অর্ধেক মিশিয়ে দেওয়া হয়। যথা- ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রকোলী, টমেটো, বেগুন ইত্যাদি।

(২) মাদায় প্রয়োগ- কদ জাতীয় সবজির বীজ বা চারা রোপণের জমিতে নির্দিষ্ট স্থানে মাদা বা থালা তৈরি করে লাগানো হয়। চারা লাগানোর পূর্বে মাদায় মৌল সার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যথা- কুমড়া জাতীয়, লাউ, শসা, চিচিঙ্গা, পেঁপে, কলা ইত্যাদি।।

(৩) লাঙ্গল স্তরে প্রয়োগ- জমি তৈরি শেষে লাঙ্গলের সাহায্যে অগভীর জুলি বা নালা তৈরি করে তাতে মৌল সার প্রয়োগ করা হয়। পরে মই দিয়ে জমি সমান করে দিয়ে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা হয়। বীজ বা চারার শেকড় বাড়ার পর প্রয়োগকৃত সার শেকড়ের সাহায্যে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে।

চিত্র ঃ লাঙ্গলের সাহায্যে সার প্রয়োগ

চিত্র ঃ সার প্রয়োগের পর মই দিয়ে সমান করে দেয়া

(৪) বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ- এ পদ্ধতিতে বীজ ও সার একত্রে বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করা হয়। এ প্রথায় বীজের ক্ষতিকর সম্ভাবনা থাকে। তাই একত্রে বীজ ও সার ড্রিল বা বপন না করাই ভালো।

(খ) উপরি প্রয়োগ- জমিতে বীজ বপন বা চারা রোপণের পরে সার প্রয়োগ করা হলে তাকে উপরি প্রয়োগ বলে। সাধারণত নাইট্রোজেন, পটাশ, ছাই, দস্তা, তরল গোবর ইত্যাদি সার জমিতে উপরি প্রয়োগ করা হয়। গাছের পাতায়, কাণ্ডে বা মূলে সরাসরি লেগে গেলে ফসলের ক্ষতি হয়। তবে শস্যের অবস্থা বুঝে সার প্রয়োগ করা হলে সারের অপচয় কম হবে। ঝড় বৃষ্টিতে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে উপরি প্রয়োগ করে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা হয়।

১১০১

সবজি চাষে এ পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উপরি প্রয়োগের কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

১। ছিটিয়ে উপরি প্রয়োগ- ছিটিয়ে বোনা সবজির জন্য নাইট্রোজেন ও পটাশ জাতীয় সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করা বেশ সহজ। মাটিতে রসের অভাব থাকলে উপরি প্রয়োগ সারের সুফল কম পাওয়া যায়। মূলা, ডাটা, লালশাক, পালংশাক ইত্যাদি সবজিতে উপরি প্রয়োগ হিসেবে সার ছিটিয়ে দেয়া হয়।

চিত্র ঃ ছিটিয়ে সারের উপরি প্রয়োগ

২। পার্শ্বপ্রয়োগ- সারি পদ্ধতিতে আবাদ করা সবজির পার্শে লাইন টেনে তাতে সার প্রয়োগ করা যায়। যথা ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, মরিচ, গোলআলু, টমেটো, শশা, মুখীকচু কোন কোন ক্ষেত্রে মূলা, পালংশাক ইত্যাদিতে সার প্রয়োগের পর ফসলের চাহিদানুযায়ী গোড়ায় মাটি তুলে সার ঢেকে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতি সবজি চাষের জন্য উপযোগী। ফসলের সারির দুদিকে একবারে সার না দিয়ে পর্যায়ক্রমে দু'দিকে দ'বারে সার দেয়া উত্তম। একে ব্যান্ড প্রয়োগ পদ্ধতিও বলা হয়।

চিত্র ঃ লাইনে সার প্রয়োগ

৩। চারপাশে প্রয়োগ- মাদায় লাগানো গাছের চারপাশে শেকড় থেকে নিরাপদ দূরত্বে রিং করে নালা কাটা হয়।। এক্ষেত্রে নালায় সার প্রয়োগ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। যথা- লাউ, শিম, কুমড়াজাতীয়, শসা, কলা, পেঁপে ইত্যাদি।

চিত্র ঃ চারার চারি পাশে সারের উপরি প্রয়োগ

৪। কাদার গোলকে প্রয়োগ- এ পদ্ধতিতে কাদামাটি দিয়ে গোলক তৈরি করা হয়। মাটির গোলকের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ ফাঁকা করে নাইট্রোজেন সার দিয়ে গোলকটি আঁটকেয়ে ভালোভাবে শুকানো হয়। সাধারণত ঃ ১ঃ১০ অনুপাত নাইট্রোজেন সার ও কাদামাটি দিয়ে গোলক তৈরি করা উত্তম। এ পদ্ধতিতে প্রয়োগকৃত সার অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে দেড়গুণ বেশি পরিমাণে গাছের গ্রহণ উপযোগী হয়। সবজি চাষে এ পদ্ধতির প্রচলন এখনো তেমন হয়নি।

চিত্র ঃ সার দিয়ে কাদার গোলক তৈরি ও প্রয়োগ

৫। বড়ি প্রয়োগ- এ পদ্ধতিতে সারের সাথে অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে আবরণ তৈরি করা হয়। এ ধরনের সার হতে উপাদান ধীরে ধীরে দ্রবণশীল হয়। ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত গাছ খাদ্যোপাদান সরবরাহ পেয়ে থাকে এবং এতে অপচয় কম হয়। যেমন- ইউরিয়া ফরম, সালফার কোটেড ইউরিয়া, মিশ্র সার উল্লেখযোগ্য। এ সারের দাম কিছুটা বেশি হলেও কার্যকরিতা অনেক বেশি। সবজি চাষে এ পদ্ধতি প্রচলন এখনো তেমন হয়নি।

৬। প্রবিষ্টকরণ- এ পদ্ধতিতে তরল বা দানা জাতীয় সার সিরিঞ্জের মত যন্ত্রে চাপ প্রয়োগের দ্বারা মাটির অভ্যন্তরে দেয়া হয়। এতে মাটির বিভিন্ন স্তরে এবং গাছের শেকড়ের কাছাকাছি সার প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। এ পদ্ধতিতে সারের অপচয় একেবারেই হয় না। তবে এ পদ্ধতি এখনো তেমন প্রচলিত হয় নাই। অনেক উন্নত দেশে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন- জাপান, তাইওয়ান।

(গ) পাতায় প্রয়োগ

বিশেষ ক্ষেত্রে সারের দ্রবণ তৈরি করে সিঞ্চনের মাধ্যমে গাছের পাতায় প্রয়োগ করা হয়। এতে নির্দিষ্ট অনুপাতে দ্রবীভূত সার সিঞ্চন যন্ত্রে বা হেলিকপ্টারের সাহায্যে গাছের পাতায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। দ্রবণকৃত সার সব সময় পাতার কোষের রসের ঘনত্বের চেয়ে কম হওয়া দরকার। অন্যথা পাতা পুড়ে যাবে। এ পদ্ধতিতে যে কোন মূখ্য উপাদানের অর্ধেক ও গৌণ উপাদানের প্রায় সবটুকু সার পাতায় প্রয়োগ করা চলে। নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও জাতীয় সার অধিক পরিমাণে লাগে বিধায় শুধু পাতায় প্রয়োগ করে গাছের চাহিদা মেটানো খুব দুরহ। তবে গৌণ উপাদানের প্রকৃতি অনুপাতে দ্রবণ তৈরি করে পাতায় স্প্রে করে গাছের চাহিদা পূরণ করা যায়। সারের দ্রবণ তৈরির নিয়ম নিচে দেয়া হলো।

সারণি ও বিভিন্ন সারের দ্রবণ তৈরির বিবরণ

উপাদান	কী আকারে পাওয়া যায়	প্রতি লিটার পানিতে মিশানোর পরিমাণ (গ্রাম)	
১) লৌহ	ফেরাস সালফেট	২.৫	৩.৫
২) ম্যাংগানিজ	ম্যাংগানিজ সালফেট	২.৫	৫.০
৩) জিংক	জিংক সালফেট	২.৫	৫.০
৪) কপার	কপার সালফেট	২.৫	৫.০
৫) বোরন	সোডিয়াম বোরেট	২.৫	৬.০
৬) মলিবডিনাম	এমোনিয়াম মলিবডেট	০.৩	০.৮
	সোডিয়াম মলিবডেট	০.৬	০.৬

এছাড়া ১-১.৫ ভাগ ইউরিয়া সারের দ্রবণ তৈরি করে সবজি ও অন্যান্য ফসলের পাতায় বিকালে প্রয়োগ করা যায়। পাতাজাতীয় সবজিতে পাতায় প্রয়োগে সবজি তাড়াতাড়ি সবুজ ও সতেজ হয়। বয়স্ক পাতা ও পাতার বাইরের পিঠের পরিশাষেণ ক্ষমতা বেশি। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলেই প্রথমে পাতায় সার সিঞ্চন করা যায়। বর্ষজীবী ফসলে তার জীবনকালে ৩-৪ বার সিঞ্চন করা চলে।

২০২২

চিত্র ঃ সিঞ্চন পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ

গোবর, খৈল ইত্যাদি জৈব সার ভালোভাবে পচায়ে তরলাকারে পাতায় প্রয়োগ করা যায়। এ পদ্ধতিতে অপচয় কম হয় ও গাছে দ্রুত খাদ্যোপাদান পরিশোষিত হয়। ফসলের জমিতে পানি পরিপূর্ণ থাকলে এবং মাটিতে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকলেও এ পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা যায়। তবে মুখ্য খাদ্যোপাদানের চাহিদা সম্পূর্ণ পূরণ করা যায় না। বেশি বাতাসের সময় সার প্রয়োগে অসুবিধা হয়। সার প্রয়োগের পর পরই বৃষ্টি হলে সার ধুয়ে যায়। তাই মেঘলা আবহাওয়ায় বা বৃষ্টির পূর্বে সার দেওয়া উচিত নয়। যে সব ফসলের পাতা মোমযুক্ত সেক্ষেত্রে পাতায় সার প্রয়োগে কোন সুফল পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ফসলে দ্রবণের সাথে আঁঠালো পদার্থ (টুইন-২০) মিশিয়ে স্প্রে করা উত্তম।

(ঘ) বিশেষ প্রয়োগ

(১) সেচের পানির সাথে- এ পদ্ধতিতে সেচের পানির সাথে সার মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতিতে সমতল জমিতে, সমস্ত জমিতে সমভাবে ও সম উচ্চতায় পানি পৌঁছালে সবগাছ সমানভাবে সার পরিশোষণ করতে পারে।

চিত্র ঃ সেচের পানির সাথে সার প্রয়োগ পদ্ধতি

(২) বুস্টার বা স্টার্টার দ্রবণ প্রয়োগ- চারার চাহিদা পূরণ ও বৃদ্ধি দ্রুত করার জন্য মূখ্য উপাদানসমূহের দ্রবণ চারার গোড়ায় সিঞ্চন করা হয়। মূখ্য উপাদান ৩টি যথা- নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ। এগুলোকে একত্রে বা পৃথকভাবে পানিতে গুলিয়ে ১ঃ৫ঃ২ অনুপাতে চারার গোড়ায় সিঞ্চন করাকে স্টার্টার প্রয়োগ বলে। সাধারণত এন.পি.কে ১ঃ৫ঃ২ অনুপাতের দ্রবণ তৈরির জন্য ডাই এমোনিয়াম ফসফেট ও মনাপটাশিয়াম মিশ্রণ সমানুপাতিক-ভাবে গুলিয়ে নিতে হয়। প্রতি গ্যালন পানিতে এক আউন্স বা প্রতি লিটার পানিতে ৬ গ্রাম দ্রবীভূত করলে এই দ্রবণ (এনপিকে) তৈরি হয়।

(৩) বায়বীয় আকারে প্রয়োগ- বায়ুতে সাধারণত ০.০৩ ভাগ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বিদ্যমান থাকে। কৃত্রিমভাবে বাতাসে এর পরিমাণ বাড়ানো গেলে গাছের সালোক সংশ্লেষণের পরিমাণ বেড়ে যাবে। ফলে ফসলের ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে এবং গাছের জীবনকাল কমে যাবে। তাই ফলন বাড়ানোর জন্য অনেক দেশে গ্রীণ হাউজে ও খোলা মাঠেও কার্বন ডাই অক্সাইড বা এমোনিয়াম প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

সার প্রয়োগের সময়- ফসলের দৈহিক বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়ে খাদ্যোপাদানের চাহিদা বিভিন্ন রকম হয়। চারা অবস্থায় খাদ্যোপাদান চাহিদা কম থাকে এবং চারার বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে চাহিদা বাড়তে থাকে। দৈহিক বৃদ্ধি, শাখা প্রশাখা, মূল ইত্যাদি অপেক্ষা ফুল ও ফল ধারণকালে চাহিদা সবচেয়ে বেশি হয়। আবার চারা অবস্থার শেষ সময়ে চাহিদা কমে যায়। সার ভালোভাবে কাজে লাগার জন্য নিচের বিষয়গুলো বিশেষভাবে দায়ী। যথা-

১। গাছের বিভিন্ন খাদ্যোপাদান মাটিতে ধরে রাখার ক্ষমতা
২। সারের মাত্রা
৩। মাটিতে তাপমাত্রা ও সারের প্রয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি।
৪। সারের গুণাবলি
৫। সারের দ্রবীভূত ক্ষমতা
৬। মাটিতে রসের পরিমাণ

সার ব্যবহারের কয়েকটি সাধারণ নিয়মাবলি নিচে দেয়া হলো।

(১) সব ধরনের জৈব সার (গোবর সার, আবর্জনা পঁচা সার, সবুজ সার), ফসফরাস পুরোপুরি এবং পটাশ সারের অর্ধেক মাত্রা জমি তৈরির শেষ চাষের সময় দিতে হয়। সার প্রয়োগ করে মাটিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

(২) সেচ বিহীন ও শুকনো জমিতে সব ধরনের জৈব ও অজৈব সার পূর্ণমাত্রায় বীজ বপনের পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়।

(৩) মাদায় রোপণযোগ্য (লাউ, কুমড়াজাতীয়, শিম, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি) সবজির জন্য ফসফরাস ও জৈব সার পুরাপুরি বীজ বপন বা চারা রোপণের পূর্বে মাদায় মৌল হিসেবে প্রয়োগ করতে হয়। পটাশ ও নাইট্রোজেনযুক্ত সার পরবর্তীতে বারে বারে উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

(৪) বহুবর্ষজীবী ফসলে বর্ষা মৌসুমের শুরুতে ও বর্ষার শেষ দিকে মোট ২ বারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

(৫) স্বল্পমেয়াদি শাক সবজিতে নাইট্রোজেন ব্যতিত প্রায় সব সারই মৌল হিসেবে এবং নাইট্রোজেন সার কয়েক কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

বিভিন্ন শাক সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, শসা, মূলা, বেগুন, মরিচ, টমেটো, গাজর ইত্যাদি বৃদ্ধির কোন পর্যায়ে কী পরিমাণ খাদ্যোপাদান প্রয়োজন তা সারণিতে পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এ ভিত্তিতে ২-৩ বারে সারের উপরি প্রয়োগ করলে বেশি সুফল পাওয়া যায় এবং অপচয় কম হয়।

২০২১

সার প্রয়োগের সাবধানতা

সার প্রয়োগের জন্য নিচের সাবধানতাগুলো মেনে চলা উচিত। যেমন-

(১) ঝড়ো বাতাসের সময়ে বা ফসলের পাতা ভেজা অবস্থায় সার উপরি প্রয়োগ করা উচিত নয়। এতে ফসলের ক্ষতি হতে পারে।

(২) কাঁচা গোবর, খৈল, চুন, হাঁড়ের গুড়ো ইত্যাদি দন্ডায়মান ফসলে প্রয়োগে করা উচিত নয়। কাঁচা সার জমিতে প্রয়োগ করা হলে তার প্রায় একমাস পরে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা উচিত।

(৩) জমিতে শুধু রাসায়নিক সার ব্যবহার করে তেমন সুফল পাওয়া যাবে না। তাই রাসায়নিক সার ও জৈব সার সুষম মাত্রায় প্রয়োগের মাধ্যমে জমির উর্বরতা বজায় রাখা যাবে।

(৪) সমতল জমিতে সমভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে।

(৫) জমির অবস্থা বা আবহাওয়ার সাথে মিল রেখে সার প্রয়োগ করা উচিত।

(৬) বিভিন্ন ধরনের সার একত্রে মেশানোর পূর্বে সেগুলোর রাসায়নিক বিক্রিয়া জেনে তারপর মিশাতে হবে। কেননা কোন কোন সার একত্রে মিশালে বিক্রিয়া ঘটে।

(৭) বৃষ্টির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বা জমিতে প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া হলে সে সময় সার প্রয়োগ করা উচিত নয়।

(৮) প্রখর রোদের সময় বিশেষ করে নাইট্রোজেনযুক্ত সার ছিটালে বেশির ভাগই বাতাসে উড়ে নষ্ট হতে পারে।

সবজি চাষে পানি সেচ ও নিকাশন

পানির অপর নাম জীবন। এ কথাটি প্রাণি ও উদ্ভিদ জগতের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। পানি মাটির খাদ্যোপাদানসমূহকে দ্রবীভূত করে গাছের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে থাকে। গাছের অঙ্গগায় আত্মীকরণ, শস্যের সজীবতা রক্ষা, প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সরবরাহ প্রভৃতি কাজে পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাটিতে পর্যাপ্ত রসের অভাবে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আবার জলাবদ্ধতা ঘটলে উদ্ভিদের শ্বাস প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সুতরাং সবজি চাষে সাফল্য লাভের জন্য পানি সেচ ও নিকাশের প্রতি বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন।

চিত্র ঃ সেচের জন্য আইল দ্বারা জমি বিভক্তকরণ

বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত অত্যাধিক হলেও বারো মাসে সমানভাবে হয় না। বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত অতিবৃষ্টি আর কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত অনাবৃষ্টির কারণে সবজির চাষে অসুবিধা হয়। তাই সেচ ও নিকাশ সুবিধাযুক্ত জমি সবজি চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। পানি সেচ ও নিকাশ সুবিধার জন্য জমি কয়েকটি সুবিধাজনক খণ্ডে বিভক্ত করে নিতে হয়। এরপর সবজির ধরন, মৌসুম ও আবাদ পদ্ধতির ওপর লক্ষ রেখে জমিতে প্রয়োজনীয় আইল ও নালা তৈরি করতে হয়। তাতে পানি নিয়ন্ত্রণ কর সহজ হয়।

বিভিন্ন সবজির পানির চাহিদা

সব ধরনের সবজির পানির চাহিদা এক রকম নয়। তাছাড়া একই সবজির জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে পানির চাহিদাও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। নিচের সারণিতে সবজির জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তর ও পানির চাহিদার তারতম্য দেখানো হলো।

সারণি ও সাধারণভাবে সবজির জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে পানির চাহিদা

জীবনচক্রের স্তর	প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ
বীজের অঙ্কুরোদগম	বীজের ওজনের ৬০-১০০%
অঙ্কুরোদগমের অব্যবহিত পর	মাটির ধারন ক্ষমতার ৯০%
চারা অবস্থায়	মাটির ধারন ক্ষমতার ৮০-৯০%
চারা স্থানান্তরের পূর্বে কিছুদিন	মাটির ধারন ক্ষমতার ৬০-৭০%
চারা রোপণের পর	মাটির ধারন ক্ষমতার ৮০%
অঙ্গবৃদ্ধি ও ফুল ফল ধারণকালে	মাটির ধারন ক্ষমতার ৫০-৮০%
মূল জাতীয় সবজি সংগ্রহের কিছুদিন পূর্বে	মাটির ধারন ক্ষমতার ৪০-৫০%
বীজ পরিপক্কতা লাভের শেষ পর্যায়ে	মাটির ধারন ক্ষমতার ৫০-৬০%

এই তথ্যের ভিত্তিতে সবজি চাষে জমিতে সেচ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। পাতাজাতীয় সবজি (লেটুস, পালং শাক, পুঁই শাক) ও কপি গোত্রের সবজির পানির চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এগুলোর শিকড় মাটির বেশি গভীরে প্রবেশ করে না বিধায় বেশি পরিমাণে ও ঘন ঘন সেচ দিতে হয়। পেঁয়াজ, মরিচ, বেগুন, শসা এবং টমেটোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানির প্রয়োজন। গোল আলু, মূলা প্রভৃতির জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন থাকলেও নিয়ন্ত্রিতভাবে সেচ দেওয়া আবশ্যক। সেচের দ্বারা বা বৃষ্টির কারণে পানিবদ্ধতা ঘটলে শিকড় ও ফসল পঁচে বিনষ্ট হতে পারে। অপরদিকে শিমজাতীয়, কুমড়া ও অন্যান্য বহুবর্ষজীবি সবজি পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত সেচে ভালো ফলন দেয়।

সবজি চাষে সেচের মাধ্যমে কী পানি দিতে হবে তাও জানা দরকার। কেননা সেচের পানির সাথে ফসলের ক্ষতিকর রোগ জীবাণু বা উপাদান যেতে পারে। বীজতলায় বীজ গজানোর বা সবজি রোপণের পর পরই যে সেচ দেওয়া হয় তা লবণমুক্ত হতে হবে। পুকুর, নদী বা খালের পানিতে নানা ধরণের আগাছা ও কলকারখানার বর্জ্য মিশে সেচের অনুপোযোগী হতে পারে। তাই সেচের পানিতে ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

(১) পুকুর, নদী বা খালের পানি সেচ দেওয়ার সময় হেঁকে নিতে পারলে ভালো।

(২) পানির উৎসের পাশে ট্যাঙ্ক স্থাপন করে বালি দ্বারা ফিল্টার করে পানি সংরক্ষণ করে তা সেচে ব্যবহার করা।

(৩) সবজির চারা অবস্থায় ০.৫ মিলিগ্রাম ক্লোরিন প্রতি এক লিটার পানিতে মিশায়ে সেচ দেয়া যায়। তাতে অনেক রোগের জীবাণু মারা যায় ও শেওলা দমন হয়।
(৪) গভীর বা অগভীর নলকূপের পানি কোন পুকুর বা ট্যাংকে জমা রেখে তারপর সেচ দেয়া ভালো। বর্তমান-কালে খাল, নালা, ডাবো ইত্যাদি জলাশয়ের পানি যেখানেও দূষিত হচ্ছে সেখানে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সেচের সঠিক সময় নির্ণয়

সেচ দেয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মাটিকে সরস রাখা, যাতে ফসলের ভালো ফলন নিশ্চিত হয়। শাক সবজির (পানি কচু ব্যতীত) বেলায় জমির সরস অবস্থার একটু নিচেই পানির মাত্রা গিয়ে যখন পৌঁছে তখনই সেচের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ অবস্থা কখন হবে তা খালি চোখে দেখে বুঝা যায় না। এজন্যে মাটির রস মেপে দেখতে হয়। হাতের সাহায্যে মাটির রস মাপার সহজ পদ্ধতি নিচে ছবিতে দেখানো হলো। সবজি চাষে সেচ সময় নির্ধারণের সাধারণ বিবেচ্য বিষয়গুলো। যথা-
(১) চারা গজানোর পর থেকে ফুল ধরা পর্যন্ত সবজির পানির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। তারপর এ চাহিদা আবার কমতে থাকে। তাই গাছের বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে কখন এবং কতবার সেচ দিতে হবে তা ঠিক করে নিতে হয়। সাধারণত বৃষ্টি না হলে সবজির ফুল আসা অবধি প্রতি ১০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে।
(২) বেলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা খুব কম। এ জাতীয় মাটিতে ঘন ঘন সেচ দিতে হবে।
(৩) জমিতে পানির অভাব হলে মাটির রং হালকা ধরনের হয়। তাই মাটি হালকা রং ধারণ করলে সেচ দেয়া উচিত।
(৪) পানির অভাব দেখা দিলে গাছের পাতা নেতিয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখা দেয়া মাত্র পানি সেচ দেয়া উচিত।
(৫) স্বল্প গভীর শিকড় বিশিষ্ট সবজির জমিতে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতার শতকরা ৭০ ভাগের কম হলেই সেচ দেয়া উচিত।
(৬) নিচের সূত্র দ্বারা মাটিতে পানির পরিমাণ জেনে নিয়ে সবজির জমিতে সেচ দেয়া যেতে পারে। জমি হতে নেয়া ১ কেজি মাটির ওজন - চুলোতে শুকানোর পর ঐ মাটির ওজন। মাটিতে পানির পরিমাণ (%)

$$\text{মাটিতে পানির পরিমাণ } (\%) = \frac{\text{জমি হতে নেয়া ১ কেজি মাটির ওজন - চুলোতে শুকানোর পর ঐ মাটির ওজন}}{\text{ঐ শুকানো মাটির ওজন}} \times \text{১০০}$$

ধরা যাকঃ চুলাতে শুকানো মাটির ওজন ৬০০ গ্রাম। তাহলে পানি ছিল ১০০০-৬০০ গ্রাম = ৪০০ গ্রাম

$$\text{এখন রসের } \% = \frac{\text{১০০০-৬০০}}{\text{৬০০}} \times \text{১০০} = \frac{\text{৪০০}}{\text{৬০০}} \times \text{১০০} = \text{৬৬.৬৭}\%$$

সূত্র মোতাবেক মাটিতে পানি শতকরা ৫০% ভাগের নিচে এলেই সবজির জমিতে সেচ দেয়া উচিত। সবজি চাষে কোন অবস্থায় সেচের প্রয়োজন এবং পানির জন্য সবজির নাজুক অবস্থা দেখে সেচ দিতে হয়। সবজির পানির নাজুক অবস্থা পরে সারণিতে দেয়া হলো। ২০২২

হাতের সাহায্যে মাটির রস মাপার কৌশল

এ পদ্ধতি খুব কার্যকরি এবং এভাবে জমিতে রসের অবস্থা দেখে সেচ দেয়া যেতে পারে। নিচের পদ্ধতি অনুসারে মাটিতে পানির ধারণ ক্ষমতা নির্ণয় করা এবং সারণির বর্ণনা মোতাবেক মাটিতে সেচ দেয়া উচিত।

ধাপ ১

জমির মাঝখানে একটি ছোট গর্ত করতে হবে। গর্তটির মাপ হবে জমিতে যে ফসল আছে সে ফসলের শেকড়ের গভীরতার ৩ ভাগের ২ ভাগ।

চিত্র ঃ মাটি সংগ্রহের জন্য ফসলের জমিতে গর্ত তৈরি করা

চিত্র ঃ মাটি দলা তৈরির জন্য মাটি নেয়া

ধাপ ২

গর্তের তলা থেকে মাটি নিয়ে হাতের মুঠোর চাপ দিয়ে গোলাকার করে দলা বা বল তৈরি করতে হবে। শেকড় অঞ্চলের গভীরতার ৩ ভাগের ২ ভাগ গভীরতার মাটি।

ধাপ ৩

সারণির বর্ণনার সাথে এ মাটির দলার বা বলের মিল করে জমির মাটিতে গাছের উপযোগী কতটুকু রস আছে তা বোঝা যাবে।

চিত্র ঃ মাটি দিয়ে দলা তৈরি

২০২২

ধাপ ৪

মাটির অবস্থা দেখে কোন মাটিতে কতভাগ রস আছে তা বোঝা যাবে এবং কোন মাটিতে কখন সেচ দেয়া হবে তা সারণিতে দেয়া হলো। জমির পনির ধারণ ক্ষমতা ৫০% এ পৌঁছালে এবং ফসলের বাড়বাড়তি ব্যাহত হলে সেচ দিতে হবে তা সারণিতে দেখানো হলো। হাতের সাহায্যে মাটিতে কত ভাগ রস আছে তা মাপার সহজ নিয়মের টেবিল-ক ১

সারণি ঃ সবজি চাষে কখন সেচের প্রয়োজন

মাটিতে রসের পরিমাণ (পানি ধারণক্ষমতার শতকরা কতভাগ)	পলিময় কাদা মাটি	
	মাটির অবস্থা	কখন সেচ দিতে হবে
০-২৫	মাটি শুকনা ও ধূলাময়	তাড়াতাড়ি
২৬-৫০	মাটির দলা হবে কিন্তু ১ মিটার তাড়াতাড়ি উপর হতে ফেলে দিলে ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে ছাড়ায়ে যাবে	তাড়াতাড়ি
৫১-৭৫	মাটির দলা শক্ত ও আঠালো হবে ২ দিন পর কিন্তু ফেলে দিলে ভাঙবে না	২ দিন পর
৭৬-১০০	মাটির ভেজা দলা হবে, হাতের তালু ভিজে আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি আসবে	৪ দিন পর রসের অবস্থা বুঝে
১০০ এর বেশি	মাটি কাদাময়	সেচ দিতে হবে না। প্রয়োজনে পানি বের করে দিতে হবে
	বেলে মাটি	
	মাটির অবস্থা	কখন সেচ দিতে হবে
০-২৫	মাটি শুকনা ও ধূলাময়	তাড়াতাড়ি
২৬-৫০	মাটি ঝুরঝুরে নয়, কিন্তু দলা হয় না।	তাড়াতাড়ি
৫১-৭৫	মাটি দলা হবে, কিন্তু ফেলে দিলে ভেঙ্গে গুড়ো হয়ে যাবে।	১ দিন পর
৭৬-১০০	মাটি দলা হবে, কিন্তু ফেলে দিলে ভাঙ্গে না।	২ দিন পর রসের অবস্থা বুঝে
১০০ এর বেশি	মাটির ভেজা দলা হবে, হাতের তালু ভিজে যাবে, আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পানি বের হবে।	৭ দিন পর মাটির রস দেখতে হবে।

২০২২

সারণি ঃ সবজি কোন কোন নাজুক অবস্থায় পানির অভাব দূর করা আবশ্যক

সবজি	যে অবস্থায় পনির অভাব এড়াতে হবে	মাটিতে রসের সর্বনিম্ন মাত্রা (%)
ফল সবজি		
১। কুমড়া	১। ফুল ফোটা ও ফলের বৃদ্ধি অবস্থা	৫০
২। উচ্ছে/করলা	২। ফসলের পুরো জীবনকাল	৫০
৩। কাঁকরোল	৩। ফসলের পুরো জীবনকাল	৫০
৪। শস্য	৪। ফসলের পুরো জীবনকাল	৫০
৫। পটল	৫। ফসলের পুরো জীবনকাল	৫০
৬। লাউ	৬। ফসলের পুরো জীবনকাল	৫০
৭। পেঁপে	৭। গাছের বাড়তি অবস্থা	৫০
৮। কলা	৮। গাছের বাড়তির প্রাথমিক সময়কাল, ফুল ফোটা পর্যন্ত ও ফল ধরা থেকে বড় হওয়া সময়কাল।	৬৫
৯। ঢেঁড়শ	৯। গাছের বাড় বাড়তির সময়কাল হতে পুরো জীবনকাল।	৬৫
১০। টমেটো	১০। ফসলের পুরো জীবনকাল	৬৫
১১। বেগুন	১১। ফসলের পুরো জীবনকাল	৬৫
১২। মরিচ	১২। ফসলের পুরো জীবনকাল	৬০
মূল ও কন্দজাতীয়		
১। মুখীকচু	১। ফসলের পুরো জীবনকাল	৫০
২। পানিকচু	২। ফসলের পুরো জীবনকাল	৮০-১০০
৩। মূলা	৩। ফসলের পুরো জীবনকাল	৫০
৪। গাজর	৪। ফসলের পুরো জীবনকাল	৫০
৫। গোলআলু	৫। বোঁটার অগ্রভাগে স্টোলন হওয়া থেকে আলু হওয়া পর্যন্ত	৭০
সবজি জাতীয়		
১। বাঁধাকপি	১। চারা রোপণ পরবর্তী ১০ দিন এবং মাথা বাঁধা শুরু হওয়া পর্যন্ত	৬৫
২। ফুলকপি	২। চারা রোপণ পরবর্তী ১০ দিন এবং ফুল ধরা থেকে শক্ত হওয়া পর্যন্ত	৬৫
৩। ডাটা শাক	৩। ফসলের পুরো জীবনকাল	৬৫
৪। লালশাক	৪। গাছের বাড় বাড়তির প্রাথমিক কাল হতে পুরো জীবনকাল	৬৫
৫। পুঁইশাক	৫। চারা অবস্থা	৬৫
মসল জাতীয় সবজি		
১। পেঁয়াজ ও রসুন	১। কন্দ শুরু থেকে পুরো জীবনকাল	৭০
২। আদা ও হলুদ	২। পুরো জীবনকাল	৫০
৩। ধনিয়া	৩। পুরো জীবনকাল	৬৫

সবজি চাষে ভালো ফলনের জন্য যেমন সেচের প্রয়োজন তেমনই ভালো নিকাশ ব্যবস্থার অভাবে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

নিকাশের উপকারিতা

১। মাটির মধ্যে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয়। গাছের শিকড় ভালোভাবে বাড়ে ও প্রয়োজনীয় খাদ্য সহজে গ্রহণ করতে পারে।

২। মাটিতে বায়ু চলাচলের ফলে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যা জৈব পদার্থ থেকে নাইট্রোজেনকে গাছের গ্রহণাপোযোগী করে তোলে।

৩। মাটির ভেতরের তাপ ঠিক রাখে। তাতে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বজায় থাকে।

৪। মাটিতে অক্সিজেন প্রবাহ বাড়ে। তাতে গাছ সকল প্রকার খাদ্য উপাদান সহজে নিতে পারে।

৫। গাছের শেকড় মজবুত ও অনেক নিচে যেতে পারে। অনেকদিন বৃষ্টি না হলে মাটির অনেক গভীর হতে রস সংগ্রহ করতে পারে।

নিকাশ না করার অপকারিতা

১। মাটির ভিতরে বায়ু চলাচল কম হয় বা বন্ধ হয়ে যায়। তাতে গাছের শিকড়ে অক্সিজেন না পেয়ে গাছ দূর্বল হয়ে মরে যেতে পারে।

২। বায়ু চলাচল কম হলে মাটিতে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা কমে যায়। ফলে জৈব পদার্থ হতে গাছের খাদ্য উপাদান সহজে বের হতে পারে না।

৩। মাটির ভিতরের তাপ কমে যায়, যা গাছের জন্য ক্ষতিকর।

৪। মাটিতে অক্সিজেনের অভাব হলে পুষ্টি উপাদান যেমন- গন্ধক, লৌহ, নাইট্রোজেনের অভাব দেখা দেয়।

৫। গাছের গোড়ায় ও শিকড়ে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রোগজীবাণুর ও পরজীবির আক্রমণ দেখা দেয়।

সেচ পদ্ধতি

জমিতে সেচের পানি সরবরাহের নানা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তম্মধ্যে প্লাবন পদ্ধতি, নালা পদ্ধতি, থালা পদ্ধতি, বর্ষণ পদ্ধতি ও ঝাঝরি পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। বর্ষণ পদ্ধতি সকল প্রকার সবজি চাষের জন্য উত্তম। এ পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষ এবং বাংলাদেশে এর সুবিধা খুব কম। পারিবারিক সবজি বাগানে ঝাঝরি পদ্ধতিতে দেওয়া হয়। জমির পরিমাণ বেশি হলে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সারি ও কেয়ারির মাঝখান দিয়ে নালা পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া সুবিধাজনক। তাছাড়া মাদায় রোপণকৃত ফল সবজির জন্য থালা পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া ভালো। সেচ দেওয়ার পদ্ধতিগুলো হলো (ক) পৃষ্ঠদেশ পদ্ধতি- প্লাবন , নালা, থালা পদ্ধতিগুলো পৃষ্ঠদেশ পদ্ধতির আওতাভুক্ত। সেচের অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে এ পদ্ধতি সহজতর। এর মাধ্যমে সবজি ক্ষেতে সেচ দিতে তুলনামূলকভাবে কম খরচ পড়ে। প্লাবন বা নালা পদ্ধতিতে পানির সমবণ্টন হয় না এবং সেচের পর মাটি সহজেই কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। জমি সমতল না হলে প্লাবন পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া কষ্টসাধ্য। নালা করে সেচ দেওয়ার সময় জমি একদিকে অল্প ঢালু করে তৈরি করে নিলে পানির অপচয় কম হয়। আবার বেশি ঢালু হলে সেচের পানির সাথে মাটি ও গাছের খাদ্য উপাদান ধূয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

সবজির দুই সারি বা কেয়ারির মাঝখান দিয়ে নালা করে পানি দেয়া যায়। এতে সবজি গাছের গাড়ার মাটি রসালো হয়, মাটি ঝুরঝুরে থাকে এবং কর্দমাক্ত হয় না। দোন, সেউতি, কপিকল, পার্সিয়ান হুইল ইত্যাদির সাহায্যে পুকুর, খাল বিল, নদী, স্তুপ হতে পানি উঠানো যায়। তারপর নালা দিয়ে সবজি ক্ষেতে সেচ দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া গভীর ও অগভীর নলকূপ বা পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে ভূ-নিম্নস্থ বা ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি দিয়েও এ পদ্ধতিতে সেচ দেয়া হয়ে থাকে। ২০২২

সমতল জমিতে সেচ নালা হতে সেচ উপনালা তৈরি করতে হয়। সেচ উপনালার সাথে জমির প্রতিটি খণ্ডের মুখ রাখতে হয়। সবচেয়ে দূরের খণ্ডে আগে সেচ দিতে হয়। দূরের খণ্ডের মুখ বন্ধ করে দ্বিতীয় খণ্ডের মুখ খুলে দিতে হয়। এভাবে দূরেরগুলো পর পর বন্ধ করে কাছেরগুলো পর পর খুলে দিতে হয়। এতে পানির অপচয় কম হয়। কেলি করে লাগানো সবজিতে এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।

সমতল জমিতে কেলি করে চাষ করা হলে প্রথম কেলির একদিকের মুখ সেচের নালার সাথে খোলা রাখতে হয়। অপর মুখ দ্বিতীয় কেলির সাথে খোলা হয়। দ্বিতীয় কেলির যে মুখ প্রথম কেলির সাথে খোলা তার অপর দিকের মুখ তৃতীয় কেলির সাথে খোলা রাখতে হয়। এভাবে সমস্ত কেলিগুলো একটির সাথে আরেকটির সংযোগ তৈরি হবে। এতে প্রথম কেলিতে সেচ দিলে পানি বাধা পেয়ে ঘুরে ঘুরে সমস্ত কেলিতে প্রবেশ করবে। কেলিগুলো সমানভাবে তৈরি করা না হলে সমস্ত কেলিতে সমভাবে পানি প্রবেশ করবে না।

চিত্র ঃ প্লাবন সেচ পদ্ধতি

চিত্র ঃ সমতল জমিতে কেলি করে লাগানো সবজিতে নালা সেচ পদ্ধতি

চিত্র ঃ সমতল জমিতে বাঁধা এবং নালা সেচ

ঢাল জমিতে সেচ দিতে হলে ঢালের অনুকূলে কেলি তৈরি করতে হয়। আর ঢালের উপরের দিকে একটি লম্বা লম্বি প্রধান নালা তৈরি করতে হয়। ঢালের অনুকূলে প্রতিটি কেলির মধ্যবর্তী নালাগুলোর উপরের মুখ প্রধান নালার সাথে খোলা থাকবে। কিন্তু নিচের দিকের মুখ বন্ধ থাকবে। এ সমস্ত জমিতে নালা তৈরির সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নালার তলদেশ সমান করে নিতে হয়। সেচ দেয়ার সময় নিয়ন্ত্রিতভাবে সেচ দিতে হয়। তাছাড়া পানির অপচয় হবে।

খ) নিম্ন পৃষ্ঠদেশ পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে মাটির ভেতর দিয়ে সবজি গাছের শেকড়ের কাছাকাছি পানি পৌঁছায়ে দেয়া হয়। এজন্য সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত পাইপ ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে সেচের জন্য সবজি সারি করে রোপণ করতে হয়।

চিত্র ঃ মাটির ভেতর দিয়ে সেচ (ঝরনা সেচ)

এ পদ্ধতি ব্যয়বহুল বলে আমাদের দেশে সাধারণত ব্যবহার করা হয় না বললেই চলে। তবে এ পদ্ধতির কতগুলো সুবিধা আছে। যথা- ১) মাটি কর্দমাক্ত হয় না, ২) মাটি একস্থান হতে অন্যস্থানে ধুয়ে যায় না, ৩) পানির অপচয় হয় না, ৪) মাটিতে বায়ু চলাচলের কোন অসুবিধা হয় না, ৫) গাছ খুব তাড়াতাড়ি রস গ্রহণ করতে পারে, ৬) খাদ্য উপাদান চুঁইয়ে যেতে পারে না।

গ) ঝরণা সেচ- এ পদ্ধতিতে মাটির উপর দিয়ে বা খুঁটির সাহায্যে পাইপ স্থাপন করা হয়। পাইপের বিভিন্ন স্থান দিয়ে পানি বের হয়ে বৃষ্টির বা ঝরণার আকারে পড়ার জন্য ঘূর্ণায়মান ভাল্ব লাগানো থাকে। এর মাধ্যমে পানি বৃষ্টির আকারে জমিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি পানি সেচের অন্যতম উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে সাধারণ কৃষকের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব নয়। স্বল্প পরিসরে সবজি চাষে এ পদ্ধতি অবশ্য অনুসরণ করা যায়। এর সুবিধা হলো যথা-

১) পানি বৃষ্টিপাতের মত এবং সমভাবে বণ্টন করা সম্ভব হয়

২) মাটি ক্ষয়ের সম্ভাবনা থাকে না

৩) মাটিতে বায়ু চলাচলের অসুবিধা হয় না

৪) মাটি শক্ত হয়ে যায় না।

চারা ছোট বা লিকলিকে অবস্থায় এবং চারা রোপণের পরপরই ঝরণা পদ্ধতিতে সেচ দেয়া উচিত নয়। তাতে চারা মাটিতে শুয়ে যেতে পারে। চারার কচি কাণ্ডে ও পাতায় মাটি লেগে ক্ষতি হতে পারে। গাছে ফুল ধরা অবস্থায় এ পদ্ধতিতে সেচ দিলে পরাগায়নে ব্যাঘাত ঘটে এবং ফলন কমে যায়।

চিত্র ঃ ঝরণা সেচ পদ্ধতি

জলাবদ্ধতা- জমিতে অতিরিক্ত সেচের ফলে বা অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর উপরে উঠে আসে। এতে গাছের শিকড়ের কাছাকাছি স্থান ভিজা থাকে এবং মাটির ভিতরের বায়ু চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। জমিতে শস্যের গোড়ায় পানি জমে থাকা হলো জলাবদ্ধতা। জমিতে জলাবদ্ধতা দেখা দিলে উর্বরা শক্তি হ্রাস পায়, শিকড়ের বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ কৃত্রিম ড্রেন বা নর্দমা তৈরি করতে হয়। এসব ড্রেন জমির উপরিভাগ হতে কমপক্ষে দেড় মিটার নিচে বা সবজি ফসলের শিকড়ের গভীরতার নিচে নামাতে হয়। এর ফলে খোলা নর্দমা বা জমির উপরিভাগের পানি এই ড্রেনের সাহায্যে বের করে সেচ এলাকার বাইরে নদী, খাল ইত্যাদিতে ফেলে দেবে।

অন্তবর্তী পরিচর্যা- জমিতে বীজ বা চারা লাগানোর পর হতে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত গাছের বৃদ্ধি ও ফলায়নের জন্য পরিচর্যা করতে হয়। এই পরিচর্যাগুলোকে অন্তবর্তী পরিচর্যা বলে। নিচে বিভিন্ন ধরনের পরিচর্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

আন্তঃকর্ষণ- আঁচড়া, কোদাল, নিড়ানী বা সময়ে সময়ে হাল্কা চাষের মাধ্যমে সবজি মাঠের আন্তঃকর্ষণ কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়। এ কাজের উদ্দেশ্য মাটিকে ঝুরঝুরে ও মোলায়েম রাখে। মাটির অভ্যন্তরে অনায়াসে পানি ও বায়ু চলাচলে সাহায্য করা। ফলশ্রুতিতে মাটিতে বসবাসকারী উপকারী কীট ও জীবাণুসমূহের কার্যকারীতা বৃদ্ধি পায় ও গাছের খাদ্যোপাদান গ্রহণে সুবিধা হয়। আন্তঃকর্ষণ করলে মাটির স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় থাকে এবং পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টিপাত বা সেচের পর মাটি শুকালে উপরিভাগে শক্ত আবরণ পড়ে। এতে মাটির অভ্যন্তরে বাতাস ও পানি চলাচলে অসুবিধা হয়। তাই আন্তঃকর্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। আন্তঃকর্ষণের ফলে আগাছাও দমন হয়ে যায়।

আচ্ছাদন বা মালচিং- শস্য চাষকালে মাটিতে রস সংরক্ষণ, আগাছা দমন ইত্যাদি উদ্দেশে যেসব কাজগুলো সম্পন্ন করা হয় সেগুলোকে আচ্ছাদন বা মালচিং বলে। মালচিং তিন প্রকার। যথা- (ক) মাটি মালচিং, (খ) খড়কুটা মালচিং ও (গ) কাগজ/পলিথিন মালচিং।

চিত্র ঃ আন্তঃকর্ষণ

চিত্র ঃ মাটি মালচিং

চিত্র ঃ খড়কুটা মালচিং

চিত্র ঃ পলিথিন মালচিং

(ক) মাটি মালচিং আন্তঃকর্ষণের সাহায্যে ২-৬ সেমি. গভীর করে মাটির উপরের স্তর ভেঙ্গে দেয়াকে মাটি মালচিং বলা হয়।

(খ) খড়কুটা মালচিং গাছের গোড়ায় বা সম্পূর্ণ কেয়ারিতে রোগবালাইমুক্ত, খড়কুটা, পাতা, কচুরিপানা ইত্যাদি বিছিয়ে দিয়ে এ মালচিং করা হয়। এ পদ্ধতি সাধারণত পটল, উচ্ছে, শশা ও আলু ইত্যাদিতে করা হয়।

(গ) কাগজ মালচিং- এ প্রথায় পলিথিন দিয়ে ফসলের সম্পূর্ণ কেয়ারি বা বেড ঢেকে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র ফসলের গাছগুলো সুনির্দিষ্ট ছিদ্র পথে বের করে অনাচ্ছাদিত রাখা হয়। ফলে মাটিতে রস সংরক্ষিত থাকে ও আগাছা জন্মাতে পারে না। বর্তমানে উন্নত বিশ্বে এ প্রথা খুবই জনপ্রিয়।

সবজি চাষে আগাছা দমন

আগাছা ঃ ছোট আকৃতির গাছ যা ফসলের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানি জায়গা, আলোবাতাস ইত্যাদিতে প্রতিযোগিতা তৈরি করে যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে তাকে আগাছা বলা হয়। আগাছা অনেক শ্রেণির আছে। যেমন- জীবনচক্র অনুসারে একবর্ষ, দ্বিবর্ষ ও বহুবর্ষজীবী। মৌসুম ভিত্তিক খরিফ ও রবি আগাছা, আবাসস্থলভিত্তিক জলজ ও স্থলজ আগাছা, আগাছার ক্ষতিকর ক্রিয়াভিত্তিক অত্যন্ত আপত্তিকর ও আপত্তিকর আগাছা।

আগাছা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি ঃ ফসলি জমিতে আগাছা জন্মাতে না দিয়ে তা নিধন বা প্রতিরোধ করাকে আগাছা দমন বলা হয়। আগাছা দমন পদ্ধতি ২ ধরনের। যথা- আগাছা প্রতিরোধ ও আগাছা নিধন।

১। **আগাছা প্রতিরোধ-** এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে আগাছার আক্রমণ বা বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
(ক) জমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে প্রস্তুত করা- জমি বারবার চাষ ও মই দিয়ে তারপর আঁচড়া ব্যবহার করা হলে। সব আগাছার লতা, বীজ, স্টোলন, কন্দ, বাল্ব একত্রে জমা হয় এবং চাষের নিচে পড়ে পঁচে যায়।
(খ) প্রত্যায়িত বীজ ব্যবহার- প্রত্যায়িত বীজের তেজভাব বেশি থাকে এবং এতে আগাছার বীজ থাকে না।
(গ) গোবর ও আবর্জনা সার ভালোভাবে পায়ে ব্যবহার- জৈব সার তৈরিতে খড়কুটা ও আবর্জনার সাথে অনেক আগাছার বীজ থাকে, যা উত্তমরুপে পচানো হলে আগাছার বীজ নষ্ট হয়ে যায়।
(ঘ) সেচের পানি নিয়ন্ত্রণ- সেচ দেওয়ার সময় নালা বা অন্য জমির উপর দিয়ে পানি প্রবাহের সময় আগাছার বীজ যেতে পারে। তাই সেচ দেওয়ার পূর্বে নালা পরিষ্কার করতে হয় এবং এক জমি হতে অন্য জমিতে পানি । প্রবাহের সময় নিয়ন্ত্রিত পথ দিয়ে পানি প্রবাহিত করতে হয়।
(ঙ) কৃষি যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা- লাঙ্গল, মই, আঁচড়া, কোদাল ইত্যাদি এক জমিতে ব্যবহারের পর অন্য জমিতে নিতে হলে পরিষ্কার করে নিতে হয়।
(চ) গবাদি পশু চলাচলে নিয়ন্ত্রণ- গবাদি পশু চরার সময় বা চাষাবাদে ব্যবহারের সময় এক জমি হতে অন্য জমিতে বা আগাছার মধ্য দিয়ে চলাচলের সময় তাদের গায়ে পায়ে লেগে অনেক আগাছা বীজ স্থানান্তরিত হতে পারে। তাই গবাদি পশু চলাচলের সময় গা, পা পরিষ্কার করে নিতে হয়।

২। **আগাছা নিধন-** আগাছা নিধন পদ্ধতি কয়েক ধরনের। যেমন- যান্ত্রিক, পরিচর্যা, রাসায়নিক ও জৈবিক পদ্ধতি।

(ক) যান্ত্রিক পদ্ধতি- কৃষি কাজে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি, যেমন- লাঙ্গল, আঁচড়া, নিড়ানি, কোদাল, মই ইত্যাদির সাহায্যে আগাছা নিধনকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আগাছা নিধন বলে।
* আঁচড়া দিয়ে আগাছা নিধন করা যায়। বিশেষতঃ গজানো ছোট আগাছা। জমিতে আড়াআড়ি আঁচড়া দিয়ে প্রখর রোদে জমি খোলা রাখলে বহু আগাছা মারা যায় এবং আঁচড়ায় বহু আগাছা সমূলে উঠে আসে।
* নিড়ানি দিয়েও আগাছা দমন করা যায়। আঁচড়া দেয়ার পরও অনেক আগাছা আগলা অধ্যায় থেকে যায়। এসব আগাছাসহ গভীর শিকড়যুক্ত আগাছা নিড়ানি দিয়ে উঠায়ে নিধন করা যায়।
* কোদাল দিয়ে আগাছা দমন করা যায়। সারি করে রোপণ বা বপনকৃত ফসলের সারির মাঝখান দিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আগাছা উঠিয়ে আনা যায়। পরে মাটি নাড়াচাড়া করে আগাছা বেছে দূরে ফেলে দেওয়া যায় বা পচায়ে সার তৈরি করা যায়।

খ) পরিচর্যাগত পদ্ধতি- জমিতে কাজের কৌশল প্রয়োগ করে আগাছা নিধন করাকে পরিচর্যাগত পদ্ধতিতে আগাছা নিধন বলা হয়।
* শস্য পর্যায় একই ফসল কয়েকবার চাষাবাদ করা হলে সেক্ষেত্রে শস্য আগাছা সাহচর্য তৈরি হয়। কেননা একেক ফসলের সাথে একেক ফসলের জন্মানোর প্রবণতা আছে। যেমন--গোল আলু, মটরশুটির সাথে বথুয়া। তাই কয়েক বছর পর পর ফসল পরিবর্তন করে চাষ করলে নির্দিষ্ট আগাছা দমন হয়ে যায়।
* খড়কুটার আবরণ মালচিং করে আগাছা দমন করা যায়। গোল আলু, কপি চাষে খড়কুটার আবরণ পলিথিন আবরণ দিয়ে ঢেকে দিলে আগাছা জন্মাতে পারে না। এছাড়া সারি করা ফসলের মাঝখান দিয়ে মাটি আগলা করে দিলেও আগাছা দমন হয়।

২০২২

৩। জমি তাড়াতাড়ি ঢেকে যায় এমন ফসল চাষ করে আগাছ দমন করা যায়। গোমটরশুটি, মিষ্টি আলু, ধৈঞ্চা, বরবটি জাতীয় ফসল চাষ করলে দ্রুত আবরণ সৃষ্টি করার ফলে জমি ঢেকে যায়। এর ফলে আগাছা জন্মাতে পারে না।

৪। জমিতে প্লাবন সেচ দ্বারা আগাছা দমন করা যায়। জমির আইল মজবুত করে প্লাবন সেচ দিয়ে জমিতে কয়েক সেমি. পানি দাঁড় করায়ে ২-৩ দিন রাখলে অনেক আগাছা পঁচে নষ্ট হয়ে যায়।

৫। জমিতে সবুজ সার চাষ করে আগাছা দমন- সবুজ সারের জন্য বপনকৃত বীজ ঘন করে দেয়ায় এবং তা দ্রুতবর্ধনশীল ও প্রচুর পত্রবহুল হওয়ায় জমিতে ছায়া করে আগাছা জন্মাতে দেয় না। এমনকি সবুজ সারের জন্য চাষ করলেও আগাছ নষ্ট হয়ে যায়।

৬। হাত দিয়ে টেনে তুলে আগাছা দমন করা যায়। জমিতে নিড়ানি দেওয়ার সময় বা সারি করে লাগানো গাছের মাঝে জন্মানো আগাছা হাত দিয়ে টেনে তুলে দমন করা যায়।

৭। বিক্রিয়াশীল ফসল চাষ করে আগাছা দমন করা যায়। ছোলা/তিল জাতীয় ফসল চাষ করলে আগাছার প্রতি বিক্রিয়ার ফলে তা জন্মাতে পারে না।

৮। জাংলা/মাচা দিয়ে আগাছা দমন করা যায়। লাউ, শিম, কুমড়াজাতীয়, পটল মাচা করে চাষ করলে তার নিচে সাধারণত আগাছা জন্মাতে পারে না। এছাড়া এসব জাংলা/মাচার নিচেও কিছু কিছু সবজি আগাছার উপদ্রব ছাড়া চাষ করা যায়। যেমন-লালশাক, হলুদ।

গ) রাসায়নিক পদ্ধতি- ফসলের রোগ ও পোকা মাকড়ের ন্যায় আগাছাও বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা দমন করা যায়। আগাছা নিধনকারী রাসায়নিক পদার্থের কার্যকারিতার ওপর ভিত্তি করে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন নির্বাচিত, অনির্বাচিত, জন্মাত্তের ও জন্মপূর্বক আগাছানাশক।

* **নির্বাচিত আগাছানাশক-** একটি নির্দিষ্ট আগাছানাশক এক বা একাধিক নির্দিষ্ট ধরনের আগাছাকে শুধু মেরে ফেলে, অন্যগুলোকে মেরে ফেলে না। এরূপ আগাছানাশককে নির্বাচিত আগাছানাশক বলা হয়। যেমন- টু-ফোর ডি, গ্রামোক্সেন, এমসিপিএ ইত্যাদি।

* **অনির্বাচিত আগাছানাশক-** একটি নিদৃষ্ট আগাছানাশক প্রায় সব ধরনের আগাছাকে মেরে ফেলে, বিধায় এ জাতীয় আগাছানাশককে অনির্বাচিত আগাছানাশক বলা হয়। যেমন-পিসিপি, সোডিয়াম ক্লোরেট, প্যারাকুয়াট ইত্যাদি।

* **জন্মাত্তের আগাছানাশক-** বীজ বপন/রোপণের পর চারা গজানো সাথে আগাছার চারাও জন্ম নেয়। এ জাতীয় আগাছা দমনের জন্য স্পর্শ কার্যকর অপেক্ষা আগাছার ভিতরে প্রবাহিত হয়ে আগাছাকে মেরে ফেলে সে জাতীয় আগাছানাশকই জন্মাতের আগাছানাশক হিসেবে বেশি উপযোগী। যেমন- প্রোপানিল, বাসতা, রনস্টার-২৫ ইসি ইত্যাদি।

* **জন্মপূর্ব আগাছানাশক-** ফসল বীজ বপন/রোপণের আগেই এ জাতীয় আগাছানাশক প্রয়োগ করতে হয়। এতে বর্ষজীবী বা যে ধরনেরই আগাছা জন্মানো থাকে তা মারা যায় এবং নতুনভাবে আগাছার চারা জন্মাতে পারে না। যেমন-ডিএনওসি, এ্যামিট্রোল, ডিনোসাম ইত্যাদি।

(ঘ) জৈবিক পদ্ধতি- এ পদ্ধতিতে আগাছা দমনে কীটপতঙ্গ, রোগ-জীবাণু, হাঁস, মাছ, পশু ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। জলজ আগাছা দমনে কার্প বা তেলাপিয়া মাছ ব্যবহার করা যায়। এক ধরনের চায়নিজ হাঁস পানির আগাছা খেয়ে পরিষ্কার করে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া পতিত জমির, জমির আইলের, খোলা মাঠের আগাছা খেয়ে নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকী ছাগল/ভেড়া কোন কোন ফসলের জমিতে ঢুকে শুধু আগাছা খায়। যেমন-দূর্বা, ভুঁইনিম।

২০২২

সবজি চাষে আগাছা, পোকামাকড় ও রোগবালাই

পোকামাকড় ও রোগবালাই ফসলের প্রধান শত্রু। বীজ বপন থেকে আরম্ভ করে শস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পর্যন্ত যে কোন সময় ইহা ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করতে পারে। শাক সবজি চাষে ক্ষতির প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। কেননা পোকামাকড় ও রোগবালাই এর আক্রমণে কেবল ফলনই হ্রাস পায় না বরং সবজির সজীবতা এবং আকর্ষণীয়তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে বাজারজাতকরণে অসুবিধা হয় ও বাজার মূল্য অত্যন্ত কমে যায়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন পদ্ধতি

১। **যান্ত্রিক দমন-** এ পদ্ধতিতে আক্রান্ত গাছ হাতে দিয়ে, জাল দিয়ে বা আলোর ফাঁদ ব্যবহার করে পোকা মাকড় ও পোকার ডিম সংগ্রহ করে মেরে ফেলা হয়। তাছাড়া আক্রান্ত গাছ বা তার অংশ বিশেষ বিনষ্ট করে বা আক্রমণের সম্ভাব্য অঙ্গ কাপড় বা পলিথিনে ঢেকে দিয়ে রোগ ও পোকার বিস্তার রোধ করা হয়।

২। **কর্ষণ দমন-** চাষাবাদ ব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করে কর্ষণ দমন পদ্ধতি কার্যকরি করা হয়। পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ, সুষম সার প্রয়োগ, সুষ্ঠু শস্যচক্র অনুসরণ, প্রতিরোধক শস্য বা জাত নির্বাচন এবং আবাদ পদ্ধতি বা মৌসুম সুবিন্যস্ত করে কীট পতঙ্গ ও রোগ বালাইয়ের উপদ্রব এ পদ্ধতিতে অনেকাংশে কমানো যায়।

৩। **প্রাকৃতিক দমন-** পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে কীট পতঙ্গ ও রোগ বালাই দমনের প্রচেষ্টাকে প্রাকৃতিক দমন বলা হয়। এ পদ্ধতিতে মাটির ভৌতিক অবস্থা, তাপমাত্রা এবং জমির পানি নিষ্কাশন বা সেচ নিয়ন্ত্রণ করে পোকা ও রোগবালাই অনেকাংশে দমন করা হয়। জমির আইলে পোকা প্রতিরোধন বা পাকা বিতাড়ক ফসল চাষ করে ফসল রক্ষা করা যায়।

৪। **জৈবিক দমন-** বিশেষ শ্রেণির পোকা-মাকড়, পাখি, হাঁস-মুরগী প্রভৃতি জীব তারা নিচু শ্রেণীর কীট পতঙ্গকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তাছাড়া কোন কোন পরভোজী সুক্ষ্ম কীটাণু স্বাভাবিক উপায়ে কীট পতঙ্গের নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকেই জৈবিক দমন বলে। পোকা আক্রান্ত জমিতে গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে রাখলে তাতে পাখি বসেও পোকা ধরে খায়। ক্ষেতে ব্যাঙ, গুইসাপ, অজগর সাপ, পেঁচা ইত্যাদি জীব/পাখির বিচরণ করার ব্যবস্থা করে পোকামাকড় দমন করা যায়।

৫। **আইনানুগ দমন-** আইন করে দেশ হতে দেশান্তরে অনিষ্টকারী পোকা-মাকড় ও রোগ জীবাণুর চলাচল বন্ধ করাই আইনানুগ দমণ। ফলে কোন বিদেশি নতুন রোগ বালাই ও কীট পতঙ্গ দেশে বিস্তার লাভ করতে পারে না। কেননা বিদেশ থেকে কোন শস্য, বীজ বা দানা আমদানী করার সময়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বেই সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখা হয় ও প্রয়োজনে অনুপ্রবেশ রোধকল্পে পোকা বা রোগ নিরোধ করে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়।

৬। **রাসায়নিক দমন-** পোকা মাকড় দমনের কাজে আজকাল রাসায়নিক পদ্ধতি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও কার্যকরি। তবে পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমনের জন্য বাজারে যে সব বালাইনাশক পাওয়া যায় সেগুলোর ব্যবহার বিধি, কার্যক্ষম হবার প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন রোগ ও কীটনাশক সচরাচর নিম্নোক্ত চার ভাগে ভাগ করা হয়। কোন কোন বালাইনাশক একাধিক প্রক্রিয়ায় কার্যক্ষম হয়ে থাকে।

(ক) স্পর্শ বিষ- যে সব কীটনাশকের সংস্পর্শে কীট পতঙ্গ বিষাক্ত হয়ে মারা যায় সেগুলোকে স্পর্শ বিষ বলা হয়। এ বিষ ফসলের গায়ে বা মাটিতে ছিটিয়ে দিয়ে পোকা দমনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শোষক পোকা ও মাটিতে বসবাসকারী পোকা দমনে ইহা বিশেষ উপযোগী।

(খ) পাকস্থলী বিষ- যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পাকস্থলীতে প্রবেশ করে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে সেগুলোকে পাকস্থলী বিষ বলে। এ শ্রেণির ঔষধ ফসলের গায়ে প্রয়োগের পর পোকামাকড় গাছের অংশ বিশেষ চিবিয়ে বা কামড়িয়ে খাওয়া বা অনিষ্ট করার সময়ে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। লেড আর্সেনেট, জিঙ্ক ফসফাইড, কারটাপ ইত্যাদি পাকস্থলী বিষ।

(গ) স্নায়ুবিষ- যে সব রাসায়নিক পদার্থ ফসলের কোন অঙ্গ বা নিকটবর্তী মাটিতে প্রয়োগ করলে গাছের সমস্ত অংগ প্রত্যঙ্গকে বিষাক্ত করে তোলে সেগুলোকে স্নায়ুবিষ বলে। এ বিষ দ্রুত কার্যকরি হয় এবং কীটপতঙ্গ গাছের যে কোন অংশ থেকে রস শোষণ করলে বা অংশ বিশেষ চিবিয়ে কামড়িয়ে খেলে বিষ ক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ জাতীয় কীটনাশক সব ধরনের পোকা দমনে কার্যকরি হলেও মাজরা পোকার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। ডায়াজিনন, এলসান, কার্বোফুরান, কারবোসালফার, ফুরাডান, বাসুডিন, পাদান ইত্যাদি ঔষধ স্নায়ুবিষ গুণাবলি সম্পন্ন।

(ঘ) বিষ বাষ্প- কোন রাসায়নিক পদার্থ বাতাসের সংস্পর্শে এসে বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টি করাকে বিষ বাষ্প বলে। ঐ ধরনের ঔষধ প্রয়োগ করলে গুদামজাতকৃত বীজ বা শষ্যদানার পোকা বা গর্তে লুকিয়ে থাকা পোকা, ইদুর ইত্যাদির শ্বাস প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটে ও মারা যায়। ফসটকসিন, সাইনাগ্রোস, এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড, সাইম্যাগ ইত্যাদি বালাইনাশক বিষবাষ্প তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

রোগ ও কীটনাশকের ভৌতরূপ

রোগ ও কীটনাশক পরিবহণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সুবিধার্থে প্রধানত ঃ নিম্নে উলেখিত ৫ (পাঁচ) টি ভাগে প্রস্তুত করা হয়।

১। **গুঁড়ো-** পানির সংমিশ্রণ ব্যতিত যে সব ঔষধ ফসলের গায়ে, মাটিতে বা শস্যদানায় ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে গুঁড়ো বালাইনাশক বলে। এগুলো শুষ্ক অবস্থায় ডাষ্টারের সাহায্যে ফসলের উপরে ছিটানো যায়। ফসলের গা বৃষ্টি বা শিশির সিক্ত হলে ঔষধের কার্যকারিতা বাড়ে ও অপচয় কম হয়। স্বল্প পরিমাণ শস্য বা স্বল্প পরিসর মাটিতে গুড়ো ঔষধ প্রয়োগ করতে তেমন কোন যন্ত্রের প্রয়াজন হয় না। বালি বা ছাইয়ের সাথে সংমিশ্রণ করে নিলে সমভাবে প্রয়োগ করতে সুবিধা হয়। গুঁড়ো বালাইনাশক ব্যবহারে পানি বহনের ঝামেলা থাকে না। ইহা পানি বিহীন শুষ্ক এলাকার জন্য বেশি উপযোগী।

২। **পানিতে মিশ্রণযোগ্য গুঁড়ো-** ইহা দেখতে গুঁড়ো বিষের ন্যায় হলেও তৎসংগে পানিতে মিশ্রণ উপযোগী রাসায়নিক পদার্থ সংমিশ্রীত থাকে। এগুঁড়ো আবার দু'রকম যথা (ক) দ্রবণযোগ্য গুঁড়ো (এসপি) ও (খ) ভেজাযোগ্য গুঁড়ো (ডবিউপি)। ইহা পানিতে পুরোপুরি দ্রবীভূত হয় না বিধায় প্রয়োগকালে মিশ্রণ তৈরির সময় পানিতে অব্যাহতভাবে নাড়তে হয়। ইহা কোমল লতা পাতায় তরল ঔষধের চেয়ে নিরাপদে ব্যবহার করা চলে। পাদান-৫০ এসপি, সালফার-৮০ ডব্লিউ জি, সেভিন-৮৫ এসপি, কপার অক্সিক্লোরাইড (ডব্লিউপি), ডায়থেন-এম ৪৫ ইত্যাদি এ শ্রেণিভূক্ত।

৩। তরল- তরল কীটনাশক ঔষধ দু'রকমে বাজারজাত করা হয় যথা (ক) ঘনীভূত (ইসি) এবং (খ) পানিতে দ্রবণীয় ঘনীভূত (ডব্লিউএসপি) কীটনাশক। ইহা বর্তমানে সর্বাধিক জনপ্রিয় ও ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর রাসায়নিক পদার্থসমূহ অত্যন্ত ঘন অবস্থায় তেলে মেশানো থাকে এবং পানির সাথে সংমিশ্রণ পূর্বক আয়তন বহুগুণে। বৃদ্ধি করে ফসলের গায়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করা যায়। ইহা প্রধানত পাকস্থলী বিষ ও স্নায়ুবিষ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সব ধরনের পোকা মাকড় ও রোগ বালাই দমনে অত্যন্ত কার্যকরি। ম্যালাথিয়ন, ডায়াজিনন, এলসান, নগস, ভেপানো, ডিডিভিপি ইত্যাদি।

৪। দানাদার- বিভিন্ন রকম দানাদার কীটনাশক হাতে বা যন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা হয়। পানি বা অন্য কোন দ্রব্যের সাথে সংমিশ্রণ করতে হয় না। ইহা বৃষ্টিতে ধুয়ে বিনষ্ট হয় না ও দীর্ঘ সময় কার্যকরি থাকে। ফুরাডান-৩জি, ডায়াজিনন-১৪জি, পাদান-১০জি, কার্বোফুরান-৫জি ইত্যাদি ঔষধ যা সবজি চাষেও ব্যবহার করা চলে।

৫। বিষ বাষ্পের বড়ি- বিষ বাষ্পের বড়ি গুদামজাত বীজ ও শস্যদানা সংরক্ষণকালে গুদামে শস্যের পোকামাকড়, ইদুর নিধন ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। ফসটক্সিন, এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড বিষ বাষ্পের একটি পরিচিত বড়ি বালাইনাশক। এছাড়া গর্তেও এ বিষ ব্যবহার করা হয়।

পোকা মাকড়ের আক্রমণ ও প্রতিকার

বিভিন্ন প্রকার পোকা মাকড় দ্বারা শাক-সবজি আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আক্রমণের ধরণ ও প্রতিকার বিধির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পোকা মাকড়গুলোকে নিম্নোক্ত চারটি ভাগে ভাগ করে তাদের আক্রমণের লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। মাজরা পোকা- যে সব মাছি ও প্রজাপতির শুককীট গাছের কচি ডগা, কাণ্ড ও ফলে ফুটো করে ঢুকে ভিতরের অংশ খায়, সেগুলোকে মাজরা পোকা হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

(ক) সবজির মাজরা বেগুনের ফল ও ডগার মাজরা পোকা, ঢেঁড়শ, বরবটি, কীম, মটরশুটি ইত্যাদির ডগা ও ফলের মাজরা পোকা এ শ্রেণিভুক্ত। প্রজাপতি পাতা, পাতার বোটা ও পুষ্প মুকুলে ডিম পাড়ে ও ডিম হতে শুককীট বের হয়ে কচি ডগা ও ফলে ছিদ্র করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। এরফলে আক্রান্ত শাখা নেতিয়ে পড়ে ও ফল পচে যায়, বাঁকা হয় বা বিকৃত আকার ধারণ করে। প্রজাপতির উৎপাত সারা বৎসরই থাকে। ফসলের বাড়ন্ত অবস্থায় আক্রমণ বেশি হয়। প্রজাপতির মুককীট জমিতে পড়ে থাকা আবর্জনা ও পাতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং পরে পূর্ণাঙ্গ পোকায় পরিণত হয়।

দমন ব্যবস্থা

১) মাজরা প্রতিরোধক জাত ব্যবহার ও কম আক্রমণ প্রবণ মৌসুমে আবাদ করা।

২) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ এবং আক্রান্ত শাখা প্রশাখা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা।

৩) ডগা বা পাতায় ডিমের গাদা দেখা মাত্র সংগ্রহ করে বিনষ্ট করা।

৪) জমিতে প্রজাপতির আনাগোনা দেখা গেলে আলোর ফাঁদ ব্যবহার করা।

৫) প্রাতঃকালে শিশিরসিক্ত অবস্থায় গাছে চুলার ছাই ছিটিয়ে দেয়া।

৬) বিঘা প্রতি ২-৩ কেজি কার্বোফুরাণ ৫-জি, ৪-৫ কেজি ফুরাডান জাতীয় দানাদার কীটনাশক প্রয়োগ করা।

৭) আক্রমণ ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছালে বীজ ফসলের জন্য ২ মিলি লিটার নগস ভেপানো ম্যালাথিয়ন/ জিথিয়ন বা সমোগোত্রীয় যে কোন কীটনাশক প্রয়োগ করা।

২। **ফলের মাছি পোকা-** কুমড়া পরিবারের প্রায় সব সবজিই ফলের মাছি পোকায় আক্রান্ত হয়। তাছাড়া ঢেঁড়শ, বরবটি, কীম ইত্যাদিও বিভিন্ন প্রকার সবজি মাছির দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ফলের গায়ে ডিম পাড়ার কারণে ফলের গায়ে দাগ পড়ে বা পচন ধরে। আক্রান্ত ফল ঝরে পড়ে, বাঁকা হয় বা বিকৃত হয়ে খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া আক্রমণের কারণে ঢেঁড়সে মোজাইক ইয়ালো ভাইরাস বিস্তার লাভ করে। বর্ষা মৌসুমে মাছি পোকার উপদ্রব বেশি হয়। মাছি এক নাগাড়ে ফলের উপরে বসে থাকে না এবং শুককীট ফলের ভিতরে থাকে বলে দমন করা খুবই কষ্টসাধ্য।

দমন ব্যবস্থা

৪) পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ ও আক্রান্ত ডগা ইত্যাদি সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে বিনষ্ট করা।

৫) মাছির আক্রমণ ক্ষতিকর পর্যায়ে পৌঁছিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মি. লি. ম্যালাথিয়ন/ফাইফানন/জিথিয়ন/ নগস ইত্যাদি স্বল্প স্থায়ী কীটনাশক ৮-১০দিন পর পর ২-৩ বার করতে হবে। তবে বীজ ফসলের জন্য এনথিও। মেটাসিসটকস /ফলিথিয়ন বা সমোগোত্রীয় দীর্ঘস্থায়ী কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ মি.লি মিশিয়ে প্রয়োগ করা উত্তম।

৬) কুমড়া ফলের মাছি পোকা দমনে কীটনাশক ছিটানোর চেয়ে নিম্নরূপভাবে বিষ টোপ তৈরি করে প্রয়োগ করলে বেশি সুফল পাওয়া যায় ও মাছি ইহা খেয়ে মারা যায়। যথা-

(ক) পরিপক্ক ফল ১০০ গ্রাম নিয়ে কুচি কুচি করে কেটে বাঁটতে হবে। এ কাই বা বাটার সংগে ১০ গ্রাম ডিপ্টেরেক্স ৮০ গুঁড়ো ও ১০ গ্রাম গুড় মিশিয়ে বিষটোপ তৈরি করে জমিতে স্থানে স্থানে মাটির পাত্রে করে দিতে হয়। উল্লেখ্য যে, বাঁশের স্ট্যান্ড বসিয়ে তাতে বিষটোপের পাত্র ফসলের চেয়ে কিঞ্চিত উপরে রাখা উত্তম। এতে বিষটোপ মাছির বেশি নজরে পড়ে ও মাছি ইহা খেয়ে মারা যায়।

(খ) প্রতি লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম লেড আর্সেনেট বা প্যারিস গ্রীন ও ৫০ গ্রাম গুড় মিশিয়েও বিসটোপ তৈরি করা। যায় এ মিশ্রণ পরে ভালোভাবে ছেকে কচি ফলের গায়ে সিঞ্চন করতে হয়।

৩। **শোষক পাকা-** গাছের পাতা, ডগা বা ফলের রস চুষে খাওয়া পোকা মাকড়কে শোষক বলা হয়। জাব পোকা, গান্ধি পোকা, থ্রিপস, মাকড়, পাতা ফড়িং, ঘোড়া পোকা ইত্যাদি বিভিন্ন সবজির পাতা, ডগা, ফুল ও ফলের

নরম অংশের উপর বসে বা বাস করে রস চুষে খায়। ফলে পাতা বিবর্ণ হয়, কুঁকড়ায়ে, যথাযথ বৃদ্ধি পায় না, ফুল শুকিয়ে যায়, ফল বিকৃত আকার ধারন করে বা পঁচে যায় এবং গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। যেমন-

(ক) জাব পোকা- জাব পোকা অতি ক্ষুদ্রাকৃতির, কোমলদেহী এবং গাঢ় সবুজ, ধূসর বা কালো বর্ণের হয়ে থাকে এবং শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ায় অতি দ্রুত বংশ বিস্তার লাভ করে। এ পোকা ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, মূলা, শিম, বরবটী, তরমুজ, সরিষা, মৌসুমী ফুল ইত্যাদি ফসলের কচি ডগায়, পাতার নিচের দিকে ও ফলে আক্রমণ করে। এ পোকা আক্রান্ত ফসলের রস চুষে খায়, ফসলের গায়ে মধু জমা করে এবং ভাইরাস রোগ বিস্তারে সহায়তা করে। ফলে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয় ও কপার ঘটিত রোগনাশক প্রয়োগে কপার বিষ ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মধু জমা করায় পিঁপড়ার উপদ্রব হয়।

দমন ব্যবস্থা- প্রতি লিটার পানিতে ২ মি.লিটার ম্যালাথিয়ন/এনথিও নগস/ভোপানো/ডায়াজিনন বা সমমানের যে কোন কীটনাশক ৮-১০ দিন পর পর সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করে এ পোকা দমন করা যায়। তবে পাতার নিচের দিকে ঔষধ প্রয়োগ করা বেশি কার্যকরি। বালাইনাশক ফসলে বিকালের দিকে সতর্কতার সাথে ঔষধ প্রয়োগ করা শ্রেয়। এতে পরাগায়ন সহায়ক মৌমাছির বিশেষ ক্ষতি হয় না।

(খ) গান্ধি পোকা- ইহা শোষক শ্রেণির পোকা ও বিভিন্ন আকার ও বর্ণের হয়ে থাকে যথা– স্কোয়াস বাগ, রেড কটন বাগ, টার্নিশড বাগ ইত্যাদি প্রধানত ঃ শিম, বরবটী, ঢেঁড়শ, বেগুন, লাউ, কচি ফুলগাছ ইত্যাদিতে আক্রমণ করে এবং জাব পোকার ন্যায় রস চুষে খায় ও গায়ে দাগের সৃষ্টি করে। দমন ব্যবস্থা জাব পোকা দমনে যে বালাইনাশক ব্যবহার করা হবে তা গান্ধি পাকা দমনে একইভাবে করতে হবে।

(গ) থ্রিপস- ইহা একটি ক্ষুদ্রাকার ও হালকা বাদামী বর্ণের শোষক পোকা। প্রধানত শুষ্ক মৌসুমে রসুন, পেঁয়াজ, শিম, মরিচ, লেটুস, মৌসুমী ফুল ইত্যাদি আক্রমণ করে রস চুষে খায়। ফলে পাতা বিবর্ণ হয়ে যায় ও গায়ে কালো বিন্দুর ন্যায় পোকার মল পড়ে থাকে।
দমন ব্যবস্থা- জাব পোকা দমনের ন্যায় একই পদ্ধতি।

(ঘ) ক্ষুদ্র মাকড়সা- ইহা অষ্টপদী ক্ষুদ্রাকার শোষক এবং লাল, সাদা ও ঘিয়ে বর্ণের হয়ে থাকে। প্রধানত শুষ্ক মৌসুমে ইহা পাতার নিচে বা তলে, কচি ডগায় বা ফলে আক্রমণ করে রস চুষে খায় ও পাতার উপরে জাল বিস্তার করে। আক্রান্ত অংগে বাদামী বা ঘিয়ে বর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ পড়ে ও সজীবতা হ্রাস পায়। বেগুন, কীম, ভূট্টা, লেটুস, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজিতে সাধারণত: আক্রমন করে।
দমন ব্যবস্থা ঃ প্রতি লিটার পানিতে ৩-৪ মিলি. কেলথেন, এনথিও বা ৪ গ্রাম থিওভিট মিশিয়ে আক্রান্ত অংগে ৮-১০ দিন পর পর প্রয়োগ করতে হবে।

(ঙ) পাতা ফড়িং (হপার ও জ্যাসিড) ঃ এটি শোষক শ্রেণির ক্ষুদ্রাকার পোকা। এ পোকা প্রধানত ঃ সবুজ বা মিশ্র বর্ণের হয়ে থাকে। ইহা পাতার নিচ দিকে বসে রস চুষে খায়, ভাইরাস রোগ ছড়ায় এবং দেহ নিঃসৃত লালার বিষক্রিয়ায় পত্রকোষের ক্ষতি সাধন হয়। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়ায়ে যায়, সাদা দাগ পড়ে বা হলুদ বর্ণ ধারন করে ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বেগুন, ঢেঁড়স, টমেটো, শিম, আলু, গাজর ইত্যাদিতে আক্রমণ করে।

দমন ব্যবস্থা ঃ পাতা ফড়িং গাছে লাফিয়ে বেড়ায় বলে ইহা দমনের জন্য স্পর্শ বিষের চেয়ে স্নায়ু বিষ বেশি কার্যকরি হয়। তাই সবজি ফসলের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি. এনথিও/ মেটাসিস্টক্স এজোড্রিন বা সমগোত্রীয় যে কোন ঔষধ মিশিয়ে প্রয়োগ করা ভালো।

৪। চিবানো পোকা

এ শ্রেণির পোকা গাছের পাতা, ডগা, কাণ্ড বা ফল কামড়ে বা চিবিয়ে খায় ও নষ্ট করে। ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এতে ফলন কমে যায় ও সবজির বাজার মূল্য হ্রাস পায়। বিছা ও লেদা পোকা, গুবরে পোকা, ফলের মাছি ও শ্বেত মাছি পোকা ইত্যাদি চিবানো পোকার অন্তর্গত। অনেক সময় এ সব পোকার আক্রমণে পাতা ও গাছ পত্রহীন হয়ে পড়ে।

(ক) বিছা ও লেদা পোকা ঃ বিভিন্ন প্রকার মথ ও প্রজাপতি শুককীট অবস্থায় এ নামে পরিচিত। শুককীটের গায়ে লোম থাকলে বিছা আর লোম না থাকলে লেদা পোকা বলা হয়। ইহারা দিনের বেলায় মাটিতে বা পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে এবং রাত্রে গাছের পাতা, কাণ্ড ও ফল চিবিয়ে খায়, চারার গোড়া কেটে দেয় এবং ডগা ও ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, টমেটো, বেগুন, আলু, ঢেঁড়স ও কুমড়া গোত্রের সবজিতে এদের প্রাদুর্ভাব বেশি হয় এবং অনেক সময় অজস্র লেদা পোকা একসঙ্গে পাতার নিচে জড় হয়ে থাকে।

দমন ব্যবস্থা-

১) পাতার গায়ে ডিম বা শুককীট দেখা মাত্র সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।

২) সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে পাতায় বিষ বা টোটা বিষ প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি লিটার পানিতে ৮-১০ গ্রাম লিড আর্সেনেট ও ৫০ গ্রাম গুড় মিশিয়ে বিষটোপ তৈরি করা যায়।

৩) ফসলের বাড়ন্ত অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি, ডায়াজিনন/ফলিথিয়ন ইত্যাদি, আর ফসল সংগ্রহ উপযোগী হওয়ার ১০-১৫ দিন পূর্ব থেকে ভক্ষকদের নিরাপত্তার স্বার্থে ২ মি.লি. ম্যালাথিয়ন/নগস/ ভেপোনা/এরোসেল ইত্যাদি স্বল্পস্থায়ী কীটনাশক প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

(খ) গুবরে পোকা (বিটল ও উইভিল)- বিভিন্ন ধরনের গুবরে পোকা ও এগুলোর শুককীট ফসলের পাতা, কাণ্ড, পাতা, ফল ইত্যাদি চিবিয়ে খায়, গোড়া কেটে দেয় বা চিবিয়ে থেতলে দেয়, চারা গাছের মুল ও পাতা ঝাঁক বা চিবিয়ে থেতলে দেয়, চারা গাছের মূল ও পাতা ঝাঁঝরা করে ফেলে। অনেক সময় আক্রান্ত অঙ্গে ছত্রাকের আক্রমণে পচন ধরে। রেড পাম্পাকীন বিটল প্রধানত কুমড়া গোত্রের সবজিতে এবং এপিলাকনা বিটল আলু, বেগুন, শিম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শাক ও কুমড়াজাতীয় সবজিতে আক্রমণ করে থাকে। তাছাড়া পালস্ বিটল গুদামজাত অবস্থায় শিম ও ডাল বীজ খেয়ে বা ছিদ্র করে বিনষ্ট করে। উইভিলকে বাংলায় ছোট গুবরে পোকা বলা হয়। এরা গাছের পাতা ও কচি অঙ্গ চিবিয়ে খায়। মিষ্টি আলুর জন্য ইহা বেশি ক্ষতিকর এবং মাঠে ও গুদামে উভয়স্থানে ক্ষতিসাধন করে থাকে।

দমন ব্যবস্থা

১) বিছা ও লেদা পোকার জন্য উল্লেখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।

২) প্রতি বিঘায় ৩ কেজি ফুরাডান বা কুরাটার দানাদার বিষ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৩) কাটা, থেতলানো আলু বেছে ভালোগুলো উত্তমরূপে ছায়ায় শুকানোর পর প্রতি কেজি বীজের সাথে ১ গ্রাম সেভিন ১০ জি কীটনাশক মিশিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। তবে খাবারের জন্য সংরক্ষিত আলু বীজে ঔষধ মিশানো

২০২২

অনুচিত। আলু ব্যতীত অন্যান্য বীজ বায়ু রোধক পাত্রে সংরক্ষণ ও মাঝে মাঝে রোদে শুকানো ও গুদামজাত করার পূর্বে আক্রান্ত বীজ ও আলু বাছাই করে সরিয়ে ফেলা উচিত।

৪) জমি সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বাঞ্ছনীয়।

মাটিতে বসবাসকারী পোকা

উরচুঙ্গা, উই, পিঁপড়া, কাটুই পোকা, চোরা পোকা ইত্যাদি মাটিতে বাস করে ও রাত্রিকালে সবজির চারা বা অল্প বয়স্ক গাছ মাটির সমতলে কেটে বিনষ্ট করে। এ শ্রেণির পোকার আক্রমণে মাঠ ও শস্য শ্রীহীন হয়ে পড়ে। উপযুক্ত দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে প্রতিনিয়ত নতুন চারা লাগিয়েও জমিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক গাছ সংরক্ষণ করা যায় না। ফুলকপি, বাঁধাকপি, মরিচ, পেঁপে, বেগুন, টমেটো, গোল আলু, তরমুজ ইত্যাদির জমিতে আক্রমণ বেশি হয়।

দমন ব্যবস্থা

১) এ শ্রেণির পোকা দমনের জন্য ২ কেজি বাসুডিন-১০ জি, ডায়াজিনন-১৪জি, সেভিন-১০ জি শেষ চাষের পূর্বে জমিতে ছিটিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়। সেভিন বা ক্যালথেন ৫০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয় স্প্রে মেশিনের সাহায্যে জমিতে বা আক্রান্ত এলাকায় প্রয়োগ করা অথবা সারি বা নালার পার্শ্বে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

২) পিপড়ে বা উই পোকায় নগস, ম্যালাথিয়ন, সেভিন ইত্যাদি স্প্রে করা এবং উরচুঙ্গা ও কাটুই পোকায় আক্রান্ত গাছের আশেপাশে বা পোকার গর্তের নিকটবর্তী স্থানে বিষটোপ ছিটিয়ে দিতে হয়। গমের ভুষি/চালের কুড়া, গুড়া সেভিন ১০০:১০:২: অনুপাতে (ওজনের) পানির সাথে মিশিয়ে বড়ির আকারে বিষটোপ তৈরি করা যায়।

৩) উল্টে পাল্টে জমি চাষ করে সূর্যালোকে মাটি শুকানো বা পানি আটকে রাখা যেতে পারে।

৪) বীজতলার চারপাশে কেরোসিন বা সেভিন ৮০ গুড়ো ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে।

গুদামজাত শস্যের পোকা দমন

গুদামজাত অবস্থায় শিম, বরবটি, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির দানা, বীজ এবং গোলআলু ও অন্যান্য মূল বা কন্দ জাতীয় ফসল নানা রকম পোকায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরূপ ক্ষয়ক্ষতি রোধে নিম্নে বর্ণিত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।

ক) ফসল সংগ্রহকালে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ বা দমন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

খ) পরিপক্কতা লাভের পর মাঠ থেকে ফসল সংগ্রহ করা এবং বিনির্ধারিত মান অনুযায়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিশুষ্ক করতে হবে।

গ) সংরক্ষণের পূর্বে বীজ, দানা বা আলু ভালোভাবে বাছাই ও শ্রেণি বিন্যাস করতে হবে।

ঘ) আক্রান্ত বীজ/আলু বাছাই করে মাটিতে পুঁতে বিনষ্ট করতে হবে।

ঙ) বীজ বা দানা বায়ুরোধক পাত্রে প্যাকিং করে সংরক্ষণ করতে হবে।

চ) আক্রমণ প্রবণ শিম, বরবটি, মটরশুটি, কুমড়া, শশা ইত্যাদি বীজের সাথে কেজি প্রতি ১ গ্রাম হারে সেভিন ১০ গুড়ো মিশিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

ছ) সংরক্ষিত বীজ মাঝে মাঝে শুকিয়ে সেগুলোর আর্দ্রতা ৭-৮% এ সীমাবদ্ধ রাখা।
জ) বায়ু চলাচল সুবিধাযুক্ত শুষ্ক মেঝে বা মাঁচায় ৩০-৪৫ সেমি. পুরু করে বিছিয়ে আলু সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
ঝ) প্রতি ১০০ কেজি শুকনো বালির সাথে ৩০-৪০ গ্রাম সেভিন-৮৫ গুড়ো মিশিয়ে তদ্বারা আলু ঢেকে রাখতে হয়। কীটনাশকের বদলে নিম বা তামাক পাতার গুড়ো বালির সাথে মিশিয়েও মিষ্টি আলু সংরক্ষণ করা চলে।
ঞ) বীজ গুদাম ও সংরক্ষণ পাত্র সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং কীট ও রোগ জীবাণুমুক্ত রাখতে হয়।

সমন্বিত পোকা দমন ব্যবস্থা

পোকা দমনের বিভিন্ন পদ্ধতি, চাষাবাদ প্রক্রিয়া ও কলাকৌশল সুবিন্যস্ত করে পরিবেশ সম্মতভাবে নূন্যতম ব্যয়ে ও কীটনাশক প্রয়োগে পোকা দমনের ব্যবস্থাকে সমন্বিত পোকা দমন ব্যবস্থা বলে। একটি নতুন উদ্যোগ বা সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন দেশে অনুসরণ করে সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশেও সমন্বিত পোকা দমনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। এককভাবে খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টার চেয়ে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সমষ্টিগতভাবে ইহাকে কার্যকরী করা হলে অধিক সুফল পাওয়া যায়। এ ব্যবস্থায় আক্রমণের তীব্রতা অর্থনৈতিক দ্বার প্রান্তে পৌছার পূর্বে এবং বিকল্প দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হলে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয় না।

সমন্বিত পোকা দমনের উদ্দেশ্য

কীটনাশক প্রয়োগে পোকা দমন করা আপাতদৃষ্টিতে কম ঝামেলাপূর্ণ ও বেশি কার্যকরী প্রমাণিত হওয়ায় বর্তমানে ইহার ব্যবহার ক্রমেই ব্যাপকতর হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পোকা নিধনের সঙ্গে হিতকর পশুপক্ষী, মাছ, ব্যাঙ, পোকা, শামুক ইত্যাদিও কীটনাশকের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় অধিক হারে বিনষ্ট হচ্ছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলছে। শুধু তাই নয়, কীটনাশকের দামও দিন দিন বাড়ছে এবং উপুর্যপরি কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে পোকামাকড়ের প্রতিরোধ ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মানব জাতীর সামগ্রীক কল্যাণে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, উৎপাদন খরচ হ্রাস ও বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধ করার উদ্দেশ্যে সমন্বিত পোকা দমন ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ফল, সবজি, দানাফসল ইত্যাদি বালাইনাশক ব্যবহার করায় তার অবকীষ্টাংশ ফসলে থাকায় তা মানুষের শরীরে খাদ্যের সাথে প্রবেশ করছে।

সমন্বিত পোকা দমন ব্যবস্থায় করণীয়

(ক) শস্য আবাদ সুবিন্যস্ত করা

১. ফসলের ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও পরিপাটি করে চাষ করতে হবে।
২. ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ উপযোগী শস্য আবাদ ও কলাকৌশল অনুসরণ করতে হবে।
৩. পোকার আক্রমণ প্রতিরোধক ফসল ও জাত আবাদ করতে হবে।
৪. যথোপযুক্ত শস্যচক্র অনুসরণ ও আক্রমণ প্রবণ সময়ে শস্য আবাদ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৫. দুটি ফসলের মধ্যবর্তী সময়ে বা প্রধান ফসলের সাথে ফালি প্রথায় আক্রমণ প্রবণ শস্য চাষ করতে হবে।

(খ) জৈবিক কার্যক্রম সুবিন্যাস্ত করা

১। পরজীবী জীবাণু ব্যবহার করে ক্ষতিকর পোকা বিনষ্ট করতে হবে।
২। পুরুষ পোকা বন্ধাকরণের মাধ্যমে বংশ বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

২০২২

৩। ক্ষতিকর পোকা খাদক পাখি ও কীটের বংশ বিস্তার ও তৎপরতার সুযোগ সৃস্টি করতে হবে।

৪। হিতকর পোকার বংশ বৃদ্ধি ও তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

সবজি চাষে রোগ বালাইয়ের আক্রমণও দমন প্রক্রিয়া

গাছের স্বাভাবিক জীবন চক্রে জীবাণুর আক্রমণ কিংবা অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রভাবে অনেক সময় বীজ বা দানা অপুষ্ট হয়, বীজ হতে আদৌ চারা গজায় না কিংবা গজালেও চারা বিকৃত বা দূর্বল হয়, সবজি স্বাভাবিক হয় না। শেকড়ে, ডাঁটায় বা পাতায় দাগ পড়ে, পচে যায়, হলুদ বর্ণ ধারণ করে, নেতিয়ে পড়ে বা কুঁকড়িয়ে যায়, পূর্ণবয়স্ক গাছে শিকড়, কাণ্ড, ডালপালা, পাতা, ফুল ইত্যাদির স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও ফলন কমে যায়। কখনো গাছ নিস্তেজ হয়ে অকালে বা অপরিণত বয়সে মরে যায়। গাছের এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থাকেই রোগ বলে।

প্রধানত গাছের রোগ বালাইকে (ক) পরভোজী বা সংক্রামক এবং (খ) অপরভোজী বা অসংক্রামক এ দ'ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) পরভোজী বা সংক্রামক রোগ ঃ ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া, শেওলা, ক্রিমি, ভাইরাস, মাইকোপ্লাজমা ইত্যাদি যে কোন জীবাণু বা অণুবীজের আক্রমণে যেসব রোগের সৃষ্টি হয় সেগুলোকে সংক্রামক রোগ বলে।

(খ) অপরভোজী বা অসংক্রামক রোগ ঃ নিম্নলিখিত এক বা একাধিক কারণে গাছে রোগাবস্থার সৃষ্টি হলে একে অসংক্রামক রোগ বলে।

১। মাটিতে গাছের খাদ্য উপাদানের ঘাটতি বা আধিক্য হওয়া।

২। অসামঞ্জস্যপূর্ণ অম্লক্ষারত্বের কারণে খাদ্যোপাদান গ্রহণযোগ্য না হওয়া।

৩। মাটিতে রসের পরিমাণ খুব বেশি বা কম হওয়া।

৪। মাটি জমাট বাঁধার কারণে বায়ু চলাচলে অসুবিধা হওয়া

৫। পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি হওয়া।

৬। মাটিতে বা বাতাসে ক্ষতিকর গ্যাস বিদ্যমান থাকা।

৭। বর্জ্য মিশ্রিত ও দূষিত পানি সেচে ব্যবহার করা।

বিভিন্ন প্রকার শাকসবজির সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ বালাইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাদি নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। ছত্রাকজনিত রোগ- ছত্রাক এক ধরনের এক বা একাধিক দেহকোষ সম্বলিত জীবাণু। ইহাদের দেহে সবুজ কণিকা থাকে না এবং অধিকাংশ ছত্রাক খালি চোখে দেখা যায় না। উদ্ভিদের স্বাভাবিক ছিদ্র ও আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের মধ্য দিয়ে এর জীবাণু উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে ভিতর দিকে অগ্রসর হয় এবং উদ্ভিদ কোষ থেকে খাদ্য শোষণ করে। ফলে উদ্ভিদের দেহ কোষ বিনষ্ট হয় এবং বিভিন্ন অংগে দাগ, পচন, বিবর্ণতা ইত্যাদি রোগাক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ছত্রাক মাটি, ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, জৈব পদার্থ ইত্যাদিতে বেঁচে থাকে ও অবস্থান করে। ইহা বীজ, পানি, পোকামাকড় বা যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে এবং অনুকূল পরিবেশে সক্রিয় হয়ে উঠে ও রোগাক্রমণের কারণ ঘটায়। সবজির ছত্রাক জনিত কয়েকটি প্রধান রোগ ও প্রতিকারের বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

সারণি ও সবজির ছত্রাকজনিত প্রধান প্রধান রোগ ও প্রতিকার

রোগের নাম/আক্রান্ত সবজির নাম	আক্রমণের কারণ ও লক্ষণ	প্রতিকারের উপায়
১। ধসে পড়া (ড্যামপিং অফ) রোগ (কপি গোত্রের সবজি টমেটো, বেগুন, মরিচ ইত্যাদি)	সবজির প্রকারভেদ অনুযায়ী ফাইথিয়াম, ফাইটোপথোরা, পেলিকুলেরিয়া, রাইজকটোনিয়া প্রভৃতি এক বা একাধিক ছত্রাকের আক্রমণে বীজ বপনের পর থেকে চারা অবস্থায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। ফলে বীজ পঁচে যায়, চারার গোড়া চিকন, লিকলিকে হয়ে ধ্বসে পড়ে ও মারা যায়। আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে এবং মেঘলা দিনে এ রোগ দ্রুত ছড়ায়। বীজ ও মাটিতে জীবাণু থাকে।	রোগমুক্ত বীজ বপন, একই বীজ তলায় পুনঃ পুনঃব্যবহার না করা, মাটি স্যাঁতসেঁতে হতে না দেয়া উত্তম প্রতিকার ব্যবস্থা। তা ছাড়া যথোপযুক্তভাবে বীজ ও বীজ তলার মাটি শোধন করা, যথারীতি ক্যাপটান, থিরাম, ডায়াথেন-এম বা কপার জাতীয় রোগনাশক ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে ৫-৬ গ্রাম গুলে বীজতলার মাটি ও চারায় প্রয়োগ করা।
২। ফল পঁচা রোগ (কুমড়া, শশা, বাংগি, টমেটো ইত্যাদি)।	ফাইটপথোরা ও ফোমপসিস জীবানুর আক্রমণে এ রোগ হয় এবং আক্রান্ত গাছের শাখায় গাঢ় তামাটে বর্ণের ক্ষত হয়। পাতায় গোলাকার দাগ পড়ে এবং ফলের গায়ে প্রথমে নরম জল দাগ পড়ে এবং সেগুলো ধূসর ও কালো হয়ে পচে যায়। বীজ ও মাটির সাহায্যে বিস্তার লাভ করে এ রোগের জীবাণু।	রোগমুক্ত বীজ ও প্রতিরোধক জাত ব্যবহার, শস্যচক্র অনুসরণ, বীজ ও মাটি শোধন এবং কপার ঘটিত যে কোন রোগনাশক ১% ঘনত্বে স্প্রে করা।
৩। মরিচের মড়ক ও ফল পঁচা (মরিচ ও ক্যাপসিকাম)	কলেটোট্রিকাম জীবাণু এ রোগের কারণ। ইহা শাখার অগ্রভাগে আক্রমণ করে গভীর দাগের সৃস্টি করে এবং পরিবাহি টিস্যু নষ্ট করে দেয়। ফলে গাছ আগা থেকে মরতে শুরু করে পুরো গাছ মরে যায়। পাকা ফলে কালো দাগের সৃষ্টি হয় ও সারা মরিচে ছড়িয়ে পড়ে এবং মেটে বর্ণ ধারন করে	ধ্বসে পড়া রোগের অনুরূপ।

২০২২

৪। নেতিয়ে পড়া রোগ (টমেটো, বেগুন, শিম শশা, তরমুজ, আলু, কপি গোত্রের ফসল ইত্যাদি)।	ফুজেরিয়ামের আক্রমণে গাছের বয়স্ক পাতা প্রথমে হলদে হয়ে ঢলে পড়ে, কিনারা থেকে শুকিয়ে গাছে ঝুলে থাকে ও ক্রমশ: উপরের পাতা আক্রান্ত হয়। পাতা ঝরে পড়ে ও শিকড় পঁচে যায়, ডগা ফেঁটে যায় ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও রস পড়ে এবং কাণ্ডের ভিতরের অংশ বিবর্ণ হয়ে কালো বা বাদামী রং ধারণ করে। সর্ব শেষে গাছ মরে যায়। বীজ, চারা ও মাটির সাহায্যে রোগ ছড়ায় ও মূল	রোগমুক্ত বীজ ও প্রতিরোধক জাত ব্যবহার, শস্যচক্র অনুসরণ, আক্রান্ত গাছ নিধন, কম নাইট্রোজেন ও অধিক পটাশ সার প্রয়োগ বীজ শোধন, সেচ নিয়ন্ত্রণ ও কপার ঘটিত রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করে এ রোগের প্রকোপ হ্রাস করা যায়।
৫। ঢলে পড়া রোগ (বেগুন, গোলআলু, টমেটো, তরমুজ, শশা ইত্যাদি)।	লোমের মধ্যদিয়ে গাছে অনুপ্রবেশ করে। ইহা নেতিয়ে পড়া রোগের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ভারটিছিলিয়াম জীবাণু এ রোগের সৃষ্টি করে। শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে জীবাণু গাছে প্রবেশ করে। কিন্তু উপর দিকের কচি পাতায় প্রথমে আক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পায়। শাখার কাষ্টল অংশ আক্রান্ত হয় ও খরা আক্রান্তের মত দেখায়।	নেতিয়ে পাতা রোগের অনুরূপ।
৬। পাতায় দাগ ধরা রোগ (কপি গাত্রৗয় ফসল, শিম, বেগুন, কুমড়া, মরিচ, ঢেঁড়স, লাউ, বীট, পালংশাক ইত্যাদি)।	অল্টারনেরিয়া ও ছারকোসপুরা শ্রেণিভুক্ত জীবাণুর আক্রমণে প্রথমে বয়স্ক পাতার বিক্ষিপ্তভাবে বাদামী রঙের দাগ পড়ে, ক্রমে দাগ বড় হয় ও দাগের কীনারা হলুদবর্ণ ধারন করে। পাতা বাদামী রঙের হয়ে মারা যায়। প্রকট আক্রমণে গাছের গোড়ায় কালো দাগ পড়ে এবং গোড়া পঁচে গাছ মরে যায়। বীজের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়।	৫:৫:৫০ অনুপাতে বোর্দো মিক্সার বা যে কোন কপারজাতীয় রোগনাশক নিয়মিত প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। বীজ শোধন, জমি আগাছামুক্ত রাখা এবং শস্য চক্র অনুসরণে উপকার হয়।
৭। পাউডারী মিলডিউ (লাউ, মিষ্টি কুমড়া, তরমুজ, মটরশুটি, শিম, শশা, বাংগি, ইত্যাদিতে বেশি ক্ষতি করে বেগুন, টমেটো, ক্যাপসিকামেও হতে পারে)।	ইরিসিফি ও লেভাইলেইলা জীবাণু প্রথমে গাছের বয়স্ক পাতা আক্রমণ করে ও পরে উপরের দিকে ছড়ায়। গাছের পাতা ও কাণ্ড সাদাটে পাউডার জাতীয় পদার্থে আচ্ছাদিত হয় এবং গোলাকার দাগের সৃষ্টি করে। দাগ ক্রমে বড় হয়, পাতা বাদামী রং ধারণ করে এবং নিস্তেজ হয়ে মারা যায়। দাগসমূহ পাতার শিরা দ্বারা বিভক্ত হয়। আর্দ্র অবস্থায় রোগ বেশি ছড়ায়, কাণ্ড ফেটে যায় ও ফল অকালে পাকে, গন্ধ ও বাদ বিনষ্ট হয়ে যায়।	১০ দিন পর পর সালফার ঘটিত রোগনাশকের গুড়ো ঔষধ শিশির ভেজা অবস্থায় ছিটালে বেশি কার্যকর হয়। তাছাড়া প্রতি লিটার পানিতে ৬-৭ গ্রাম ডায়াথেন এম/থিয়োভিট/কপার অক্সি ক্লোরাইড মিশিয়ে প্রয়োগে করে ইহা দমন করা হয়।

২০২২

৮। ডাউনী মিলিডিউ (কুমড়াজাতীয় ফসল, পালংশাক, শিম, বীট, মটরশুটি, মরিচ, পেঁয়াজ, লেটুস ইত্যাদি)।	সিডোপারোসপোর জীবানু এ রোগ সৃষ্টি করে। পাতার উপরে তৈলাক্ত বা বাদামী হলুদ দাগ পড়ে উষ্ণ ও আর্দ্র অবস্থায় রোগ ছড়ায় ও পাতায় কুয়াশার মত আবারণ সৃষ্টি করে। আক্রান্ত পাতা ও গাছ দুর্বল হয়ে মারা যায় ফল পাকে না।	১০ দিন পর পর বোর্দোমিক্সার বা কপার ঘটিত রোগনাশক বা প্রতি লিটার পানিতে ৫-৬ গ্রাম ডাইথেন এম-৪০ থিয়োভিট-৮০ গুড়ো মিশিয়ে, সিঞ্চন করলে রোগ দমন হয়।
৯। শুকনা ক্ষত রোগ, (কুমড়া, শিম ও কপি গোত্রের সবজি)।	কলেটোট্রিকাম জীবাণু আক্রমণ ঘটায়। গাছের পাতা ও ফল প্রথমে গভীর গোলাকার হলুদ বা সাদা দাগ দেখা দেয় এবং পরে সেগুলো কালচে বা ধুসর বর্ণ ধারণ করে। একাধিক দাগের সমম্বয়ে বড় দাগের সৃষ্টি হয়, ছিদ্র হয়ে যায়, গাছ নেতিয়ে পড়ে, বোঁটা ও শাখা ফেঁটে যায় ও ক্ষতের সৃষ্টি হয় ভেজা মাটিতে ক্রমাগত আবাদ, অধিক হারে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত এ রোগ বিস্তারের কারণ।	আক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে দেয়া, রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার, কুমড়া-জাতীয় ফসল ব্যতীত শস্যচক্র অনুসরণ, বীজ শোধন, জমির মাটি শুকিয়ে নিয়ে চাষ করা, কম নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ, নিয়ন্ত্রিত সেচ দেয়া এবং বোর্দোমিক্সার বা প্রতি লিটার পানিতে ৫-৬ গ্রাম ডাইথেন-এম বা কপার অক্সি ক্লোরাইড প্রয়োগ করা।
১০। আগাম ধসা (আর্লি ব্রাইট) (টমেটো, গোল আলু ইত্যাদি)	অলটারনেরিয়া সোলানী দ্বারা গাছে আলু বা ফল ধরার আগে সাধারণত এ রোগ সৃষ্টি হয়। প্রথমে উপরের পাতায় ও পরে নিচের পাতায় বিক্ষিপ্তভাবে কালচে বাদামী বর্ণের চক্রাকার দাগ পড়ে। দাগগুলো ক্রমে বড় হয়ও তার ভেতরে সমকেন্দ্রিক রিং তৈরি হয়। পাতা কিছুটা কুঁকুড়িয়ে যায় ও সব পাতায় দাগ ছাড়ায়। কিন্তু পাতা পঁচে না ও গাছ সাধারণত মরে না। আলু ও টমেটো আকারে ছোট হয় ও ফলন কমে যায়।	আক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে দেয়া, রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার, কুমড়া-জাতীয় ফসল ব্যতিত শস্যচক্র অনুসরণ বীজ শোধন, জমির মাটি শুকিয়ে নিয়ে চাষ করা, কম নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ, নিয়ন্ত্রিত সেচ দেয়া এবং বোর্দো মিক্সার বা প্রতি লিটার পানিতে ৫-৬ গ্রাম ডাইথেন-এম বা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রয়োগ করা
১১। নাবি ধ্বসা (লেইট বাইট) (গোল আলু, টমেটো, ক্যাপসিকাম ইত্যাদি)।	ফাইটোপথোরা ইনফেসটেন্স নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। প্রথমে পাতার কিনারায় বাদামী দাগ ও পরে কাণ্ড ও পাতার বিভিন্ন সথানে কালো দাগ পড়ে, পঁচা গন্ধ হয়। পাতা ভিতর দিকে কুঁকড়িয়ে যায়। ফল ও আলুর গায়ে দাগ পড়ে এবং পচন ক্রিয়া দেখা দেয়। কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায়, ভিজা পরিবেশে ইহা দ্রুত ছড়ায় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাঠের ফসল বিনষ্ট করে দেয়।	আক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে দেয়া, রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার, কুমড়া-জাতীয় ফসল ব্যতিত শসাচক্র অনুসারণ, বীজ শোধন, জমির মাটি শুকিয়ে নিয়ে চাষ করা, কম নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ, নিয়ন্ত্রিত সেচ দেয়া এবং বোর্দোমিক্সার বা প্রতি লিটার পানিতে ৫-৬ গ্রাম ডাইথেন-এম বা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রয়োগ করা।

২০২২

১২। কাণ্ডের (গোড়া পঁচা) (আলু, শিম, টমেটো, ঢেঁড়স এবং কুমড়া ও কপি গোত্রের সবজি)।	ফাইটোপথোরা, রাইজোকটনিয়ার জীবাণুর প্রভাবে এ রোগ ক্রমশ হয়ে থাকে। এ সব ছত্রাক মাটিতে থাকে এবং উষ্ণ আর্দ্র পরিবেশে কাণ্ডের ভূসংলগ্ন অংশে আক্রমণ করে। অনেক পাতা ও ফলে আক্রমণ ছড়ায় ও তুলার মত বস্তু দিয়ে আক্রান্ত অঙ্গ ঢেকে দেয়। গাছের বৃদ্ধির সব পর্যায়ে হতে পারে।	পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ, বীজ ও মাটি শোধন, প্রতিরোধক জাত ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার, শস্যচক্র অনুসরণ এবং ২% ঘনত্বে কপারজাতীয় রোগনাশক প্রয়োগ করা।

২। ব্যাকটেরিয়াজনিত

ব্যাকটেরিয়া এক ধরনের এককোষী অতি ক্ষুদ্রাকার (দৈর্ঘ-১-৫ মাইক্রোন) জীবাণু, যা অতি শক্তিশালী ণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না। ইহারা গোলাকার, নলাকার অথবা সরু ও বাঁকানো হয়ে থাকে এবং এদের দেহে কোন সবুজ কণিকা থাকে না। ইহা মাটিতে পচনরত জৈব পদার্থে ও অন্যত্র খাদ্য বস্তুর মধ্যে বেঁচে থাকে। অনুকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া স্বাভাবিক ছিদ্র ও জখমের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে ও রোগাক্রমণ ঘটায়। ব্যাকটেরিয়াজনিত সবজির রাগের প্রধান কয়েকটি সারণিতে উল্লেখ করা হলো।

সারণি ও সবজির ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ ও প্রতিকার

১। কালো পঁচা রোগ (কপি গোত্রের ফসল)	জেনথোমোনাস কমেপষ্ট্রি এ রোগের কারণ। পাতার কিনারা বা কোন আঘাত প্রাপ্ত স্থানে প্রথমে রোগের সূচনা হয় এবং শিরা হলুদ হয়ে ইংরেজি 'ভি' আকার ধারন করে ও পরবর্তীতে বাদামী বা কালো হয়ে পাতার কেন্দ্রের দিকে শিরা-উপশিরা, কাণ্ড ও ফলে ছড়িয়ে পড়ে। পাতা শুকিয়ে যায়, ঝরে পড়ে ও কাণ্ডের ভিতরে কালো ও বিবর্ণ হয়ে পচে যায় এবং গাছের মৃত্যু ঘটে। ঝড় বাদলে ক্ষতিগ্রস্থ ফসল বেশি আক্রান্ত হয়।	রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার, বীজ শোধন দীর্ঘমেয়াদী শস্যচক্র অনুসরণ রোগাক্রান্ত গাছ নিধন ও রোগ বিস্তারে সহায়ক গুবরে পোকা দমন করা। তাছাড়া ফসল ও সবজি সতর্কতার সাথে নড়াচাড়া করা যাতে কোন আঘাত না লাগে।
২। নরম পঁচা রোগ (ব্যাকটেরিয়াল সফট রট)/আলু, পেঁয়াজ, টমেটো, বেগুন, কুমড়া ও কপি গোত্রের সবজি।	বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে মাঠে, পরিবহণ ও সংরক্ষণের সময়ে এ রোগের লক্ষণ প্রথমে দাগ রূপে দেখা দেয়। দাগ দ্রুত ভিতর ও চার পাশে বিভিন্ন অঙে ছড়িয়ে পড়ে ও আক্রান্ত অঙ্গ কিছুদিনের মধ্যে পচে বিনষ্ট হয়। এ রোগে সবজি সংরক্ষণের বড় সমস্যা এবং আলুতে বাক লেগ নামে পরিচিত।	-ঐ-
৩। নেতিয়ে পড়া রোগ (ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট) (টমেটো, মরিচ, বেগুন, শিম, কুমড়া ইত্যাদি)।	এ রোগে প্রথমে গাছের কচি পাতা ও পরে ধীরে ধীরে সব পাতা ও গাছ নেতিয়ে পড়ে। আক্রান্ত গাছের গোড়ার দিকের জাইলেম টিসু পচে এ অবস্থার সৃষ্টি করে। জাইলেমকে কালো দেখায় ও আক্রান্ত কেড় ও কাণ্ড কেটে চাপ দিলে সাদা রস বের হয়। আলুতে ইহা রিং রট বা ব্রাউন রট নামে পরিচিত।	-ঐ-

৪। স্ক্যাব রোগ (আলু, গাজর, মূলা, বীট, শালগম, বেগুন, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ ইত্যাদি)।	ষ্টেপটোমাইসিস স্ক্যাবিস নামক ব্যাকটেরিয়া এ রোগের আক্রমণ ঘটায় ও প্রধানত মাংসল অঙ্গ আক্রান্ত হয়। গুঁটি বসন্তের ন্যায় ইহা সবজিতে ক্ষতের সৃষ্টি করে। কোন ক্ষত ভাসা আবার কোন ক্ষত গর্তের মত হয়ে থাকে এবং ক্ষতগুলো পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বিরাট আকার ধারন করে।	-ঐ-

৩। ভাইরাসজনিত রোগ

ভাইরাস এক প্রকার অতি ক্ষুদ্রাকৃতির কণা যা অনেক সময় রোগ জীবাণুর ভূমিকা পালন করে থাকে। ইলেকট্রোনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিত একে দেখা যায় না। অধিকাংশ ভাইরাস জীবত উদ্ভিদে এবং কিছু সংখ্যক ভাইরাস উদ্ভিদের মৃত দেহেও বেঁচে থাকতে পারে।

ভাইরাস প্রধানত জাব পোকা, লিফ হপার, হোয়াইট ফ্লাই ইত্যাদি রস শোষক পোকার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। তাছাড়া কৃমি, বীজ, পরাগ ইত্যাদির মাধ্যমেও কিছু সংখ্যক ভাইরাস রোগের বিস্তার ঘটে। অঙ্গের স্বাভাবিক ছিদ্র ও জখমের মধ্য দিয়ে এবং পোকা মাকড়ের সহায়তায় ইহা উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করে। উদ্ভিদ দেহে ভাইরাস গতিশীল থাকে এবং আক্রান্ত উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে হলুদায়ন, মোজাইক, পাতা কুঁকড়ে যাওয়া ও অস্বাভাবিক আকৃতি ধারণ, দানা উৎপাদন, গাছের বৃদ্ধি ও ফল না হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অনেক শাক সবজি বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। পোকা মাকড় দমন ও রোগাক্রান্ত গাছ বিনষ্ট করাই উত্তম ব্যবস্থা। সবজির ভাইরাসজনিত কয়েকটি রোগের বিবরণ নিচের সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ঃ সবজির প্রধান প্রধান ভাইরাসজনিত রোগ ও প্রতিকার

১। মোজাইক ভাইরাস (কপি ও কুমড়া, টমেটো, ঢেঁড়স, পেঁপে, শসা, তরমুজ, শিম, মটরশুটি, মরিচ, আলু ইত্যাদি)।	ভাইরাসের আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, পাতা কুঁকড়ায়, পাতার বর্ণ সাদাটে, হলুদাভাব, সবুজ প্যাচ দেখা যায়। গাছ মরে না কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতির হয়ে থাকে ফল ছোট, বিবর্ণ ও নিকৃষ্ট মানের হয়। জাব পোকা, পাতা ফড়িং, হোয়াইট ফ্লাই ইত্যাদি এ রোগ ছড়ায়।	আক্রান্ত গাছ মূলসহ তুলে পুড়িয়ে দেয়া, আগাছা ধ্বংস করা ও নিয়মিত কীটনাশক প্রয়োগ করে গোত্রীয় ফসলে পোকামাকড়ের আনাগোনা বন্ধ করা।
২। পাতা কুঁকড়ানো (টমেটো, আলু, মরিচ ইত্যাদি)।	ইহা ভাইরাসঘটিত রোগ। জাব পোকা, পাতা ফড়িং ও মাটির সাহায্যে ছড়ায়। উপরিভাগের পাতা প্রথমে আক্রান্ত হয় ও পরে নিচের দিকে প্রসার লাভ করে। আক্রান্ত পাতা নিচের দিকে কুঁকড়ায়, সহজে ভেঙ্গে যায়, পাতার শিরা মোটা হয়, গাছ বড় হতে পারে না, গাছের স্বাভাবিক রং ও গঠন বিনষ্ট হয়ে যায়। ফল খুব কম ধরে ও বড় হয় না।	-ঐ-

২০২২

৪। কৃমিজনিত রোগ

কৃমি এক প্রকার লম্বাকৃতির ক্ষুদ্র ছোট প্রাণী। এরা সাধারণতঃ গাছ গাছড়া ও জীব জন্তুর উপর খাবারের জন্য নির্ভর করে। কোন কোন কৃমি মাটি ও আবর্জনা থেকে শৈবাল, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে ও উদ্ভিদের কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু অন্যান্যগুলো পরজীবী হিসেবে উদ্ভিদের রস খায় ও রোগের সৃষ্টি করে। কৃমি সাধারণতঃ উদ্ভিদের শিকড় ও মাটির নিচের অংশে আক্রমণ করে। কোন কোন সময়ে এরা শিকড়ে ক্ষত সৃষ্টি করে রস চুষে খায়। অন্যান্য সময়ে শিকড়ের ভিতরে ঢুকে বাস করে, রস চুষে খায়, ডিম পাড়ে এবং সেখানেই বংশ বিস্তার করে। ফলে শিকড়ে গিটের সৃষ্টি হয়, পচন ধরে, উদ্ভিদের খাদ্যোপাদান সংগ্রহে অসুবিধা হয়, অন্যান্য জীবাণুর আক্রমণ প্রবণতা বাড়ে, ক্রমে আক্রান্ত গাছ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সবজি এতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। বর্তমানে কৃমি দমনের জন্য নিমাটিসাইড আবিষ্কৃত হয়েছে। সারণিতে সবজির বহুল প্রচলিত মূলে গিট রোগের বিবরণ ও প্রতিকার উল্লেখ করা হলো।

সবজির কৃমিজনিত রোগ ও প্রতিকার

রোগ ও আক্রান্ত সবজির নাম	রোগের লক্ষণ ও কারণ	রোগ প্রতিকারের উপায়
শিকড়ে গিট হওয়া (টমেটো, ঢেঁড়শ, আলু, শিম, বেগুন, কুমড়াজাতীয় সবজি ইত্যাদি)	কৃমির আক্রমণে মূলে গিট তৈরি হয়, খাদ্য গ্রহণে বাধা সৃষ্টি হয়, পাতা হলুদ হয়ে নেতিয়ে পড়ে, গাছ মারা যায়। কৃমি মূলের গিটে ও মাটিতে বাস করে।	প্রতিরোধী জাত ব্যবহার, মাটি শোধন নিমাগন, কার্বোফুরান প্রয়োগ; ধান-গম, গাঁদা ফুল চাষের শস্য চক্র করলে উপকার পাওয়া যায়।

৫। মাইকোপ্লাজমা জনিত রোগ

এটি এককোষী জীবাণু। সবজির অনেক রোগের জন্য মাইক্রোপ্লাজমা দায়ী।

সারণিঃ মাইক্রোপ্লাজমাজনিত রোগ ও প্রতিকার।

রোগ ও আক্রান্ত সবজির নাম	রোগের লক্ষণ ও কারণ	রোগ প্রতিকারের উপায়
১। ক্ষুদ্রাকৃতি পাতা। (বেগুন, টমেটো)।	আক্রান্ত গাছে সরু, ছোট, নরম ও হালকা বর্ণের অসংখ্য পাতা জন্মে। খাটো অনেক ডালপালা হয়, গাছে ফুল ধরে না।	শেকড়সহ গাছ তুলে পুড়ে ফেলতে হবে। বেগুন পরিবারের সবজির চাষ কয়েক বছর বাদ দিতে হবে। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার ও জাব পোকা, হপার, ফ্লাইপোকা দমন করতে হবে।
২। বেগুনী আগা (টমেটো, মরিচ)।	আক্রান্ত গাছে ডালের আগার কচি পাতা সরু হয়ে কুঁকড়ে যায় এবং বেগুনী/গোলাপী রং ধারণ করে, গাছে ফুল ধরে না।	-ঐ-

২০২২

৬। শেওলা জনিত রোগ- এক প্রকার উদ্ভিদ। গাছে মরিয়া রোগ তৈরি করে।

৭। শরীরতাত্ত্বিক রোগ- গাছে অপুষ্টিজনিত করণে ও রোগ সৃষ্টি হয়।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. বেলে মাটিতে শতকরা কতভাগ বালিকণা থাকে?

২. কোন মাটিতে ৩৫ ভাগ কর্দমকণা ও একই পরিমাণ পলিকণী থাকে ?

৩. মাটিতে পিএইচ মানাঙ্ক কত ভাগের নিচে থাকলে অম্লীয় মাটি বলে ?

৪. প্রশম মাটিতে পিএইচ মানাঙ্ক কত?

৫. কী প্রয়োগ করে অম্লীয় মান বাড়ানো যায়, অর্থাৎ পিএইচ মানাঙ্ক বেশি হয় ?

৬. ২০০৭-০৮ সনে মোট আবাদি জমির কত % জমিতে শাক সবজি চাষ হয় ?

৭. চাষবিহীন জমি হতে কত % পানি বাষ্পীভূত হয়ে যায় ?

৮. পুষ্টি সরবরাহে সারের চাহিদার কত % জৈব উৎস হতে আসা উচিত?

৯. সার প্রয়োগের পদ্ধতি বিবেচনা করে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ?

১০. কাদায় গোলকের মাধ্যমে সার প্রয়োগে নাইট্রোজেনযুক্ত সার ও মাটির অনুপাত কত ?

১১. স্টার্টার দ্রবণ তৈরিতে ১:৫:২ অনুপাতে কী কী নেওয়া হয় ?

১২. ফুলকপি চাষে মাটিতে সর্বনিম্ন কত % রস হলে অবশ্যই সেচ দিতে হয় ?

১৩. মালচিং কত প্রকারের হয় ?

১৪. কোন পোকা সবজির ভাইরাস ছড়ায় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গার্হস্থ্য সবজি বাগান সম্পর্কে লেখ।

২. অম্ল মাটি বলতে কী বোঝায় ?

৩. মাটির পিএইচ মানাঙ্ক কীভাবে সংশোধন করা যায় ?

৪. জমিতে সারের পরিমাণ নির্ধারণে কোন কোন বিষয় বিবেচনা করতে হয় ?

৫. পাতায় প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন সারে দ্রবণ তৈরি করা সম্পর্কে লেখ।

৬. যে সব বিষয়গুলো সারের কার্যকারিতা বাড়ায় তা লেখ।

৭. জমিতে সেচ ও নিকাশ বলতে কী বোঝায় ?

রচনামুলক প্রশ্ন

১. সবজি চাষের জন্য মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা কর।

২. সবজি চাষের জন্য জমি তৈরির সুবিধাদি ও প্রস্তুত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩. সবজি চাষের সারের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা কর।

৪. জমিতে সেচের সঠিক সময় কিভাবে নির্ণয় করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

৫. সবজি চাষে আগাছা দমণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

কাঁকরোল ও ধুন্দলের চাষাবাদ

কাঁকরোলের চাষ

কাঁকরোলের জাত ঃ বাংলাদেশে সুনির্দিষ্টভাবে কাঁকরোলের কোন জাত নেই। তবে ফলের আকার, বর্ণ এবং কাটার বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন জাতের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন- মনিপুরি, আসামি, সবুজ টেম্পু, হলুদ টেম্পু, বর্ণ টেম্পু, মুকন্দপুরি ইত্যাদি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

কাঁকরোল চাষের জন্য ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি হতে আগাছা বেছে ফেলতে হবে। জমি সমতল করে নেওয়া উচিত। তবে পানি জমার সম্ভাবনা থাকলে জমিকে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত করে নিতে হয়।

সার প্রয়োগ

কাঁকরোল চাষের জন্য হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের নিয়ম নিচে দেওয়া হলো।

সারের নাম	মোট পরিমাণ	মৌল প্রয়োগ জমিতে ৫০% মাদায় ৫০%	উপরি প্রয়োগ	
			১ম	২য়
গোবর	১২-১৫ টন	১২-১৫ টন	-	-
ইউরিয়া	১৫০ কেজি	-	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি
টি.এস.পি	১২৫ কেজি	১২৫ কেজি	-	-
এমওপি	১০০ কেজি	-	৫০ কেজি	৫০ কেজি

গোবর ও টি.এস.পি সারের ৫০% শেষ চাষের সময় সমস্ত জমিতে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকী ৫০% মাদায় বা নালায় প্রয়োগ করতে হয়। গাছ ২৫-৩০ সে.মি. লম্বা হলে ইউরিয়া ও পটাশ সারের ৫০% মাদার চারিদিকে বা পাশ দিয়ে নালা কেটে সেই নালায় প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকী ৫০% সার ফুল আসার সময় একইভাবে প্রয়োগ করতে হয়।

চারা রোপণ ও অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

বীজ/চারা রোপণ ও মাদা পদ্ধতিতে চাষ করলে ২ × ২.৫ মিটার দূরত্বে প্রতি হেক্টরে ২০০০টি মাদা তৈরি করা যাবে। মাদাপ্রতি ২টি করে মোট ৪০০০ কন্দমূল লাগে। তবে কাণ্ডের কাটিং করা হলে প্রতি মাদায় অন্তত ৩টি করে মোট ৬০০০টি কাটিং লাগানো উচিত। প্রতি হেক্টরে অন্তত ১২৫-১৫০টি পুরুষ মোথা বা কাটিং লাগাতে হবে। কেননা এর পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদা গাছে জন্মে। পুরুষ মোথা বা কাটিং না লাগালে কাঁকরোলের স্ত্রী ফুলগুলো পরাগায়নের অভাবের ফলে পরিণত হতে পারে না। জমিতে সারি করে বা মাদা তৈরি করে কন্দমূল বা কাটিং রোপণ করতে হয়। মাদা পদ্ধতিতে কাঁকরোল রোপণে ৪০০ সে.মি. চওড়া বেড তৈরি করতে হয়। প্রতি বেডে ২ সারি মাদা করে এক মাদা হতে অন্য মাদার দূরত্ব ২৫০ সে.মি রাখতে হয়। নালার মাটি বেডে উঠিয়ে

দিলে বীজতলা কিছুটা উচু হয় তাতে সেঁচ বা বৃষ্টির পানি সহজে বের হতে পারে। এছাড়া সারি করে ১.৭৫-১২৫ মিটার দূরত্বে কন্দমূল বা কাটিং রোপণ করা যায়। কাঁকরোলের একই গাছে পুরুষ ও স্ত্রী ফুল জন্মায় না। তাই পরাগায়নের সুবিধার্থে ক্ষেতে সমানভাবে আনুমানিক ১০ ভাগ পুরুষ গাছ থাকা উচিত। পুরুষ গাছ বাগানের ধার দিয়ে লাগানো যেতে পারে। এতে পরাগায়নের সুবিধা হয়। পুরুষ গাছে দেরিতে ফুল আসে বিধায় এগুলো স্ত্রী গাছ রোপণের ১০-১৫ দিন আগে রোপণ করতে হয়।

কন্দ বা কাটিং রোপণের এক মাসের মধ্যে গাছ গজিয়ে উঠে। মাটি শুষ্ক হলে সেচের সাহায্যে কন্দ বা কাটিং -এর চারিদিকে ভেজা রাখতে হবে।

মাচা বা বাউনি কাঁকরোলের জন্য অপরিহায। কাঁকরোলের গাছ ১৬-১৫ সে.মি. লম্বা হলেই গাছের গোড়া একদিকে হেলিয়ে বাঁশের কাঠি পুঁতে দিতে হবে। গাছ ৫০ সে.মি. লম্বা হলে তখন ১– ১.৫ মিটার উঁচু করে মাচা দিয়ে তাতে গাছ তুলে দিতে হবে। কাঁকরোলে কৃত্রিম পরাগায়ন ফলন বৃদ্ধির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কাঁকরোলে ভোরবেলা কৃত্রিম পরাগায়নের উপযুক্ত সময়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

পোকার নাম	ক্ষতির ধরন	দম ব্যবস্থা
জাব পোকা	পাতার সবুজ অংশ ও কাণ্ডের রস চুষে খায়	ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি ১১২৫ মি.লি/হেক্টর বা ডাইক্লোরোফস ১০০ ইসি ৫৬ ইসি ১০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
ইপিল্যাকনা বিটল	পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। পাতার শিরাগুলো দেখতে জালির মত দেখায়। পরে পাতা শুকীয়ে যায়।	ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি ১১২৫ মি.লি/হেক্টর বা ডাইক্লোরোফস ১০০ ইতি ৫৬০ ইসি ১০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
বিছা পোকা	পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে।	ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি ১১২৫ মি.লি/হেক্টর ডাইক্লোরোফস ১০০ ইসি ৫৬০ ইসি ১০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
মাজরা পোকা	কীড়া ছিদ্র করে ফলের ভিতরাংশ খেয়ে ফেলে। আক্রান্ত ফল নষ্ট হয়ে যায়।	৫০০ মিলি/হেক্টর সাইপারমেথ্রিন বা ডায়জিন ১৭০০ মিলি/হেক্টর বা ডিপেটেরেক্স ৫৬০ মিলি/হেক্টর ১০০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
ফলের মাছি পোকা	কচি ফলের খোসায় পাড়া ডিম হতে কীড়া বের হয়ে ফলের ভিতর প্রবেশ করে শাঁস খেয়ে ফেলে। আক্রান্ত ফল নষ্ট হয়ে যায়।	ফলের মাছি ধরার ফাঁদ ব্যবহার করা যায়। এতে ভিটেরেক্স ৮৫ ডবিউপি ৫ গ্রাম ঔষধ ১০০ গ্রাম পিষানো কুমড়ার সাথে মিশিয়ে বিষ টোপ তৈরি করে ফাঁদে রাখতে হয়। ফলের মাছি পোকা আক্রমণ এভাবে দমন করা যেতে পারে। প্রতি ৪০০ বর্গমিটার জমির জন্য ১টি পাকা কাঁঠালের মোথা (বোথা) দড়ি দিয়ে বেঁধে মাচার নিচে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এর ফলে কাঁঠালের গন্ধে মাছি কাঁকরোলের উপর না বসে কাঁঠালের মোথায় বসে ডিম পাড়বে। এতে কাঁকরোল পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে।

চিত্র ঃ বিছা পোকার মথ ও কীড়া

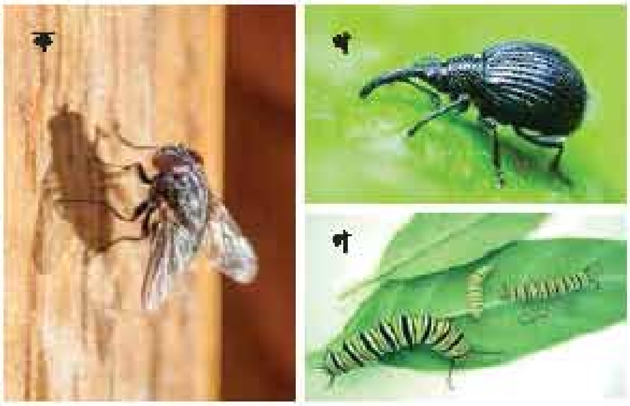

চিত্র ঃ ফলের মাছি পোকা ক) পূর্ণাংগ মাছি (খ) ফলকীট ,(গ) বুকনীট

রোগবালাই

রোগ ঃ চারা ঢলে পড়া রোগ ঃ এ রোগ সাধারণত কচি গাছের গোড়ায় আক্রমণ করে এবং আক্রান্ত অংশে পচে চারা ঢলে পড়ে যায়।

প্রতিকার

১) পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে।

২) আক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলতে হবে।

৩) রোগমুক্ত মোথা লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

পাউডারী মিলডিউ- পাতার উপরে সাদা পাউডার এ ন্যায় পদার্থ দেখা যায় এবং পাতা মরে যায়। সাদা পাউডার দ্বারা। অনেক সময় পাতা আবৃত হয়ে যায়। এ রোগ দমনের জন্য ২ গ্রাম থিয়োভিট প্রতি ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

মোজাইক ভাইরাস- এ রোগের আক্রমণে গাছের সবুজ পাতায় হলুদ মোজাইক রং ধারণ করে। গাছের বাড়ন কমে যায়, ফল কমে যায় এবং ফলের আকার ছোট হয়।

প্রতিকার

১। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত ব্যবহার করতে হবে। ২। রোগমুক্ত গাছ লাগানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ৩। আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

রেটুন ফসল/মুড়ি ফসল- শীতের শুরুতেই কাঁকরোল গাছ মরে যায় এবং পরবর্তী বর্ষা না আসা পর্যন্ত মাটির নিচে এর মোথা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। তাই শীতকালে এ অবস্থায় কাঁকরোলের জমিতে স্বল্পমেয়াদী অন্য ফসল করা যায়। পরবর্তী বর্ষার আগেই ঐ মোথাগুলোকে সক্রিয় করার জন্য মাটি আলগা করে সার ও সেচ প্রয়োগ করতে হয়। তাহলেই রেটুন ফসল হিসেবে ফল পাওয়া যাবে। সাধারণত রেটুন ফসলের ফুল ও ফল তাড়াতাড়ি হয়। সেচ ও নিকাশ-বন্যামুক্ত উঁচু ও পানি নিকাশের সুবিধাযুক্ত দোঁআশ, বেলেদোআশ মাটি কাঁকরোলের জন্য উত্তম। মাটিতে রস বেশি থাকলে এর বৃদ্ধি ভালো হয়। তবে দাঁড়ানো পানি কাঁকরোলের জন্য ক্ষতিকর।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ- কাঁকরোল যখন সবুজ থেকে হলদে ভাবাপন্ন হয় তখনই উঠানোর উপযুক্ত হয়। সাধারণত পরাগায়নের ১০-১৪ দিন পরই কাঁকরোল তোলার উপযুক্ত হয়। মাঘের মাঝামাঝি হতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাঁকরোল গাছের মোথা ১টন/হেঃ হারে তুলে বাজারে বিক্রি করা যায়। তবে মোথা বিক্রির সময় স্ত্রী ও পুরুষ মোথা বা কাটিং উভয়ই আনুপাতিক হারে এক সাথে বিক্রি করা উচিত। চারা গজানোর ২ মাসেই ফল ধরে। ফল উঠিয়ে ২-৩ দিন পর্যন্ত রেখে বিক্রি করা যায়।

ফলন- প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ টন কাঁকরোল পাওয়া যায়।

ধুন্দলের চাষ

ধুন্দলের চাষ

ধুন্দলের জাত ঃ ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্র হতে ধুন্দলের পুষা চিকনি জাত অনুমোদন করেছে। তবে ধুন্দলের অনুমোদিত ও উন্নত কয়েকটি জাত আছে যা আমাদের দেশে চাষ হচ্ছে। যেমন- মজনুশাহ, ফুজিয়ান, লালনশাহ, গ্রীপিচ, কর্ণফুলী, মিয়ান ইত্যাদি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

এঁটেল বা দোআশ মাটি এবং সুনিষ্কশিত জমিতে ধুন্দল ভালো জন্মে। জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাদা তৈরি করতে হয়। জমিতে বেড করে বা ২.০-২.৫ মিটার দূরত্বে মাদায় বীজ রোপণ করতে হয়।

সার প্রয়োগ

ধুন্দল চাষের জন্য নিম্নোক্ত পরিমাণ সার দিতে হয়। গোবর ও টিএসপি সারের ৫০% জমি তৈরির সময় শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করতে হয়। বাকী ৫০% মাদায় দিতে হয়। ইউরিয়া ও এমওপি সার চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর, ৫০-৬০ দিন পর এবং ৭৫-৮০ দিন পর ৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ হিসেবে দিতে হয়। প্রতিবারই সার উপরি প্রয়োগের সময় গাছের গোড়া হতে কিছু দূর দিয়ে মাটির সাথে মিশায়ে দিতে হয়।

সারের নাম	পরিমাণ/হেক্টর
গোবর সার	১০ টন
ইউরিয়া	১৫০ কেজি
টিএসপি	১২০-১৩০ কেজি
এমওপি	১০০ কেজি

চারা রোপণ ও অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

ধুন্দলের গাছ দীর্ঘ প্রসারি বিধায় কিছুটা পাতলা করে রোপণ করতে হয়। তবে মাদা হতে মাদার দূরত্ব ২.০-২.৫ মিটার এবং সারিতে মাদা হতে মাদার দূরত্ব ১ মিটার করে বীজ রোপণ করা যায়। ধুন্দল বেড়ায়, গাছে বা বাউনিতে উঠিয়ে দেওয়া যায়। জমিতে সারের উপরি প্রয়োগের সময় আগাছা পরিষ্কার করে মাটি মালচিং করে দিতে হয়। এতে যথেষ্ট রসের প্রয়োজন তাই এভাবে জমিতে রস সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়।

সেচ ও নিষ্কাশন

ধুন্দল গাছের গোড়ায় পানি জমলে গাছ মারা যায়। আবার ধুন্দল গাছের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত রসের প্রয়োজন হয়। জমি চাষের পর বেড আকারে তৈরি করে তাতে মাদা করলে জমিতে পানি দাঁড়ানোর সুযোগ থাকে না।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

বীজ রোপণের দুই মাসের মধ্যে ফল ধরে। ধুন্দল কচি অবস্থায় সংগ্রহ করতে হয়। অন্যথায় আঁশ শক্ত হলে খাবার অনুপযোগী হয়ে যায়। ধুন্দল ধরা শুরু হলে ঠিকমত পরিচর্যা করলে ২-৩ মাসব্যাপি ফল অব্যাহতভাবে সংগ্রহ করা যায়। ফল সংগ্রহ করে ২-৩ দিন পর্যন্ত আর্দ্র, ছায়া ও ঠান্ডা পরিবেশে সংরক্ষণ করা যায়। ধুন্দল বাজারে নেওয়ার সময় চাপ বা আঘাত পেলে সেখানে বিবর্ণ হয়ে যায়। তাই ঝুড়িতে খড় বিছিয়ে বা ছালায় খাড়াভাবে সাজিয়ে সাবধানে বাজারে পাঠাতে হয়।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. কাঁকরোলের ১টি জাতের নাম লেখ।

২. মাদা পদ্ধতিতে ২ × ২.৫ মিটার দূরত্বে কাঁকরোল চাষে ১ হেক্টরে কয়টি মাদা লাগে ?

৩. ধুন্দল চাষে কত মিটার দূরত্বে মাদায় বীজ বপন করা হয়?

৪. ধুন্দল বীজ রোপণের কত মাসের মধ্যে ফল ধরে ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. কাঁকরোল চাষে সারের পরিমাণ উল্লেখ কর।

২. কাঁকরোল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে লেখ।

৩. ধুন্দলের চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কাঁকরোলের জাতসহ বীজ রোপণ ও পোকামাকড় দমন সম্পর্কে বর্ণনা কর।

২. ধুন্দলের চাষাবাদ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুখীকচু ও লতিরাজ কচু চাষাবাদ

মুখীকচুর চাষ

মুখীকচুর জাত ঃ বাংলাদেশে অঞ্চল ভেদে মুখীকচু বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- ছড়াকচু, গুড়িকচু, বিন্নীকচু, ঝুমের মুখী, বিলাসী ইত্যাদি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি ঃ দোআশ ও বেলে দোঁআশ মাটি ও সুনিষ্কাশিত অবস্থায় চাষ করলে মুখীকচু ভালো জন্মে। মুখি কচুর জমি খুব ভালোভাবে চাষ করতে হয়। তাই পুনঃ পুনঃ চাষ ও মই দিয়ে জমি পরিপাটি করে ৬০-৭৫ সে.মি দূরত্বে লাঙ্গল দিয়ে জুলি অর্থাৎ অগভীর নালা তৈরি করে সেই নালাতে কচুর বীজ রোপণ করতে হয়। সেচ সুবিধাযুক্ত জমিতে ফাল্গুন মাসে জমি তৈরি করে এবং সেচ সুবিধা না থাকলে বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টিপাতের পরই জমি তৈরি করে বীজ রোপণ করতে হয়। মুখী কচুর জমির মাটি চেপে গেলে এবং বৃষ্টির পানি কোথাও বেধে থাকলে সেখানে কচুর বৃদ্ধি দারুনভাবে ব্যাহত হয়। এমনকি গাছ মারাও যায়। পানি বদ্ধস্থানে কচুর গাছের ছড়া ছাড়ে না, নতুন কুঁশি হয় না।

সার প্রয়োগ

মুখী কচু চাষে সার ব্যবহার অত্যাবশ্যক। মুখী কচুতে নিম্নোক্ত পরিমাণ সার দেওয়া যায়।

সারের নাম	হেক্টর প্রতি পরিমাণ	প্রয়োগের সময়
পঁচা গোবর/আবর্জনা পচা সার	১০-১২ টন	সবটুকু জমিতে শেষ চাষের সময় দিতে হবে।
ইউরিয়া	১২০-১৫০ কেজি	৫০% বীজ লাগানোর ৩০/৩৫দিন পর বাকী ৫০% বীজ লাগানোর ৮০/৯০ দিন পর
টিএসপি	১১৫-১২৫ কেজি	সবটুকু জমিতে শেষ চাষের আগে
এমওপি	১৪০-১৬৫ কেজি	৫০% জমির শেষ চাষের আগে ৫০% ইউরিয়া ১ম উপরি প্রয়োগের সময়

ইউরিয়া ও এমওপি সার বীজ লাগানোর পর ১ম ও ২য় উপরি প্রয়োগের সময় কচুর আইলের পাশ দিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে কোদাল দিয়ে মাটি হালকাভাবে নড়াচাড়া করে আইলে মাটি উঠিয়ে দিতে হয়।

চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা

জমি চাষের পর ৬০-৭৫ সে.মি. দূরত্বে জুলি/নালা টেনে নালাতে ২৫-৩০ সে.মি. পর পর ১০-১৫ গ্রাম ওজনের কচুর বীজ মুখী রোপণ করতে হয়। জমিতে যদি জৈব পদার্থ সঠিক মাপে ব্যবহার করা যায় এবং বীজের আকার ২০-২৫ গ্রাম হয় তাহলে ৪৫ সে.মি. পর পর মুখী কচুর বীজ রোপণ করতে হয়। মুখী কচুর বীজ রোপণ পর

দু'পাশের মাটি দিয়ে হালকাভাবে বীজগুলো ঢেকে দিতে হয়। মুখীগুলো রোপণ প্রায় ১ মাস আগে স্তুপাকারে রেখে খড়কুটা দিয়ে ঢেকে পানি ছিটিয়ে দিলে বীজ গজায়ে যায়। সামান্য গজানো মুখী রোপণ করা ভালো। হেক্টরে ৬০০ ৮০০ কেজি বীজ লাগে।

অন্তবর্তী পরিচর্যা- বীজ গজায়ে মাটির উপরে উঠলে সম্ভব হলে খড়কুটা বিছিয়ে হালকাভাবে থেকে দেয়া যায়। মুখী কচুর জমির আগাছা বাছাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে বীজ রোপণের পর প্রথম ২-৩ মাস আগাছামুক্ত রাখা খুবই জরুরি। আনুমানিক ৩ মাস বয়সে সমস্ত জমি পাতায় ঢেকে যায়। সার প্রয়োগের পর প্রতি বারেই কোদাল দিয়ে বীজ রোপণের আইলে বা সারিতে মাটি উঠিয়ে দিতে হয়। কচুর বয়স ৩ মাসের পর হতে পাতা ও গাছ ছোট হতে থাকে। তখন জমি কিছুটা ফাকা হতে দেখা যায়। এ সময় মুখীগুলো বড় হতে থাকে। অন্যদিকে জমি ফাঁকা হওয়ার কারণে আগাছাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই পুনারায় জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। অর্থাৎ মুখী কচুর জমি সব সময়ই আগাছামুক্ত রাখতে হয়।

সেচ ও নিকাশ- মুখী কচুর জমিতে পানি জমলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, এমনকি গাছ মারা যায়। তাই সেচের বা নিকাশের নালা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার পানি সেচের সুবিধা থাকলে আগাম রোপণ করা যায় এবং আগাম ফসল সংগ্রহ করা যায়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

বীজ রোপণের প্রায় ৬ মাস পর গাছের পাতা হলুদ হয়ে ধীরে ধীরে গাছ মরতে থাকে, তখন মুখী কচু সংগ্রহ করা যায়। কোদাল দিয়ে আইল ভেঙ্গে মুখী সংগ্রহ করার পর ২-৩ দিন ছায়ায় ও বায়ু চলাচলের সুবিধাযুক্ত স্থানে রেখে শুকায়ে নিতে হয়। এরপর ছোট-বড়, আঘাতপ্রাপ্ত বা কাঁটাগুলোকে বাছাই করে শ্রেণী বিভক্ত করতে হয়। পরিপুষ্ট মুখী ৪-৫ মাস ঘরে রাখা যায়। বস্তায় করে দূরবর্তী বাজারে পাঠানো যায়।

ফলন : হেক্টরপ্রতি ৩৫-৪০ টন ফলন হয়। তবে এর ৬০-৭৫% মুখী এবং বাকীটা গুড়িকন্দ হয়।

লতিরাজ বা পানি কচুর চাষ

লতি কচুর চাষ

লতিরাজ কচুর জাত ঃ লতির আকার ও রঙের ওপর ভিত্তি করেও বহুজাতের পানি কচু দেখা যায়। তবে পানি কচুর জাত হলো নারকেলী, গজারী, কাজলী, লতিরাজ, শোলাকচু, বাঁশকচু, খামাকচু ইত্যাদি।।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি ঃ লতিরাজ কচু প্রধানত লতির জন্য চাষ করা হয়। পানি শুকায় না বা সহজে পানি দেওয়া যাবে এমন মজা পুকুর, টিউবওয়েলের পানি গিয়ে জমে এমন নিচু জমি বা সব সময়ই সামান্য পানি থাকে বা ভেজা থাকে এ ধরনের জমি থকথকে কাদাময় করে তৈরি করতে হয়। জমির উর্বরতাভেদে ৬০-৭৫ সে.মি দূরে দূরে সারি তৈরি করতে হয়। লতিরাজ কচুর জমি খুব বেশি গভীর করে নরম করতে হয় না। কেননা তাতে চারা লাগানোর পর গাছ হেলে পড়ে যেতে পারে। চারা যাতে কাদায় হালকা গভীর করে রোপণের পর দাঁড়ায়ে থাকতে পারে। সেজন্য আধা শক্ত অবস্থা রেখে জমি তৈরি করতে হয়।

সার প্রয়োগ ঃ পানি কচু চাষে জমি উর্বর না হলে সার প্রয়োগ করতে হয়। জমি কাদা করার শেষ সময় গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিঙ্ক সার প্রয়োগ করতে হয়। চারা রোপণের ২০-৩০ দিন পর ১ম কিস্তিতে ৮০

কেজি ইউরিয়া ও চারা রোপণের ৬০-৯০ দিনের মধ্যে ২য় কিস্তিতে ৭০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হয়। তবে ইউরিয়া সারের ২য় কিস্তির সময় অতিরিক্ত ৬০ কেজি এমওপি সার দেয়া যায়।

সারের নাম ও সার প্রয়োগের নিয়ম ঃ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর	১০-১৫ টন
ইউরিয়া	১৪০-১৬০ কেজি
টিএসপি	১২০-১৩০ কেজি
এমওপি	১৫০-১৭০ কেজি
জিপসাম	৯০ কেজি
জিঙ্ক	৮ কেজি

চারা রোপণ ও অন্তবর্তী পরিচর্যা

পানি কচুর চারা রোপণ করা যায়। এ চারা পানিকচুর বড় গাছের গোড়া থেকে ছোট ছোট চারা আকারে বের হয়। এ চারাকে তেউড় বলা হয়। ৪-৬টি পাতা বিশিষ্ট চারা রোপণের জন্য সবচেয়ে ভালো। এ জাতীয় তেউড়ের মাঝের ২/১টি পাতা রেখে অন্যান্য সমস্ত পাতা ও শিকড় ছেটে এবং কাণ্ডের কিছু অংশ কেটে ফেলা হয়। চারা যদি ৩০ সে.মি এর বেশি লম্বা হয় তাহলে ডাঁটাসহ অর্ধেক অংশ কেটে ফেলতে হয়। চারা প্রস্তুত করে রোপণে দেরি হলে ভিজা ও ছায়াযুক্ত স্থানে, খোলাভাবে বিছিয়ে সপ্তাহ খানেক রাখা যায়। তবে আঁটি বেঁধে রাখলে চারা পঁচে যেতে পারে। ৬০-৭৫ সেমি. দূরত্বে সারি করে সারিতে ৪৫-৫০ সেমি. পর পর ৫-৭ সে.মি. গভীরে ১টি করে চারা রোপণ করতে হয়। হেক্টর প্রতি ২৭০০০-৩৮০০০টি চারার প্রয়োজন হয়।

অন্তবর্তী পরিচর্যা

পানি কচুর জমিতে কচুর গাছের গোড়ায় দাঁড়ানো পানি রাখতে হয়। তবে মাঝে মাঝে পানি নাড়াচাড়া করে কাদাময় করে দিতে হয়। পানি কচুতে সারের উপরিপ্রয়োগের আগে জমির পানি বের করে নিলে ভালো হয়। সার প্রয়োগ করে মাটি নাড়াচাড়া করে দিয়ে ৪৮ ঘন্টা পর পুনরায় পানি দিতে হয়।

চিত্র ঃ লতিরাজ কচু রোপণ

গাছ হতে লতি বের হওয়ার আগ পর্যন্ত জমিতে ৫-৬ সে.মি করে দাঁড়ানো পানি রাখতে হয়। সার প্রয়োগের সময় মাটি নাড়াচাড়া করে সার মিশিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে আগাছা থাকলে তা মাটির মধ্যে পুঁতে দিতে হয়। জমি থেকে পানি বের করার সুযোগ না থাকলে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করে ২-৩ দিন পর মাটি হাতিয়ে নাড়াচাড়া করে দিতে হয়। কচুর লতির সংখ্যা বেশি এবং মোটা করার জন্য জমিতে দাঁড়ানো পানি না রেখে শুধু ভেজা রাখতে হয়। লতি বের হওয়ার পর ২ সপ্তাহ পানি সরিয়ে ভেজা বা শুকনোভাবে করে রাখতে হয়। আবার নির্দিষ্ট মাত্রায় পানি দিতে হয়। এভাবে ৩-৪ বার পানি দেওয়া ও বের করা হলে লতি লম্বা ও মোটা হয়। ২২০২

অন্তবর্তী পরিচর্যায় রোগ ও পোকামাকড় দমন

লতিরাজ কচুতে মাকড় ও লেদা পোকার আক্রমণ কিছুটা দেখা যায়।

মাকড়- পাতার নিচে ছোট ছোট মাকড় থাকে এবং পাতার রস চুষে খায়। থিয়োভিট, কুমুলাস, নিউরোন, ওমাইট যেকোন বালাইনাশক ব্যবহার করে মাকড় (মাইট) দমন করা যায়।

লেদা পোকা- ছোট ও কালচে বা মেটে রঙের পোকা পাতা খেয়ে ফেলে। পাতায় গাদা অবস্থায় থাকতে তুলে মেরে ফেলতে হয়। সাইপারমেথ্রিন/ম্যালথিয়ন স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

রোগ- পাতার দাগ রোগ- প্রথমে পাতায় বাদামি দাগ পড়ে। পরে তা বৃত্তাকার হয়ে পচে যায়। কপার মিশ্রিত ছত্রাকনাশক স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

সেচ ও নিকাশ

অন্তবর্তী পরিচর্যায় লতিরাজ কচুর পানি সেচ ও নিকাশ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফসল সংগ্রহ, সক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

লতিরাজ কচু রোপণের ৩ মাস হতেই লতি সংগ্রহ করা যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর অনেক আগে হতেই সংগ্রহ শুরু হয়। পরিচর্যা ঠিকমত করলে ৭/৮ মাস পর্যন্ত লতি সংগ্রহ করা যায়। লতি উঠানো শুরু করলে ৮-১০ দিন পর পর উঠানো যায়। উঠাতে দেরি করলে লতির অগ্রভাগে পাতা গজাতে শুরু করে। লতি সংগ্রহ করে ছোট ছোট মুঠি বেঁধে বাজারে পাঠাতে হয়। তবে বাজারে পাঠানোর আগে পলিথিনের মোড়কে বা ভিজা বস্তা দিয়ে মুড়ে দিতে হয়। এতে লতি সতেজ থাকে। কেননা খোলা অবস্থায় এবং শুকনো স্থানে রাখলে লতি শুকায়ে শক্ত হয়ে যায়।

ফলন- হেক্টর প্রতি ১৮-২০ টন পর্যন্ত লতি পাওয়া যেতে পারে।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. মুখিকচুর ১টি জাতের নাম লেখ।

২. মুখি কচুর কতগ্রাম ওজনের বীজ লাগাতে হয় ?

৩. লতিরাজ কচুর ১টি জাতের নাম লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ

১. মুখি কচু চাষে সারের মাত্রা উল্লেখ কর।

২. লতিরাজ কচুর অন্তবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. মুখি কচুর চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. লতিরাজ কচুর চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২০২২

সপ্তম অধ্যায়

পুঁইশাক ও গিমা কলমির চাষাবাদ

পুঁইশাকের চাষ

পুঁইশাকের জাত ঃ পুঁই শাকের জাতকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- কাণ্ড সবুজ ও কাণ্ড লাল।

কাণ্ড সবুজ- এ জাতের কাণ্ড সবুজ ও মোটা, রসালো এবং নরম। এর পাতা চওড়া ও পুরু, পাতার রং সবুজ।

কাণ্ড লাল- এ জাতের কাণ্ড বেগুনী লাল, কাণ্ড শক্ত এবং তুলনামূলকভাবে চিকন। এর পাতা ছোট এবং পাতলা, পাতার কিনারা দিয়ে বেগুনীমত দেখায়। লাল জাতের পুঁই গাছের ফল বেশি ধরে। তবে কয়েকটি পুঁইশাকের উন্নত জাত পাওয়া গেছে। যেমন- বারি পুঁইশাক-১, মাধুরী, মনিষা, রূপসাগ্রীন ইত্যাদি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি- বার বার চাষ ও মই দিয়ে জমির মাটি ঢেলাবিহীন ও ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়। জমিতে সরাসরি বীজ বুনার জন্য ১ মিটার প্রস্থ বেড তৈরি করতে হবে। বেড কতটুকু লম্বা হবে তা নির্ভর করে চাষের প্রয়োজন ও জমির দৈর্ঘ্যের ওপর। আর বেডের উচ্চতা হবে ১০-১৫ সেমি.। বেডের দুপাশে নালার গভীরতা হবে ২০ সেমি. এবং প্রস্থ হবে ৩০ সেমি.

সরাসরি বীজ বপন বা রোপণ- সরাসরি বীজ বপন বা রোপণ করলে ৭৫ সেমি. দূরে সারিতে ৪৫ সেমি. দূরে দূরে বীজ বপন বা রোপণ করা হয়।

সার প্রয়োগ

পুঁইশাকে হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ এবং প্রয়োগের সময় নিচে দেয়া হলো–

সারের নাম	সার দেয়ার সময়	পরিমাণ কেজি/হেক্টর
ইউরিয়া	১ম উপরি প্রয়োগ- চারা গজানোর ৭-১০ দিন পর	১০০
	২য় উপরি প্রয়োগ ৩০-৪০ দিন পর	১০০
	৩য় উপরি প্রয়োগ ১ম ফসল কাটার পর পরই	১০০
	৪র্থ উপরি প্রয়োগ ২য় ফসল কাটার পর পরই	১০০
টিএসপি	মৌল হিসেবে শেষে চাষের আগে	১২০
এমওপি	মৌল/শেষ চাষের আগে	১০০
	উপরি প্রয়োগ/১ম ফসল কাটার পর পরই	৮০
গোবর	মৌল অর্ধেক শেষ চাষের আগে এবং অর্ধেক গর্তে বা মাদায়	৫০০০

১ম ও ২য় উপরি প্রয়োগ ঃ উল্লিখিত সময়ে সার প্রয়োগ করে চারার গোড়ার চারদিকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রথম ফসল কাটার পর তৃতীয়বার ইউরিয়ার উপরি প্রয়োগ এবং পটাশ সার ১ম উপরি প্রয়োগ হিসেবে দিতে হয়ে। এ সময় গাছের গোড়ার চারিদিকে ১৫-১৬ সেমি. দূরে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। চতুর্থবার ও একইভাবে দিতে হয়।

২০২২

জমিতে গন্ধক ও দস্তার অভাব হলে জিপসাম ১০০ কেজি ও দস্তা ১০ কেজি হিসেবে প্রতি হেক্টরে দেয়া যেতে পারে।

বীজ বা চারা রোপণ ও অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

পুঁইশাকের বীজ ছিটিয়ে বপন বা লাইনে রোপণ করা যায়। আবার পলিব্যাগে চারা তৈরি করেও রোপণ করা যায়। তবে চারা তৈরি করে জমিতে রোপণ করা ভালো। চারা তৈরি করার জন্য বীজতলায় বীজ বুনে চারার বয়স ৫-৬ সপ্তাহ হলে তুলে মূল জমিতে লাগাতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে অন্তত ১২ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে গজাতে সুবিধা হয়। জমিতে সরাসরি বীজ রোপণ করলে প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ রোপণ করা উচিত।

বেডে বীজ বপন বা রোপণ- বেডে বীজ বপন বা রোপণ করলে সারিতে ২-৪ সেমি. গভীর করে প্রতি গর্তে ২-৩টি বীজ বপন বা রোপণ করতে হয়। পরবর্তীতে আগাছা পরিষ্কার ও ঘাস বাছাই করার সময় প্রতি গর্তে ১টি করে সতেজ চারা রেখে বাকীগুলো তুলে ফেলতে হবে।

পলিব্যাগে চারা তৈরি- ৫ × ৫ সেমি. সাইজের ছিদ্রযুক্ত ছোট পলিব্যাগে গোবরসার ও বালি সমান অনুপাতে মিশিয়ে ভরতে হবে। ১টি ব্যাগে ১টি করে বীজ মাটির ১ সেমি. গভীরে বসাতে হবে। ৩-৫ দিনের মধ্যে বীজ গজাবে এবং ২৫-৩৫ দিনে চারা রোপণের উপযুক্ত হবে।

বর্ষা মৌসুমে পুঁইশাক লাগাতে হলে ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে। পানি নিষ্কাশনের জন্য কমপক্ষে ১৫ সে.মি গভীর ও ৩০ সেমি. প্রশস্ত নালা করতে হবে। নালার মাটি দ্বারা বেড় ১০-১৫ সেমি. উঁচু করা যাবে। বেডের দুই কিনারে ২০ সেমি. বাদ দিয়ে লম্বালম্বি ৬০ সেমি. মাদা তৈরি করতে হবে। বীজ বা চারা রোপণের পর পরই সেচ দেয়া উচিত। তাতে বীজ তাড়াতাড়ি গজায় এবং চারা লাগানো হলে তাড়াতাড়ি লেগে যায়। একই জমিতে প্রতি বছর পুঁইশাকের চাষ করা উচিত নয়।

পরিচর্যা

আগাছা দমন, মাটি আলগা করে সারের উপরি প্রয়োগ এবং গাছের গোড়ায় হাল্কাভাবে মাটি দেয়ার কাজ একসাথেই করা যেতে পারে। গাছ যখন ৩০-৪৫ সেমি. লম্বা হবে তখন মাথার ডগা কেটে দিলে শাখা প্রশাখা বেশি হবে। পুঁইশাক ১.৫ মিটার উঁচু করে মাচাতেও দেওয়া যেতে পারে। পুঁইশাক সুষ্ঠু বাড়বাড়তির জন্য পুরো জীবনকালে যথেষ্ট সার ও রসের প্রয়োজন হয়। তাই বেশি ফলনের জন্য ডগা কাটার পর ইউরিয়া ও এমওপি সার প্রয়োগ করে হালকা সেচ দিতে হয়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই

পোকামাকড় দমন

পুঁইশাকে তেমন কোন মারাত্মক রোগবালাই হয় না। তবে কদাচিৎ পাতায় দাগ পড়া এবং কাণ্ড ও কীকড় পচা রোগ দেখা দিতে পারে।

রোগ- পুঁইশাকে পাতা পচা বা চারা পঁচা রোগ দেখা দিলে সে গাছ তুলে পুঁতে ফেলতে হয়।

প্রতিকার

১) রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২) জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৩) জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখতে হবে।

২০২২

৪) একই জমিতে বার বার পুঁইশাক চাষ না করে শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।
৫) ডায়াথেন এম ৪৫ বা কপার অক্সিক্লোরাইড ছত্রাকনাশক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

সেচ ও নিকাশ- পুঁইশাকে রসের প্রয়োজন বেশি তাই ১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হয়। পানি শুকালে মাটি আগলা করাসহ আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হয়। পানি নিকাশের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

চারা রোপণের ৬-৮ সপ্তাহ পরে ১ম বার সংগ্রহ করা যায়। ডগা ৩০-৩৫ সেমি. লম্বা হলে গোড়ায় ২-৩ টি পাতা রেখে মাটি হতে ৫-৬ সেমি. উপরে কাটতে হয়। এরপর ১৫ দিন অন্তর অন্তর ২০-৩০ সেমি. লম্বা ডগা হলেই ফসল সংগ্রহ করা যায়। এভাবে ৬-৭ বার ফসল আহরণ করা যেতে পারে। ৪ থেকে ৬ মাস পর ফুল আসলে আর ফসল সংগ্রহ করা যাবে না। আবার সারি করে ৮-১০ সেমি. পর পর বীজ বুনে/রোপণ করে ৭/৮টি পাতা হলে সম্পূর্ণ গাছসহ তুলে বিক্রি করা যায় এবং পুনরায় বীজ রোপণ করা যায়। এভাবে স্বল্প সময়ে বারবার পুইশাক সগ্রহ করা যায়। পুঁইশাক কেটে স্তরে স্তরে ছালা দিয়ে সাজায়ে পানি দিয়ে ভিজিয়ে বাজারজাত করা যায়।
ফলন : হেক্টর প্রতি ২০-২৫ টন।

গিমা কলমি শাকের চাষ

গিমা কলমি শাকের চাষ

কলমি শাকের জাত ঃ পুকুর, খাল, বিল বা জলাশয়ের ধারে কলমিগাছ এমনিতে জন্মে থাকে। তবে কলমি শাক দু'ধরনের। (ক) কাণ্ড ও পাতা সম্পূর্ণ সবুজ ও (খ) কাণ্ড, বোটা, কীরা লালচে কিন্তু পাতা গাঢ় সবুজ। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (RARI) কলমি শাকের মধ্য হতে নির্বাচন করে গিমা কলমির জাত উদ্ভাবন করেছেন। এ জাতটি খাড়াভাবে জন্মে থাকে। তবে বেশি বিলম্ব করলে লতায়ে যায়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি ঃ মাটির প্রকারভেদে ৪/৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল করতে হয়। জমি গভীরভাবে চাষ করলে গিমা কলমির জন্য ভালো। তবে দোঁআশ ও বেলে দোঁআশ মাটিতে গিমা কলমি বেশি ভালোভাবে জন্মে থাকে। জমি চাষের পর ১ মিটার করে চওড়া বেড তৈরি করে বেডের পাশে বা দুই বেডের মাঝখান দিয়ে ২০-২৫ সেমি. চওড়া করে নালা তৈরি করতে হয়। এক ধরনের কলমি শাক পানিতে জন্মে থাকলেও গিমা কলমিতে পানি নিকাশের সুবন্দোবস্ত রাখতে হয়।

সার প্রয়োগ ঃ গিমা কলমি চাষের জন্য কম উর্বর জমি হলে জৈব সার বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করতে হয়। জমির শেষ চাষের পূর্বে সম্পূর্ণ পচা গোবর সার, টিএসপি ও পটাশ সার সম্পূর্ণ জমিতে বা বেডে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। সারের পরিমাণ নিচে দেয়া হলো।

সারের নাম	হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ
গোবর/কম্পাস্টে সার	৬-৮ টন
ইউরিয়া	২৮০ কেজি
টিএসপি	১২০ কেজি
এমওপি	৭৫ কেজি

ইউরিয়া সার ৪ কিস্তিতে ভাগ করে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। চারা গজানোর পর ৮/১০ সেমি. উঁচু হওয়ার পরে সারির পাশ দিয়ে ইউরিয়া ছিটিয়ে দিয়ে মাটি নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিতে হয়। গিমা কলমি ১ মাসের মধ্যেই আহরণ করা যায়। তাই ১ম আহরণ করার পর পরই ২য় কিস্তি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে হালকা সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। ১ম আহরণের ৮-১০ দিন পর পুনরায় ২য় আহরণ করা যায়। ২য় আহরণ করার পর পর পুনরায় ৩য় কিস্তি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হয়। আবার ৮-১০ দিন পর শাক আহরণ করে ৪র্থ কিস্তি সারের উপরিপ্রয়াগ করে আর একবার শাক সংগ্রহ করে পরবর্তীতে বীজের জন্য রেখে দেওয়া যায়। কেননা ৪ বারের পর সাধারণত শাক হিসেবে ভালো ফলন দেয় না এবং মানগত দিক থেকে নিম্নমানের হয়ে যায়।

বীজ/চারা রোপণ ও অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

বীজ রোপণ ঃ জমি চাষের পর বেড তৈরি করে বেডে ৩০ সেমি. পর পর বা দূরত্বে লাইন টেনে প্রতি লাইনে ১০- ১৫ সেমি. পর পর ছোট গর্ত করে সে গর্তে দ'টি করে বীজ ১ সেমি. গভীরে লাগাতে হয়। বীজ রোপণের ৩-৪ দিনের মধ্যে বীজ গজায়। বীজ গজানোর পর চারা ৩৪ সেমি. হলে প্রতি গর্তে ১টি করে চারা রেখে বাকীটা উঠিয়ে ফেলতে হয়। কাটিং রোপণের ক্ষেত্রে ২/৩টি গিরাসহ কাটিং নিয়ে ১টি গিরা মাটির গভীরে পুঁতে কাটিং রোপণ করতে হয়। কাটিং রোপণের পূর্বে ছত্রাকনাশকে কাটিং ডুবিয়ে নিলে ভালো হয়। বীজের ক্ষেত্রে বীজ রোপণের পূর্বে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে নিলে চারা গজানোর হার বৃদ্ধি পায়।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা ঃ চারা গজানো বা কাটিং রোপণের পর ১৫ সেমি. পর পর ১টি করে গাছ রেখে বাকীগুলো ১টি উঠানের সময় আগাছা তুলে ফেলতে হয়। গিমা কলমির শিকড়ে প্রচুর আলোকবাতাস লাগার জন্য মাটি সব সময় আগলা করে রাখতে হয়। বর্ষাকালে চাষের সময় সাধারণত সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে একনাগাড়ে ১০-১৫দিন বৃষ্টি না হলে সেচ দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ৩/৪ বার সারের উপরি প্রয়োগ করার পর পর মাটি খুচিয়ে আলগা করে দিতে হয়, তাতে সারের কার্যকারিতা বাড়ে এবং গাছে আলোবাতাস পায়।

পোকামাকড় ও রোগ দমন

পোকামাকড় ঃ মাঝে মাঝে বিটল পোকা গাছের পাতা খেয়ে ছিদ্র করে। ম্যালথিয়ন, ডায়াজিনন বা ফেনিট্রোথিয়ন স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়। পাউডারি মিলডিউ রোগে পাতায় হালকা হলুদ দাগ পড়ে এবং আস্তে আস্তে তা পরিবর্তিত হয়ে পাতায় সাদা ধুসরাভ দাগ হয়। এর ফলে গাছ দুর্বল হয়, বৃদ্ধি কমে যায়। কপার মিশ্রণ যৌগ বালাইনাশক স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

সেচ ও নিকাশ : পিমা কলমি প্রচুর পানি পছন্দ করে। কিন্তু পানিতে স্যাঁতসেতে অবস্থা পছন্দ করে না। দীর্ঘ খরা হলে সেচ দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। বৃষ্টি বা সেচের পানি বের করে দেয়ার ব্যবস্থা রাখতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

বীজ গজানোর ৩০ দিনের মধ্যেই শাক সংগ্রহ করার উপযোগী হয়। গাছগুলো ৩০-৩৫ সেমি. লম্বা হলে মাটির লেবেল হতে বা গাছের গোড়া হতে ২/৩ সেমি. উপরে কেটে আহরণ করতে হয়। শাক কেটে ডালা/ঝুড়িতে সুচারুরূপে স্তরে স্তরে সাজিয়ে ছায়ায় ও ঠান্ডায় রাখতে হয়। তারপর মুঠি বেঁধে বাজারে পাঠাতে হয়। শাক কাটার পর খোলা মেলাভাবে রোদে রেখে দিলে খুব দ্রুত এর মান খারাপ হয়ে যায়। শাক কাটার পর ঠান্ডা ও আর্দ্র ঘরে বেশি আর্দ্রতায় ২/৩দিন রাখা যেতে পারে।। ফলন- যত্নের সাথে চাষ করলে হেক্টরে ৪০-৫০টন পর্যন্ত শাক পাওয়া যেতে পারে।

চিত্র : পিমা কলমি শাক কেটে মুঠি বাঁধা

চিত্র : পূর্ণাঙ্গ পিমা কলমি গাছ।

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. পুঁইশাকের কয়টি জাত আছে?

২. কোন জাতের পুঁইশাকের গাছে ফল বেশি ধরে ?

৩. পুঁইশাক চাষে হেক্টর প্রতি কত কেজি জিপসাম দিতে হয় ?

৪. পুঁইশাকের চারা কত সেমি. সাইজের ব্যাগে করা হয় ?

৫. কলমি শাক কয় ধরনের হয় ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পুঁইশাক চাষে হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ উল্লেখ কর।

২. পুঁইশাক চাষে অন্তবর্তী পরিচর্যা সম্পর্কে লেখ।

৩. কলমি শাক চাষে হেক্টরপ্রতি সারের পরিমাণ উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পুঁইশাকের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২. কলমি শাকের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২০২২

অষ্টম অধ্যায়

গাজরের চাষ

গাজরের জাত

গাজরের এশিয়াটিক ও ইউরোপীয় জাত আছে। এশিয়াটিক জাত আকারে বড়, হলুদ গাঢ় বর্ণের এবং স্বাদে মিষ্টি হয়ে থাকে। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় জন্মে এবং শীতের পরিবেশ ছাড়াই বীজ উৎপাদন করতে পারে। ইউরোপীয় জাত কিছুটা ছোট, আকর্ষণীয় ও কম আঁশাল। বাংলাদেশে যে সমস্ত জাত চাষ হয়ে থাকে তার প্রায় সবগুলোই বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। বাংলাদেশে চাষকৃত জাত হলো যথা- রয়েল ক্রস, কোরেল ক্রস, কীনকো, সানটিনো রয়েল ও স্কারলেট নান্টেস, কুরোদা-৬৫, জি কুরোদা, ইয়লো রকেট, অরেঞ্জ কীং ইত্যাদি।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি তৈরি : জমি অত্যন্ত ঝুরঝুরে ও রসালো হলে গাজর ভালো জন্মে। এর বীজ অত্যন্ত ছোট ও হালকা। তাই বীজ বপনের আগে ১ ভাগ বীজের সাথে ৯ ভাগ বালি বা ছাই মিশিয়ে নিলে সমভাবে বপন করা যায়। জমিতে সরাসরি ছিটিয়ে বা বেডে লাইন করে বীজ বপন/রোপণ করা যায়। বেডে বপন করা হলে ২৫সেমি. পর পর জোড়া সারি করে ১-১.৫ সেমি. গভীর জুলিতে বীজ বপন করা উত্তম। প্রতি দুই সারি পর পর ৩০ সেমি. করে ফাক দেওয়া যেতে পারে। বীজ বপনের জন্য তৈরি জুলিতে এক নাগাড়ে বীজ বুনার পর ঝুর ঝুর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। প্রয়োজনবোধে মাটির উপরে খড় বিছিয়ে হালকা করে সেচ দেওয়া যেতে পারে। বীজ গজানার পর খড় সরায়ে দিতে হয়। মাটি আগলা ও চারা পাতলা করে ৫-৭ সেমি. দূরত্বে একটি করে গাছ রাখলে ভালো হয়। এ কাজ চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর করতে হয়।

সার প্রয়োগ ঃ হেক্টর প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো

গোবর সার	-	১০ টন	টিএসপি সার	-	১৫০ টন
ইউরিয়া	-	২০০ কেজি	এমওপি সার	-	১২০ কেজি

গোবর/কম্পোস্ট এবং টিএসপি সার পুরোপুরি এবং ইউরিয়া ও পটাশ সারের ১/৩ অংশ জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও পটাশ সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। চারা গজানোর ২০ থেকে ২৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং পরবর্তী ১৫ দিন পর পর ২য় ও ৩য় কিস্তি সার দেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তির সার ১৫ দিন পর পর সারির দু'পাশে হালকা জুলি কেটে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্তিতে পটাশ সারও ঐ একইভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বীজ/চারা রোপণ ও অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা

বীজ বপন ঃ গাজরের বীজ খুব ছোট। গাজর বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা হয়। এর চারা তৈরি করে চাষ করা হয় না। বীজ সমভাবে ও সহজভাবে বপনের জন্য ১ ভাগ বীজের সাথে প্রায় ৯ ভাগ ছাই বা শুকনো বালি মিশিয়ে নিলে ঠিকমত বপন করা যায়। পরিচর্যার সুবিধার্থে চাষকৃত জমিতে ৫০-১০০ সেমি. চওড়া করে বেড তৈরি করতে হয়।

২০২২

প্রতি বেড পর পর ২০ সেমি. চওড়া ও ২০ সেমি. গভীর করে নালা তৈরি করতে হয়। বেডে ৩০ সেমি. পর পর সারি টেনে অর্থাৎ প্রতি বেডে জোড়া তিন সারি করে তাতে ১-১.৫ সেমি. গভীর করে নালা/জুলি টানতে হবে। এ নালায় ছাই বা বালি মিশ্রিত বীজ পাতলা করে একনাগাড়ে বপন করে দিতে হয়। তারপর হালকাভাবে ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিয়ে সামান্য চেপে দিতে হয়। ২-৩ দিনের মধ্যে বীজ গজানো শুরু করে। অনেক সময় বীজ বপনের পর খড় দেওয়া হয়। বীজ গজানোর পর খড় দিলে তা সরায়ে দিয়ে চারা পাতলা করতে হয়। চারা ৫/৭ সেমি. লম্বা হলে প্রতি সারিতে ৫-০ সেমি. পর পর ১টি করে গাছ রেখে অন্যগুলো তুলে ফেলতে হয়। এ কাজ চারা গজানোর ১৫-২০ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হয়।

পোকামাকড় দমন

জাব পোকা ঃ এ পোকা পাতা ও গাছের কচি অংশের রস চুষে খেয়ে যথেষ্ট ক্ষতি করে। জাব পোকার আক্রমণ হলে ম্যালাথিয়ন ১.২ লিটার ৬০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে এক হেক্টর জমিতে স্প্রে করে দমন করা যায়।

সেচ ও নিষ্কাশন

আগাছা দমন এবং সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়। সার প্রয়োগ এবং সেচ বা বৃষ্টিপাতের পর মাটি খুচিয়ে আগলা করে দিতে হয়। গাছের গোড়ায় হালকাভাবে মাটি তুলে দিলে গাজর যথাযথভাবে বৃদ্ধি পায় ও ফলন বেশি হয়। এসব কাজ করার সময় শিকড়ের যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংক্ষণ ও বাজারজাতকরণ

বীজ বপনের ১১০-১২০ দিনের মধ্যে গাজর সংগ্রহ উপযোগী হয়। তবে ৭০-৭৫ দিন বয়স থেকেই উঠানো যায়। কিন্তু তাতে ফলন কম হয়। হেক্টরে ১৫-২৫ টন গাজর ও ৩০০-৪০০ কেজি বীজ জন্মিতে পারে। বীজের জন্য গাজর বেশি সময় ধরে জমিতে রাখতে হয়। ফুল হওয়ার ৩০-৩৫ দিন পর বীজ শুকিয়ে খড়ের ন্যায় বা বাদামী রং ধারণ করে। এ সময় ভোরে ফুলের ডাটাসহ কেটে আনতে হয়। পরে মাড়াই করার স্থানে শুকিয়ে কাঠি দিয়ে আস্তে আস্তে পিটিয়ে মাড়াই করে ও পরিষ্কার করে বীজ সংগ্রহ করতে হয়। গাজর পরিপক্ক হওয়ার পর উঠিয়ে পাতা বোঁটা পর্যন্ত কেটে ছায়ায় ২-৩দিন শুকাতে হয়। ছায়া ও ঠান্ডা স্থানে গাজর ২-৩ সপ্তাহ রাখা যায়। এরপর আরও ২-৩ মাস রাখতে হলে ঠান্ডা পরিচ্ছন্ন বালি দিয়ে ঢেকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হয়।

২০২২

অনুশীলনী

এক কথায় উত্তর

১. গাজরের কয় ধরনের জাত আছে ?

২. গাজর বীজ বপনে ১ ভাগ বীজের সাথে কয়ভাগ বালি মেশাতে হয় ?

৩. গাজর বীজ কয়ভাবে বপন/রোপণ করা যায় ?

৪. গাজর কতদিনে সংগ্রহ করা যায় ?

৫. হেক্টরে গাজর কত টন হতে পারে ?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. গাজরের বীজ বপন পদ্ধতি সম্পর্কে লেখ।

২. গাজর চাষের হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ উল্লেখ কর।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গাজরের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা কর।

ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১

দশম শ্রেণি (দ্বিতীয় পত্র)

ব্যবহারিক

২০২২

ব্যবহারিক

দ্বিতীয় পত্র (দশম শ্রেণি)

উপযুক্ত সবজি চারা শনাক্তকরণ পদ্ধতি ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যাকরণ

পাঠ-১-২৪ উপযুক্ত সবজি চারা শনাক্তকরণ পদ্ধতি ও রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা করা।

প্রাথমিক তথ্য- বাংলাদেশে বহু রকমের সবজি চাষ হয়ে থাকে। সব সবজিরই চারা উৎপাদন করার প্রয়োজন হয় না। চারা রোপণের উপযুক্ত হলে দেরি না করে রোপণ করতে হয়। বয়স্ক এবং অনুপযুক্ত চারা রোপণ করলে ফলন কমে যায়। জমির মাটিতে উপযুক্ত রস যেন থাকে। বীজতলার মাটিতে চারার গোড়া যতটুকু গভীরে ছিল রোপণের সময় ততটুকু গভীরে রোপণ করতে হয়। সারি টেনে নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা লাগিয়ে চারার গোড়ার মাটি সামান্য চেপে দিতে হয়। মাটি শুষ্ক হলে ঝাঝরি দিয়ে সেচ দিতে হয় এবং রোদের সময় ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয়। মাটিতে চটা ধরলে নিড়ানি দিয়ে তা ভেঙ্গে দিতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। বীজতলা ও রোপণ উপযোগী সবজির চারা ২। নিড়ানি ৩। চারা উঠানোর জন্য বাঁশের চটা ৪। ঝাঝরি ৫। কলার খোল ৬। খাতা কলম।

কাজের ধাপ

চারা শনাক্তকরণ

১. বীজতলার পাশে দাঁড়ায়ে চারা স্বাভাবিক আকারের কিনা দেখতে হবে।
২. চারায় ৪-৫টি হতে অনধিক ৬টি পাতাযুক্ত হয়েছে কীনা দেখতে হবে।
৩. রোগের সবরকম লক্ষণ থেকে চারা মুক্ত আছে কীনা দেখতে হবে।
৪. চারার কাণ্ড, পাতা ও গুচ্ছমুলের বৃদ্ধি প্রায় সমানুপাতিক কিনা দেখতে হবে।
৫. কাণ্ড পুরু ও সতেজ কিনা দেখতে হবে।
৬. পাতা স্বাভাবিক সবুজ আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
৭. চারার কষ্টসহিষ্ণুতা করে নিতে হবে। তাতে চারায় শ্বেতসার সঞ্চিত হয়।
৮. চারা স্থানান্তরজনিত আঘাত কাটিয়ে উঠার মত যোগ্য কিনা দেখতে হবে।

উল্লিখিত গুণাগুণ থাকলে সে সমস্ত চারা রোপণের জন্য শনাক্ত করার যায়।

রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

১. চারা বীজতলা হতে উঠায়ে রোপণ পরবর্তী চারার গোড়ায় ৩-৪দিন সকালে প্রয়োজনে বিকালেও ঝাঁঝরি দিয়ে হালকাভাবে সেচ দিতে হবে।
২. চারা রোপণ করে গোড়া সামান্য চেপে দিতে হবে এবং চারা বেকে গেলে সোজা করে দিতে হবে।
৩. চারা রোপণের পর প্রখর রোদের ভাব থাকলে ৫-৭ দিন পর্যন্ত দিনে ছায়া করে দিতে হবে।
৪. চারা রোপণ হতে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত মালচিং, আগাছা দমন, শূন্যস্থান পূরণ, অংগ হাটাই, পরাগায়ন, স্প্রে করা ইত্যাদি সুচারুরূপে করতে হবে।
৫. কাজের প্রতিটি বিষয় খাতায় ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।

কম্পোষ্ট সার তৈরির দক্ষতা অর্জনে কম্পোষ্টের উপকরণ চিহ্নিতকরণ

পাঠ-১-৩ঃ কম্পোষ্ট সার তৈরির দক্ষতা অর্জনে কম্পোষ্টের উপকরণ চিহ্নিত করা, সারের গাদা তৈরি করা ও কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করা।

প্রাথমিক তথ্য- ভালো কম্পোষ্ট তৈরির জন্য কার্বন, নাইট্রোজেন ও অনুজীবের উৎসগুলো একত্রীকরণ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কম্পোষ্ট এক ধরনের জৈব সার। গাছপালা তাজা বা শুকনো, লতাপাতা, খড়কুটা, তরিতরকারির অবশিষ্টাংশ, কচুরিপানা, সবুজ ঘাস, পশুপাখির মলমূত্র, কশাইখানার বর্জ্য ইত্যাদি কম্পোষ্ট তৈরিতে প্রয়োগ করা যায়। কম্পোষ্ট তৈরিতে বিষাক্ত দ্রব্য (বিষকাঁটালি, তামাক), অপচনশীল রাসায়নিক দ্রব্যাদি (প্লাষ্টিক ও প্লাস্টিকজাতীয় পদার্থ), কার্বন বেশি আছে এমন গাছ (বাঁশপাতা, ইউক্যালিপটাস, কলা ও হলুদের পাতা) এবং রোগাক্রান্ত গাছপালা ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়।

গাদা পদ্ধতিতে কম্পোষ্ট তৈরির জন্য নির্দিষ্ট মাপ (৩ মিটার ×১.২৫ মিটার ×১.৫ ২.০০ মিটার) দিয়ে সেখানে আবর্জনা, ও অন্যান্য উপকরণ স্তরে স্তরে সাজাতে হবে। স্তুপের উপরে মাটি ও কাঁচা গোবরের পুরুস্তর করে লেপে দিতে হবে। পচনক্রিয়ার জন্য মাঝে মাঝে উপর দিয়ে ছিদ্র করে পানি দিতে হবে। স্তুপের উপরে চালা দিতে হয়। ৩-৪ মাসে কম্পোষ্ট তৈরি করে ব্যবহার করা যায়। পঁচনক্রিয়া ঠিকমত হলে ১.৫-২ মাসেও কম্পোষ্ট তৈরি হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ-

১। খড়কুটা, আবর্জনা, লতাপাতা ইত্যাদি জৈব উপকরণ, ২। পশুপাখির মলমূত্র ও অন্যান্য বর্জ্য ৩। কাঁচা গোবর। ৪। ভিটা মাটি ৫। বাঁশ ৬। চাটাই ৭। কোদাল ৮। চালা ৯। টেপ (মাপার ফিতা) ১০। রকী, ১১। খাতা কলম।

কাজের ধাপ-

১. কম্পোষ্ট গাদা তৈরির জন্য উচু স্থানে ৩ ×২ মিটার দৈঘ্য ×প্রস্থ) মেপে চিহ্ন করতে হবে।

২. চারকোনায় ৪টি বাঁশে খুঁটি পুঁতে রশি দিয়ে চাটাই দিয়ে আয়তাকার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

৩. এই ক্ষেত্রের ভিতর ঘাস, লতাপাতা, প্রাণিজ আবর্জনা, গরু ছাগলের ঘরের ঝাড়ুর ময়লা জাতীয় সব পঁচনশীল দ্রব্য ফেলে প্রথমে ৩০ সেমি. স্তর বানাতে হবে।

৪. এ স্তরের উপরে ১ কেজি গুড়া খৈল, কাঁচা গোবর, পচা মাটি ইত্যাদি দিয়ে ৫ সেমি. পুরু স্তর বানাতে হবে।

৫. এরপর পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

৬. এভাবে উপকরণ প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে ৩ থেকে ৬টি স্তর পর পর একই নিয়ম অনুসরণ করে সাজাতে হবে।

৭. সর্বশেষ স্তরের উপর পলিথিন/খড় দ্বারা চালা তৈরি করে দিতে হবে।

৮. গাদা যদি শুকিয়ে যায় তাহলে মাঝে মাঝে উপর দিয়ে ছিদ্র করে পানি দিতে হবে, যাতে ঠিকমত পচন ক্রিয়া চলতে পারে।

৯. গাতা তৈরির ১ মাস পর স্তরগুলো ওলটপালট করে দিলে পচন ক্রিয়া সমভাবে হবে এবং ১.৫ - ২ মাসে সম্পূর্ণ পঁচে কম্পোষ্ট ব্যবহার উপযোগী হবে।

ব্যবহার ঃ কম্পোষ্ট তৈরি হলে গাদা ভেঙ্গে শুকিয়ে গুড়া করে প্যাকেটজাত/বস্তায় ভরে রাখা যাবে। তবে খুব বেশি শুকানো উচিত নয়। পচনের ফলে কালচে রং ধারণ করে এবং ঝুরঝুরে হয়। কোন দুগর্ন্ধ থাকে না এবং হাতে নিয়ে মুঠি করে চাপ দিলে স্পঞ্জের মত মনে হয়। এতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশসহ অন্যান্য উপাদান থাকে। এটি সবজির জন্য অত্যন্ত উন্নতমানের জৈব সার।

সার উপরি প্রয়োগকরণ

পাঠ ১-৩ঃ সার উপরিপ্রয়োগ, পাতা জাতীয় সবজিতে এর পরিমান, মূল জাতীয় সবজিতে এর পরিমাণ নির্ধারণ ও প্রয়োগ করা।

প্রাথমিক তথ্য

ফসলের বীজ বপন/চারা রোপণের পরে ফসলের বৃদ্ধি পর্যায়ে সার প্রয়োগ করাকে উপরি প্রয়োগ বোঝায়। গাছের জন্য বেশি পরিমাণে লাগে এবং গ্রহণ উপযোগী হতে সময় লাগে এরূপ সারগুলো মৌল সার হিসেবে চাষের সাথে প্রয়োগ করা হয় (টিএসপি, পটাশ, দস্তা, চুন, জিপসাম, বোরণ ইত্যাদি। তবে, নাইট্রোজেন ও পটাশ সার, বোরণ ও দস্তা সার গুলিয়ে, ছাই, পঁচা খৈল ও গোবর সার উপরি প্রয়োগ করা যায়। স্বল্প মেয়াদি ও পাতা জাতীয় সবজিতে নাইট্রোজেন ব্যতিত সব সার মৌল এবং নাইট্রোজেন সার কয়েক কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়। ফুল, মূল ও ফল জাতীয় সবজিতে উপরি প্রয়োগের সার ২-৩ টি কিস্তিতে প্রয়োগ করলে বেশি সুফল পাওয়া যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। পাতা, মূল ও ফল জাতীয় সবজি ক্ষেত ২। বিভিন্ন ধরনের সার ৩। সার ছিটানোর পাত্র ৪। খাতা কলম

কাজের ধাপ

পাতাজাতীয় সবজি

১। পালং ও লালশাক, সিলারী, ধনেপাতা, বাঁধাকপি, মূলা শাক ইত্যাদি পাতাজাতীয় সবজি ক্ষেত নিতে হবে।

২। পাতাজাতীয় সবজিতে ফসল তোলার পূর্ববর্তী ৩০ দিন খাদ্য পরিশোষণ হার বেশি। তাই এ সময়ে ২-৩ কিস্তিতে সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

৩। সার গাছের পার্শ্বে, উপর হতে ছিটিয়ে , গোড়ায় ব্যান্ড আকারে, সারির পাশ দিয়ে, মাদায় চারিদিকে, স্প্রে করে দেওয়া যাবে। তবে সম্পূর্ণ ইউরিয়া ২-৩ কিস্তিতে, পটাশ মোট সারের অর্ধেক ২ কিস্তিতে খৈল/ছাই/গোবর ৫০% ১-২ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

মূলজাতীয় সবজি

১। ফসল তোলার ৪৫ দিন আগে ১৫-২০ দিন পর পর ২-৩ কিস্তিতে সারির পাশ দিয়ে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

২। সবজির পাশ দিয়ে লাইন টেনে তাতে সার দিয়ে মাটি দিয়ে বা মাটি তুলে গোড়া বেধে দিতে হবে।

৩। ২ কিস্তিতে সার দিলে লাইনের দুইপাশ দিয়ে ২ বারে দিতে হবে, তাতে সারের কার্যকারিতা বেশি হবে। সার প্রয়োগ সম্পর্কে তাত্ত্বিক অংশে উল্লেখ আছে।

ফলজাতীয় সবজি- মূল জাতীয় সবজির অনুরূপ।

সারের উপরি প্রয়োগের সময় জমিতে রসের ঘাটতি থাকলে সেচে দিতে হবে। তাতে সার বেশি কাজে লাগবে।

২০২২

গোল আলুর কাটিং ও কিউরিং করার দক্ষতা অর্জন করা

পাঠ-১-৩ ঃ গোল আলুর কাটিং ও কিউরিং করা ও কিউরিং পরবর্তী লাগানো

প্রাথমিক তথ্য- বীজ আলু সব সময় ছোট (২০ গ্রাম) আকারের পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ছোট বীজ বেশি ভালো। সেক্ষেত্রে বড় আকারের বীজ আলুকে কেটে টুকরো করে রোপণ করা যায়। কাটিং করার সময় টুকরার ওজন, আকার, চোখের সংখ্যা লক্ষ রাখতে হয়। এছাড়াও কাটিংকৃত আলুটি যাতে রোগে আক্রান্ত না হতে পারে সেজন্য কাটার যন্ত্রটি শোধন করে নিতে হয়। আলুর কর্তিত স্থানটি ঠিকমত শুকানো হলে শক্ত চটার ন্যায় হবে। তাতে রোগজীবাণু ঢুকতে বাধাগ্রস্থ হবে। কাটা আলু কিউরিং করার পর অঙ্কুর গজানোর জন্য খড়কুটা দ্বারা জাগ দিতে হয়। এতে শক্তিশালী অঙ্কুর বের হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ-

১। বীজ আলু, ২। চাকু, ৩। ছাই ৪। ডেটল/স্যাভলন ৫। খড়কুটা, ৬। ডালা, ৭। খাতা কলম।

কজের ধাপ

১. বীজ প্রস্তুতকরণের জন্য ২০ গ্রাম ওজনের আস্ত আলু বা ৩-৪ সেমি, অর্থাৎ ৩০ গ্রামের বীজ আলুকে দুটুকরা। এবং ৪ সেমি. এর বড় অর্থাৎ ৪০ গ্রামের বড় আলুকে দু'এর অধিক টুকরো করে কাটতে হবে।

২. বীজ আলু কাটার আগে চাকু, ছুরি বা বটিকে স্যাভলন/ডেটল দ্বারা মুছে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

৩. আলুর কাটিং এর প্রতি টুকরাতে কমপক্ষে ২টি চোখ থাকতে হবে।

৪. আলু কাটর পর কাটাস্থানে গোবরের শুকনো ছাই মাখায়ে ছায়ায় রেখে শুকাতে হবে।

৫. কাটিংগুলো শুকানো হলে কাটাস্থানে শক্ত চটা ধরবে। এরপর এগুলো ৫-৭ সেমি. পুরু করে বিছিয়ে খড়কুটা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৬. আলু কাটিং এর সময় পুরাতন অঙ্কুর ভেঙ্গে দিতে হবে।

৭. কিউরিং করার পর বীজ নিম্নে বর্ণিত দুরত্বে লাগাতে হবে।

দূরত্ব ঃ- সারি হতে সারি = ৬০-৭৫ সেমি.

বীজ হতে বীজ = ২০-২৫ সেমি.

নালার গভীরতা ৫-৭ সেমি.।

৮. আলু রোপণ সম্পর্কে তাত্ত্বিক অংশে বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

গীমা কলমি, কাঁকরোল, ধুন্দল, পুঁইশাক, গাজর চাষাবাদে জমি নির্বাচন, গর্ত তৈরি, চারা রোপণ, চারার পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরন

পাঠ-১-৫ঃ গীমা কলমি, কাঁকরোল, ধুন্দল, পুঁইশাক, গাজর চাষাবাদে জমি নির্বাচন, গর্ত তৈরি, চারা রোপণ, চারার পরিচর্যা, ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরন।

প্রাথমিক তথ্য- মাটি দোঁআশ ও এঁটেল দোঁআশযুক্ত উঁচু ও মাঝারি উঁচু এবং নিষ্কাশন সুবিধা আছে এমন জমি উত্তম। এ সমস্ত সবজি কিছুটা ছায়াময় স্থানে জন্মালেও পর্যাপ্ত সূর্যালোকে যেখানে পড়ে সে সমস্ত স্থানে ফলন বেশি হয়। সবজি লাইনে বপন করা যায়। আবার অনেক সবজি মাদা করে মাদায় বীজ রোপণ করা যায়। মাদায় গর্ত করে রোপণ করা হয়। চারা সাধারণত বিকেলে বা মেঘলা দিনে যে কোন সময় রোপণ করা যায়। এতে চারার মৃত্যু হার কম হয়। চারা রোপণের পর জমি শুকনো থাকলে ঝাঁঝরি দিয়ে পানি দিতে হয়। সূর্যের আলো প্রখর হলে চারায় ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১। সবজির বীজ, ২। নিড়ানি ৩। কোদাল, ৪ কাঠি ৫। টেপ ৬। চাকু ৭। ছায়ার জন্য চালা, ৮। ডালা/বস্তা ৯। জমির বন্ধুরতার তথ্য ১০। খাতা কলম।

কাজের ধাপ

১. দোঁআশ বা এঁটেল দোঁআশ মাটি, উঁচু বা মাঝারি উঁচু এবং সেচ ও নিকাশের সুবিধাযুক্ত জমি নির্বাচন করতে হবে।

২. সবজির জন্য নির্দিষ্ট দূরত্বে লাইন বা মাদা তৈরি করতে হবে।

সবজির নাম	দূরত্ব (সেমি.)
গীমা কলমি	লাইন হতে লাইন ১৫ সেমি. চারা হতে চারা ১০ সেমি.
কাঁকরোল	মাদা হতে মাদা উভয়দিকে ৩ মিটার, মাদায় গর্ত ৭৫ × ৭৫ সেমি. চওড়া ও গভীর
ধুন্দল	মাদা হতে মাদা ২ মি., মাদার লাইন হতে লাইন ১ মিটার, গর্ত ৭৫ × ৬০ সেমি.
পুঁইশাক	লাইন হতে লাইন ৪৫ সেমি, চারা হতে চারা ৩০ সেমি.
গাজর	লাইন হতে লাইন ৩০ সেমি. চারা হতে চারা ৫ সেমি.

৩. গীমা কলমি ও পুঁইশাক বীজ ৩-৫ সেমি. গভীর নালা টেনে ঐ নালায় নির্দিষ্ঠ দূরত্বে বীজ রোপণ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

৪. গাজর বীজ বপনের জন্য ২-৩ সেমি. গভীর করে নালা টেনে নালায় বীজ হালকা করে বপন করতে হবে এবং চারা গজালে ৫ সেমি. পর পর গাছ রেখে পাতলা করে দিতে হবে।

৫. গাজর বীজ বপনের সময় বীজের ওজনের ৯-১০ গুণ পর্যন্ত ছাই/বালি মিশিয়ে নিলে সমভাবে বীজ বপন করা সহজ হবে।

৬. গীমা কলমি, পুঁইশাক ও গাজর বেড করে বপন করতে হবে তাতে সেচ ও নিকাশের সুবিধা হবে এবং নিড়ানিসহ সারের পার্শ্ব প্রয়োগ সহজ হবে।

৭. কাঁকরোল ও ধুন্দল চারার গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য দুই মাদা পর পর সারি টেনে নালা কেটে মাটি তুলে বেড করে দিতে হবে। মাটিতে চটা ধরলে সাথে সাথে ভেঙ্গে ঝুরঝুরে করে দিতে হবে।

৮. মাদায় আগাছা জন্মালে নিড়ানি দিয়ে উঠায়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে।

৯. মাটি শুকনো হলে বা বৃষ্টিপাত না হলে অবস্থা বুঝে প্রয়োজনে ১০ দিন পর পর হালকা করে সেচ দিতে হবে।

১০. রোগ পোকার আক্রমণ যাতে না হতে পারে সেজন্য কপার মিশ্রিত ছত্রাকনাশক ও ম্যালাথিয়ন/ফেনিট্রথিয়ন জাতীয় বালাইনাশক স্প্রে করতে হবে।

১১. যে সমস্ত কাজ করা হবে তা খাতায় লিখে রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ করা, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও দক্ষতা অর্জন

পাঠ-১-৩ঃ সার উপরি প্রয়োগ করা, সারের মাত্রা নির্ধারণ ও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা।

প্রাথমিক তথ্য- শিকড়ের নাগালের মধ্যে সার প্রয়োগ করা হলে গাছ তা গ্রহণ করতে পারে। সার মাটিতে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া করে মাটিতে আবদ্ধ হয়, পানিতে ধুয়ে/চুয়ায়ে যায়, বাতাসে উড়ে যায়। তবে সার প্রয়োগের কয়েকটি পদ্ধতি আছে। তন্মধ্যে উপরি প্রয়োগ ১টি পদ্ধতি। জমিতে দণ্ডায়মান ফসলে সার প্রয়োগ করাকে উপরি প্রয়োগ বোঝায়। তবে সহজে দ্রবণীয় বা দ্রুত গাছের গ্রহনোপযোগী পর্যায়ে যায়, এরূপ সারই একমাত্র উপরি প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত হয়। এছাড়াও কিছু সার উপরি প্রয়োগ করা হয়। যেমন- ছাই, পচা খৈল ও গোবর, দস্তা এবং জৈব উজ্জীবক সার। উপরি প্রয়োগ কয়েকভাবে করা হয়। যথা-ছিটিয়ে, পার্শ্বে, চারপাশে, কাদার গোলকে করে, বড়ি করে, প্রবিষ্ট করে। আবার ছিটিয়ে প্রয়োগ দু'ভাবে করা হয় (সরাসরি উপর থেকে ছিটিয়ে এবং পাতায় স্প্রে করে)। ফসল বপন/রোপণ (চারা বা বীজ, ছিটিয়ে/সারিতে/মাদাতে) কীভাবে করা হয়েছে তার ওপর সারের পরিমাণও দক্ষভাবে প্রয়োগ নির্ভর করে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। তরল, দানাদার ও পাউডার সার, ২। ডালা ৩। স্প্রে মেশিন, ৪। সার মাপার যন্ত্র ৫। কাঠি ৬। নিড়ানি, ৭। কোদাল ৮ খাতা কলম

কাজের ধাপ

১. বিভিন্ন ধরনের সার নিতে হবে।

২. ৩৩ নং ব্যবহারিক পাঠে সবজিতে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময় উল্লেখ আছে তা দেখে নিতে হবে।

৩. রাসায়নিক সার ঘন মাত্রার সার। তাই শেকড়ের সাথে যাতে না লাগে সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

৪. মাটিতে রস না থাকলে সার দেয়া উচিত হবে না। মাটির রস পরীক্ষা করে নিতে হবে।

৫. বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা গাছের পাতা ভেজা থাকলে সে সময় সার দেয়া উচিত নয়। সার প্রয়োগের আগে মাঠ পরিদর্শন ও আবহাওয়ার অবস্থা দেখে নিতে হবে।

৬. সার উপরিপ্রয়োগ হিসেবে যে পদ্ধতিতেই দেওয়া হাকে, তা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৭. প্রখর রোদের সময় সার উপরি প্রয়োগ করা উচিত নয়। সার প্রয়োগের আগে সূর্যের প্রখরতা দেখে নিতে হবে।

৮. সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখতে হবে।

সবজি ফসলের রোগের আক্রান্তের লক্ষণ দেখে রোগ শনাক্তকরণ

পাঠ-১-৭ ঃ সবজি ফসল রোগে আক্রান্তের লক্ষণ শনাক্ত করা (গাজর, কাঁকরোল, ধুন্দল, পুঁইশাক, গীমাকলমি, লতিরাজ কচু, মুখি কচু)।

প্রাথমিক তথ্য- রোগজীবাণু উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করে কোষ নষ্ট করে ও খাদ্যরস গ্রহণ করে। এতে উদ্ভিদের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, যা রোগের লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়। যেমন-গোড়া পঁচা, পাতার দাগ, স্ক্যাব, পাউডারি মিলডিউ, মোজাইক, শুকনা পঁচা ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। রোগের নমুনা, ২। চাকু ৩। আতশীকাঁচ ৪। ট্রে, ৫। ফরসেপ ৬। খাতা পেন্সিল।

কাজের ধাপ

১. রোগের বর্ণনা দেখে জমিতে গিয়ে ফসলের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে।

২. নমুনা সংগ্রহের সময় খুব সাবধানে চাকু/কাঁচি দিয়ে কেটে ট্রেতে নিতে হবে।

৩. সংগৃহীত নমুনাটি ছায়ায় রেখে সতেজ থাকা অবস্থায় রোগের লক্ষণ দেখতে হবে।

গাজর	স্ক্যাব	গাজরের গায়ে বিভিন্ন আয়তন ও আকৃতির গুটি বসন্তের ন্যায় দাগ সৃষ্টি হয়। কোনগুলো অগভীর, কোনগুলো ভাসা অবস্থা। দাগের কিনারা অসমান, মাঝে মাঝে অনেকগুলো দাগ একত্রে হয়ে বড় আকার ধারণ করে। আক্রান্ত স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়।
কাঁকরোল	পাউডারি মিলডিউ	আক্রান্ত পাতার উপর সাদা সাদা পাউডারের গুড়ার ন্যায় পদার্থ বিদ্যমান। এই সাদা গুড়ো দ্বারা আবৃত থাকে। বয়স্ক পাতায় বেশি দাগ বিলম্বে বাদামী রঙ ধারণ করে। আক্রমণের তীব্রতায় পাতা মারা যায়।
ধুন্দল	ঐ	ঐ
কাঁকরোল	মোজাইক	পাতায় হলদে ও গাঢ় সবুজ রঙের ছাপে ছোট ছোট মিশ্রণ সৃষ্টি হয়। তীব্র আক্রমণে পাতা হলদে হয়ে যায় এবং শিরা নিচের দিকে কুঁকড়ে বেঁকে যায়। ফুল ও ফল ধরা কমে যায় এবং ফলের বিকৃতি ঘটে।
পুঁইশাক	পাতার দাগ	পাতায় বাদামি দাগ পড়ে। দাগগুলে গোলাকার ও তার কিনারা উজ্জল লাল বর্ণের হয়। পরবর্তীতে দাগের মধ্যে শুকিয়ে ছিদ্র হয়ে যায়।
গীমা কলমি	গোড়া পচা	মাটি সংলগ্ন কাণ্ড পচে যায়। সেখানে প্রথমে বিবর্ণ হয়ে কালচে হয় এবং গোটা কাণ্ড ঘিরে ফেলে ও পরে পচে যায়। আক্রান্ত গাছ দূর হতে হলদে দেখায় ও টান দিলে উঠে গাছ আসে।
লতিরাজ কচু	পাতার মড়ক	পাতার উপর বেগুনি হতে বাদামি রঙের গোলাকার দাগ পড়ে। পরে দাগ বৃদ্ধি পেলে পাতা ঝলসে যায়। ৩-৪ দিন বৃষ্টিতে এর মাত্রা দ্রুত বিস্তার লাভ করে।
মুখী কচু	শুকনা পচা	আক্রান্ত মুখী কচুর খোসা একটু ডাবা, আক্রান্ত স্থান শুকনা ও শক্ত, কুঁচকানো হয়। কুচকানো স্থানে ফাঁপা হয়।

৪. রোগের লক্ষণের সাথে নমুনা দেখে মিলিয়ে তা চিহ্নিত করে খাতায় বর্ণনাসহ লিখতে হবে।

৫. প্রতিটি সবজির নমুনা রোগের লক্ষণের সাথে মিলিয়ে খাতায় লিখতে হবে।

৬. নমুনাগুলোকে রোগের লক্ষণের সাথে মিলানোর পর তা পুঁতে/পুড়ায়ে নষ্ট করতে হবে।

সবজির রোগ প্রতিকারের দক্ষতা অর্জন

পাঠ-১-৩ ঃ সবজির রোগ প্রতিকারের দক্ষতা অর্জন করা

প্রাথমিক তথ্য- রোগের আক্রমণে সবজির ফলন হ্রাস পায় এবং গুণগত মান কমে যায়। ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধরনের রোগনাশক সরকার রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করে থাকে যা বিভিন্ন কোম্পানী বাজারজাত করছে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. রোগনাশকের প্যাকেট বা বোতল
২. মাপার যন্ত্র
৩. চামচ
৪. পানি
৫. স্প্রেয়ার/ডাষ্টার
৬. বালতি
৭. হ্যান্ড গ্লোবস
৮. মাস্ক
৯. ছোট সাদা কাগজ
১০. গামবুট
১১. এ্যাপ্রোন
১২. চশমা
১৩. বিকার/সিলিন্ডার/পিপেট

কাজের ধাপ

রোগনাশক শনাক্তকরণ

১. রোগনাশকের প্যাকেট/বোতল র‌্যাকে/টেবিলে এমনভাবে সাজিয়ে রাখুন, যাতে টেবিলের সামণে দাঁড়ালে সহজে প্যাকেটে/বোতলের লেখা দেখা যায়।

২. রোগনাশক নাড়াচাড়ার আগে মাক্স, হ্যান্ড গ্লোবস, গামবুট, এ্যাপ্রোন ও চশমা পরতে হবে।

৩. লেবেল কোন রোগের জন্য ব্যবহার করা যাবে তা দেখে নিতে হবে।

৪. লেবেলে রোগনাশক ব্যবহারের মাত্রা লেখা থাকে তা ভালোভাবে দেখে নিতে হবে।

৫. প্যাকেট/বোতলের লেখা পড়ে, তার নাম, ভৌতিক অবস্থা ও রঙ পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখতে হবে।

৬. লেবেলে কোন রোগের জন্য ব্যবহার করা যাবে তা দেখে নিতে হবে। লেবেলে রোগনাশক ব্যবহারের মাত্রা লেখা থাকে তা ভালোভাবে দেখে নিতে হবে।

রোগনাশকের মাত্রা নির্ধারণ

১. প্যাকেটের বোতলের গায়ে লেখা মাত্রা দেখে ব্যালেন্স/বিকার/সিলিন্ডারের সাহায্যে মেপে নিতে হবে। পাউডার/দানাদার হলে ব্যালেন্সের ওপর সাদা কাগজ দিয়ে তাতে রোগনাশক ওজন করে নিতে হবে তরল হলে পিপেট/দাগ কাটা সিলিন্ডার/ড্রপার দ্বারা রোগনাশক মেপে নিতে হবে।

২. রোগনাশক মাপার পরে বালতিতে নির্দেশনা মোতাবেক পরিষ্কার পানি নিয়ে তাতে রোগনাশক ঢালতে হবে। তারপর বাঁশের/কাঠের লাঠি দিয়ে নাড়াচাড়া করে মেশাতে হবে।

৩. বালতিতে রোগনাশক মিশ্রিত পানি স্প্রেয়ার মেশিনে সাবধানে ঢেলে মুখ বন্ধ করে পাম্প করতে হবে।

রোগনাশক দক্ষভাবে ব্যবহার

১. রোগনাশক ব্যবহারের জন্য মাপা, মিশ্রণ তৈরি, স্প্রেয়ারে ঢালা ইত্যাদি কাজ করার পূর্বে গামবুট, এ্যাপ্রোন, মুখোশ ও হ্যান্ড গ্লোবস পরতে হবে।

২. এ্যাপ্রোন না থাকলে গায়ের স্বাভাবিক কাপড়ের উপর ঢিলে-ঢালা বিশেষ তৈরি পোশাক পরতে হবে।

৩. বৃষ্টি বা মেঘলা অবস্থায় স্প্রে করা যাবে না।

৪. বাতাসের অনুকূলে স্প্রে করতে হবে।

৫. স্প্রে করার সময় স্প্রে নজল যতদূর সম্ভব নিচু করে ধরতে হবে।

৬. প্রখর রৌদ্র বা ঝড়ো বাতাসের সময় স্প্রে করা যাবে না।

৭. রোগনাশকের খালি প্যাকেট/বোতল মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

৮. স্প্রে করার পর সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফেলতে হবে এবং মেশিনটি পরিষ্কার পানি দিয়ে ডাঙ্গায় রেখেই ধুতে হবে।

৯. কাজের প্রতিটি ধাপ খাতায় লিখতে হবে।

সবজির পোকা শনাক্তকরণ

পাঠ-১-৫ ঃ সবজির পোকা শনাক্তকরণ (ক্ষতিকর ও উপকারী পোকা, সংগৃহীত পোকার হার্বোরিয়াম তৈরি, বিষটোপ ও ফেরোমোন ব্যবহার করে ক্ষতিকর পোকা দমন)।

প্রাথমিক তথ্য- সবজির পোকা শনাক্তকরণের জন্য কীলিং জারসহ সবজি ক্ষেতে যেতে হবে। কলিং জার না থাকলে সাধারণভাবে হাত জাল দিয়ে বা সুইপ নেটের সাহায্যে পোকা সংগ্রহ করে সাবধানে পলিব্যাগে ঢুকাতে হবে, যাতে পোকা মাকড়ের কোন অংগ ভেঙ্গে না যায়। পোকা লাফালাফি করায় হাত-পা ভেংগে যায়, পাখা দুমড়ে মুচড়ে যায়, এন্টেনা ভেঙ্গে যায়। ফলে পোকা শনাক্ত করা কঠিন হয়ে যায়। রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ও বিকালে পোকা ধরা উত্তম। প্রখর সূর্যতাপ, খুব ঠান্ডা বা ঝড়বৃষ্টির সময় পোকা ধরা উচিত নয়। কেননা এ সময় পোকা ধরলে পলিথিনের গায়ে লেপ্টে যায়। তবে পোকা ধরার সাথে সাথে কীলিং জারে দেয়া সবচেয়ে ভালো।

পোকা ধরে শনাক্ত করে হার্বোরিয়াম শিটে পোকার নাম ও আক্রান্ত ফসলের নাম লিখে তার কিছুটা উপরে স্বচ্ছ টেপ বা স্বচ্ছ গাম দ্বারা পোকাকে আটকে দিতে হয়। হার্বোরিয়াম শিটে পোকা গাম দিয়ে বা ছোট ভায়ালে পুরে পেট দিয়ে আটকে দেওয়া যায়। সম্পূর্ণ হার্বোরিয়াম শিটটিতে (২৯ সেমি. × ৪২ সেমি.) পোকা স্থাপন করে সেলোফিন পেপার দিয়ে মুড়ে রাখতে হয়। তাতে বৎসরাধিককাল পোকা সংরক্ষণ করা যায়। সেলোফিন পেপার দিয়ে মুড়ানোর সময় ন্যাপথেলিন দেয়া যায়।

পোকা ধরা বা মারা অনেক রকমের ফাঁদ আছে, যার অনেকগুলোই সহজে তৈরি করা যায়। এক এক ধরনের পোকা মারা বা ধরার জন্য এক এক রকমের ফাঁদ কার্যকর। যেমন– আলোর ফাঁদ, রস ফাদ, ফেরোমোন ব্যবহৃত ফাঁদ, বিষ ফাঁদ ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. পোকা ধরার হাতজাল (সুইপিং নেট)	১২. ওয়াচ গাস
২. স্বচ্ছ পলিথিন ব্যাগ	১৩. কাঁচি
৩. রাবার ব্যান্ড	১৪. গাম
৪. চিমটা (ফরসেপ)	১৫. স্বচ্ছ পট
৫. কিলিং জার	১৬. বাঁশের খুঁটি
৬. আতশ কাঁচ	১৭. পোকা লেবেলিং কার্ড
৭. ভায়ালরাবার টিউব	১৮. হার্বোরিয়াম কীট
৮. প্লাষ্টিকের ছোট গামলা	১৯. সেলোফিন পেপার
৯. সাবান গোলা পানি	২০. খাম (মথ রাখার জন্য)
১০. বিভিন্ন ফাঁদ (ফেরোমোন, বিষ টোপ)	২১. এ্যাসপিরেটর।
১১. পেট্রিডিস	

১. পোকা ধরার জাল নিয়ে সবজি ক্ষেতে যেতে হবে।

২. জাল দিয়ে সুইপ করে পোকা ধরে স্বচ্ছ পলিব্যাগে বা কিলিংজারে নিয়ে তাতে ক্লোরোফর্ম দ্বারা ভেজাতুলা দিয়ে পাত্রের মুখ কিছুক্ষণ বন্ধ রেখে দিলে পোকা মারা যাবে।

৩. এরপর পলিব্যাগ/জার হতে পোকা বের করে ওয়াচ গ্লাসের উপর রেখে প্রত্যক্ষ করে পোকাগুলোকে শনাক্ত করতে হবে।

৪. যে পোকা ছোট ও ধীর গতিতে চলে সেক্ষেত্রে এসপিরেটরের সাহায্যে পোকা ধরে ভায়ালে নিতে হবে। মথ হলে খামে পুরে নিতে হবে।

৫. হার্বোরিয়াম শিটে পোকা স্থাপনের আগে শুকিয়ে নিতে হবে। পোকা শুকাতে ৭/৮ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। অনেক পোকা শুকানোর পর হাত পা শক্ত হয়ে যায়। তাই পেট্রিডিসে ০.৫-১.০ সেমি. পুরু ভিজা বালি দিয়ে তাতে ৩-৪ ফোটা কার্বোলিক এসিড দিয়ে ব্লটিং পেপার বিছাতে হবে। এর উপর পোকা রেখে ঢাকনা দিয়ে বন্ধ রাখলে আস্তে আস্তে পোকাটি নরম হবে। প্রজাপতি/মথজাতীয় পোকার পাখা ছড়িয়ে রাখতে হয়। সেজন্য স্প্রেডিং বোর্ডে রেখে মাথার নিচে পাখার সংযোগস্থলে (থোরাক্স) ইনসেক্ট পিন গেঁথে দিতে হবে। পাখাগুলোকে ফরসেফ দিয়ে টান করে পাখার উপর ছোট কাগজের টুকরো স্থাপন করে কাগজের দুই মাথায় পিন দিয়ে চেপে কয়েকদিন রাখতে হবে।

৬. তৈরিকৃত ও শনাক্তকৃত নমুনাগুলোকে হার্বোরিয়াম শিটে পিন/ভায়ালে টেপ লাগিয়ে/শক্ত টুকরা কাগজে গাম দিয়ে পিনে আটকিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি নমুনার নিচে লেবেলিং করতে হবে।

পোকার নাম ঃ পোষাকের নাম ঃ সংগ্রহের স্থান

সংগ্রহের তারিখ ঃ সংগ্রহকারী ঃ ফেরোমোন ফাঁদ

(ক) স্বচ্ছ প্লাষ্টিক বৈয়াম নিয়ে তার দুইদিকে ত্রিকোণাকার করে কেটে ফাঁকা করতে হবে।

(খ) বৈয়ামের ঢাকনার মাঝখানে ছিদ্র করে গুনা (তার) ঢুকিয়ে সেক্স ফেরোমোন (তুলা ও সুতা দিয়ে পেঁচিয়ে ফেরোমোনকে গুটি বানিয়ে রাবার নলের মধ্যে ভরে দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হবে। প্রতি গুটিতে ২০ ফোটা ফেরোমোন মাখাতে হবে।

(গ) বয়েমের নিচের অংশে ৩-৪ সেমি. সাবান মিশ্রিত পানি রাখতে হবে।

(ঘ) এভাবে তৈরি বয়েমটির যে দুইদিকে কাটা নেই সেদিকে দুটি বাঁশ দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। এভাবে বানানো ফাঁদে পোকা আকৃষ্ট হয়ে পানিতে পড়ে মারা যাবে।

(ঙ) ফাঁদ প্রধানত বেগুন ক্ষেতে বেশি ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে শুধু পুরুষ মাছিই আকৃষ্ট হয় এবং মারা যায়।

৭. বিষটোপ

(ক) লাউ, কুমড়া, করলা, কাঁকরোল, ঝিঙ্গা, চিচিংগা, ধুন্দল, খিরা, পটলজাতীয় ক্ষেতে ফলের মাছি পোকা দমনের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

(খ) ছোট মাটির সানকি বা নারকেলের মালায় ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টিকুমড়া (কুচি কুচি করে কেটে তা থেঁতলে ও পিষে) কাই করে নিতে হবে।

(গ) কাই করা মিষ্টি কুমড়ার সাথে ১২ ফোটা ডিডিভিপি/সামান্য ডিপটেরেক্স নিয়ে ৫০-১০০ মিলি পানি দিতে হবে।

(ঘ) ৩-৪টি গিটওয়ালা বাঁশ নিয়ে উপরের ১-২ টা গিট পর্যন্ত সমানভাবে ৩ ভাগে ফাঁড়তে হবে।

(ঙ) বাঁশটি সবজি ক্ষেতে মাচার চাইতে অন্তত ১৫-২০ সেমি. উঁচু করে পুঁতে ফাঁড়া মাথা ফাঁক করে বিষ মিশ্রিত সানকিটি সেখানে বসাতে হবে।

(চ) সানকিটি যাতে পড়ে না যায়, সেজন্য সুতলি দিয়ে ফাঁড়া বাঁশের মাথা টান করে বেঁধে দিতে হবে। এরপর বাঁশের মাথার উপর একটা ঢাকনা দিতে হবে, যাতে বিষটোপের পাত্র ও ঢাকনার মধ্যে অন্তত ১০ সেমি. ফাঁক থাকে।

(ছ) বিষটোপ শুধু পুরুষ মাছির তুলনায় স্ত্রী মাছি বেশি আসে। স্ত্রী মাছিরাই এসব সবজিতে ডিম পেড়ে নষ্ট করে। তাই স্ত্রী মাছি মারা গেলে সবজি ক্ষেত রক্ষা পায়।

(জ) কাজের প্রতিটি ধাপ খাতায় লিখতে হবে।

আধুনিক কলা কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা

পাঠ-১-২ ঃ আধুনিক কলা কৌশল (হরমোন ব্যবহার, হাইব্রিড বীজ ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা

প্রাথমিক তথ্য হরমোন- ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন ও আধুনিক কলাকৌশলের মধ্যে হরমোনের ব্যবহার ও হাইব্রিড বীজ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। হরমোন এক প্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যা উদ্ভিদে কিছু কিছু স্থানে অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়ে শরীরবৃত্তীয় অনেক প্রকারের কাজ করে থাকে। হরমোন উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশে অর্থাৎ কাণ্ডের শীর্ষে, মুলের অগ্রভাগে এবং যেখান হতে শাখা প্রশাখা উৎপত্তি হয় সে সমস্ত স্থানের কোষে একপ্রকার বৃদ্ধিকারী পদার্থ (হরমোন নিঃসৃত হয়।

হরমোন কৃষি ক্ষেত্রে ফসলের বৃদ্ধি ও পুষ্টি ঘটায়। যেমন-

১. গাছের কলমে নতুন মূল গজাতে সাহায্য করে।
২. ক্যামবিয়াম স্তরের সৃষ্টি করে ও শাখা প্রশাখা বিস্তারে সহায়তা করে।
৩. গাছের ক্ষতস্থান পূরণে সাহায্য করে।
৪. আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৫. আলুর দ্রুত অঙ্কুরোদগম বিঘ্নিত করে।
৬. দ্রুত পুষ্প ধারন ও ফলে পরিণত হতে সাহায্য করে।
৭. গাছে শস্য ধারন ক্ষমতা বাড়ায়।

উদ্ভিদের বৃদ্ধি, প্রজনন, ফুল, ফল ধারণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ হয় যে সমস্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা তা হলো–(ক) অক্সিন (খ) জিবারেলিন গ) কাইনিন বা সাইটোকাইনিন, ঘ) ডরমিন ঙ) ইথিলিন।

হাইব্রিড- বৈসাদৃশ্যমূলক গুণসম্পন্ন দুইটি একই জাতীয় ফসলের মধ্যে সংকরায়ন করে প্রথমে এমন এফ-১) উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যার গুণাবলি হবে উন্নত ধরনের। যেমন- সতেজ, পীড়ন সহিষ্ণুতা, ফলন ও দানার গুণ বেশি ইত্যাদি। যখন এফ-১ উন্নত ধরনের হয় তখন তাকে শংকর সাবল্য বলে। শংকর সাবল্য প্রকাশ করা হয়, সেই ফসলের ফলন, গাছের বৈশিষ্ট্য, ফলের সংখ্যা ও আকার ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। হরমোন ২। কাঁচি/চাকু ৩। বিভিন্ন ধরনের সবজির ক্ষেত ৪। স্প্রে মেশিন
৫। বালতি ৬। পানি ৭। হাইব্রিড বীজ কাজের ধাপ

হরমোন

১. ফসলের ধরন (পাতাজাতীয়, ফলজাতীয়, কন্দজাতীয়) অনুসারে হরমোন নির্ধারণ করতে হবে।

২. উদ্ভিদের শেকড় গজানোর কাজে, ফুল থেকে ফল ধারনের কাজে, আগাছা নিধনে অক্সিন হরমোন প্রয়োগ করতে হবে।

৩. দ্রুতবর্ধনশীল কাণ্ডের অগ্রভাগ ভেংগে বা কেটে দিলে তার নিচের অংশে অক্সিন ক্রিয়াশীল হয়ে অনেক মুকুল ও শাখা গজায়ে দিবে। এ কাজটি লতানো সবজিতে, টমেটো, পেঁপে গাছের মাথা কেটে বা ভেঙ্গে দিয়ে প্রমাণ করা যাবে।

৪. গাছের বৃদ্ধি ধীর হলে হরমোন জিবারেলিন ব্যবহার করে গাছকে দীর্ঘ ও অনেক বড় আকার করা যাবে। বীজ অঙ্কুরোদগম ও গাছের সুপ্তাবস্থা দূর করতে এটি ব্যবহার করা যাবে।

৫. উদ্ভিদের মূল উন্নত করতে বেশি পরিমাণ অক্সিন ও অল্প পরিমাণ কাইনিন ব্যবহার করতে হবে।

৬. মুকুল ও বীজের সুপ্তাবস্থা দূর করে, স্বল্প দিবসীয় গাছের ফুল ফোটা ত্বরান্বিত করার জন্য ডরমিন হরমোন ব্যবহার করতে হবে।

৭. ছায়াতে জন্মানো চারায় ইথিলিন চারাকে স্ফীত করে। ফুল ফোঁটাতে ও ফল পাকাতে ইথিলিন ব্যবহার করা যাবে।

হাইব্রিড বীজ

১. হাইব্রিড বীজ বপন। রোপণের জন্য নির্দিষ্ট সময় জেনে নিতে হবে। কেননা বৃদ্ধি পর্যায়ে, ফুল ফোঁটা, ফল ধারন ইত্যাদি পর্যায়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা না থাকলে ফলনে ভীষণ প্রভাব পড়বে।

২. হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে হলে মাটি খুব উর্বর হতে হবে।

৩. হাইব্রিড বীজ দ্বারা ফসল জন্মানোর পর সেই ফসল হতে পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য বীজ হিসেবে রাখা যাবে না।

৪. হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে ফসল ফলাতে হলে সকল ধরনের পরিচর্যা সঠিকভাবে সঠিক সময়ে করতে হবে, অন্যথা ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৫. সব কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে খাতায় লিখতে হবে।

সমাপ্ত

স্বাস্থ্যসেবা : শেখ হাসিনার অবদান, কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দশটি বিশেষ উদ্যোগের একটি হলো কমিউনিটি ক্লিনিক। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সারাদেশে মোট ১৩,৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সাধারণ রোগের জন্য এসব কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ৩২ প্রকার ওষুধও সরবরাহ করা হয়।

২০২২ শিক্ষাবর্ষ

ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবল কাল্টিভেশন-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য